ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস পরিক্রমা

শ্রীপ্রভাতাংশু মাইতি

শ্রীধর প্রকাশনী

পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের নব-প্রবর্তিত পাঠ্যসূচী অনুসারে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য রচিত।

[Vide W. B. H. S. Council's Syllabus Volume I. Published in March, 1976]

ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস পরিক্রমা

(১৭৬৩—১৯৪৫)

[একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর পাঠ্য]

অধ্যাপক **প্রভাতাংশু মাইতি**, এম. এ.

ইতিহাস বিভাগের প্রধান অধ্যাপক, স্কটিশ চার্চ কলেজ, কলিকাতা এবং 'Studies in Ancient India', 'A History of Europe', 'ইওরোপের ইতিহাস পরিক্রমা', 'আধুনিক ভারত' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা।

শ্রীধর প্রকাশনী

প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা

১০৩/৪ ডি. বিধান সরণী • কলিকাতা-৬

প্রকাশক ঃ
শ্রীনীহারেন্দ্র পান
শ্রীধর প্রকাশনীর পক্ষে
২০৩/৪ডি, বিধান সরণী
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রথম প্রকাশ ঃ আগষ্ট, ১৯৭৬
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ জুলাই, ১৯৭৮
তৃতীয় সংস্করণ ঃ আগষ্ট, ১৯৭৯

মূল্য ঃ বার টাকা মাত্র

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীঅমলেন্দু পান, এম. এ.
রামকৃষ্ণ মুদ্রণালয়
২০৯ বি, বিধান সরণী
কলিকাতা-৭০০০০৬

ভূমিকা

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচী অনুযায়ী 'ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস পরিক্রমা' লিখিত হইল। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ হইতে বিংশ শতকের চতুর্থ দশকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত বিশ্ব ইতিহাসের প্রধান ঘটনাবলী এই পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। অধুনা ইতিহাসের পঠন-পাঠন পদ্ধতির মৌলিক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ইতিহাসকে কেবলমাত্র ঘটনাপঞ্জীতে পরিণত না করিয়া ইতিহাসের মর্মবস্তুর বিশ্লেষণ করাই বর্তমানকালের স্বীকৃত রীতি। ইতিহাসের মর্মকথার সহিত ছাত্রগণের পরিচয় না হইলে ছাত্রগণের নিকট পরীক্ষার সময় ইতিহাস এক ভীতিপ্রদ বিষয় বলিয়া মনে হইবে। ছাত্র-ছাত্রীগণ কোন রকমে তাহা কণ্ঠস্থ করিয়া পরীক্ষা-সমুদ্র পার হওয়াই একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া মনে করিবে। তাহাদের মনে জিজ্ঞাসার উদয় হইবে না। অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে জ্ঞানদীপ্তি, শিল্প-বিপ্লব, আমেরিকার বিপ্লব ও ফরাসী বিপ্লব এই চারিটি বিপ্লব বিশ্ব ইতিহাসের মোড় ফিরাইয়া দেয়। পরবর্তী শতকে তাহার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ হইতে সমাজতন্ত্রবাদ, জাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিশ্ব ইতিহাসে নব ভাবধারার সৃষ্টি করে। এই পুস্তক রচনার সময় এই সকল ভাবধারা ও তাহাদের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। বিভিন্ন প্রামাণ্য ঐতিহাসিকের রচনার সহায়তা লইয়া এই পুস্তকটি রচিত হইয়াছে। পাদটীকায় মূল গ্রন্থকারের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। ছাত্র-ছাত্রীগণের সুবিধার জন্য পার্শ্বটীকা দেওয়া হইয়াছে। উৎসাহী ছাত্র-ছাত্রীগণের জন্য পাদটীকায় উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়াছে। সংসদের নির্ধারিত পৃষ্ঠা সংখ্যার স্বল্প পরিসরের মধ্যেই পুস্তকটির মান যথাসাধ্য উন্নত করার চেষ্টা করা হইয়াছে।

নব প্রবর্তিত উচ্চ মাধ্যমিক একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী একটি সর্বভারতীয় জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনার সন্তান। কেহ কেহ ইহাকে প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় বা অধুনালুপ্ত ইণ্টার মিডিয়েট শ্রেণীর মানের সমতুল্য মনে করিয়া পাঠ্য পুস্তক রচনা করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়। কিন্তু উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সিলেবাস পুস্তকে স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে যে, মাধ্যমিক শিক্ষার শেষ পর্যায় (end stage) হিসাবে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাকে গ্রহণ করা দরকার। ইহাকে স্বয়ং-সম্পূর্ণ শিক্ষা পর্যায় হিসাবে গণ্য করা উচিত। এই কথা মনে না রাখিলে পাঠ্য পুস্তকগুলি হয় অতি সরলীকরণ অথবা অতি কঠিনতা দোষে দুষ্ট হইবে। এই পুস্তক রচনার সময় উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর মান অনুযায়ী তথ্য পরিবেশনের চেষ্টা করা হইয়াছে। পুস্তকটি চলিত ভাষায় ছাত্র-ছাত্রীগণের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া লিখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। পুস্তকের প্রথমে সংসদের পাঠ্যসূচী ও শেষে সংক্ষিপ্ত ও রচনাত্মক প্রশ্নাবলী সংযোজিত করা হইয়াছে।

কোন পাঠ্যপুস্তক, সর্বাঙ্গসুন্দর ও ত্রুটিমুক্ত হইতে পারে না। সুতরাং 'ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস পরিক্রমার' কোন ত্রুটি থাকিবে না এমন অহমিকা প্রকাশ আমি যুক্তিযুক্ত

মনে করি না। মাননীয় শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ এই পুস্তকটির উন্নতিকল্পে কোন পরামর্শ দিলে সাদরে গ্রহণ করিব। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য আমার লিখিত অন্যান্য পুস্তকগুলির ন্যায় এই পুস্তকটি সমাদৃত হইবে বলিয়া আশা করি।

আমার ছাত্র অধ্যাপক অমলেন্দু পানকে প্রুফ দেখিয়া দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাই। যদি কোন ত্রুটি তাহার সতর্ক চক্ষু এড়াইয়া গিয়া থাকে তাহার জন্য লেখকই দায়ী। পরিশেষে আমার সহকর্মী শিক্ষক-শিক্ষিকাগণকে বিনীত ধন্যবাদ জানাই। ইতি—

পি ৯০৫ লেক টাউন
কলিকাতা-৫৫
১লা আগষ্ট, ১৯৭৬

বিনীত
গ্রন্থকার

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস পরিক্রমার তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হোল। এই সংস্করণ প্রকাশের সময় বইটিকে আগাগোড়া পরিমার্জন করা হয়েছে, অনেক নূতন তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। তাছাড়া মূল ইংরাজী বইয়ের উদ্ধৃতিগুলি পাতার নীচে দেওয়া হয়েছে। বইটির মান যথা সম্ভব উন্নত করার চেষ্টা হয়েছে। লাইনো টাইপে বইটি ছাপা হয়েছে। আশা করি সহৃদয় শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ আগের সংস্করণের মত বইটির প্রতি আগ্রহ দেখাবেন। আমার ছাত্র শ্রী অমলেন্দু পান এম. এ. প্রুফ দেখে আমায় অশেষ ঋণে বদ্ধ করেছে। যদি কোন ভুল তার সতর্ক চক্ষুর অগোচর থাকে তবে সে দোষ আমারই। পরিশেষে শিক্ষক-শিক্ষিকাগণকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। ইতি—

পি ৯০৫ লেক টাউন
কলিকাতা-৫৫
২৫শে জুলাই, ১৯৭৯

বিনীত
গ্রন্থকার

REVISED SYLLABI IN HISTORY IN EUROPE AND THE WORLD (1763—1945)

Paper II (Full Marks—100)

CHAPTER I

Europe 1763-1789—Europe in 1763—Englightened Despotism.

CHAPTER II

Industrial Revolution—Scientific Inventions and Growth of Mechanical Industries—Factory system—Effects of the Industrial Revolution upon contemporary society and politics.

CHAPTER III

War of American Independence—Background—Causes of War—Treaty of Versailles 1783.

CHAPTER IV

French Revolution and Napoleon—Causes of the Revolution—Calling of the States General—National Assembly—Legislative Assembly—National Convention—Reign of Terror—Significance of the Revolution—Advent of Napoleon—From Consulate to Empire—Reforms and conquests of Napoleon—his fall—Impact of the Revolution on Europe.

CHAPTER V

Reconstruction of Europe—The Congress of Vienna—Metternich system—Concert of Europe : its activities, causes of its failure.

CHAPTER VI

Revolution and Reaction—July Revolution—February Revolution—Greek War of Independence.

CHAPTER VII

The Mid-Century upheavel—National Revolutions of 1848-50—The sequence, character and sequel of the Revolutions.

CHAPTER VIII

Relations of Great Powers, 1850-71—The Eastern Question and the Crimean War—France under Napoleon III—Unifications of Italy and Germany—Franco-Prussian War—Significance of the Settlement of 1871.

CHAPTER IX

Major Eupopean States and the system of Alliances—Germany under Bismarck and William II (1871-1914)—Russia under Alexander II, Alexander III and Nicholas II—System of Alliances.

CHAPTER X

Socialism and Imperialism—Karl Marx and Socialism—Reforms and revolutions in China.

CHAPER XI

Dismemberment of the Ottoman Empire—Development of Balkan Nationalism—From Treaty of Berlin of Balkan Wars.

CHAPTER XII

First World War and its aftermath—Causes of the War—Major Participants—Peace Settlement of 1919-23—League of Nations—Modernisation of Turkey.

CHAPTER XIII

Russian Revolution—its impact.

CHAPTER XIV

Dictatorship and Failure of Collective Security—Locarno Treaty and Pact of Paris—Disarmament—Work :of the League—Fascism on the ascendant and breakdown of Collective Security—Chamberlain—Daladier—Mussolini—Hitler and Stalin—Origin of Second World War.

———

সূচীপত্র

• ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস পরিক্রমা •

সূচনা

(Introduction)

ইতিহাস প্রবাহমান। কোন নির্দিষ্ট গণ্ডীতে ইতিহাসকে ভাগ করা সম্ভব নয়। মানব সভ্যতার কাহিনীই হইল ইতিহাসের মুখ্য বস্তু। আদিম গুহাবাসী মানুষ নিষ্ঠুর প্রকৃতির সহিত নিরন্তর সংগ্রাম করিয়া জীবন ধারণ করিয়াছে। ক্রমে তাহারা সমাজ গড়িতে শিখিয়াছে, রাষ্ট্র স্থাপন করিয়াছে। আজ মানুষের অভীপ্সা পৃথিবী ছাড়াইয়া চাঁদে পৌঁছিয়াছে। একদিকে বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ প্রাকৃতিক শক্তিকে জয় করিয়া জীবন যাত্রাকে সুগম করিয়াছে। অপরদিকে মানুষের সামাজিক, রাষ্ট্রিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য দার্শনিক ও চিন্তাবিদ্‌গণ কাজ করিয়াছেন।

ইতিহাসের গতিপথে বিশেষ ধারার প্রভাব দেখা যায়। আধুনিক যুগের ইতিহাসের মুখ্য ধারা হইল রেনেসাঁস বা পুনর্জাগরণ আন্দোলন। মধ্যযুগে মানুষ ছিল অন্ধ বিশ্বাসী। স্বাধীন ও যুক্তিবাদী চিন্তাধারাকে মধ্যযুগে আমল দেওয়া হইত না। পোপের নেতৃত্বে খ্রীষ্টীয় গীর্জা মানুষের সামাজিক ও আত্মিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করিত। খ্রীষ্টীয় গীর্জা যাহা অনুমোদন করিত না তাহা পালন করা ছিল ঘোরতর অপরাধ। আধুনিক যুগের রেনেসাঁস আন্দোলন মানুষের মনের এই জড়ত্বকে কাটাইয়া স্বাধীনভাবে চিন্তার অধিকার দেয়। স্বাধীন চিন্তার প্রসারে মানুষের হারাইয়া যাওয়া ব্যক্তিত্ব আবার ফিরিয়া আসে। প্রাচীন গ্রীক, লাতিন দার্শনিক ও সাহিত্যকারগণের রচনা পড়িয়া মানুষ নূতন করিয়া আত্মবিশ্বাস ফিরিয়া পায়। রেনেসাঁস আন্দোলন ইওরোপের চিন্তা জগতে যে মুক্তির হাওয়া বহাইয়া দেয় তাহার ফলে সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শন, ভৌগোলিক আবিষ্কার সর্বক্ষেত্রেই ইওরোপীয় জাতিগুলির প্রতিভা ও উদ্যম ছড়াইয়া পড়ে। ধর্ম নিরপেক্ষ, যুক্তিবাদী, সৃজনশীল জীবনযাত্রার ডাকে ইওরোপীয় জাতিগুলি সাড়া দেয়।

রেনেসাঁস আন্দোলনের ফলে ইওরোপীয় সাহিত্য পেত্রার্ক, বোক্‌কাচো, ইরাসমাস, হোরেস, টমাস মোর, ফ্রান্সিস বেকন প্রভৃতি মনীষীর দানে সমৃদ্ধ হয়। চিত্রকলায় লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, মাইকেল এ্যাঞ্জেলো, রাফায়েল প্রভৃতি চিত্রশিল্পীগণ নূতন যুগের সূচনা করেন। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কম্পাস, সামুদ্রিক জরিপ ও আগ্নেয়াস্ত্র আবিষ্কারের ফলে ইওরোপীয়গণ নূতন শক্তি লাভ করে। দুঃসাহসী নাবিকেরা ইওরোপীয় বাণিজ্য ও উপনিবেশ বিভিন্ন দেশে বিস্তারের কাজে লাগিয়া পড়ে। বার্থলোমিউ দিয়াজ নামে এক পর্তুগীজ নাবিক ১৪৮৭ খ্রীঃ ভারতে আসিবার জন্য উত্তমাশা অন্তরীপ পর্যন্ত পথ আবিষ্কার করেন। কলম্বাস ১৪৯২ খ্রীঃ আমেরিকা মহাদেশ আবিষ্কার করেন। পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-দা-গামা উত্তমাশা অন্তরীপ হইয়া ১৪৯৮ খ্রীঃ ভারতের কালিকট বন্দরে পৌঁছান। ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে আমেরিকা, ভারত ও প্রাচ্য দেশে ইওরোপের বাণিজ্য ও উপনিবেশ বিস্তারের সূচনা হয়।

আধুনিক যুগের অন্যতম প্রধান ঘটনা হইল জাতীয় রাষ্ট্রের উৎপত্তি। মধ্যযুগের পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের স্থলে ফ্রান্স, জার্মানী, রাশিয়া, ইংলণ্ড প্রভৃতি জাতীয় রাষ্ট্র গড়িয়া উঠে। জাতীয় রাষ্ট্র জাতীয় রাজতন্ত্রের মাধ্যমে বিকাশ লাভ করে। ফ্রান্সের বুরবোঁ রাজবংশ, অষ্ট্রিয়ার হ্যাপসবার্গ রাজবংশ, ইংলণ্ডের হ্যানোভার রাজবংশ, প্রাশিয়ার হোহেনজোলার্ন রাজবংশ এবং রাশিয়ার রোমানভ রাজবংশ জাতীয় রাষ্ট্রের আদর্শকে রূপায়িত করে।

আধুনিক যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল সাম্রাজ্য ও উপনিবেশের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ইওরোপের বাহিরে উপনিবেশের অধিকার লইয়া ইংলণ্ডের সহিত ফ্রান্স ও স্পেনের দীর্ঘকাল লড়াই চলে। শেষ পর্যন্ত উপনিবেশের লড়াইয়ে ইংলণ্ড তাহার নৌবলের সাহায্যে জয়লাভ করিয়া বিশ্ব শক্তিতে পরিণত হয়। অপরদিকে ইওরোপের অন্যান্য শক্তিগুলি নৌবলকে গুরুত্ব না দিয়া স্থল যুদ্ধে মত্ত থাকায় তাহাদের শক্তি ইওরোপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

আধুনিক যুগে শিল্প বিপ্লবের ফলে বড় বড় কল-কারখানা গড়িয়া উঠে। কল-কারখানায় প্রভূত উৎপাদনের ফলে উদ্বৃত্ত মাল বিক্রয়ের জন্য নূতন বাজারের দরকার দেখা দেয়। এজন্য ইওরোপীয় জাতিগুলি এশিয়া ও আফ্রিকার বাজার দখলের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামিয়া পড়ে। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে এজন্য তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাধে। শিল্প বিপ্লবের ফলে ইওরোপের অর্থনীতি ও সমাজের চেহারা পাল্টাইয়া যায়। বড় বড় কল-কারখানা গড়িয়া উঠিলে লোকে উহাতে কাজ করিয়া নূতনভাবে জীবিকা অর্জনের সুযোগ পায়। দ্বিতীয়তঃ, এক শ্রেণীর লোক কল-কারখানা চালাইয়া এবং ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া প্রচুর মুনাফা লাভ করে। এই নূতন ধনতন্ত্রী শ্রেণী সমাজে পুরাতন সামন্ত শ্রেণীকে হঠাইয়া ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করে। তৃতীয়তঃ, কল-কারখানাকে কেন্দ্র করিয়া বড় বড় শহর গড়িয়া উঠে। গ্রাম হইতে বহু লোক জীবিকার জন্য এই সকল কল-কারখানায় কাজ করিতে আসিয়া শহরে ও বস্তিতে বসবাস করিতে থাকে। ইহার ফলে গ্রামীন জীবনের পরিবর্তন হয়। শহরগুলি জনসংখ্যার চাপে ধুঁকিতে থাকে।

সর্বশেষে, অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় ভাগকে "বিপ্লবের যুগ" (Age of Revolution) বলা হয়। এই সময় তিনটি বিপ্লব ঘটে, আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ, ফরাসী বিপ্লব ও শিল্প বিপ্লব। এই তিনটি বিপ্লবের ফলে সমাজ, রাষ্ট্র, সর্বক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন ঘটে। আমেরিকার গণতান্ত্রিক ও যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থা ও মানব অধিকারের ঘোষণা এক নবীন রাষ্ট্রাদর্শের সূচনা করে। ফরাসী বিপ্লব ইওরোপের পুরাতন রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থায় প্রচণ্ড আঘাত হানে। সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার আদর্শ ভবিষ্যৎ ইতিহাসকে প্রভাবিত করে। শিল্প বিপ্লব কৃষি ও কুটীর শিল্প নির্ভর অর্থনীতিকে পাল্টাইয়া কল-কারখানা ও শহর নির্ভর অর্থনীতির পত্তন করে।

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে ইওরোপের অবস্থা
(Europe in the Middle of the Eighteenth Century

১৭৬৩ খ্রীঃ ইওরোপের রাজনৈতিক অবস্থা (Europe in 1763) ঃ ১৭৬৩ খ্রীঃ দুইটি সন্ধির দ্বারা সপ্তবর্ষের যুদ্ধের অবসান ঘটে, যথা হিউবাটসবার্গের সন্ধি এবং প্যারিসের সন্ধি। হিউবাটসবার্গের সন্ধির দ্বারা অষ্ট্রিয়া সাইলেশিয়া প্রদেশ স্থায়ীভাবে প্রাশিয়াকে ছাড়িয়া দেয়। প্যারিসের সন্ধি দ্বারা ফ্রান্স, কানাডা, কেপ ব্রিটন, নোভাস্কোশিয়া প্রভৃতি উত্তর আমেরিকার স্থানগুলি ইংলণ্ডকে ছাড়িয়া দেয়। ইংলণ্ড আমেরিকা মহাদেশে মিসিসিপি নদী পর্যন্ত উপনিবেশ বিস্তারের অধিকার পায়। প্যারিসের সন্ধি দ্বারা ভারতবর্ষেও ইংরাজ অধিকার প্রতিষ্ঠার পথ রচিত হয়। ভবিষ্যতে ফরাসীরা ভারতে রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করিবে না এবং ভারতীয় রাজনীতিতে হাত দিবে না এই প্রতিশ্রুতি তাহাদের দিতে হয়। ইংরাজের নিকট হইতে ফরাসীরা তাহাদের বাণিজ্যকেন্দ্র যথা চন্দননগর, পণ্ডিচেরী, মাহে প্রভৃতি ফিরিয়া পায়। ইহার ফলে ফরাসী বাধা না থাকায় ইংলণ্ড নিরঙ্কুশভাবে ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনের সুযোগ পায়। স্পেন প্যারিসের সন্ধির দ্বারা মধ্য আমেরিকায় ফ্লোরিডা প্রদেশ ইংলণ্ডকে ছাড়িয়া দেয়।

হিউবাটসবার্গ ও প্যারিসের সন্ধি ঃ সপ্তবর্ষের যুদ্ধের অবসান

ঐতিহাসিক রেড্ডাওয়ে অভিমত দিয়াছেন যে ১৭৬৩ খ্রীঃ যাহা ঘটিয়াছিল তাহা অপেক্ষা যাহা ঘটিবার সূচনা হয় তাহা অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ।[১] ১৭৬৩ খ্রীঃ বৃহৎ ঘটনা ছিল ইংলণ্ডের ঔপনিবেশিক আধিপত্য লাভ এবং পৃথিবীর প্রধান নৌ-শক্তিরূপে ইংলণ্ডের আত্মপ্রকাশ। প্যারিসের সন্ধি দ্বারা ইংলণ্ড ভারতে ও উত্তর আমেরিকায় প্রায় একচ্ছত্র অধিকার পায়। কানাডায় ইংলণ্ডের আধিপত্য স্থাপিত হয়। মধ্য আমেরিকায় স্পেনের ক্ষমতা হ্রাস পাইলে ইংলণ্ড প্রতিপত্তি লাভ করে। ইংলণ্ড তাহার নৌবলের সাহায্যে একদিকে সাম্রাজ্য বিস্তার, অপরদিকে বাণিজ্য বিস্তারের কাজে নামিয়া পড়ে। অর্থনীতিবিদ এ্যাডাম স্মিথ এই অভিমত দিয়াছেন যে সপ্তবর্ষের যুদ্ধের ফলে ইংলণ্ডের আর্থিক স্বচ্ছলতা ও সমৃদ্ধি দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

ইংলণ্ডের নৌ ও ঔপনিবেশিক আধিপত্য লাভ

১৭৬৩ খ্রীঃ ইংলণ্ডের সফলতার পশ্চাতে একটি বিরাট ক্ষতির ছায়া লুকাইয়াছিল। ১৭৬৩ খ্রীঃ কানাডায় ফরাসী আধিপত্য ধ্বংস হইলে, উত্তর আমেরিকায় ১৩টি ইংরাজ

---

১. "The Seven Years' War is notable rather for what it sowed than for what it reaped". Reddaway—Europe from 1715—1815. P. 257.

উপনিবেশের ফরাসী আক্রমণের ভয় দূর হয়। ফরাসী আক্রমণের ভয়ে এযাবৎ তাহারা ইংলণ্ডের আশ্রয় চাহিত। সপ্তবর্ষের যুদ্ধের পর ফরাসী আক্রমণের ভয় দূর হইলে উপনিবেশগুলি ইংলণ্ডের অধীনতা পাশ ছিন্ন করিয়া ১৭৭৬ খ্রীঃ স্বাধীনতা ঘোষণা করে। সপ্তবর্ষের যুদ্ধে ইংলণ্ডের নিকট তাহার পরাজয়ের প্রতিশোধ লইবার জন্য ফ্রান্স আমেরিকার উপনিবেশগুলির পক্ষ নেয়। আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধে ফরাসী হস্তক্ষেপের ফলে ইংলণ্ডের পরাজয় ঘটে। স্বাধীন উপনিবেশগুলি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিয়া বিশ্বের অন্যতম প্রধান শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র গঠন

১৭৬৩ খ্রীঃ অষ্ট্রিয়া ও ফ্রান্সের ন্যায় দুইটি বৃহৎ শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া প্রাশিয়া ইওরোপে অসাধারণ মর্যাদা পায়। প্রাশিয়ার রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডারিক তাঁহার কূটবুদ্ধি, রণচাতুর্য ও দূরদৃষ্টির জন্য সর্বত্র মর্যাদা পান। প্রাশিয়ার উত্থান ইওরোপে এক নূতন শক্তিসাম্য প্রতিষ্ঠা করে। প্রাশিয়ার উত্থানের পূর্বে, অষ্ট্রিয়ার হ্যাপসবার্গ রাজবংশ জার্মানীর উপর নেতৃত্ব করিত। অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে সপ্তবর্ষের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া প্রাশিয়া জার্মানীর নবীন নেতা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। সপ্তবর্ষের যুদ্ধের পর হইতে অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া জার্মানীর নেতৃত্ব লাভের জন্য এক দীর্ঘস্থায়ী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মাতিয়া উঠে। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা ১৭৬৩ খ্রীঃ আরম্ভ হয় এবং প্রায় একশত বৎসর পরে ১৮৬৬ খ্রীঃ প্রাশিয়ার চূড়ান্ত জয়ের ফলে ইহার অবসান হয়।

প্রাশিয়ার উত্থান

অষ্টাদশ শতকে ইওরোপের রাজনীতিতে রাশিয়ার অনুপ্রবেশ ছিল এক বৃহৎ ঘটনা। সপ্তদশ শতকে জার পিটার দি গ্রেট বা জার মহান পিটারের আমল হইতে রাশিয়া ধীরে ধীরে ইওরোপের রাজনীতিতে অংশ লইতেছিল। পিটার শাসন সংস্কারের দ্বারা রাশিয়াকে আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করার চেষ্টা করেন। তিনি দক্ষিণে তুরস্কের সাম্রাজ্য গ্রাস করিয়া কৃষ্ণ সাগর পর্যন্ত রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করেন। উত্তর-পশ্চিমে বাল্টিক সমুদ্র পর্যন্ত তিনি রাশিয়ার রাজ্যসীমা বিস্তার করেন। অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে জারিনা ক্যাথারিণ পিটারের আরব্ধ কাজকে আগাইয়া লইয়া যান। জারিনা দ্বিতীয় ক্যাথারিণ প্রতিবেশী পোল্যাণ্ড ও তুরস্ককে গ্রাস করিয়া রাশিয়ার ক্ষমতা বাড়াইবার কাজে হাত দেন। রাশিয়ার ক্ষমতাবৃদ্ধি ইওরোপের পুরাতন শক্তিসাম্যকে ভাঙিয়া দেয়। ইওরোপের কোন্ বৃহৎ ঘটনা ইহার পর হইতে রাশিয়াকে বাদ দিয়া সমাধান করা সম্ভব হয় নাই।

রাশিয়ার উত্থান : ইওরোপীয় রাজনীতিতে প্রবেশ

রাজা চতুর্দশ লুইয়ের আমল হইতে ফ্রান্স ছিল ইওরোপের প্রধান শক্তি। সপ্তবর্ষের যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে ফ্রান্স তাহার দীর্ঘকালের স্বীকৃত মর্যাদা হারাইয়া ফেলে। ফ্রান্সের রাজা পঞ্চদশ লুইয়ের অদূরদর্শী নীতি এবং তাঁহার উপপত্নী মাদাম দ্য পম্পাদুরের রাজকার্যের উপর অশুভ প্রভাব ফ্রান্সের শাসনযন্ত্রকে বিকল করিয়া দেয়। ১৭৬৩ খ্রীঃ ফ্রান্সের ইতিহাসের সর্বপ্রধান ঘটনা ছিল উপনিবেশের যুদ্ধে ইংলণ্ডের নিকট তাহার

পরাজয়। ইহার ফলে ফ্রান্স ও ভারত আমেরিকার আধিপত্য হারায়। প্যারিসের সন্ধির দ্বারা ফ্রান্সের এই পরাজয় চূড়ান্তরূপে স্বীকৃত হয়। ঔপনিবেশিক যুদ্ধে ইংলণ্ডের নিকট ফ্রান্সের পরাজয় এবং ইওরোপের যুদ্ধে প্রাশিয়ার নিকট পরাজয় ফরাসী জাতির মনে গভীর হতাশা সৃষ্টি করে। এদিকে ফ্রান্সের বুরবোঁ রাজবংশের স্বৈরাচারী শাসন এবং অভিজাতগণের স্বার্থপরতা ফরাসী জাতির মনে গভীর অসন্তোষ সৃষ্টি করে। ফরাসী দেশ ধীরে ধীরে বিপ্লবের দিকে আগাইতে থাকে।

ফ্রান্সের পতন: ফরাসী বিপ্লবের সূচনা

সপ্তবর্ষের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া অষ্ট্রিয়া, সাইলেশিয়া প্রদেশ চূড়ান্তভাবে প্রাশিয়াকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়। ইহার পর হইতে জার্মানীর নেতৃত্ব লইয়া অষ্ট্রিয়ার সহিত প্রাশিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে। জার্মানীতে তাহার আধিপত্য বিপন্ন হইলে, ইহার ক্ষতিপূরণের জন্য অষ্ট্রিয়া ডানিউব নদী অঞ্চলে রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা চালায়। ১৭৬৩ খ্রীঃ পর স্পেনও একটি সাধারণ শক্তিতে পরিণত হয়।

অষ্ট্রিয়া ও স্পেনের অবস্থা

অষ্টাদশ শতকের মধ্য ভাগ হইতে তুরস্কের দ্রুত পতন ঘটিতে থাকে। রাশিয়ার জারিনা দ্বিতীয় ক্যাথারিণ, তুরস্কের দুর্বলতার সুযোগে তুরস্কের ইওরোপীয় সাম্রাজ্য গ্রাস করিবার চেষ্টা করেন। দ্বিতীয় ক্যাথারিণ তুরস্কের নিকট হইতে ক্রিমিয়া, ইউক্রেন ও আজফ অধিকার করেন। ইহার ফলে রুশ-তুরস্ক বিরোধ ও পূর্বাঞ্চল সমস্যার সৃষ্টি হয় (বিশদ বিবরণ অষ্টম অধ্যায় দেখ)।

তুরস্কের দুর্বলতা: পূর্বাঞ্চল সমস্যা

অষ্টাদশ শতকে প্রাশিয়া প্রভৃতি রাজ্যগুলি ন্যায় নীতি অপেক্ষা নগ্ন আক্রমণ নীতিকে বেশী মূল্য দেয়। ন্যায়বিচার ও আন্তর্জাতিক আইন অপেক্ষা "জোর যার মুলুক তার" নীতিই অধিকতর প্রকট হইয়া উঠে। ঐতিহাসিক হ্যাসালের মতে ইহার ফলে "ইওরোপের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মান অত্যন্ত নীচে নামিয়া যায়।"[১] আন্তর্জাতিক ন্যায়নীতিবোধ নষ্ট হওয়ায় দুর্বল দেশগুলির দুর্দিন ঘনাইয়া আসে। এই নগ্ন ক্ষমতালোভী নীতির উদাহরণ পোল্যাণ্ডের ব্যবচ্ছেদের ক্ষেত্রে দেখা যায়। দুর্বল পোল্যাণ্ড রাজ্যকে ১৭৭২ খ্রীঃ তিনটি প্রবল রাষ্ট্র যথা প্রাশিয়া, রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়া ভাগ করিয়া নেয়। নিরীহ ও শান্তিপ্রিয় পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা বিনা কারণে নষ্ট করায় আক্রমণবাদের জয় সূচিত হয়।

ইওরোপের রাজনীতিতে নগ্ন আক্রমণবাদের প্রভাব: পোল্যাণ্ড ব্যবচ্ছেদ

অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় ভাগ ছিল "নবীন দার্শনিক মতবাদ ও আলোকপ্রাপ্ত স্বৈরতন্ত্রের যুগ।" ঐতিহাসিক রেভাওয়ে মন্তব্য করিয়াছেন যে, "দার্শনিকগণ এই যুগে প্রত্যক্ষভাবে সমাজকে প্রভাবিত করেন।" ঐতিহাসিক ফিশারের মতে ফরাসী দার্শনিকগণ সমাজের উন্নতি বিধানের জন্য তাঁহাদের দার্শনিক মতবাদের বাস্তব প্রয়োগ

১. "Diplomacy was corrupt, international immorality was universal". Hassal. P. 2.

করেন। "ষোড়শ শতকে রিফর্মেশন বা ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের সময় লুথারের মতবাদ যেরূপ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল, সেইরূপ অষ্টাদশ শতকে দার্শনিকগণের মতবাদ ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়"।[১] এই যুগের দার্শনিককুলের মধ্যে ফরাসী দার্শনিক মন্তেস্কু, ভলতেয়ার, রুশো ছিলেন অগ্রগণ্য। বিজ্ঞান, দর্শন, অর্থনীতি সর্বক্ষেত্রে এই যুগের ফরাসী মনীষার অসাধারণ বিকাশ ঘটে। অষ্টাদশ শতকে শিল্প বিপ্লব ও উপনিবেশ বিস্তারের ফলে ফ্রান্স ও ইংলন্ডে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়। এই নবোদিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী নবীন দর্শন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাঠ লইয়া ক্ষয়প্রাপ্ত অভিজাতগণের হাত হইতে নেতৃত্ব কাড়িয়া লইতে আগাইয়া আসে।

জ্ঞানদীপ্তি : মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জ্ঞানদীপ্তি

(Enlightenment)

জ্ঞানদীপ্তি (Enlightenment) : প্রাচীন যুগে গ্রীক ও রোমান চিন্তাবিদগণ বিজ্ঞান ও দর্শনের চর্চা করেন। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর ইওরোপে মধ্যযুগের সূচনা হয়। মধ্যযুগে যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞান চর্চা পিছাইয়া পড়ে। অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার প্রাধান্য পায়। এজন্য মধ্যযুগকে "অন্ধবিশ্বাসের যুগ" বা (Age of Faith) বলা হয়। পঞ্চদশ শতকে গ্রীক পন্ডিতগণের প্রভাবে ইতালীতে পুনরায় গ্রীক দর্শন ও সাহিত্যের চর্চা আরম্ভ হয়। ক্রমে এই চর্চা ইওরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছড়াইয়া পড়ে। ইহার ফলে মধ্যযুগীয় অন্ধবিশ্বাসের স্থলে যুক্তিবাদের জাগরণ ঘটে। এই জাগরণকে রেনেসাঁস বা পুনর্জাগরণ আন্দোলন বলা হয়। ইহার ফলে আধুনিক যুগের সূচনা হয়। রেনেসাঁসের প্রভাবে বিজ্ঞান ও দর্শনের চর্চার ফলে ইওরোপে যুক্তিবাদের জাগরণ ঘটে। মধ্যযুগীয় অন্ধবিশ্বাস, তন্ত্র, মন্ত্রের স্থলে যুক্তিবাদ মানুষের চিন্তাকে প্রভাবিত করে। প্রকৃতি বিজ্ঞানের চর্চার ফলে লোকে বুঝিতে পারে যে প্রকৃতি একটি নিয়ম (Law) দ্বারা শাসিত হয়।

আধুনিক যুগ : যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞান চর্চা

আধুনিক যুগের প্রথম দিকে কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও, বেকন ও হারভে নামক চার জন বিজ্ঞানী প্রকৃতির রহস্যের যুক্তিবাদী ব্যাখ্যা করেন। কোপার্নিকাস প্রমাণ করেন যে পৃথিবী সৌরমণ্ডলের অনেকগুলি গ্রহের মধ্যে একটি গ্রহমাত্র। গ্যালিলিও

১. "Philosophies continued to enlighten society and their teachings were applied as swiftly as Luther's in the first decade of Reformation." Reddaway, P. 257.

একটি দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে প্রমাণ করেন যে পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে। তিনি আরও প্রমাণ করেন যে সূর্যও তাহার কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে। গ্যালিলিওর আবিষ্কারের আগে লোকে ভুল ধারণাবশতঃ মনে করিত যে সূর্যই পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে। গ্যালিলিওর প্রমাণ অন্ধবিশ্বাসীগণের ধারণায় ভয়ানক আঘাত দেয়। পোপের নির্দেশে খ্রীষ্টীয় চার্চ গ্যালিলিওর মতবাদকে নিন্দা জানায়। অখ্রীষ্টীয় মতবাদ প্রচারের



কোপার্নিকাস



বেকন

জন্য গ্যালিলিওকে কারাবাসে জীবন কাটাইতে হয়। বেকন বিজ্ঞানের প্রযুক্তি এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার উপর জোর দেন। হারভে নামে জনৈক ইংরাজ চিকিৎসা বিজ্ঞানী সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন যে মানুষের দেহের রক্ত হৃদযন্ত্র হইতে ধমনী ও শিরা দিয়া প্রবাহিত হইয়া পুনরায় হৃদযন্ত্রে ফিরিয়া আসে। হারভে রক্তসঞ্চালন প্রক্রিয়া আবিষ্কার করার ফলে চিকিৎসা বিজ্ঞানে নবযুগ আরম্ভ হয়। সপ্তদশ শতকে বিজ্ঞানী স্যার আইজাক নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তির অস্তিত্ব প্রমাণ করেন। নিউটনের আবিষ্কারের ফলে ইহা প্রমাণিত হয় যে বিশ্ব-প্রকৃতি একটি নিয়ম (Law) দ্বারা শাসিত হয়। রসায়নবিদ রবার্ট বয়েল প্রমাণ করেন যে কোন বস্তুকে পোড়ান হইলে তাহা হইতে শক্তি বা এনার্জি উৎপন্ন হয়।

আধুনিক যুগের প্রথম দিকে প্রকৃতি বিজ্ঞানের যে চর্চা আরম্ভ হয় তাহা সপ্তদশ শতক ও অষ্টাদশ শতকে ব্যাপক প্রসার লাভ করে। বিজ্ঞান চর্চার জন্য ডাচ বিজ্ঞানী টাইকো ব্রাহে একটি মানমন্দির স্থাপন করেন। ডেনমার্কের রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডারিক এই মান মন্দিরের ব্যয়ভার বহন করিতেন। রোমে বিজ্ঞান চর্চার জন্য একাদমী লিংকসে (Acadamy of Lynxes), ইংলণ্ডে রয়্যাল সোসাইটি (Royal Society), ফ্রান্সে বিজ্ঞান একাদমী (Acadamy of Science) স্থাপিত হয়। এছাড়া ইংলণ্ডে ১৬৭৫ খ্রীঃ পৃথিবী বিখ্যাত গ্রীনউইচের মানমন্দির স্থাপিত হয়।

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে বিজ্ঞান চর্চার প্রসার

বৈজ্ঞানিকগণের গবেষণার ফলে সকলেই জানিতে পারে যে প্রকৃতি একটি নিয়মের দ্বারা (Law) চলে। এই জ্ঞানই অষ্টাদশ শতকের জ্ঞানদীপ্তির ভিত্তি হিসাবে

কাজ করে। দার্শনিকগণ এই মতবাদ প্রচার করেন যে প্রকৃতি যদি নিয়মের দ্বারা শাসিত হয় তবে রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থাও নিয়মের দ্বারা চালিত হওয়া উচিত। মানুষ ও সমাজ হইল প্রকৃতির অঙ্গ। সুতরাং প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী সমাজ ও রাষ্ট্রের নিয়ম মানিয়া চলা দরকার। এই নিয়ম হইল যুক্তিবাদ। সমাজ ও রাষ্ট্রকে যুক্তি শাসন করিবে এই কথা দার্শনিকেরা বলেন। ঐতিহাসিক ফিশারের মতে "এই যুগের চিন্তাবিদগণের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে তাঁহারা সমাজের উন্নতি সাধনের জন্য তাঁহাদের মতবাদকে কাজে লাগান।"[১]

সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিচালনায় যুক্তিবাদের প্রয়োগ

ডেভিড হিউম নামক দার্শনিক এই তথ্য প্রচার করেন যে মানুষের অভিজ্ঞতাকে প্রমাণ করিবার জন্য যুক্তি ও চিন্তাশক্তিকে কাজে লাগান উচিত। ইমানুয়েল কাণ্ট নামক জার্মান দার্শনিক বলেন যে প্রকৃতির নিয়মের মত ন্যায়নীতি সমাজকে শাসন করিয়া থাকে।

অষ্টাদশ শতকের দার্শনিকগণের যুক্তিবাদী চিন্তাধারা

মন্তেস্ক্যু নামক ফরাসী দার্শনিক তাঁহার স্পিরিট অফ ল বা আইনের মর্ম নামক গ্রন্থে যুক্তিবাদের আলোকে রাষ্ট্র, ইতিহাস ও রাজনীতির আদর্শ সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি ব্যক্তি স্বাধীনতা ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের ক্ষমতাকে পৃথক করার কথা বলেন। মন্তেস্ক্যুর এই মতকে ক্ষমতাবিভাজন (Separation of Power) নীতি বলা হয়। ফরাসী দার্শনিক ভলতেয়ার তাহার রচনাবলীতে খ্রীষ্টীয় গীর্জার যৌক্তিকতা নস্যাৎ করেন। ফরাসী দার্শনিক রুশো তাঁহার সামাজিক চুক্তি বা সোসিয়েল কণ্ট্রাক্ট নামক রচনায় প্রমাণ করেন যে রাজা ঈশ্বরের আদেশে ক্ষমতা পান নাই; জনসাধারণের ইচ্ছায় রাষ্ট্র স্থাপিত হইয়াছে। জনসাধারণই রাষ্ট্রের উৎস ও সার্বভৌম শক্তি। রাজ্য বা রাষ্ট্রের শাসনকর্তা জনসাধারণের ইচ্ছা মানিতে বাধ্য। রুশোর মতবাদ গণতন্ত্রবাদের জন্ম দেয়। রুশো মানুষের সমান অধিকারের মতবাদও প্রচার করেন। রুশো ছিলেন অষ্টাদশ শতকের চিন্তা-নায়কগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৈপ্লবিক। তাঁহার মতবাদ ফরাসী বিপ্লবের পথ রচনা করে।

ডেনিস দিদেরো, ডি' এলেমবার্ট প্রভৃতি পণ্ডিতেরা বিশ্বকোষ বা এনসাইক্লোপিডিয়া নামে গ্রন্থাবলী রচনা করেন। বিশ্বকোষ গ্রন্থাবলীতে তদানীন্তন ফ্রান্সের স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থার সমালোচনা করা হয়। বিশ্বকোষ পড়িয়া লোকে প্রাকৃতিক নিয়মাবলী এবং উহার আলোকে রাষ্ট্রিক নিয়মাবলী কি হওয়া উচিত তাহা বুঝিতে পারে। অষ্টাদশ শতকে মার্কাণ্টাইলবাদ নামে এক ভুল অর্থনীতি চালু ছিল। এই নীতি অনুসারে মনে করা হইত যে পৃথিবীর সম্পদ সীমাবদ্ধ। যাহাতে সম্পদ দেশের বাহিরে না চলিয়া যায় এজন্য সরকার ব্যবসায়, বাণিজ্য, আমদানী প্রভৃতি বিষয়কে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করিত। মার্কাণ্টাইলবাদ ছিল ভুল। ইহার স্থলে অষ্টাদশ শতকে ফিজিওক্রেসী নামে এক নূতন অর্থনীতিবাদের উদ্ভব হয়। কোয়েসনে, এ্যাডাম স্মিথ প্রভৃতি ছিলেন এই নূতন মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা। কোয়েসনে মার্কাণ্টাইল মতবাদের ভুল ত্রুটি দেখাইয়া

১. "A leading features of the movement of thought was its active concern for the regeneration of the society". Fisher—A History of Europe. P. 697.

দেন। তিনি অবাধ বাণিজ্য নীতির কথা বলেন। ইংলণ্ডের অর্থনীতিবিদ এ্যাডাম স্মিথ, জাতীয় সম্পত্তি বা ওয়েলথ অফ নেশনস (Wealth of Nations) নামে এক বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে এ্যাডাম স্মিথ প্রমাণ করেন যে শ্রমই হইল সম্পদের উৎস। রাষ্ট্র দ্বারা উৎপাদন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা হইলে সম্পদের উৎপাদন ব্যাহত হইবে। রাষ্ট্রের উচিত উৎপাদনকারীগণের উপর হস্তক্ষেপ না করিয়া তাহাদের স্বাধীনভাবে প্রতিযোগিতা করিতে দেওয়া। এ্যাডাম স্মিথের এই মতবাদকে হস্তক্ষেপ-না-করা বা লেসাফেয়ার (Laissez faire) নীতি বলা হয়।

বিশ্বকোষ রচনা ও ফিজিওক্র্যাট মতবাদী অর্থনীতির উদ্ভব

অষ্টাদশ শতকে ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রেও যুক্তিবাদের প্রয়োগ দেখা যায়। ইতিহাসকে কাহিনী স্তর হইতে সমাজ বিজ্ঞানের স্তরে আনা হয়। ভিকো নামক ইতালীয় ঐতিহাসিক ইতিহাস রচনায় তথ্যনিষ্ঠা ও সমালোচনা রীতি প্রবর্তন করার পথ দেখান। মন্তেস্ক্যু ইতিহাসে বিবর্তনবাদের কথা বলেন। হার্ডার নামক জার্মান ঐতিহাসিক "নব ইতিহাসবাদ" প্রচার করেন। হার্ডার বলেন যে ইতিহাসে মানব সভ্যতার অগ্রগতির কথা বলা উচিত। বিভিন্ন জাতি এই অগ্রগতির পথে কতদূর সফলতা লাভ করিয়াছে ইতিহাসে তাহার পরিচয় থাকার কথাও তিনি বলেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক গিরন তাঁহার ডিক্লাইন এ্যাণ্ড ফল অফ রোমান এম্পায়ার বা রোমান সাম্রাজ্যের পতন নামক বিখ্যাত রচনায় প্রাকৃতিক শক্তির উপাসক রোমান সভ্যতার পতনের কাহিনী বর্ণনা করেন।

ইতিহাস চর্চায় যুক্তিবাদের প্রয়োগ

আইন শাস্ত্রের রচনার ক্ষেত্রে বেকারিয়ার অপরাধতত্ত্বের নব ব্যাখ্যা, জেরেমি বেন্থামের হিতবাদী দর্শন বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। বেন্থাম তাঁহার ইউটিলিটি বা হিতবাদী[1] দর্শনে বলেন যে সরকারের কর্তব্য সর্বোচ্চ সংখ্যক লোকের জন্য সর্বোচ্চ হিতকারী শাসন প্রবর্তন করা।

আইন শাস্ত্রে যুক্তিবাদের প্রয়োগ

এইভাবে অষ্টাদশ শতকে জ্ঞানদীপ্তি বা Enlightenment-এর বিকাশ হয়। জ্ঞানদীপ্তি কেবলমাত্র জ্ঞানীগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। রাজা, মহারাজা, মধ্যবিত্ত সকল শ্রেণীই জ্ঞানদীপ্তির প্রভাবে প্রভাবিত হন। ফ্রান্সের রাণী মেরী এ্যাণ্টোনেট দুগ্ধ উৎপাদনের জন্য বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা চালাইতেন। হল্যাণ্ডের শাসনকর্তা ডি ওয়াইট নিজে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার চালাইতেন। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত লোকেরা দার্শনিকগণের রচনা পড়িতেন।

জ্ঞানদীপ্তির প্রভাব

জ্ঞানদীপ্তির প্রসারের ফলে ইওরোপের শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে যুক্তিবাদ, মানবতাবাদ, প্রকৃতিবাদ ও আশাবাদ জাগিয়া উঠে।[2] যুক্তিবাদের প্রয়োগে লোকে যুক্তি দ্বারা রাষ্ট্র, সমাজ ও নীতিবোধকে যাচাই করিতে শিক্ষা পায়। প্রকৃতিবাদের প্রভাবে মধ্যযুগীয় কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাস কাটাইয়া লোকে বিজ্ঞানের প্রমাণের সাহায্যে ঘটনার বিচার করিতে শিখে। মানবতাবাদ মানুষকে তাহার

জ্ঞানদীপ্তির ফল

১. বঙ্কিমচন্দ্র Utilitarinianism-এর বাংলা অনুবাদ 'হিতবাদ' করিয়াছেন, Vide বিবিধ প্রবন্ধ।
২. Hayes—Modern Europe. P. 378.

প্রকৃতিদত্ত অধিকার আদায় করিতে এবং জ্ঞানকে মানুষের মঙ্গলের জন্য কাজে লাগাইতে শিখায়। ইওরোপের স্বৈরাচারী রাজাগণ জ্ঞানদীপ্তির প্রভাবে প্রজাগণের প্রতি তাঁহাদের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হন। ইহার ফলে অষ্টাদশ শতকে জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরতন্ত্রের বিকাশ ঘটে। আশাবাদ চিন্তাশীল মানুষকে এক উন্নততর জীবনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে। এইভাবে জ্ঞানদীপ্তি অষ্টাদশ শতকের সমাজ, রাষ্ট্র ও চিন্তার ক্ষেত্রে এক বিপ্লব ঘটায়।

আলোকপ্রাপ্ত স্বৈরতন্ত্র[1] (Enlightened Despotism): অষ্টাদশ শতকে যে জ্ঞানদীপ্তির বিকাশ ঘটে তাহার প্রভাবে রাষ্ট্র শাসনের আদর্শ প্রভাবিত হয়। কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও, বেকন, কেপলার প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকেরা প্রকৃতি বিজ্ঞানের চর্চার যে সূত্রপাত করেন, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে বিজ্ঞানীরা তাহাকে আরও আগাইয়া দেন। নিউটন, হার্সেল প্রভৃতি বিজ্ঞানী পদার্থ বিদ্যার অনুশীলন দ্বারা প্রকৃতির নিয়মগুলিকে ব্যাখ্যা করেন। প্রাকৃতিক শক্তিকে মানুষের মঙ্গলের কাজে লাগাইবার জন্য চেষ্টা আরম্ভ হয়। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে প্রকৃতি একটি নিয়ম (Law) দ্বারা শাসিত হয়। দার্শনিকেরা ইহার ফলে বলেন যে প্রকৃতি যদি নিয়মের দ্বারা শাসিত হয় তবে সমাজ ও রাষ্ট্রও নিয়মের অধীন হইবে। বিজ্ঞান চর্চার ফলে অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের স্থলে যুক্তিবাদের বিকাশ হয়। ইহাকে জ্ঞানদীপ্তি বলে।

জ্ঞানদীপ্তির ফলে নূতন দার্শনিক মতবাদের বিকাশ

জ্ঞানদীপ্তির ফলে যে যুক্তিবাদ প্রতিষ্ঠিত হয় দার্শনিকগণ তাহাকে রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার সংস্কারের জন্য প্রয়োগ করেন। হিউম, বেন্থাম প্রভৃতি দার্শনিকেরা হিতবাদী দর্শন বা utilitarian philosophy প্রচার করেন। তাঁহারা বলেন যে রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল সর্বোচ্চসংখ্যক লোকের সর্বাধিক হিত সাধন করা। মন্তেস্ক্যু নামক ফরাসী দার্শনিক তাঁহার "আইনের মর্ম" বা Spirit of Laws নামক গ্রন্থে রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে আইন, শাসন ও বিচার এই তিন স্বতন্ত্র ভাগে পৃথক করার কথা বলেন। তিনি ব্যক্তি স্বাধীনতা ও নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের আদর্শ প্রচার করেন। রুশো তাঁহার "সামাজিক চুক্তি" বা সোসিয়াল কনট্রাক্ট নামক মতবাদ দ্বারা প্রচার করেন যে জনগণের ইচ্ছাই হইল রাষ্ট্রের শক্তির উৎস। কোয়েসনে, দিদেরো প্রভৃতি লেখকেরা মার্কণ্টাইলবাদ নামক প্রচলিত অর্থনৈতিক মতবাদের ঘোর সমালোচনা করেন। তাঁহারা অবাধ ব্যক্তিগত ব্যবসায় ও অবাধ বাণিজ্যের জন্য দাবী জানান।

অষ্টাদশ শতকের রাজাগণ জ্ঞানদীপ্তির প্রভাব উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। দার্শনিকগণের প্রভাবে তাঁহারা একথা স্বীকার করিতে বাধ্য হন যে প্রকৃতি যেমন নিয়মের শাসন মানিয়া চলে, রাষ্ট্রকেও সেইরূপ দর্শন ও নীতির শাসন মানিয়া চলিতে হইবে। দার্শনিকদের মতবাদ অষ্টাদশ শতকের রাষ্ট্র শাসন ব্যবস্থায় গভীর প্রভাব বিস্তার করে।[2] সপ্তদশ শতকে রাজাগণ স্বর্গীয় অধিকার নীতিতে বিশ্বাস করিতেন। এই নীতি

১. ঐতিহাসিক রেডডাওয়ে Enlightened Despotism-কে তিনটি আখ্যা দিয়াছেন যথা, Enlightened Despotism, Philosophical Despotism, Benevolent Despotism.

২. Hayes. P. 415.

অনুযায়ী লোকে বিশ্বাস করিত যে ঈশ্বর রাজাগণকে বংশানুক্রমিক শাসনের অধিকার দিয়াছেন। তাঁহারা তাঁহাদের কাজের জন্য ঈশ্বরের নিকট জবাবদিহি করিবেন। প্রজাগণের নিকট তাঁহাদের কাজের জবাবদিহি করিতে তাঁহারা বাধ্য নন। অষ্টাদশ শতকে দার্শনিকেরা যুক্তিবাদ প্রয়োগ করিয়া স্বর্গীয় অধিকার নীতির ত্রুটি দেখাইয়া দেন। দার্শনিকেরা বলেন যে প্রকৃতির নিয়মের ন্যায় ঈশ্বর রাষ্ট্রের পরিচালনার জন্য নিয়ম স্থির করিয়া দিয়াছেন। এই নিয়ম হইল এই যে রাজাকে অধিকার ভোগ করিতে হইলে কর্তব্য অবশ্যই করিতে হইবে।[১] দার্শনিকগণের মতবাদের প্রভাবে রাজাগণ বুঝিতে পারেন যে কর্তব্য না করিলে অবিমিশ্র অধিকার লাভ করা যায় না। অষ্টাদশ শতকের রাজাগণ প্রজার মঙ্গলের জন্য কর্তব্যের কথা স্বীকার করিলেও তাঁহাদের স্বৈরাচারী ক্ষমতাকে ছাড়িতে রাজী ছিলেন না। জ্ঞানদীপ্তির প্রভাবে তাঁহারা প্রজার কল্যাণের জন্য অনেক প্রকার সংস্কার চালু করেন। কিন্তু প্রজাগণকে রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণ করিতে দিতে তাঁহারা মোটেই রাজী ছিলেন না। সুতরাং স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা বহাল থাকে, তবে শাসকগণ ধর্মীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারের জন্য কাজ করেন। জ্ঞান-দীপ্তির ফলেই স্বৈরাচারী শাসকগণের এই উদার মনোভাব জাগ্রত হয়। এইজন্য অষ্টাদশ শতকের রাষ্ট্রাদর্শকে আলোকপ্রাপ্ত স্বৈরতন্ত্র বা জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরতন্ত্র বলা হয়। সপ্তদশ শতকের রাজাগণ নিছক স্বৈরতন্ত্রে বিশ্বাস করিয়া প্রজার মঙ্গলের জন্য কোন কাজ করেন নাই। পরের শতকে তাঁহাদের বংশধরেরা যুক্তিবাদের প্রভাবে প্রজা কল্যাণের কাজ করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন। এজন্য লর্ড এ্যাক্টন ইহাকে "অনুতপ্ত স্বৈরতন্ত্র" (Repentant Monarchy) বলিয়াছেন।

জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরতন্ত্র

আলোকপ্রাপ্ত স্বৈরতন্ত্রের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, যথা—(১) রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য রাজাই একমাত্র সংস্কারের কাজ করিবেন। জনসাধারণকে শাসন ব্যবস্থায় অংশ লইতে দেওয়া হইবে না। (২) রাজা কেবলমাত্র অধিকার ভোগ করিবেন না। রাষ্ট্র ও প্রজার কল্যাণের জন্য কাজ করা তাঁহার একান্ত কর্তব্য। (৩) রাজা ও প্রজা উভয়েই রাষ্ট্রের জন্য কাজ করিতে বাধ্য। রাষ্ট্র হইল সকলের উপরে। মস্তিষ্ক দেহের অংশ হইলেও যেমন মস্তিষ্কের আদেশে দেহ পরিচালিত হয়, সেইরূপ রাজা রাষ্ট্রের অংশ হইলেও তিনি হইলেন রাষ্ট্রের মস্তিষ্ক। তিনি যাহা আদেশ করিবেন সকলে তাহা পালন করিতে বাধ্য। রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য কি ধরনের সংস্কার করা হইবে তাহা রাজাই একমাত্র স্থির করিবেন। প্রজার ইচ্ছানুযায়ী তাহা স্থির করা হইবে না।[২]

জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য

১৭৬৩ খ্রীঃ পর আলোকপ্রাপ্ত স্বৈরতন্ত্রের স্বর্ণযুগ আরম্ভ হয়। এই সময় ইওরোপের অধিকাংশ রাজা ও রাষ্ট্রনেতাগণ বিভিন্ন প্রকার সংস্কারের কাজে হাত দেন। উত্তরে সুইডেন হইতে দক্ষিণে পর্তুগাল, পূর্বে রাশিয়া হইতে পশ্চিমে ফ্রান্স পর্যন্ত সর্বত্র সংস্কারের ধুম পড়িয়া যায়।

জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরতন্ত্রের স্বর্ণযুগ

---

১. Rights are deductions of duties.

২. "Everything for the people but nothing by the people."

আলোকপ্রাপ্ত স্বৈরাচারীগণের মধ্যে প্রাশিয়ার রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডারিক, অষ্ট্রিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় যোসেফ, রাশিয়ার জারিনা দ্বিতীয় ক্যাথারিণ, স্পেনের রাজা তৃতীয় চার্লস, পর্তুগালের প্রথম যোসেফ, সুইডেনের তৃতীয় গাষ্টাভাস প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মন্ত্রী বা রাষ্ট্রনেতাগণের মধ্যে ফ্রান্সের চোইসুল ও টুর্গো, স্পেনের ডি আরাণ্ডা ও ইতালীর তানুচ্চির নাম স্মরণীয়। মেইনজ ও ট্রায়ারের বিশপগণও জ্ঞানদীপ্তির দ্বারা প্রভাবিত হন।

আলোকপ্রাপ্ত রাজাগণ

আলোকপ্রাপ্ত স্বৈরাচারী শাসকগণের মধ্যে প্রাশিয়ার দ্বিতীয় ফ্রেডারিক, অষ্ট্রিয়ার দ্বিতীয় যোসেফ ও রাশিয়ার দ্বিতীয় ক্যাথারিণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাজ করেন। এঁদের মধ্যে অষ্ট্রিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় যোসেফ দার্শনিক মতবাদের প্রকৃত অনুরাগী ছিলেন। তিনি ছিলেন ঘোর আদর্শবাদী। বাস্তব-বুদ্ধির অভাবে শেষ পর্যন্ত তিনি বিফলতা বরণ করেন। রাশিয়ার জারিনা দ্বিতীয় ক্যাথারিণ ভলতেয়ারের অনুরাগিণী ছিলেন। তিনি রাশিয়ায় এক শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু তিনি শেষ পর্যন্ত স্বৈরতন্ত্রই কায়েম রাখেন। অভিজাতগণেরও তিনি অনেক ক্ষমতা বাড়ান। কিন্তু দরিদ্র ভূমিদাসগণের মুক্তির কোন চেষ্টা তিনি করেন নাই। প্রাশিয়ারাজ দ্বিতীয় ফ্রেডারিক ছিলেন সর্বাপেক্ষা বাস্তববাদী সফল সংস্কারক। তবে তিনি আদর্শবাদ অপেক্ষা বাস্তব প্রয়োজনকে অধিক মূল্য দেন। তিনি সংস্কারের সুযোগে রাজতন্ত্রের ক্ষমতা বাড়ান। প্রজার মঙ্গলের জন্য বিচার ব্যবস্থা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক সংস্কারও তিনি করেন।

দ্বিতীয় ফ্রেডারিক, দ্বিতীয় যোসেফ ও দ্বিতীয় ক্যাথারিণ

দ্বিতীয় ফ্রেডারিক ও দ্বিতীয় যোসেফ প্রভৃতি আলোকপ্রাপ্ত শাসকগণ তাঁহাদের সংস্কার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয়করণের দিকে বিশেষ নজর দেন। প্রাদেশিক ও স্থানীয় আইন সভাগুলির ক্ষমতা কমাইয়া কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বাড়াইবার চেষ্টা করা হয়। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির দিকেও তাঁহারা নজর দেন। যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতির জন্যও তাঁহারা চেষ্টা করেন। শাসন ও বিচার বিভাগের সংস্কার করা হয়। ধর্মসহিষ্ণুতা ও জাতীয় চার্চ গঠনের জন্য চেষ্টা করা হয়। কর ব্যবস্থার সংস্কার করিয়া সরকারের আয় বৃদ্ধির দিকে নজর দেওয়া হয়। শিক্ষা, শিল্প ও কলার উন্নতির জন্য চেষ্টা করা হয়। এইভাবে আলোকপ্রাপ্ত শাসকগণ তাঁহাদের উদারতা ও প্রগতিশীল চিন্তার পরিচয় দেন।

জ্ঞানদীপ্ত সংস্কার ব্যবস্থা

অষ্টাদশ শতকে আলোকপ্রাপ্ত স্বৈরতন্ত্র শেষ পর্যন্ত বিফলতায় পর্যবসিত হয়। আলোকপ্রাপ্ত স্বৈরতন্ত্রের বিফলতার প্রধান কারণ ছিল এই যে স্বৈর শাসকগণ জনসাধারণকে শাসন ব্যবস্থায় অংশীদার করিতে অস্বীকার করেন। তাঁহারা নিজ ইচ্ছাকে জনসাধারণের উপর চাপাইয়া দেন। জনসাধারণের সহযোগিতা ও মতামতের তাঁহারা কোন দাম দেন নাই। জ্ঞানদীপ্ত শাসকগণ তাঁহাদের সংস্কারের উপযোগিতা সম্পর্কে জনগণকে বুঝাইবার চেষ্টা করেন নাই। ফলে সাধারণ লোকে এই সকল সংস্কারকে সন্দেহের চোখে দেখে। জ্ঞানদীপ্ত শাসকগণ তাঁহাদের উত্তরাধিকারীগণকে সংস্কারের কাজ

আলোকপ্রাপ্ত স্বৈরতন্ত্রের বিফলতার কারণ

চালাইবার মত শিক্ষা দেন নাই। যোগ্য উত্তরাধিকারীর অভাবে সংস্কারের কাজ ব্যর্থ হয়। তাছাড়া দ্বিতীয় যোসেফ প্রভৃতি সংস্কারপন্থীরা বাস্তব অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সংস্কার করেন নাই। ইহার ফলে জনসাধারণের বিরোধিতায় সংস্কারগুলি বিফল হয়।

প্রাশিয়া-রাজ দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের জ্ঞানদীপ্ত সংস্কার ১৭৪০-৮৬ খ্রীঃ (The Enlightened Reforms of Fredrick II, 1740—1786)ঃ অষ্টাদশ শতকে জ্ঞানদীপ্তির ফলে দার্শনিক ও বিজ্ঞানীগণের মধ্যে যুক্তিবাদের উদয় হয়। দার্শনিকগণ যুক্তিবাদকে রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া প্রচলিত ব্যবস্থার ত্রুটিগুলি দেখান। অষ্টাদশ শতকের জ্ঞানদীপ্তি ও যুক্তিবাদ কেবলমাত্র চিন্তাবিদগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। রাজা, রাষ্ট্রনীতিবিদ, মধ্যবিত্ত সকলেই ইহার দ্বারা প্রভাবিত হন। অষ্টাদশ শতকের রাজাগণ জ্ঞানদীপ্তির ফলে ভাবিতে শিখেন যে অধিকার ভোগ করিতে হইলে কর্তব্য করিতে হইবে। যুক্তিবাদের প্রভাবে কর্তব্যের কথা ভাবিলেও তাঁহারা তাঁহাদের স্বৈরাচারী ক্ষমতা ছাড়িতে রাজী ছিলেন না। এজন্য তাঁহারা শাসন ব্যবস্থায় প্রজাগণকে অংশ গ্রহণ করিতে দিতেন না। নিজ অভিপ্রায় অনুযায়ী সংস্কার চালু করিতেন। ঐতিহাসিকেরা অষ্টাদশ শতকের এই সংস্কারপন্থী রাজতন্ত্রকে প্রজাহিতৈষী স্বৈরতন্ত্র বা Benevolent Despotism বা Enlightened Despotism বা জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরতন্ত্র বলিয়াছেন।

জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরতন্ত্রের মর্ম

প্রাশিয়ার রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডারিক বা মহান ফ্রেডারিক (Frederick the Great) ছিলেন একজন প্রখ্যাত জ্ঞানদীপ্ত স্বৈর শাসক। ঐতিহাসিক লর্ড এ্যাক্টনের মতে "জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরতন্ত্রের যুগে সর্বাপেক্ষা জ্ঞানদীপ্ত ছিলেন দ্বিতীয় ফ্রেডারিক"।[১] তিনি মনে করিতেন যে রাজা ঈশ্বরের আদেশে রাজ্য শাসন করেন। তবে প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী রাজার অধিকারের সহিত রাজার কর্তব্যও জড়িত আছে। রাজা ও প্রজা উভয়ই রাষ্ট্রের জন্য কাজ করিতে বাধ্য। ফ্রেডারিক নিজেকে "রাষ্ট্রের প্রধান ভৃত্য" বলিয়া মনে করিতেন (I am the first servant of the state)। জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরতন্ত্রের আদর্শ অনুযায়ী তিনি মনে করিতেন যে রাজা রাষ্ট্রের ভৃত্য হইলেও রাজাই একমাত্র রাষ্ট্রকে পরিচালনা করিবেন। মস্তিষ্ক যেমন দেহকে চালায়, রাজা হইলেন রাষ্ট্রের মস্তিষ্ক। তিনি রাষ্ট্রকে চালাইবেন।

ফ্রেডারিকের স্বৈরতান্ত্রিক মতবাদ

দার্শনিক মতবাদের প্রেরণায় ফ্রেডারিক নিম্নলিখিত সংস্কারগুলি প্রবর্তন করেন ঃ—রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য তিনি নিজে এবং অপর সকলকে কঠোর পরিশ্রম করিতে বাধ্য করেন। মন্ত্রীসভাকে তিনি বিভিন্ন দপ্তরে ভাগ করেন। তাঁহার নির্দেশ অনুযায়ী মন্ত্রীসভা চলিতে বাধ্য হয়। মন্ত্রীগণ তাঁহাদের কাজের জন্য রাজার নিকট দায়ী থাকিতেন। ফ্রেডারিক কৃষির উন্নতির জন্য অনাবাদী জমিকে আবাদযোগ্য করান। বৈজ্ঞানিক প্রথায় কৃষিকার্য করার জন্য তিনি

ফ্রেডারিকের সংস্কার সমূহ

১. "In the age of enlightenment of despotism the most enlightened was Frederick II." Lord Acton.

উৎসাহ দেন। তিনি আমদানি কমাইয়া রপ্তানী বাড়াইবার চেষ্টা করেন। রেশম ও অন্যান্য শিল্পের প্রসারের জন্য তিনি উৎসাহ দেন। বিদেশে বাণিজ্যের বিস্তারের জন্য তিনি বিভিন্ন কোম্পানী স্থাপন করেন। তিনি বিচার ব্যবস্থার সংস্কার করেন। কর্পাস ফ্রিডারিকা নামক আইনের দ্বারা তিনি দণ্ড-বিধির সংশোধন করেন। অপরাধীর অঙ্গচ্ছেদ ও দৈহিক নির্যাতন রদ করেন। নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে তিনি উচ্চ আদালতে আপীল করিবার অধিকার দেন। শিক্ষার উন্নতির জন্য তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন, বার্লিনে বিজ্ঞান একাদমী প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ধর্মীয় স্বাধীনতা স্বীকার করেন। তিনি সংবাদপত্রকে স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার দেন। তিনি সৈন্যবাহিনীর সংস্কার করিয়া প্রাশিয়ার সমরযন্ত্রকে শক্তিশালী করেন।



ফ্রেডারিক দি গ্রেট

ফ্রেডারিকের মতবাদের ত্রুটি

ফ্রেডারিকের প্রজাহিতৈষী স্বৈরতন্ত্রের অনেক ত্রুটি ছিল। ঐতিহাসিক ম্যারিয়ট ও রবার্টসন মন্তব্য করিয়াছেন যে রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করিবার অজুহাতে ফ্রেডারিক নিজ স্বৈরতন্ত্রকে দৃঢ় করেন। তিনি রাষ্ট্র ও রাজাকে প্রায় অভিন্ন মনে করিতেন। মন্ত্রীগণকে স্বাধীনভাবে নীতি গ্রহণের অধিকার না দিয়া তিনি মন্ত্রীগণকে প্রায় কেরানীতে পরিণত করেন। তাঁহারা কাজ শিখিবার সুযোগ পান নাই। মন্ত্রীগণ কাজ না জানায় এবং সুযোগ্য লোকের অভাবে, ফ্রেডারিকের মৃত্যুর পর শাসন ব্যবস্থায় ঘোর বিশৃংখলা দেখা দেয়। ফ্রেডারিক জ্ঞানদীপ্ত শাসক হইলেও প্রাশিয়ায় ভূমিদাসগণকে শোষণের হাত হইতে রক্ষা করিবার কোন চেষ্টা তিনি করেন নাই। তিনি কৃষকের অবস্থার উন্নতির জন্য কোন চেষ্টা করেন নাই। তিনি নিজ ক্ষমতা ও জেদ রক্ষা করিবার জন্য প্রায় ১৫ বৎসর অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। এই যুদ্ধের খরচ মিটাইবার জন্য তিনি সাধারণ লোককে করভারে জর্জরিত করেন। প্রাশিয়ার জনগণের মধ্যে শ্রেণীভেদ ও জাতিভেদ দূর করারও তিনি চেষ্টা করেন নাই। তিনি কেবলমাত্র অভিজাতগণকে দায়িত্বশীল পদে নিয়োগ করিতেন। যোগ্যতা থাকিলেও অন্য শ্রেণীর কোন লোক এই পদ পাইত না। ফ্রেডারিকের কঠোর স্বৈর শাসনে ও সামরিক চাপে প্রাশিয়ার জনসাধারণের স্বাধীনভাবে কাজ করিবার ও নূতন কিছু সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা নষ্ট হয়। তাছাড়া তিনি প্রাশিয়ার জন্য দরকার অপেক্ষা বহু গুণ বেশী সৈন্য রাখেন। ভলতেয়ার বলেন যে "প্রাশিয়া হইল একটি দেশ যেখানে সৈন্যদলের জন্য প্রজা, প্রজার জন্য সৈন্যদল থাকে না" (Prussia is a country where the army keeps the people, not the people the army)।

ফ্রেডারিকের সংস্কার ব্যবস্থার ত্রুটি

একথা সত্য যে জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরতন্ত্রের সাধারণ ত্রুটিগুলিই ফ্রেডারিকের সংস্কার নীতির ত্রুটির জন্য দায়ী ছিল। ফ্রেডারিক তাঁহার বাস্তববুদ্ধির দ্বারা এই ত্রুটিপূর্ণ মতবাদকে অনেকটা সাফল্য মণ্ডিত করেন। দ্বিতীয় যোসেফের ন্যায় তিনি হতাশা ও ব্যর্থতার অন্ধকারে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন নাই। ঐতিহাসিক হেইজ এজন্য তাঁহাকে "অষ্টাদশ শতকের জ্ঞানদীপ্ত শাসকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ"[১] বলিয়াছেন। ফ্রেডারিক যে শাসন ব্যবস্থা প্রচলন করেন তাহা তাঁহার মৃত্যুর পর উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে ভাঙিয়া পড়ে। ফ্রেডারিক তাঁহার সেনাদলে বিদেশী ভাড়াটে সৈন্য নিয়োগ করেন। এই সেনাগণ রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত ছিল না। ফলে নেপোলিয়নের আক্রমণে প্রাশিয়ার শোচনীয় পরাজয় ঘটে। ঐতিহাসিক হ্যাসাল এজন্য বলিয়াছেন যে "ফ্রেডারিক প্রাশিয়ার উত্থান ও পতন উভয়ের জন্যই সমান দায়ী ছিলেন।"[২]

ফ্রেডারিকের কৃতিত্ব

অস্ট্রিয়ার দ্বিতীয় যোসেফের জ্ঞানদীপ্ত শাসন সংস্কার, ১৭৮০—৯০ খ্রীঃ (The enlightened Reforms of Joseph II of Austria, 1780—90): জ্ঞানদীপ্তির যুগে অন্যতম প্রখ্যাত জ্ঞানদীপ্ত স্বৈর-শাসক ছিলেন অস্ট্রিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় যোসেফ। আকাশে উল্কাপিণ্ড যেমন ক্ষণকালের জন্য তাহার দীপ্তিতে চোখ ধাঁধাইয়া দিয়া অন্ধকারে বিলীন হইয়া যায়, দ্বিতীয় যোসেফ দশ বৎসর কাল (১৭৮০-৯০ খ্রীঃ) তাঁহার বহুমুখী সংস্কার, প্রবল আদর্শবাদ ও জ্ঞানদীপ্তির দ্বারা ইওরোপের ইতিহাসকে আলোকিত করেন। দ্বিতীয় যোসেফ ছিলেন যুক্তিবাদী দর্শনের অনুরাগী ছাত্র। ঐতিহাসিক শেভিল এজন্য তাঁহাকে "জ্ঞানদীপ্তির মূর্তিমান প্রতীক" (Enlightenment personified) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, "আমি দর্শন শাস্ত্রকে আমার সাম্রাজ্যের বিধান রচনার ভার দিয়াছি। তাহার যুক্তিপূর্ণ নীতিগুলি আমার সাম্রাজ্যকে নিশ্চিতভাবে নব রূপ দান করিবে"।[৩] জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে রাজা স্বৈরাচারী হইলেও রাষ্ট্র ও প্রজার মঙ্গলের জন্য সংস্কার করিবেন। এই নীতি অনুসারে দ্বিতীয় যোসেফ অনেকগুলি প্রগতিশীল সংস্কার করেন।

যোসেফের আদর্শ

যোসেফ প্রথমেই রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত করার কাজে হাত দেন। (১) তিনি প্রাদেশিক সভাগুলির অধিকার নাকচ করিয়া সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে দেন। তিনি সাম্রাজ্যকে তেরটি অঞ্চলে ভাগ করিয়া প্রতি অঞ্চলের উপর একজন করিয়া সামরিক শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। (২) প্রদেশ-গুলির পুরাতন সীমানা ও শাসন ব্যবস্থা তিনি নাকচ করিয়া দেন। (৩) তিনি জার্মান ভাষাকে সরকারী বা রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা দেন। (৪) তিনি বিচার ব্যবস্থার উন্নতির জন্য ছয়টি আপীল আদালত স্থাপন করেন। মৃত্যুদণ্ড ও দৈহিক

যোসেফের শাসন ও রাজস্ব সংস্কার

---

১. "One of the finest type benevolent despots of the 18nth century." Hayes.

২. Hassal—Balance of power. P. 380.

৩. "I have made Philosophy the legislator of any empire. Her logical prinoiple sbail transform Austria."

নির্যাতন রদ করেন। প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া উহাতে জার্মান ভাষা শিক্ষা আবশ্যিক করেন। (৫) সরকারী কর্মচারীগণকে তিনি খরচ কমাইতে বাধ্য করেন। (৬) তিনি জমি জরীপ ও লোক গণনা করিয়া কর ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করেন। যোসেফের নূতন কর ব্যবস্থায় জমিদার, কৃষক সকল শ্রেণীই আনুপাতিক হারে কর দিতে বাধ্য হয়। জমির খতিয়ান তৈয়ারী করিয়া তিনি ইহার ভিত্তিতে কর ধার্য করেন। বাণিজ্যের উন্নতির জন্য যোসেফ হল্যাণ্ডের সেল্ট (Scheldt) নদীকে আন্তর্জাতিক জলপথে পরিণত করার চেষ্টা করেন। অষ্ট্রিয়ার সম্পদ যাহাতে বাহিরে না যায়, সেজন্য তিনি বিদেশী মালের আমদানি কমাইবার চেষ্টা করেন।

ভূমিদাসগণের মুক্তির আইন; চার্চের জাতীয়করণ

দ্বিতীয় যোসেফ তাঁহার বিখ্যাত মুক্তির ঘোষণার দ্বারা ১৭৮২ খ্রীঃ ভূমিদাসগণকে মুক্তি দিয়া তাহাদের স্বাধীন কৃষকে পরিণত করেন। মুক্তিপ্রাপ্ত ভূমিদাসগণকে তিনি জমির কিছু অংশ দেন। তিনি জমি জরীপ করিয়া উহার ভিত্তিতে কাগজপত্র তৈয়ারীর চেষ্টা করেন। যোসেফের ভূমি সংস্কারের ফলে ভূমিদাসগণ মুক্ত হইবার ফলে অষ্ট্রিয়ার বহু জমিদার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাহারা যোসেফের শাসন সংস্কারের ঘোর বিরোধিতা করে। যোসেফ প্রটেষ্টাণ্ট ও অন্য ধর্মাবলম্বীগণকে ধর্মীয় স্বাধীনতা দেন। তিনি অষ্ট্রিয়ার ক্যাথলিক চার্চকে পোপের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত করিয়া জাতীয় চার্চে পরিণত করেন। ১৭৮৩ খ্রীঃ এক ঘোষণার দ্বারা পোপ কর্তৃক অষ্ট্রিয়ার ধর্মযাজকগণকে নিযুক্ত করার অধিকার তিনি নাকচ করেন।

দ্বিতীয় যোসেফের সংস্কার ছিল সমসাময়িক যুগ অপেক্ষা অগ্রগামী। জমিদার শ্রেণী ও ক্যাথলিক গীর্জা এই দুই শক্তিশালী কায়েমী স্বার্থ যোসেফের সংস্কারের দ্বারা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইহার ফলে এই দুই শ্রেণী যোসেফের সংস্কার নীতির বিরুদ্ধে প্রবল বিরোধিতা করে। যোসেফের রাজস্ব নীতির বিরুদ্ধে হাঙ্গেরীতে বিদ্রোহ দেখা দেয়। ক্যাথলিক প্রজারাও যোসেফের ধর্মীয় সংস্কারে অসন্তুষ্ট হয়। জার্মান ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা করায় নেদারল্যাণ্ডে বিদ্রোহ দেখা দেয়। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে

যোসেফের সংস্কারের বিফলতা

বিদ্রোহের সম্মুখীন হইয়া দ্বিতীয় যোসেফ তাঁহার অধিকাংশ সংস্কার বাতিল করিয়া দেন। দ্বিতীয় যোসেফ ভগ্ন হৃদয়ে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর আগে তিনি আদেশ দেন তাঁহার সমাধির উপর প্রস্তর ফলকে যেন এই কথা খোদাই করা থাকে, "এখানে যে ব্যক্তি চির-নিদ্রায় নিদ্রিত আছে সে জীবনে যাহাই সফল করিতে চেষ্টা করিয়াছিল তাহাতেই বিফলতা বরণ করিয়াছে।"[১] এই উক্তির মধ্যে যোসেফের গভীর হতাশাবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

যোসেফের ব্যর্থতার জন্য তাঁহার বাস্তব জ্ঞানের অভাব বিশেষ দায়ী ছিল। অষ্ট্রিয়ার বাস্তব অবস্থা ছিল অত্যন্ত জটিল। এই বাস্তব অবস্থা এবং সাম্রাজ্যে ভাষাগত ও ধর্মগত বিভেদের কথা তিনি ভাবেন নাই। তিনি একসঙ্গে অনেকগুলি সংস্কার চালু করার চেষ্টা

১. "Here lies a man who never succeeded in anything that he attempted".—Hayes.

করেন। যে কাজ সম্পন্ন করিতে একশত বৎসর লাগা উচিত ছিল, তিনি তাহা দশ বৎসরের মধ্যে সমাধা করার চেষ্টা করেন। পুরাতন ব্যবস্থাকে ভাঙিয়া নূতন ব্যবস্থা গড়িতে হইলে যে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা দরকার যোসেফের তাহা ছিল না। তিনি অল্পেই ধৈর্য হারাইয়া ফেলিতেন। যোসেফ প্রগতিশীল সংস্কার করিলেও জনসাধারণকে রাজনৈতিক অধিকার দিতে রাজী ছিলেন না। মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীগণ রাজনৈতিক অধিকার দাবী করিলে তিনি তাহাদের দমাইয়া দেন। ইহার ফলে তাঁহার সংস্কারের প্রতি আস্থা নষ্ট হয়।

যোসেফের বিফলতার কারণ

যোসেফের সংস্কার নীতি বিচার করিলে ইহা বুঝা যায় যে তাঁহার সংস্কারগুলি ছিল তাঁহার যুগ অপেক্ষা অগ্রগামী। তিনি অষ্টাদশ শতকের লোক হইলেও তাঁহার ভাবধারা ছিল ঊনবিংশ শতকের উপযোগী।[১] তিনি ছিলেন বাস্তবতাবোধহীন স্বপ্নদর্শী আদর্শবাদী। তিনি যদি আদর্শবাদ অপেক্ষা বাস্তব অবস্থার দিকে নজর দিতেন তবে প্রাশিয়ার দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের মত তিনিও সফল হইতেন। কিন্তু তাহা হইলে তিনি নূতন যুগ সৃষ্টি করিতে পারিতেন না। দ্বিতীয় ফ্রেডারিক ছিলেন নিজ যুগের অনুবর্তী আর দ্বিতীয় যোসেফ ছিলেন নূতন যুগের স্রষ্টা। তাঁহার বিফলতা ছিল এক মহান বিফলতা মাত্র।

যোসেফের কৃতিত্ব

জারিনা দ্বিতীয় ক্যাথারিণ, ১৭৬২—৯৬ খ্রীঃ (Czarina Catherine II of Russia as an Enlightened Despot, 1762-96): জ্ঞানদীপ্তির প্রভাবে রাশিয়ার জারিনা দ্বিতীয় ক্যাথারিণ কিছু পরিমাণ আলোকপ্রাপ্ত সংস্কার করেন। দ্বিতীয় ক্যাথারিণ ছিলেন শিক্ষিতা ও সংস্কৃতিপ্রাণা। তিনি ফরাসী দার্শনিক ভলতেয়ারের অনুরাগিনী ছিলেন। ক্যাথারিণ একথা সর্বদা মনে রাখিতেন যে তিনি প্রজার জন্য মঙ্গলজনক কাজ করিলেও চূড়ান্ত ক্ষমতা নিজ হাতে রাখিবেন। তিনি জ্ঞানদীপ্তির ভাবধারাকে বাস্তব বুদ্ধির সহযোগে প্রয়োগ করেন।

দ্বিতীয় ক্যাথারিণের আদর্শবাদ

দ্বিতীয় ক্যাথারিণ প্রদেশের ক্ষমতা সংকুচিত করিয়া কেন্দ্রের হাতে সকল ক্ষমতা ন্যস্ত করিবার চেষ্টা করেন। তিনি রাশিয়াকে ৫০ টি প্রদেশে ভাগ করিয়া প্রদেশগুলির উপর নিজ মনোনীত শাসনকর্তা বসান। তিনি সংবিধান সংস্কারের জন্য ৫৬৪ জন সভ্য লইয়া একটি আইন পরিষদ গঠন করেন। এই আইন পরিষদ যাহাতে একমাত্র তাঁহার ইচ্ছা মানিয়া চলে সেদিকে তিনি কড়া নজর রাখিতেন। জেলাগুলিতে তিনি জেলা-পরিষদ স্থাপন করিয়া উহার মাধ্যমে প্রজাদের তাঁহার নিকট আবেদন-নিবেদন করিতে নির্দেশ দেন। তিনি আইভান বেটস্কি নামক শিক্ষাবিদের সাহায্যে শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার করেন। জিমন্যাসিয়াম নামক আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া তিনি অভিজাতবংশীয় ছাত্রগণকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। সমাজের সর্বশ্রেণীর জন্য তিনি জাতীয় বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা চালু করেন। অভিজাত মহিলাগণকে তিনি ইওরোপীয় ফ্যাসান ও চালচলন রপ্ত করিতে উৎসাহ দেন। ভূমিদাস

ক্যাথারিণের সংস্কার সমূহ

১. Riker—Short History of Europe. P. 122.

প্রথার যৌক্তিকতা বিচার করিবার জন্য তিনি পণ্ডিতগণকে প্রবন্ধ রচনা করিতে নির্দেশ দেন। ভূমিদাসগণকে মুক্ত করিবার উদ্যম দেখাইলেও তিনি শেষ পর্যন্ত কিছু না করিয়া তাহাদের অভিজাতগণের অধীনস্থ রাখেন। জমিদারগণের শোষণ হইতে এই দরিদ্র অবহেলিত শ্রেণীকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার দার্শনিক চিন্তা কাজে লাগান নাই। তাছাড়া সংবিধান রচনার জন্য আইন পরিষদ স্থাপন করিলেও তিনি এই পরিষদের কোন সুপারিশ কার্যকরী করেন নাই। জারের ক্ষমতা কমাইয়া প্রজাগণকে রাজনৈতিক অধিকার দিতে তিনি রাজী ছিলেন না। ফ্রান্সে বিপ্লব দেখা দিলে, ক্যাথারিণ মনে করেন যে রাশিয়ায় উদারতন্ত্র স্থাপন করিলে অনুরূপ বিপ্লব দেখা দিবে। আসলে জ্ঞানদীপ্তির প্রতি ক্যাথারিণের অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল না। ঐতিহাসিক কোচানের মতে তিনি ছিলেন বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায় দলের সভ্যা। জ্ঞানদীপ্তি ছিল তাঁহার শখের ব্যাপার, স্বৈর ক্ষমতা ছিল তাঁহার জীবন মরণের প্রশ্ন। ঐতিহাসিক রাইকারের মতে যদিও দ্বিতীয় ক্যাথারিণ ছিলেন দার্শনিক মনোভাবের প্রতি অনুরক্তা, কিন্তু ইহার বাস্তব প্রয়োগে তিনি উদাসীনা ছিলেন।[১] দ্বিতীয় ক্যাথারিণের আলোকপ্রাপ্ত সংস্কারগুলি আসলে তেমন কার্যকরী হয় নাই। ইহার প্রধান কারণ এই ছিল যে তিনি জ্ঞানদীপ্তি অপেক্ষা স্বৈরতন্ত্রের বেশী অনুরাগিণী ছিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিল্প-বিপ্লব (The Industrial Revolution)

শিল্প-বিপ্লব (The Industrial Revolution)ঃ ফরাসী সমাজবাদ্ ব্ল্যাঙ্ক (Blanqui) শিল্প-বিপ্লব কথাটি ১৮৩৭ খ্রীঃ সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন। শিল্প-বিপ্লব বলিতে দৈহিক শ্রমের পরিবর্তে যন্ত্র দ্বারা ব্যাপক শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন বুঝায়। অষ্টাদশ শতকে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে কাজে লাগাইয়া নূতন নূতন যন্ত্র আবিষ্কার করা হয়। এই সকল যন্ত্র চালাইবার জন্য বড় বড় কারখানা বা ফ্যাক্টরী গড়িয়া উঠে। যান্ত্রিক শক্তির সাহায্যে শিল্পের উৎপাদন করায় পুরাতন হস্ত চালিত কুটির শিল্প প্রায় উঠিয়া যায়। উৎপাদন ব্যবস্থা আগাগোড়া পাল্টাইয়া যায়। শিল্পের ক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যবস্থার এই বৈপ্লবিক ও আমূল পরিবর্তনকে শিল্প-বিপ্লব বলা হয়।

শিল্প-বিপ্লব কাহাকে বলে

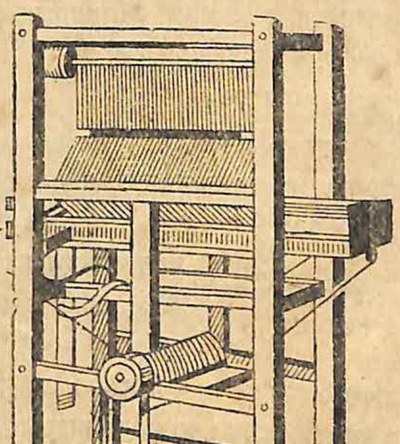
শিল্প-বিপ্লব সর্বপ্রথম ইংলণ্ডেই আরম্ভ হয়। পরবর্তীকালে ইহা ফ্রান্স, বেলজিয়াম, জার্মানী ও রাশিয়া প্রভৃতি দেশে ছড়াইয়া পড়ে। ইংলণ্ডে সর্বপ্রথম শিল্প-বিপ্লব ঘটিবার কয়েকটি কারণ ছিল। প্রথমতঃ, ইংলণ্ডের আবহাওয়া, কয়লা ও লৌহ সম্পদের প্রাচুর্য শিল্প-বিপ্লবের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। দ্বিতীয়তঃ, ইংলণ্ডের ক্যানালগুলির সাহায্যে খনি হইতে কল-কারখানায়

ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লব আরম্ভ হইবার কারণ

১. "Catherine was more a philosopher than a statesman". Riker P. 185.

সহজে কয়লা বহন করা যাইত। এই কয়লার সাহায্যে ইঞ্জিন চালান যাইত। তৃতীয়তঃ, এই সময় ইংলণ্ডের উদারপন্থী দলের (Whig) হাতে সরকার ছিল। এই দলের নেতারা ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিল্প উৎপাদনের উন্নতির দিকে বিশেষ নজর দেন। চতুর্থতঃ, ফ্রান্সের সহিত ইংলণ্ডের যুদ্ধের জন্য অস্ত্র-শস্ত্র, লোহার বিশেষ দরকার পড়ে। যুদ্ধের চাহিদা মিটাইবার জন্য শিল্পের দ্রুত প্রসার ঘটে। পঞ্চমতঃ, ইংলণ্ডের পিউরিটান ধর্মমতের লোকেরা অলসতাকে পাপ মনে করিত। ইংলণ্ডের পিউরিটানপন্থীগণ কল-কারখানা স্থাপনের কাজে বিশেষ উদ্যোগী হয়। ষষ্ঠতঃ, ফ্রান্সিস বেকনের আমল হইতে ইংলণ্ডের বৈজ্ঞানিকেরা বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগের দিকে বিশেষ নজর দেন। ইহার ফলে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির আবিষ্কার সর্বপ্রথম ইংলণ্ডেই হয়। সপ্তমতঃ, ইংলণ্ডে কয়লা ও লোহার অপর্যাপ্ত যোগান থাকায় ইংলণ্ডে শিল্পের প্রসার সহজ হয়। এই সকল কারণে ইংলণ্ডে সর্বপ্রথম শিল্প-বিপ্লব ঘটে। ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লব প্রথম আরম্ভ হইলেও ক্রমে ইহা ইওরোপের অন্য দেশে ছড়াইয়া পড়ে। ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লবের প্রসার আলোচনা করিলে ইওরোপের অন্যান্য স্থানে পরবর্তীকালে ইহার প্রসার সম্পর্কে ধারণা করা যাইবে।

ঐতিহাসিক উডওয়ার্ডস শিল্প-বিপ্লবকে চারিটি ধারায় বিভক্ত করিয়াছেন, যথা—(১) যন্ত্রের সাহায্যে কল-কারখানায় শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন ; (২) মাল চলাচলের উন্নত ব্যবস্থা গঠন ; (৩) উৎপন্ন শিল্পদ্রব্যের বিক্রয়ের জন্য বাজার গঠন ; (৪) মূলধন যোগাইবার জন্য ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার প্রসার। শিল্প-বিপ্লব বলিতে কেবলমাত্র যন্ত্রের সাহায্যে মালের উৎপাদন বুঝায় না। উপরের চারিটি শাখায় শিল্পের প্রসার ও উৎপাদন ব্যবস্থাকে শিল্প-বিপ্লব বলা যায়।



পাওয়ার লুম

ইংলণ্ডে কলের সাহায্যে বস্ত্র বয়ন

ইংলণ্ডের বয়ন শিল্পে সর্বপ্রথম যন্ত্রের ব্যবহার আরম্ভ হয়। ইহার ফলে হাতে তৈয়ারী তাঁতের কাপড়ের পরিবর্তে যন্ত্রে তৈয়ারী কাপড় বাজারে চালু হয়। জন কে নামে এক ব্যক্তি (১৭৩৩ খ্রীঃ) ফ্লায়িং শাটল বা 'উড়ন্ত মাকু' নামে এক কাপড় বুনিবার যন্ত্র আবিষ্কার করেন। ইহার পর হারগ্রীভ নামে অপর একজন (১৭৬৫ খ্রীঃ) স্পিনিং জেনি নামে একটি সূতা তৈয়ারীর যন্ত্র আবিষ্কার করেন। রিচার্ড আর্করাইট নামে অপর একজন ব্যক্তি (১৭৬৯ খ্রীঃ) ওয়াটার ফ্রেম বা জল শক্তির সাহায্যে চালিত এক কাপড় বুনিবার যন্ত্র আবিষ্কার করেন। জন কার্টরাইট, মিউল নামে অপর একটি কাপড় বুনিবার উন্নত ধরণের যন্ত্র আবিষ্কার করেন।

উপরের যন্ত্রগুলিকে জল বা বায়ু শক্তির দ্বারা চালনা করা যাইত। বাষ্প দ্বারা ইঞ্জিন চালাইবার উপায় আবিষ্কৃত হইলে প্রকৃত শিল্প-বিপ্লব আরম্ভ হয়।[১] বাষ্প চালিত ইঞ্জিন যে কোন স্থানে বসাইয়া যে কোন যন্ত্র চালান সম্ভব ছিল। ১৭৬৯ খ্রীঃ জেমস ওয়াট এক উন্নত ধরণের বাষ্প চালিত ইঞ্জিন তৈয়ারী করিলে শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে নবযুগ আরম্ভ হয়। বাষ্প চালিত ইঞ্জিনের সাহায্যে কল-কারখানায় বড় বড় যন্ত্রগুলি চালান সম্ভব হয়। ম্যাথু বোল্টন নামে এক ধনপতি জেমস ওয়াটের সাহায্যে বাষ্প ইঞ্জিন নির্মাণের কারখানা বসান। বোল্টন এই কারখানার মালিক ছিলেন বলিয়া ইঞ্জিনগুলির নাম হয় বোল্টন ইঞ্জিন। বোল্টন ইঞ্জিনের সাহায্যে বিভিন্ন ধরণের যন্ত্র চালান সম্ভব হয়। বোল্টন ইঞ্জিন দ্বারা কয়লা তোলা, কাপড় বোনা, রেল চালান, জাহাজ চালান প্রভৃতি কাজ করা সম্ভব হয়।

বাষ্পীয় ইঞ্জিন নির্মাণ

এদিকে ইঞ্জিন, বয়লার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি তৈয়ারী করিতে প্রচুর লোহার দরকার পড়ে। ১৭৬০ খ্রীঃ জন স্মীটন নামে এক ব্যক্তি লোহা গালাইবার জন্য ব্লাষ্ট ফার্নেস বা চুল্লী আবিষ্কার করেন। ইহার ফলে লৌহ শিল্পে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটে। এদিকে লোহা গালাইবার ও ইঞ্জিন চালাইবার জন্য খনিজ কয়লার ব্যবহার আরম্ভ হয়। বাষ্পীয় ইঞ্জিনের সাহায্যে খনির নীচ হইতে কয়লা উপরে তোলার ব্যবস্থা হইলে প্রচুর কয়লা পাওয়া যায়। মাটির নীচে খনি শ্রমিকেরা যাহাতে নিরাপদে কাজ করিতে পারে এজন্য হামফ্রে ডেভি সেফটি ল্যাম্প বা নিরাপদ বাতি আবিষ্কার করেন। ঐতিহাসিক উডওয়ার্ডসের মতে লোহা গালাইবার কাজে খনিজ কয়লা ব্যবহারের ফলে লোহার উৎপাদন বাড়ে। লোহার উৎপাদন বাড়িলে কলকব্জার দাম সস্তা হয়। সস্তায় যন্ত্রপাতি তৈয়ারী হইবার ফলে জিনিস-পত্রের দামও কমিয়া যায়।[২]

লৌহ শিল্প ও কয়লার উৎপাদন

যন্ত্রের সাহায্যে মাল উৎপাদন হইলে মালের যোগান বাড়ে। এই বাড়তি মাল যাহাতে বিভিন্ন স্থানে দ্রুত পাঠান যায় এজন্য মাল চলাচল ব্যবস্থার উন্নতির দরকার হয়। জর্জ ষ্টিভেনসন (১৮১৪ খ্রীঃ) বাষ্প চালিত রেল ইঞ্জিন নির্মাণ করেন। ইহার ফলে পরিবহন ব্যবস্থায় অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটে। ষ্টিভেনসনের রেল ইঞ্জিন লোহার পাতের উপর দিয়া ঘণ্টায় ৩০ মাইল বেগে ছুটিতে পারিত। বাষ্পীয় ইঞ্জিনের সাহায্যে সমুদ্রে জাহাজ চালাইবার ব্যবস্থাও করা হয়। ফুলটন নামে এক ব্যক্তি (১৮৬৭ খ্রীঃ) একটি বাষ্প চালিত জাহাজে করিয়া ৩২ ঘণ্টায় ১৩০ মাইল সমুদ্র পাড়ি দেন। ফুলটনের আবিষ্কারের ফলে বাষ্পীয় জাহাজের যুগ আরম্ভ হয়। দ্রুতগামী জাহাজে করিয়া একদেশ হইতে কম খরচে অন্য

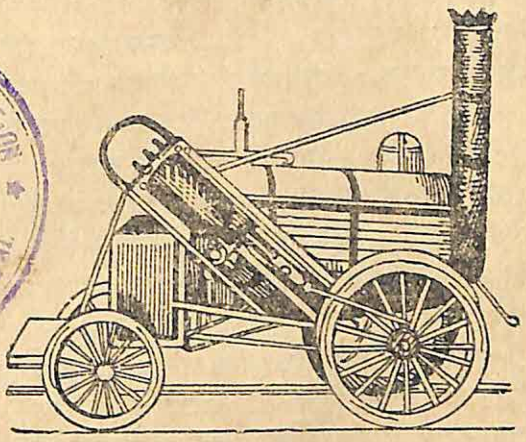
রেলপথ ও বাষ্পীয় পোত নির্মাণ

---

১. "The basis of Industrial Revolution was the application of steam power to machinery"—D. Thomson.

২. "The use of coal increased the output of iron; a larger output of iron cheapened the cost of machinery and cheaper machines lessened expense of coal mining." Woodwards.

দেশে মাল পাঠান আরম্ভ হয়। টেলফোর্ড ও ম্যাকাডাম নামে দুই ইঞ্জিনিয়ার পিচের রাস্তা নির্মাণের কৌশল আবিষ্কার করিলে সকল ঋতুতে ব্যবহারের উপযোগী পিচ রাস্তা নির্মাণ সম্ভব হয়। ইহার ফলে যাতায়াত ও মাল বহনের কাজে বিশেষ উন্নতি ঘটে।



বাষ্পীয় রেল ইঞ্জিন

বৈদ্যুতিক শক্তি, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন আবিষ্কৃত হইলে যোগাযোগ ও উৎপাদন ব্যবস্থায় যুগান্তর ঘটে।

শিল্প-বিপ্লব অথবা যন্ত্রের দ্বারা মাল উৎপাদন আরম্ভ হইলে প্রয়োজন অপেক্ষা অনেক বেশী মালের উৎপাদন হয়। এই বাড়তি মাল অন্য দেশের বাজারে বিক্রয় করিয়া মুনাফা করার সম্ভাবনা দেখা দেয়। তাছাড়া কল-কারখানায় ব্যবহারের জন্য সস্তা কাঁচা মাল বাহিরের দেশ হইতে আনার দরকারও হয়। যেমন ম্যাঞ্চেস্টারের কাপড়ের কলের জন্য গুজরাট ও মিশর হইতে তুলা, রং-এর কারখানার জন্য বাংলার নীল প্রভৃতির কথা বলা যায়। এই দুই প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ইওরোপীয় দেশগুলি ভারত, চীন প্রভৃতি এশিয়ার নানা দেশ, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন করে। এই সকল দেশের বাজারে তাহাদের মাল বিক্রয় করে এবং এই স্থানগুলি হইতে কাঁচামালও যোগাড় করা হয়। এশিয়া, আফ্রিকার বাজারে একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করিবার জন্য ইওরোপীয় জাতিগুলির মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হয়।

মাল বিক্রয় ব্যবস্থার পরিবর্তন। বাজার দখলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা

শিল্প-বিপ্লবের ফলে বড় বড় কলকারখানা স্থাপিত হয়। এই কারখানা স্থাপনের জন্য প্রচুর মূলধনের দরকার হয়। এজন্য ব্যাংক ব্যবস্থা গড়িয়া উঠে। ব্যাংকগুলি নূতন শিল্পকে একটি নির্দিষ্ট সুদে মূলধন সরবরাহ করিলে ব্যাংকের দেওয়া মূলধনে বড় বড় কারখানা স্থাপিত হয়। শিল্পকে চালু রাখিবার জন্য ব্যাংক ব্যবসায় অপরিহার্য হইয়া পড়ে। এইভাবে শিল্প-বিপ্লব চারিটি ধারায় বিস্তার লাভ করে।

ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের প্রসার

শিল্প-বিপ্লবের ফলাফল (Impact of the Industrial Revolution on contemporary society and politics)ঃ বিপ্লব কথাটির অর্থ হইল পুরাতন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন। শিল্প-বিপ্লবের ফলে ইওরোপের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটে। কলকারখানায় মূলধন খাটাইয়া শিল্পপতিগণ প্রচুর মুনাফা লাভ করে। সমাজে একশ্রেণীর ধনপতির উদ্ভব হয়। যন্ত্রের সাহায্যে অল্প সময়ে, অল্প পরিশ্রমে অধিক মাল উৎপন্ন হওয়ায় মানুষের জীবনযাত্রা আরামপ্রদ হয়। কলকারখানায় বহু বিলাস দ্রব্য নির্মিত হওয়ায় লোকে তাহা ব্যবহার করার সুযোগ পায়। রেল, জাহাজ প্রভৃতি দূরগামী ও দ্রুত যানবাহন আবিষ্কারের ফলে দূরদেশে যাতায়াত সহজসাধ্য হয়। দেশের বিভিন্ন স্থানে নূতন নূতন শিল্প নগর গড়িয়া উঠে। বড় বড় কলকারখানায় বহু লোকের কর্ম সংস্থান হয়। লোকে জীবিকার্জনের জন্য নূতন পথের সন্ধান পায়। কৃষির বিকল্প হিসাবে শিল্প একটি বড় জীবিকায় পরিণত হয়। আগে ধনী জমিদারেরা সমাজে ক্ষমতা পাইত। এখন বড় বড় শিল্পপতি যাহাদের বুর্জোয়া বলা হয়, তাহারা ক্ষমতা পায়। কল-কারখানা, অফিসে কাজ করা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। পুরাতন কৃষি-ভিত্তিক সামন্তশাসিত সমাজ ব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়ে। গ্রামাঞ্চলের বৈচিত্রহীন ও দরিদ্র জীবনের মোহ কাটাইয়া কলকারখানায় কাজের জন্য লোকে শহরে চলিয়া আসে। স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীন জীবনযাত্রা শিল্প-বিপ্লবের আঘাতে ভাঙিয়া পড়ে। কারখানায় যন্ত্রে তৈয়ারী মালের দাম কম হওয়ায়, হাতে তৈয়ারী কুটির শিল্পের মাল ইহার সহিত প্রতিযোগিতায় হটিয়া যায়। কলকারখানায় তৈয়ারী মাল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বাজারে বিক্রয়ের ব্যবস্থা হয়। ইহার ফলে ব্যবসায়-বাণিজ্যের বিরাট প্রসার ঘটে। মোট কথা শিল্প-বিপ্লব পৃথিবীতে প্রায় এক নূতন সভ্যতার সৃষ্টি করে।

শিল্প-বিপ্লবের সুফল

শিল্প-বিপ্লব মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত ও আরামপ্রদ করিলেও ইহার কুফল কম ছিল না। শিল্প-বিপ্লবের বহু সামাজিক কুফল দেখা যায়। এক শ্রেণীর লোক কলকারখানা স্থাপন করিয়া এবং পুঁজি খাটাইয়া বহু মুনাফা পায়। কিন্তু ইহারা শ্রমিকগণকে কম মাহিনা দিয়া বেশী সময় খাটাইয়া, দারিদ্র্য ও দুরবস্থার মধ্যে জীবন কাটাইতে বাধ্য করে। শ্রমিকগণকে তাহাদের ন্যায্য পারিশ্রমিক ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত করা হয়। সমাজে একশ্রেণী যাহাদের মালিক বা বুর্জোয়া বলা হয় তাহারা শ্রমিকদের শোষণ চালায়। সমাজে ধনী ও দরিদ্রের ফারাক বাড়িয়া যায়। দার্শনিক কার্ল মার্ক্স শিল্প-বিপ্লবের ভয়াবহ পরিণাম লক্ষ্য করিয়া বলেন যে ধনী অধিকতর ধনী হইতেছে এবং দরিদ্র ক্রমেই অধিকতর দরিদ্র হইতেছে। ঐতিহাসিক ফিশার মন্তব্য করিয়াছেন যে, "এ্যাডাম স্মিথ শিল্প-বিপ্লবের প্রথম দিকে সূর্যের আলো বা আশা দেখেন, শিল্প-বিপ্লব পূর্ণতা লাভ করিলে মার্ক্স সেক্ষেত্রে অন্ধকার বা দারিদ্র্যের ছায়া লক্ষ্য করেন।"[১] দ্বিতীয়তঃ, শ্রমিকগণ কলকারখানায়

সামাজিক কুফল

১. "When Smith had seen only sunlight, Marx saw only shadows......ever widening gulf between wealth and poverty." Fisher.

চাকুরীর জন্য শহরাঞ্চলে বাস করায় তাহাদের জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়ে। তাহারা যে মজুরী পাইত তাহাতে শহরে ভালভাবে বাস করার ব্যয় সংকুলান করা সম্ভব ছিল না। তাছাড়া কারখানার চাকুরীতে তাহাদের যে কোন সময়ে ছাঁটাই হইবার সম্ভাবনা ছিল। ইহার ফলে শ্রমিকদের সর্বদা দারিদ্র্য ও আতঙ্কে দিন কাটাইতে হয়। তৃতীয়তঃ, শ্রমিকেরা কারখানার পার্শ্ববর্তী বস্তীগুলিতে বসবাস করিত। এই বস্তীগুলির অবস্থা ছিল অত্যন্ত নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর। পানীয় জল ও স্বাস্থ্যরক্ষার কোন সুব্যবস্থা এখানে ছিল না। শ্রমিক বস্তিগুলি মড়ক, নৈতিক মানের স্খলন, দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও দাঙ্গার ফলে নরককুণ্ডে পরিণত হয়। চতুর্থতঃ, বস্তির নিরানন্দময় ও একঘেয়ে জীবনের হাত হইতে মুক্তির জন্য অধিকাংশ শ্রমিক মদ্যপান ও অন্যান্য পাপ কাজে লিপ্ত হয়। শিক্ষা ও নৈতিকতার অভাবে তাহারা জীবনের লক্ষ্য হারাইয়া ফেলে। পঞ্চমতঃ, কারখানায় কাজ করিয়া নগদ পয়সা পাইবার লোভে এবং শহরের আরাম ও আমোদ-প্রমোদ ভোগ করিবার আশায় বহু-লোক গ্রাম ছাড়িয়া শহরের কারখানা অঞ্চলে চলিয়া আসে। ইহার ফলে গ্রামগুলি দ্রুত জনহীন হইয়া পড়ে। অপরদিকে অত্যধিক লোকের চাপে শহরের জল সরবরাহ, গৃহ, স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা সবই ভাঙিয়া পড়ে। ষষ্ঠতঃ, বড় বড় কলকারখানা স্থাপিত হইলে উহাকে কেন্দ্র করিয়া ইংলন্ডে বার্মিংহাম, ম্যানচেষ্টার, শেফিল্ড প্রভৃতি নূতন শিল্পনগর, ফ্রান্সে লায়নস, জার্মানীতে হামবুর্গ প্রভৃতি শিল্পকেন্দ্র স্থাপিত হয়। সপ্তমতঃ, যান্ত্রিক শিল্পের প্রসারের ফলে কুটির শিল্প ধ্বংস হয়। লোকে কলে তৈয়ারী সস্তার কাপড় ও অন্যান্য জিনিষ কিনিতে আরম্ভ করিলে হাতে তৈয়ারী জিনিষের বাজার নষ্ট হয়। যে সকল লোক হাতের কাজ করিয়া জীবন ধারণ করিত তাহারা বেকার হইয়া দিন মজুরে পরিণত হয়। বেকার কারিগরগণ কলকারখানাকে তাহাদের প্রধান শত্রু মনে করিয়া কল-কারখানা ভাঙিবার জন্য দাঙ্গা আরম্ভ করে। ইংলন্ডে শিল্প-বিপ্লবের গোড়ার দিকে বেকার শ্রমিকেরা কারখানা ভাঙিবার জন্য যে দাঙ্গা বাধায় তাহাকে লাডাইট দাঙ্গা বা Luddete Riot বলা হয়।

রাজনৈতিক ফলাফল

শিল্প-বিপ্লবের রাজনৈতিক ফলাফলও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। শিল্পপতিগণ কলকারখানা ও ব্যবসায়ে প্রভূত অর্থ আয় করিয়া সমাজে প্রতিপত্তি লাভ করে। সরকার শিল্পপতিদের কথামত চলিতে বাধ্য হয়। শিল্পপতিরা সরকারকে দিয়া তাহাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য বিভিন্ন আইন পাশ করাইয়া নেয়। এই সকল আইন দ্বারা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ও বিভিন্ন শ্রমিক আন্দোলন দমাইবার চেষ্টা করা হয়। বুর্জোয়া শ্রেণী এইভাবে সরকারকে কুক্ষিগত করে এবং শ্রমিক শোষণ করিয়া মুনাফা বাড়ায়। দ্বিতীয়তঃ, শ্রমিক শ্রেণী ইহা উপলব্ধি করে যে তাহাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য সরকার যদি আইন পাশ না করে তবে তাহাদের উন্নতি হইবে না। মালিকেরা শ্রমিকদের বেশী খাটাইয়া কম মজুরী দিতে থাকিবে। এদিকে সরকারের উপর প্রভাব না খাটাইলে শ্রমিকের স্বার্থে সরকার আইন পাশ করিবে না ইহা বুঝা যায়। সুতরাং পার্লামেন্টের নির্বাচনে শ্রমিকেরা যাহাতে ভোট দেওয়ার অধিকার পায় তাহা লইয়া ইংলন্ডে চার্টিষ্ট আন্দোলন নামে এক ব্যাপক আন্দোলন আরম্ভ হয়।

এই আন্দোলনের চাপে সরকার শেষ পর্যন্ত শ্রমিকদিগকে ভোটাধিকার দিতে বাধ্য হন। শ্রমিক শ্রেণী পার্লামেণ্টে তাহাদের প্রতিনিধি পাঠাইয়া শ্রমিকের স্বার্থরক্ষার জন্য যথা— নিম্নতম মজুরী আইন, শ্রমিক বীমা আইন প্রভৃতি আইন পাশ করাইয়া নেয়। তৃতীয়তঃ, শ্রমিকগণের ন্যায্য মজুরি ও অন্যান্য সুবিধা আদায়ের জন্য ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন আরম্ভ হয়। ট্রেড ইউনিয়নগুলি ধর্মঘট প্রভৃতি দ্বারা মালিকের উপর চাপ সৃষ্টি করিয়া শ্রমিকের দাবী আদায়ের চেষ্টা করে। চতুর্থতঃ, শিল্প-বিপ্লবের ফলে সমাজতন্ত্র (Socialism) নামে এক নূতন রাজনৈতিক মতবাদের উদ্ভব হয়। সেণ্ট সাইমন, লুই ব্ল্যাঙ্ক প্রভৃতি চিন্তাবিদগণ বলেন যে শ্রমই সম্পদের উৎস। শ্রমিকের শ্রমের ফলেই সম্পদ উৎপন্ন হয়। প্রাকৃতিক সম্পদকে শ্রমিকেরা শ্রম দ্বারা সম্পদে পরিণত করে। মালিকেরা শ্রমিকদের খাটাইয়া সেই সম্পদ লাভ করে। শ্রমিকেরাই এই সম্পদের ন্যায্য মালিক। মালিকশ্রেণী শ্রমিককে বঞ্চিত করিয়া মুনাফা ভোগ করে। তাহারা শ্রমিককে তাহার ন্যায্য পাওনা দেয় না। সুতরাং সমাজতন্ত্রবিদ্‌রা বলেন যে শিল্পগুলিতে শ্রমিকের মালিকানা স্থাপন করা দরকার। শ্রমিক যাহাতে তাহার ন্যায্য পাওনা পায় এদিকে সরকারের লক্ষ্য দেওয়া কর্তব্য। এই মতবাদকে সমর্থন করিয়া যে আন্দোলন গড়িয়া উঠে তাহাকে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন বলা হয়। ক্রমে সমাজতন্ত্রবাদীরা সমাজে নূতন করিয়া ধন সম্পদ বণ্টনের দাবী জানায়। মার্ক্স প্রভৃতি চিন্তাবিদরা বলেন যে শ্রমিকের দ্বারাই রাষ্ট্র গঠন করিয়া ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাষ্ট্রের হাতে নেওয়া উচিত। রাষ্ট্র শ্রমিকের স্বার্থে এই জাতীয় সম্পত্তিকে পরিচালনা করিবে। প্রতি ব্যক্তি তাহার ক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করিবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সরকার হইতে সাহায্য পাইবে। সমাজে এক শ্রেণীর স্বার্থে অপর শ্রেণীকে শোষণ করা যাইবে না। কারণ রাষ্ট্র শোষিত শ্রমিকদের দখলে থাকায় রাষ্ট্র শোষণ বন্ধ করিবে। ধনী ও দরিদ্র বলিয়া থাকিবে না। কারণ সকল সম্পদ রাষ্ট্রের হাতেই যাইবে। মার্ক্সের আদর্শ পুরাপুরি গৃহীত না হইলেও বহু রাষ্ট্র সমাজতান্ত্রিক নীতি অনুসারে ধনবৈষম্য দূর করার কাজে হাত দেয় এবং শ্রমিকের স্বার্থরক্ষার জন্য আইন রচনা করে।

অর্থনৈতিক ফলাফল

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শিল্প-বিপ্লব ইওরোপে গভীর পরিবর্তন আনে। প্রথমতঃ, শিল্প-বিপ্লবের ফলে চাহিদা অপেক্ষা মালের উৎপাদন বাড়ে। এই উদ্বৃত্ত মাল বিক্রয়ের জন্য ইওরোপীয় জাতিগুলির মধ্যে বাজার দখলের ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হয়। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স শিল্পে অগ্রসর হওয়ায় এশিয়া ও আফ্রিকার রাজ্যগুলি তাহাদের একচেটিয়া দখলে আসে। জার্মানী প্রভৃতি দেশে শিল্প-বিপ্লব দেরীতে আরম্ভ হওয়ায় এই দেশগুলি তাহাদের উদ্বৃত্ত মাল বিক্রয়ের জন্য বাজার দখল করিতে গিয়া দেখে যে এশিয়া-আফ্রিকার উপনিবেশগুলিতে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স দখল লইয়াছে। ফলে জার্মানী প্রভৃতি দেশ বলপূর্বক ইংলণ্ড, ফ্রান্সের বাজার দখলের চেষ্টা করে। ইহার ফলে আন্তর্জাতিক রেষারেষি বাড়ে এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধে। দ্বিতীয়তঃ, ইওরোপীয় জাতিগুলি আফ্রিকা মহাদেশকে ভাগ করিয়া নিজ নিজ উপনিবেশ ও বাজারে পরিণত করে। তৃতীয়তঃ, শিল্প-

বিপ্লবের ফলে বিজ্ঞানের প্রয়োগ বিদ্যার প্রসার হয়। এইভাবে, শিল্প-বিপ্লব এক নূতন যুগের সূচনা করে।

মানব সভ্যতার উপর শিল্প-বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া

(Effects of the Industrial Revolution on Human Civilisation): অষ্টাদশ শতকের শিল্প-বিপ্লব আজ সমগ্র মানব সভ্যতাকে প্রভাবিত করিয়াছে। যে দেশ শিল্পে যত অগ্রসর সেই দেশ আজ বিশ্বে তত শক্তিশালী হিসাবে পরিগণিত হয়। শিল্পে উৎপাদন ক্ষমতাই এখন দেশের উন্নতির মানদণ্ড বলিয়া গণ্য করা হয়। যদি কোন দেশ শিল্পে অনুন্নত হয় তবে সেই দেশের জীবনযাত্রার মান হয় নীচু, সেই দেশের সম্পদ হয় সীমিত। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাহার সম্মান ও ক্ষমতাও হয় নগণ্য। শিল্পের উন্নতির ভিত্তিতে অধুনা অপর রাষ্ট্রগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়, যথা, অত্যন্ত উন্নত; উন্নতিশীল ও অনুন্নত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকা ও রাশিয়াকে শিল্পে অত্যন্ত উন্নত দেশ বলিয়া ধরা হয়। ইহারা ভারী শিল্প যথা লোহা, বিদ্যুৎ, আণবিক শক্তি প্রভৃতিতে সমৃদ্ধশীল। এই সকল দেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা এমনই অগ্রগামী যে অন্যান্য দেশগুলি তাহার নাগাল পায় না। এই সকল দেশের উৎপাদন ক্ষমতা এত বেশী যে ইহারা পৃথিবীর অনুন্নত দেশগুলিকে খয়রাতি সাহায্য বা ঋণ দিয়া থাকে। আন্তর্জাতিক রাজনীতি প্রধানতঃ এই দুই দেশের অঙ্গুলিহেলনে চলে। বিশ্ব ব্যাংক, আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার প্রভৃতি সংস্থাগুলি এই দেশগুলির দানে পরিপুষ্ট হয়। পশ্চিম জার্মানী, ফ্রান্স, জাপান, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশগুলিও শিল্পে উন্নত দেশ বলা হয়। ইহারাও প্রচুর মাল উৎপাদন করিয়া বিশ্বের বাজারে বিক্রয় করে। এই সকল দেশগুলির শক্তিও কম নহে।

অগ্রসর দেশ

ভারত, চীন, মিশর, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশগুলিকে উন্নয়নশীল দেশ বলা হয়। এই দেশগুলি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির অধীনে ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর স্বাধীনতা লাভ করিবার পর এই দেশগুলি বুঝিতে পারে যে কৃষি নির্ভর অর্থনীতি লইয়া পৃথিবীতে টিকিয়া থাকা সম্ভব নহে। সুতরাং এই দেশগুলি শিল্প বিস্তারের কাজে নামিয়া পড়ে। ভারত বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে দুর্গাপুর, ভিলাই, রাউরকেল্লা প্রভৃতি ভারী শিল্প নগরী গড়িয়া তুলে। রাসায়নিক সার, ট্রাক্টর ও সেচ ব্যবস্থার উন্নতি করিয়া কৃষির ক্ষেত্রেও শিল্প-বিপ্লবকে ছড়াইয়া দেওয়ার চেষ্টা চলে। ভোগ্যপণ্যের যান্ত্রিক উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হয়। এইভাবে ভারত প্রভৃতি দেশগুলি শিল্প-বিপ্লবের ক্ষেত্রে আগাইয়া চলিয়াছে। তবে উপযুক্ত প্রযুক্তি বিদ্যার অভাব ও রসদপত্রের অভাবে অগ্রগামী দেশ অপেক্ষা উন্নয়নশীল দেশগুলি পিছাইয়া আছে। তবুও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে শিল্প-বিপ্লব ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশের শক্তি ও স্বনির্ভরতা অনেক বাড়াইয়াছে। জীবনযাত্রার মান অনেক উঁচু হইয়াছে। মাথাপিছু জাতীয় আয় বাড়িয়াছে। কর্ম সংস্থানের উন্নতি হইয়াছে। কৃষি নির্ভর অর্থনীতির স্থলে আজ শিল্প নির্ভর অর্থনীতি ভারত প্রভৃতি দেশগুলিকে নূতন শক্তি দিয়াছে। চীনও শিল্পের

উন্নয়নশীল দেশে শিল্প-বিপ্লব

প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়া দ্রুত শিল্পায়নের পথে ছুটিয়াছে। আজ শিল্পে অগ্রগতির ফলে চীন এশিয়ার এক বৃহৎ শক্তির মর্যাদা পাইয়াছে।

অনগ্রসর দেশ

আরব, নেপাল, আফ্রিকার দেশগুলি শিল্পের ক্ষেত্রে অনগ্রসর দেশ বলিয়া পরিগণিত হয়। কিন্তু সকল দেশের উন্নতি ছাড়া মানব সমাজের সামগ্রিক উন্নতি সম্ভব নয়।

অস্ত্রশিল্প

সর্বশেষে বলা যায় যে শিল্প-বিপ্লব মানব সমাজের জীবনযাত্রা আরামপ্রদ করিলেও ইহার ফলে অবিমিশ্রভাবে হিতকর হয় নাই। বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে যেমন একদিকে মানুষের বহু মঙ্গল সাধিত হইয়াছে, অন্যদিকে যুদ্ধে শত্রুকে পরাজয়ের জন্য বহু মারণাস্ত্রের আবিষ্কার হয়। এই সকল মারণাস্ত্র নির্মাণের জন্য বহু কল-কারখানা গড়িয়া উঠে। তাছাড়া বৃহৎ শক্তিগুলি এই মারণাস্ত্র হাত করিয়া অন্য দেশের উপর কর্তৃত্ব ফলায়। ইহার ফলে মানব জাতির শান্তি ও স্থিতি বিপন্ন হইয়াছে। মোটকথা শিল্প-বিপ্লব আজ নিছক কথার কথা নহে, মানব সভ্যতার উন্নতির প্রধান স্তম্ভে পরিণত হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়

আমেরিকার বিপ্লব: আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ

(The American Revolution : The War of American Independence)

আমেরিকায় ইংরাজ উপনিবেশ

আমেরিকার ঔপনিবেশিক যুগ (The Colonial Period of America) : কলম্বাস ১৪৯২ খ্রীঃ আমেরিকা মহাদেশ আবিষ্কার করিবার পর ইওরোপীয় জাতিগুলি এই নূতন মহাদেশে উপনিবেশ বিস্তারের কাজে নামিয়া পড়ে। ইংলণ্ডের বহু লোক উত্তর আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়া এই স্থানে বসবাস আরম্ভ করে। ইংরাজ ঔপনিবেশিকগণের চাপে আদিবাসী রেড ইণ্ডিয়ানগণ ক্রমশঃ ধ্বংস হইয়া যায়। উত্তর আমেরিকায় এইভাবে ইংরাজ উপনিবেশ স্থাপিত হয়। উত্তর আমেরিকার প্রথম ইংরাজ উপনিবেশের নাম ছিল জেমস টাউন। ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেমসের নাম অনুসারে এই উপনিবেশের নাম রাখা হয়। সপ্তদশ শতকে বহু সংখ্যক ইংরাজ ইংলণ্ড ছাড়িয়া আমেরিকায় বসবাস করিতে আসিলে আমেরিকায় ইংরাজ উপনিবেশের সংখ্যা বাড়িতে থাকে। শেষ পর্যন্ত উত্তর আমেরিকায় ইংরাজ উপনিবেশের সংখ্যা হয় তেরটি। এই ইংরাজ উপনিবেশগুলির নাম হয় "ত্রয়োদশ উপনিবেশ" (Thirteen Colonies)।

মাতৃভূমি ইংলণ্ড ছাড়িয়া ইংরাজ ঔপনিবেশিকদের আমেরিকায় বসবাস করিবার

অনেকগুলি কারণ ছিল। সপ্তদশ শতকে ইংলণ্ডের স্টুয়ার্ট রাজাগণের ধর্মান্ধতায় বীতশ্রদ্ধ হইয়া অনেক ইংরাজ স্বাধীনভাবে বসবাস করিবার জন্য আমেরিকায় আসে। এই নূতন মহাদেশে ভূসম্পত্তি লাভ ও জীবিকা অর্জনের সুবিধার আশায় অনেকে দেশ ছাড়িয়া চলিয়া আসে। আমেরিকার সোনার খনির লোভেও অনেক লোক এই নূতন মহাদেশে (New World) বসবাস করিতে সংকল্প নেয়। এইভাবে অষ্টাদশ শতকে ত্রয়োদশ উপনিবেশের জনসংখ্যা ১৩ লক্ষে পোঁছায়।

আমেরিকায় ইংরাজ উপনিবেশ স্থাপনের কারণ

আমেরিকার ত্রয়োদশ ইংরাজ উপনিবেশ আইনতঃ মাতৃভূমির অধীন হইলেও কার্যতঃ স্বায়ত্ব শাসন ভোগ করিত। শাসনকার্যের তদারকী করিবার জন্য ইংরাজ সরকার প্রতি উপনিবেশে একজন করিয়া ইংরাজ গভর্ণর বা শাসনকর্তা নিয়োগ করিতেন। এই শাসনকর্তা স্থানীয় প্রতিনিধি সভার পরামর্শ লইয়া শাসন চালাইতেন। কার্যতঃ উপনিবেশগুলি স্বায়ত্ব শাসনের অধিকার ভোগ করিত। উপনিবেশগুলির আভ্যন্তরীণ বিষয়ে ইংরাজ সরকার সাধারণ ভাবে হাত দিতেন না। ঐতিহাসিক হেফনারের মতে ব্রিটিশ সরকার আমেরিকার বিষয়ে "হিতকর উদাসীনতা" (salutary neglect) নীতি গ্রহণ করেন।

উপনিবেশের স্বায়ত্ব শাসন

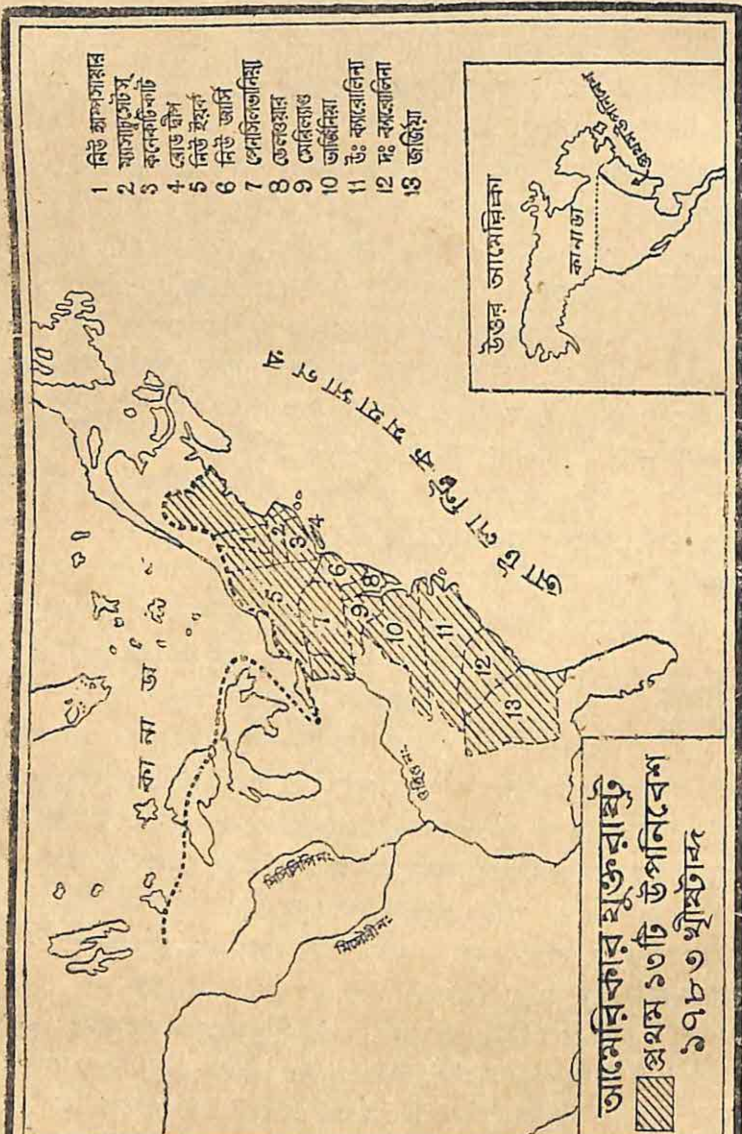
রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ না করিলেও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকার আমেরিকার উপনিবেশকে স্বাধীনভাবে চলিতে দিতে রাজী ছিলেন না। ইংলণ্ডের নেতাগণ মনে করিতেন যে উপনিবেশের সম্পদ ইংলণ্ডের শ্রীবৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করা উচিত। উপনিবেশের অধিবাসীগণ ইংলণ্ডেরই সন্তান। সুতরাং তাহাদের আলাদা কোন স্বার্থ থাকিতে পারে না। এই মতবাদের অনুসরণ করিয়া তাঁহারা বিভিন্ন আইন দ্বারা উপনিবেশের ব্যবসায়-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেন। ইহার ফলে আমেরিকার ঔপনিবেশিকদের মনে অসন্তোষ দানা বাঁধে। তবে ইংরাজ সরকার আমেরিকায় আমদানী ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ করিলেও এই আইনগুলি কড়াকড়িভাবে প্রয়োগ করিতেন না। আমেরিকাবাসীগণ ইংরাজ সরকারের আমদানী নিয়ন্ত্রণ আইনকে আড়াল দিয়া মদ তৈয়ারীর জন্য অন্যান্য স্থান হইতে ঝোলাগুড় প্রভৃতি আমদানী করিত। ইংরাজ সরকার তাহা দেখিয়াও দেখিতেন না। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের আগে উপনিবেশ-গুলির অবস্থা মোটামুটি এইরূপ ছিল।

মার্কান্টাইলবাদ ও ঔপনিবেশিকগণের অসন্তোষ

আমেরিকার বিপ্লব বা স্বাধীনতা যুদ্ধের কারণ, ১৭৭৬ খ্রীঃ (Causes of the American War of Independence) ঃ আমেরিকার "ত্রয়োদশ উপনিবেশ" (Thirteen colonies) ইংলণ্ডের অধীনতা পাশ ছিন্ন করিয়া ১৭৭৬ খ্রীঃ স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ইহার ফলে স্বাধীনতাকামী ঔপনিবেশিকগণের সহিত ইংলণ্ডের এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। পরিণামে আমেরিকা স্বাধীনতা লাভ করে। ঐতিহাসিক লর্ড এ্যাক্টন এই যুদ্ধকে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ না বলিয়া 'আমেরিকার বিপ্লব' (The

আমেরিকার বিপ্লব

American Revolution) আখ্যা দিয়াছেন। লর্ড এ্যাক্টনের মতে আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা ছিল একটি বৈপ্লবিক পদক্ষেপ।[১] ম্যাক্স বেলফ নামক ঐতিহাসিকও আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধকে আমেরিকার বিপ্লব নামে অভিহিত করিয়াছেন। কারণ



আমেরিকানরা স্বাধীনতা যুদ্ধে যে সকল শাসনতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক আদর্শ ঘোষণা করে তাহা ছিল বৈপ্লবিক এই আদর্শগুলি কেবলমাত্র আমেরিকার ইতিহাসকে প্রভাবিত

১. "The Declaration of Independence was revolutionary."

করে নাই। ইওরোপের ইতিহাসকেও উহা প্রভাবিত করে। এই কারণে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধকে 'আমেরিকার বিপ্লব' বলা অধিক সঙ্গত।

আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ এক হিসাবে অনিবার্য ছিল। দীর্ঘদিন ধরিয়া আমেরিকাবাসীদের মনে জাতীয়তাবোধ দানা বাঁধিতেছিল। পুরুষের পর পুরুষ ধরিয়া পাশাপাশি বাস করিয়া, নিষ্ঠুর প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া, একই গীর্জায় উপাসনা করিয়া আমেরিকাবাসীদের মনে একটি একাত্মবোধ জাগে। ইংরাজ জাতি ও ইংলণ্ড হইতে তাহারা যে পৃথক এই বোধ তাহাদের মনে দেখা দেয়। পরে ইংরাজ সরকারের সহিত কর নীতি লইয়া ঝগড়া বাধিলে এই জাতীয়তাবোধ বিদ্রোহের রূপে আত্মপ্রকাশ করে। সুতরাং ইংলণ্ডের সরকারের সহিত কর লইয়া ঝগড়া না বাধিলেও, আমেরিকার স্বাধীনতা ঠেকাইয়া রাখা সম্ভব ছিল না। জন এ্যাডামস এই কারণে মন্তব্য করিয়াছেন যে "আমেরিকার বিপ্লব হইল উপনিবেশের অধিবাসীদের মানসিকতার ফল" (The Revolution was in the mind of the people)।

স্বাধীনতা যুদ্ধের কারণ

আমেরিকাবাসীদের জাতীয়তাবাদের উদ্ভবের অনেকগুলি কারণও ছিল। অষ্টাদশ শতকের জ্ঞানদীপ্তি ও দার্শনিক মতবাদ ইওরোপ হইতে আমেরিকার উপনিবেশে বিস্তার লাভ করে। টম পেইন তাঁহার শক্তিশালী লেখনীর দ্বারা আমেরিকাবাসীগণের মনে স্বাধীনতা স্পৃহা জাগান। জেমস ওটিস ও জর্জ ওয়াশিংটন প্রভৃতি আমেরিকানগণ মনে করিতেন যে আমেরিকানগণের স্বাধীনতা লাভ করার অধিকার আছে। ১৭৬৩ খ্রীঃ পর ইংলণ্ডের সহিত কর লইয়া বিরোধ দেখা দিলে স্বাধীনতার সুপ্ত ইচ্ছা ফলবতী হয়। ইংলণ্ডের সহিত আমেরিকার দূরত্ব হেতু এবং আমেরিকা ও ইংলণ্ডের সমাজ ব্যবস্থা আলাদা হওয়ায় মাতৃভূমি ইংলণ্ডের সহিত ঔপনিবেশিকগণের মানসিক যোগ ক্রমে ক্ষীণ হইয়া পড়ে। আমেরিকার উপনিবেশের অধিবাসীরা ছিল মধ্যবিত্তশ্রেণীর। ইহাদের আত্মবিশ্বাস, আত্মমর্যাদা বোধও খুবই প্রখর ছিল। সুতরাং মাতৃভূমি ইংলণ্ডের শোষণ নীতির নিকট ইহাদের পক্ষে বেশী দিন মাথা নত করা সম্ভব ছিল না। আমেরিকাবাসীদের স্বাধীনতা বোধ আরও একটি কারণে জাগে। ইংরাজ সরকার আমেরিকার উপনিবেশগুলিকে কার্যতঃ স্বায়ত্ব শাসন দান করেন। ইংরাজ গভর্ণর বা শাসনকর্তারা স্থানীয় প্রতিনিধি সভার পরামর্শ লইয়া চলিতেন। উপনিবেশগুলির উপর বিধিনিষেধ তেমন কড়াভাবে চালান হইত না। ইহার ফলে দীর্ঘদিন ধরিয়া আমেরিকানরা শৃঙ্খলাবদ্ধ ও নিয়মিত ভাবে ইংলণ্ডকে কর আদায় দিতে ভুলিয়া যায়। সপ্তবর্ষের যুদ্ধের পর ইংরাজ সরকার এই অনিয়মিত অবস্থা দূর করিয়া উপনিবেশগুলি হইতে নিয়মিত কর আদায়ের চেষ্টা করিলে আমেরিকানরা তাহাতে ক্ষেপিয়া যায়। দীর্ঘ দিনের স্বায়ত্ব শাসনের অধিকার তাহারা ছাড়িয়া দিতে অরাজী হয়। সুতরাং ইংলণ্ডের শিথিল শাসন ঔপনিবেশিকদের স্বাধীনতা বোধের সৃষ্টি করে।

অষ্টাদশ শতকের মার্কাণ্টাইল মতবাদ ইংলণ্ডের ঔপনিবেশিক নীতিকে প্রভাবিত করিয়াছিল। এই মতবাদের মূলকথা এই ছিল যে বিদেশ হইতে সম্পদ আহরণ করিয়া

স্বদেশের সমৃদ্ধি বাড়াইতে হইবে। মার্কান্টাইল নীতি অনুসারে ইংরাজ সরকার উপনিবেশগুলিকে শোষণ করিয়া ইংলণ্ডের সমৃদ্ধি বাড়াইতেন। এই কারণে আমেরিকার উপনিবেশগুলির উপর তাঁহারা অনেকগুলি বৈষম্যমূলক আইন চাপাইয়া দেন। নেভিগেশন আইন দ্বারা ইংরাজ সরকার নির্দেশ দেন যে উপনিবেশগুলি নীল, তামাক ও চিনি কেবলমাত্র ইংলণ্ডের নিকট বিক্রয় করিতে পারিবে। অন্য কোন দেশ বেশী দিলেও উপনিবেশগুলি এই মাল তাহাদের নিকট বিক্রয় করিতে পারিবে না। অপর একটি আইন দ্বারা বলা হয় যে ঔপনিবেশিকগণকে কেবলমাত্র ইংলণ্ডে তৈয়ারী মাল কিনিতে হইবে। অন্য দেশ হইতে মাল কিনিলে ইংলণ্ডকে তাহার জন্য একটি বাড়তি ট্যাক্স দিতে হইবে। আমেরিকায় কোন কারখানা স্থাপন করা নিষিদ্ধ করা হয়। ইংলণ্ডের কারখানা হইতে ঔপনিবেশিকদের মাল কিনিতে বাধ্য করা হয়। এই আইনগুলি ছিল শোষণমূলক। আমেরিকার ঔপনিবেশিকগণের মনে এই আইনগুলি ঘোর অসন্তোষ সৃষ্টি করে। সপ্তবর্ষের যুদ্ধের পর ইংরাজ সরকার এই আইনগুলির প্রয়োগে কড়াকড়ি আরম্ভ করায় অশান্তির আগুন জ্বলিয়া উঠে।

অর্থনৈতিক শোষণ

সপ্তবর্ষের যুদ্ধের আগে কানাডা হইতে ফরাসী আক্রমণের ভয়ে ইংরাজ উপনিবেশগুলি মাতৃভূমির সামরিক সাহায্যের উপর নির্ভর করিত। সপ্তবর্ষের যুদ্ধের ফলে কানাডা ইংরাজ অধিকারে আসায় সেই ভয় দূর হয়। ফলে উপনিবেশগুলি ইংলণ্ডের আধিপত্য কাটাইয়া স্বাধীনতা লাভ করিতে আগ্রহী হয়। সপ্তবর্ষের যুদ্ধের সময় ইংরাজ সেনাপতি মণ্টকাম (Montcalm) ইংরাজ সরকারকে জানাইয়াছিলেন যে, "ইংলন্ড ফরাসী উপনিবেশ দখল করিলে, আমেরিকায় নিজ উপনিবেশ হারাইবে।"[১] সপ্তবর্ষের যুদ্ধের পর মণ্টকামের এই সতর্কবাণী সত্যে পরিণত হয়।

সপ্তবর্ষের যুদ্ধের পর উপনিবেশের স্বাধীনতা প্রিয়তা

সপ্তবর্ষের যুদ্ধে জিতিয়া ইংরাজ সরকার উপনিবেশগুলির উপর তাঁহাদের কর্তৃত্ব দৃঢ় ভাবে স্থাপন করিবার সংকল্প নেন। এতদিন ধরিয়া উপনিবেশ যেরূপ ঢিলাভাবে শাসন করা হইয়াছিল তাহা বন্ধ করা হয়।[২] নূতন কর ও নূতন তদারকী ব্যবস্থা চালু করা হয়। ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় জর্জ এই ব্যাপারে অনমনীয় মনোভাব নেন। ইংলন্ডের টোরীদলও উপনিবেশগুলিকে শায়েস্তা করার পক্ষপাতী ছিল। টোরী দল মনে করিত যে "রাজনীতির উদ্দেশ্য হইল ক্ষমতা লাভ এবং ক্ষমতা লাভের জন্য দরকার হইলে বল প্রয়োগ করা উচিত"।[৩] এডমণ্ড বার্ক, এ্যাডাম স্মিথ, ডিন টাকার প্রভৃতি উদারচেতা দূরদর্শী ইংরাজ চিন্তানায়কেরা সরকারকে জবরদস্তি নীতি ত্যাগ করিতে উপদেশ দেন। কিন্তু রাজা তৃতীয় জর্জ, তাঁহার মন্ত্রীমন্ডলী ও পার্লামেণ্ট তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই।

তৃতীয় জর্জ মন্ত্রীসভার দমন নীতি

১. "If they conquered the French colonies, they would lose their own."
২. "The policy of the hour was to enforce English sovereignty." Lord Acton.
৩. "The object of politics is power and that it must be retained by force."

(১) ইংলণ্ডের গ্রেনভিল মন্ত্রীসভা আমেরিকা হইতে অন্যদেশে মালের চোরাই চালান বন্ধ করিবার জন্য Writs of Assistance বা সহায়তার পরোয়ানা নামে এক আদেশ জারী করেন। এই আইনের বলে যে কোন আমেরিকানের ঘরবাড়ী যে কোন সময়ে অতর্কিতভাবে খানা তল্লাসী করা যাইত। এই আইনের ব্যাপক প্রয়োগ হইলে আমেরিকানগণের ব্যক্তি স্বাধীনতা ও আত্মসম্মানে ঘা লাগে। তাহারা তীব্র প্রতিবাদ জানায়।

গ্রেনভিল মন্ত্রীসভার নীতি

(২) গ্রেনভিল মন্ত্রীসভা ইহার পর Stamp Act বা টিকিট কর, Sugar Act বা চিনি কর ধার্য করেন। টিকিট কর দ্বারা আমেরিকানগণকে যে কোন দলিলপত্রে নির্দিষ্ট মূল্যের স্ট্যাম্প বা টিকিট লাগাইতে বলা হয়। চিনি কর দ্বারা আমেরিকানগণকে ফরাসী উপনিবেশ হইতে সস্তা দরে ঝোলা গুড় ও চিনি খরিদ করিতে নিষেধ করা হয়। আমেরিকানদের বলা হয় যে তাহারা ইংলণ্ড হইতে বেশী দাম দিয়া গুড় বা চিনি কিনিতে বাধ্য থাকিবে। এদিকে ফরাসী ঝোলা গুড় দিয়া আমেরিকানদের পানীয় মদ তৈয়ারী হইত। ফরাসী গুড়ের সরবরাহ বন্ধ হইলে মদের দাম বাড়িয়া যায়। আমেরিকানরা ইহাতে ভীষণ চটিয়া যায়। তাহারা দলিল কর দিতে অস্বীকার করে। জেমস ওটিস (James Otis) নামে জনৈক জ্ঞানী আমেরিকান বলেন যে, "যেহেতু ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে আমেরিকানগণের কোন প্রতিনিধি নাই সেহেতু এই পার্লামেণ্টের পাশ করা ট্যাক্স দিতে তাহারা বাধ্য নহেন" (No taxation without representation)। আমেরিকানগণ ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের আমেরিকায় কর ধার্য করার অধিকার অস্বীকার করায় সমস্যার জটিলতা বাড়ে। "বিষয়টি ইংলণ্ডের দিক হইতে পার্লামেণ্টে অধিকারের প্রশ্ন ; আমেরিকানগণের দিক হইতে স্বাধীনতার প্রশ্ন হইয়া দাঁড়ায়।"[১] ইংলণ্ডের অধিকাংশ নেতা মনে করেন যে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের এক্তিয়ার অস্বীকার করার অর্থ হইল আমেরিকার উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা ঘোষণা করা। ইংরাজ সরকারের পক্ষে ইহা সহ্য করা সম্ভব নয়। কারণ এই নজীর ধরিয়া আয়ারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করিবে। এদিকে আমেরিকানগণ বলে যে, "যে পার্লামেণ্টে তাহাদের প্রতিনিধি নাই, সেই পার্লামেণ্টকে তাহারা স্বীকার করিবে না।"

দলিল আইনের প্রতিবাদ

ইতিমধ্যে গ্রেনভিল মন্ত্রী সভার পতন ঘটে। নূতন রকিংহাম মন্ত্রীসভা উভয় দিক বিবেচনা করিয়া স্ট্যাম্প এ্যাক্ট বা দলিল কর উঠাইয়া দেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে Declaratory Act বা "ঘোষণার আইন" পাশ করিয়া উপনিবেশের উপর ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের কর ধার্য করার আইনগত অধিকার ঘোষণা করেন। ইহার পর অর্থমন্ত্রী টাউনসেণ্ড (১৭৬৭ খ্রীঃ) চা, চিনি, কাগজ প্রভৃতির উপর আমদানী কর বসান। আমেরিকাবাসীগণ এই করের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। ইতিমধ্যে বোষ্টন বন্দরে একদল ইংরাজ সেনাদল স্থানীয় অধিবাসীগণের উপর গুলি চালায়।

ঘোষণার আইন

১. "It was a question between liberty and authority, government by force" Lord Acton.

রাজা তৃতীয় জর্জ ইহার পর লর্ড নর্থকে মন্ত্রী নিযুক্ত করেন। লর্ড নর্থ অবস্থার গুরুত্ব বুঝিয়া অন্যান্য কর উঠাইয়া দিয়া কেবলমাত্র চায়ের উপর পাউণ্ড পিছু তিন পেনী কর ধার্য করেন। লর্ড নর্থের উদ্দেশ্য ছিল পার্লামেণ্টের কর ধার্য করার অধিকার বজায় রাখা। "কিন্তু এই তিন পেনীর জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়।"[১]

তিন পেনীর কর

১৭৭৩ খ্রীঃ কয়েকজন দুঃসাহসী আমেরিকান আদিবাসী রেড ইণ্ডিয়ানদের ছদ্মবেশ ধরিয়া বোষ্টন বন্দরের ডার্টমাউথ জাহাজে চড়িয়া ইংলণ্ড হইতে আনা চায়ের পেটিগুলি সমুদ্রের জলে ফেলিয়া দেয়। এই ঘটনাকে "বোষ্টন চা পার্টি" (Boston Tea Party) বলা হয়। ইংরাজ সরকার এই ঔদ্ধত্যের শাস্তিস্বরূপ বোষ্টন বন্দর বন্ধ করিয়া দেন এবং মাসাচুসেটস প্রদেশের স্বায়ত্বশাসনের অধিকার নাকচ করেন।

বোষ্টন চা পার্টি



জর্জ ওয়াশিংটন

ইংরাজ সরকারের দমন নীতির প্রতিবাদে আমেরিকানগণ রুখিয়া দাঁড়ায়। ১৭৭৪ খ্রীঃ জর্জিয়া ব্যতীত অপর ১২টি উপনিবেশের প্রতিনিধিরা ফিলাডেলফিয়া কংগ্রেসে সমবেত হন। তাঁহারা একটি প্রস্তাবে রাজা তৃতীয় জর্জের নিকট উপনিবেশের অধিকারগুলি ফিরাইয়া দিতে এবং তাহাদের অভিযোগের প্রতিকার করিতে অনুরোধ জানান। কিন্তু তৃতীয় জর্জ এই আবেদন অগ্রাহ্য করেন। ইতিমধ্যে লেক্সিংটন শহরে ১৭৭৫ খ্রীঃ ইংরাজ সেনার সহিত আমেরিকানগণের এক খণ্ড যুদ্ধ হয়। ইহার ফলে শান্তিপূর্ণ মীমাংসার সম্ভাবনা নষ্ট হয়। ত্রয়োদশ উপনিবেশের প্রতিনিধিরা ১৭৭৫ খ্রীঃ ফিলাডেলফিয়া দ্বিতীয় কংগ্রেস অধিবেশনে ঔপনিবেশিকদের অধিকার রক্ষার সঙ্কল্প নেন। এজন্য সেনা সংগ্রহ ও যুদ্ধ চালনার দায়িত্ব জর্জ ওয়াশিংটন নামে এক বিশিষ্ট ব্যক্তির হাতে দেওয়া হয়। ইংরাজ সরকার আমেরিকার উপনিবেশের বিদ্রোহ দমনের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করিলে আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ইতিমধ্যে টমাস পেইন (Thomas Paine) নামক একজন লেখকের কমনসেন্স (Common sense) নামক রচনা আমেরিকাবাসীদের মনে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করে। টমাস পেইন তাঁহার গ্রন্থে এই তত্ত্ব প্রচার করেন যে রাজতন্ত্র আমেরিকাবাসীদের পক্ষে ক্ষতিকর। ইহার ফলে আমেরিকার ঔপনিবেশিকরা ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের প্রতি আস্থা হারাইয়া ফেলে। আমেরিকাবাসীরা প্রজাতন্ত্রের আদর্শে প্রভাবিত হয়। অবশেষে ফিলাডেলফিয়ার তৃতীয় কংগ্রেসে সর্বসম্মতিক্রমে আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা (Declaration of

ফিলাডেলফিয়া কংগ্রেস

১. "That three pence brokeup the British empire." Lord Acten.

Independence) ১৭৭৬ খ্রীঃ গৃহীত হয়। বিশিষ্ট আমেরিকান চিন্তাবিদ টমাস জেফারসন আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র রচনা করেন। এইভাবে আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ আরম্ভ হয়।

আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে (Declaration of Independence) বলা হয় যে—(১) জীবন ধারণ, স্বাধীনতা ও স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করার অধিকার সকল মানুষের আছে। প্রকৃতি এই অধিকার সকলকেই দিয়াছে। (২) জনসাধারণের সমর্থনই হইল সরকারের শক্তির উৎস। জনসাধারণের আনুগত্য ছাড়া কোন সরকারের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। (৩) অত্যাচারী সরকারের আদেশ মানিতে জনসাধারণ বাধ্য নহে। এই সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার মৌলিক অধিকার জনগণের আছে। আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ন্যাচারাল রাইটস বা প্রকৃতি দত্ত অধিকার ও গ্রীক দার্শনিকগণের মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। আধুনিক যুগে গণতন্ত্রের একটি উল্লেখযোগ্য দলিল রূপে ইহাকে গণ্য করা হয়। ফরাসী বিপ্লবের সময় "মানবজাতির অধিকারগুলি" নামে যে ঘোষণাপত্র প্রচারিত হয় তাহার রচনায় আমেরিকার ঘোষণাপত্রের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

স্বাধীনতার ঘোষণা পত্র

আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রকৃতি (Nature of American War of Independence) ঃ আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধকে জাতীয়তাবাদী বিপ্লব বলা যায় কিনা ইহা লইয়া ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। বেয়ার্ড নামক জনৈক ঐতিহাসিক মনে করেন যে আমেরিকার ধনপতি বা পুঁজিপতিগণ নিজ শ্রেণীর স্বার্থ কায়েম করিবার জন্য এই যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তাঁহারা আমেরিকার সংবিধানকে এমনভাবে রচনা করেন যে পুঁজিপতিগণের সম্পত্তির অধিকার তাহাতে রক্ষিত হয়। জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকেরা, বেয়ার্ডের উপরোক্ত মতবাদের বহু ত্রুটি দেখাইয়াছেন। এণ্ড্রুজ নামক ঐতিহাসিকের মতে আমেরিকার সকল স্থানে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পুঁজিবাদ গঠিত হয় নাই। সুতরাং পুঁজিবাদ রক্ষার প্রশ্ন উঠিতে পারে না। আমেরিকানগণের স্বাধীনতা স্পৃহা বহুদিন হইতে জাগিয়াছিল। রাজা তৃতীয় জর্জ ও তাঁহার মন্ত্রীসভার অনমনীয় মনোভাব তাহাকে তীব্র করিয়া তুলে। টমাস পেইনের রচিত কমন সেন্স (Common Sense) নামক পুস্তক আমেরিকা বাসীগণকে স্বাধীনতা লাভে বিশেষ উদ্বুদ্ধ করে। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ ছিল বিভিন্ন ভাবধারার মিলিত ফল। জাতীয়তাবাদ, ইংলণ্ডের জবরদস্তি নীতি, ধনী ব্যবসায়ীদের স্বার্থ, সাধারণ লোকের স্বাধীনতার প্রতি আগ্রহ এই বিপ্লবের ক্ষেত্র রচনা করে। সুতরাং ইহাকে কেবলমাত্র বুর্জোয়া বিপ্লব বলা যায় না।

আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের বিবরণ (History of the American War of Independence) ঃ আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম দিকে ইংরাজ সেনার নিকট আমেরিকার সেনাদল বাংকারহিলের যুদ্ধে পরাজিত হয়। ইহার পর আমেরিকান প্রতিনিধি বেঞ্জামিন ফ্রাংকলিন এই যুদ্ধে ইংরাজের বিরুদ্ধে ফ্রান্সের সাহায্য লাভের জন্য চেষ্টা করেন। সপ্তবর্ষের যুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ লইবার জন্য ফরাসী-

রাজ ষোড়শ লুই আমেরিকার স্বপক্ষে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যোগ দেন। স্পেন ও হল্যাণ্ড এই যুদ্ধে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যোগ দেয়। ইহার ফলে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের মোড় ফিরিয়া যায়। এদিকে আয়ারল্যাণ্ডে বিদ্রোহ দেখা দিলে ইংরাজ সরকার বিব্রত হইয়া পড়ে। ভারতে মহীশূরের সুলতান হায়দর আলিকে ইংরাজের বিরুদ্ধে সাহায্য দিতে ফরাসীরা চেষ্টা করে। আমেরিকায় যাহাতে অন্য দেশ সাহায্য না পাঠাইতে পারে এজন্য ব্রিটিশ নৌবহর নিরপেক্ষ দেশের জাহাজ তল্লাসী আরম্ভ করিলে এই দেশগুলি চটিয়া যায়। এই দেশগুলি 'সশস্ত্র নিরপেক্ষতা' বা Armed Neutrality নীতি গ্রহণ করিয়া খানা তল্লাসীর বিরুদ্ধে বাধা দিতে সিদ্ধান্ত নেয়। ইতিমধ্যে সারোটোগার যুদ্ধে ইংরাজ সেনাপতি বারগোয়েন আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন। ফরাসী নৌ সেনাপতি ডি গ্রাস আমেরিকার ভার্জিনিয়া উপকূল হইতে ব্রিটিশ নৌবহরকে বিতাড়ন করেন। স্থলপথে জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে আমেরিকান সেনা ও জলপথে ফরাসী নৌবহর ইংরাজ সেনাদলকে ঘিরিয়া ফেলিলে ইংরাজ সেনাপতি লর্ড কর্ণওয়ালিস ইয়র্কটাউনে ১৭৮১ খ্রীঃ আত্মসমর্পণ করেন। ইহার ফলে ইংরাজ শক্তির চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে। ১৭৮৩ খ্রীঃ ভার্সাইয়ের সন্ধির দ্বারা ব্রিটিশ সরকার আমেরিকার উপনিবেশের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া নেন। এই সন্ধি দ্বারা আমেরিকার ও কানাডার সীমারেখা স্থির করা হয়। ভার্সাই সন্ধির সহিত প্যারিসের সন্ধিও স্থাপিত হয়। এই সন্ধি দ্বারা ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও স্পেনের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও স্পেন পরস্পরের অধিকৃত স্থান পরস্পরকে ফেরত দেয়।

আমেরিকার সাফল্যের কারণ (Causes of the American Success)ঃ আমেরিকার যুদ্ধে ইংরাজ সেনাদল উন্নত ধরণের অস্ত্র ও নৌবলে বলবান হইয়াও ঔপনিবেশিকগণের হাতে পরাজিত হয়। এই পরাজয়ের জন্য কয়েকটি রাজনৈতিক ও সামরিক কারণ ছিল। রাজনৈতিক দিক হইতে দেখা যায় যে ইংলণ্ডের জনমতের একটি বড় অংশ আমেরিকার ঔপনিবেশিকগণের সহিত যুদ্ধ না করিয়া আপোষ মীমাংসার পক্ষপাতী ছিল। ইহার ফলে ইংরাজ সেনাদলের মনোবল ভাঙিয়া যায়। ইংরাজ অফিসার ও সেনাদের মধ্যে বেশ বড় অংশ আমেরিকার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। ইংলণ্ডের যুদ্ধমন্ত্রী স্যার জর্জ জার্মান ছিলেন আত্মম্ভরী ও অপদার্থ লোক। তিনি উপযুক্ত সমর পরিকল্পনা গঠনে ব্যর্থ হন। ইংলণ্ডের বৈদেশিক দপ্তর এই যুদ্ধে চূড়ান্ত অক্ষমতার পরিচয় দেয়। যাহাতে ফ্রান্স ও অন্যান্য দেশ ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে আমেরিকার ঔপনিবেশিকদের সাহায্য না করে সেজন্য তাহারা কোন চেষ্টা করে নাই। ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইংলণ্ড মিত্রহীন হইয়া পড়ে। ফ্রান্স ও স্পেন আমেরিকার পক্ষে আসিবার ফলে ইংলণ্ডের জয়লাভের সম্ভাবনা দূর হয়। ফরাসী নৌবহর অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে এই যুদ্ধে ইংরাজদের কোনঠাসা করিয়া ফেলে। আমেরিকার ঔপনিবেশিকগণের মধ্যে বেশ কিছুসংখ্যক লোক ইংলণ্ডের রাজার প্রতি অনুগত ছিল। ইংলণ্ডের সমর দপ্তর ইহাদের কাজে লাগাইতে কোন চেষ্টা করে নাই। ইংরাজ সেনাপতিদের ভুল এই যুদ্ধে তাহাদের পরাজয় ডাকিয়া আনে। ইংরাজ সেনাপতি বারগোয়েনের অলসতা ও দূরদর্শিতার অভাব এবং ইংলণ্ডের সমর দপ্তরের অকর্মণ্যতা ইংলণ্ডের পরাজয়

ত্বরান্বিত করে। ইংলন্ড হইতে আমেরিকার দূরত্ব ইংলণ্ডের সমর প্রচেষ্টাকে পঙ্গু করিয়া দেয়। আটলাণ্টিক মহাসমুদ্র পার হইয়া সেনা ও রসদপত্রের সরবরাহ বজায় রাখা ইংলণ্ডের পক্ষে সহজ কাজ ছিল না। তাছাড়া আমেরিকার বিশাল ভূভাগে সেনা স্থাপন করার মত শক্তিও ইংলণ্ডের ছিল না। আমেরিকানগণের প্রধান দুর্বলতা ছিল নৌশক্তির অভাব। ফরাসী নৌসেনাপতি ডি গ্রাস নৌবহর লইয়া আমেরিকার পক্ষে যোগ দিলে আমেরিকার জয় সুনিশ্চিত হইয়া যায়। ডি গ্রাস তাঁহার রণকৌশলের দ্বারা ইংরাজ বাহিনীকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলেন। আমেরিকান সেনাপতি জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বও রণকুশলতা আমেরিকার সাফল্যের সোপান রচনা করে। ওয়াশিংটন আমেরিকার যুদ্ধকে জাতীয় যুদ্ধে পরিণত করেন। আমেরিকানগণ স্বাধীনতালাভের জন্য চূড়ান্ত আত্মত্যাগে প্রস্তুত ছিল। ইংরাজ সেনাদলের মধ্যে এই ধরণের আদর্শবাদের অভাব দেখা যায়। আয়ারল্যাণ্ডের বিদ্রোহ, ভারতে মহীশূরের সহিত ইংরাজদের যুদ্ধ, নিরপেক্ষ দেশগুলির বিরোধিতা ইংলণ্ডের পরাজয়কে নিশ্চিত করিয়া দেয়।

আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধের ফলাফল (Results of the War of American Independence)ঃ আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধের ফলাফল এরূপ সুদূর-প্রসারী ছিল যে ঐতিহাসিকেরা ইহাকে আমেরিকার স্বাধীনতার সংগ্রাম না বলিয়া 'আমেরিকার বিপ্লব'[১] বলিয়া অভিহিত করেন। স্বাধীনতা লাভ করিবার পর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র দ্রুত ক্ষমতা লাভ করে। অল্পকালের মধ্যে ধনসম্পদ, জনবল ও সামরিক শক্তির দ্বারা আমেরিকা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শক্তিগুলির অন্যতম হইয়া দাঁড়ায়। জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, সম্পদে, শক্তিতে আমেরিকা বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় রাষ্ট্রে পরিণত হয়। আমেরিকার এই উন্নতি তাহার স্বাধীনতা লাভের ফলেই সম্ভব হয়।

প্রজাতান্ত্রিক আদর্শ

আমেরিকার প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান ছিল অষ্টাদশ শতকের পক্ষে এক বৈপ্লবিক পদক্ষেপ। অষ্টাদশ শতক ছিল রাজতন্ত্রের যুগ। রাজাগণ মনে করিতেন যে, প্রজাগণের জন্য কিছু কাজ তাঁহারা করিলেও শাসন-ব্যবস্থায় প্রজাগণের অংশ গ্রহণ করিতে দিতে পারেন না। সেই যুগে রাজতন্ত্র নাকচ করিয়া আমেরিকার জনগণের ইচ্ছায় শাসিত প্রজাতান্ত্রিক সরকার স্থাপন ছিল এক বৈপ্লবিক ঘটনা। আমেরিকায় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ফলে রাজতন্ত্রের বিকল্প হিসাবে এক নবীন রাষ্ট্রব্যবস্থার আদর্শ ছড়াইয়া পড়ে। ইওরোপে জ্ঞানদীপ্তির ফলে যে দার্শনিক মতবাদের উদ্ভব হয়, আমেরিকার সংবিধানে তাহার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এজন্য আমেরিকার সংবিধানকে জ্ঞানদীপ্তির বাস্তব প্রয়োগ বলা হইয়া থাকে।[২]

ইংলণ্ডের উপনিবেশ নীতির পরিবর্তন

আমেরিকার বিপ্লব ইংলণ্ডের ইতিহাসে গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। টোরী মন্ত্রীসভা আমেরিকার যুদ্ধে পর্যুদস্ত হইবার ফলে কিছুদিনের জন্য ইংলণ্ডে টোরী দলের জনপ্রিয়তা নষ্ট হয়। এই সুযোগে হুইগ দল ক্ষমতা লাভ করে। ইংলণ্ডের লোকের মনে এই ধারণা জন্মায় যে রাজা

১. Lord Acton.

২. "They were most practical application of Enlightenment."

তৃতীয় জর্জের জন্যই আমেরিকায় ইংলণ্ডের পরাজয় ঘটিয়াছে। সুতরাং হুইগ দল ইংলণ্ডের শাসন ব্যবস্থায় রাজার হস্তক্ষেপ বন্ধ করে। দ্বিতীয়তঃ, হুইগ দল ইংলণ্ডের শ্রমিক শ্রেণীর ভোটাধিকারের দাবী মানিয়া দেয়। তৃতীয়তঃ, আমেরিকার যুদ্ধে হারিয়া ইংরাজ সরকার তাহাদের পুরাতন ঔপনিবেশিক নীতি পাল্টাইতে বাধ্য হয়। ডারহাম রিপোর্টের ভিত্তিতে ইংরাজ সরকার শ্বেত জাতি অধ্যুষিত উপনিবেশগুলিকে স্বায়ত্ব শাসনের অধিকার দান করে। ফলে কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্বায়ত্ব শাসন লাভ করে। চতুর্থতঃ, ভারতবর্ষে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যাহাতে ক্ষমতার অপব্যবহার না করে তাহা দেখিবার জন্য ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট একটি "নিয়ন্ত্রণ পরিষদ" বা Board of Control স্থাপন করে।

ফ্রান্সে আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধের প্রভাব

আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ ফ্রান্সের ইতিহাসে গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। আমেরিকার যুদ্ধে যে সকল ফরাসী স্বেচ্ছাসেবক যোগ দেন তাঁহারা আমেরিকার সংবিধান ও মানব অধিকারের আদর্শের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হন। তাঁহারা স্বদেশে ফিরিবার পর স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের স্থলে আমেরিকার ন্যায় একটি গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা গঠনের কথা বলেন। ফরাসী রাজ ষোড়শ লুই আমেরিকার যুদ্ধে বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়া তাঁহার রাজকোষ শূন্য করিয়া ফেলেন। অর্থাভাববশতঃ তিনি ফ্রান্সের জাতীয় সভা বা স্টেটস জেনারেলের অধিবেশন আহ্বান করেন। ইহার ফলে ফরাসী বিপ্লব আরম্ভ হয়।

ইওরোপে ইহার প্রভাব

ইওরোপের অন্যান্য দেশেও আমেরিকার বিপ্লবের প্রভাব ছড়াইয়া পড়ে। সর্বত্র পুরাতনতন্ত্রের প্রতি আস্থা নষ্ট হয়। হল্যাণ্ডে স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে একটি বিদ্রোহ ঘটে। এই বিদ্রোহ বিফল হইলে বহু ডাচ স্বদেশ ত্যাগ করিয়া আমেরিকায় বসবাস করিতে যাত্রা করে। আয়ারল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, জার্মানী প্রভৃতি দেশ হইতে বহু স্বাধীন-চেতা লোক আমেরিকার স্বাধীনতার আদর্শে আকৃষ্ট হইয়া তথায় বসবাস করিতে যান। ইতালীতে আমেরিকার অনুকরণে ফিলাডেলফিয়া সমিতি নামে একটি গুপ্ত সমিতি স্থাপিত হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

ফরাসী বিপ্লব (French Revolution)

পূর্ব কথা (Background) ঃ ষোড়শ শতক হইতে ফ্রান্স, ইওরোপের একটি শক্তিশালী রাষ্ট্ররূপে ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করে। সপ্তদশ শতকে ফ্রান্সের সিংহাসনে বুরবোঁ বংশীয় রাজা চতুর্দশ লুই বসেন। চতুর্দশ লুই রাজকীয় গুণ লইয়া

জন্মিয়াছিলেন বলা যায়। বুদ্ধিবৃত্তি, শাসন দক্ষতা, শিক্ষা, সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ নানা দিক হইতে তিনি ছিলেন এক অসাধারণ ব্যক্তি। এজন্য লোকে তাঁহাকে Grand Monarch বা মহৎ রাজা বলিত। তাঁহার রাজত্বকাল হইতে ফ্রান্স ইওরোপের রাজনীতির কেন্দ্রস্থলে দাঁড়াইয়া থাকে। ফ্রান্সকে বাদ দিয়া ইওরোপের কোন সমস্যাই সমাধান করা সম্ভব ছিল না। ফ্রান্স ইওরোপের সভ্যতা-সংস্কৃতির পীঠস্থানে পরিণত হয়। চতুর্দশ লুই ফ্রান্সে বুরবোঁ রাজবংশের স্বৈরক্ষমতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি জাতীয় সভা বা প্রতিনিধি সভার সাহায্য ছাড়া ফ্রান্সের শাসন ব্যবস্থা চালাইতেন। রাজার ইচ্ছাই ফ্রান্সের একমাত্র আইনে পরিণত হয়। চতুর্দশ লুই এজন্য বলিতেন যে—"রাজাই হইলেন রাষ্ট্র" (The State ! It is myself)।

পঞ্চদশ লুই, ১৭১৫-১৭৭৪ খ্রীঃ (Louis XV) ঃ চতুর্দশ লুইয়ের মৃত্যুর পর পঞ্চদশ লুই ফ্রান্সের সিংহাসনে বসেন। পঞ্চদশ লুই ছিলেন বিলাসী, কর্ম-বিমুখ ও ইন্দ্রিয়-পরায়ণ। লোকে তাঁহাকে "প্রজাপতি রাজা" (Butterfly Monarch)[১] বলিত। তিনি তাঁহার রক্ষিতা মাদাম দ্য পম্পাদুর ও তাঁহার প্রিয় অভিজাতগণের কথামত রাজ্য পরিচালনা করিতেন। আইনতঃ রাজা সর্বেসর্বা হইলেও, যেহেতু রাজা ছিলেন অকর্মণ্য, সেজন্য তাঁহার নামে অভিজাতগণই দেশ শাসন করিত। দেশে পার্লামেণ্ট বা কোন প্রতিনিধি সভা না থাকায় দেশের লোকের সহিত রাজার কোন যোগাযোগ ছিল না। রাজার নিকট দেশের লোকের অভাব-অভিযোগ জানাইবার জন্য কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা ছিল না।

পঞ্চদশ লুই তাঁহার বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে কয়েকটি মারাত্মক ভুল করেন। তিনি অষ্ট্রিয়ার উত্তরাধিকারের যুদ্ধে ও সপ্তবর্ষের যুদ্ধে ইংলণ্ডের নিকট পরাজিত হইলে ভারত ও আমেরিকায় ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য নষ্ট হয়। ইওরোপেও প্রাশিয়ার নিকট হারিবার ফলে ফ্রান্সের মর্যাদা নষ্ট হয়। বৈদেশিক নীতির বিফলতা এবং আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে স্বৈরতন্ত্র, অভিজাত প্রাধান্য ও দুর্নীতির ফলে ফ্রান্সে বুরবোঁ শাসনের জনপ্রিয়তা নষ্ট হয়। ফ্রান্সের উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণী পুরাতন ব্যবস্থা পাল্টাইয়া নূতন শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য চঞ্চল হইয়া উঠে। পঞ্চদশ লুই অকর্মণ্য হইলেও দূরদর্শী ছিলেন। তিনি ফ্রান্সের এই অগ্নিগর্ভ অবস্থা উপলব্ধি করিয়া মন্তব্য করেন যে "আমার মৃত্যুর পরেই মহাপ্রলয় ঘটিবে" (After me the deluge)।

বৈদেশিক নীতি

ষোড়শ লুই, ১৭৭৪-১৭৯৩ খ্রীঃ (Louis XVI) ঃ পঞ্চদশ লুইয়ের ১৭৭৪ খ্রীঃ মৃত্যু হইলে তাঁহার পৌত্র ষোড়শ লুই ফরাসী সিংহাসনে বসেন। ষোড়শ লুই সৎ ও লাজুক প্রকৃতির লোক ছিলেন। বুরবোঁ বংশের ধারা ছিল যুদ্ধপ্রিয়তা, স্বৈরতন্ত্রের প্রতি অনুরক্তি ও সুন্দরী রমণীগণের প্রতি আগ্রহ। ষোড়শ লুই তাঁহার বংশ চরিত্রের ব্যতিক্রম ছিলেন। পত্নী মারিয়া এ্যাণ্টোনেটের প্রতি তিনি একনিষ্ঠ ছিলেন। রাজকার্যের অনেক বিষয়ে তিনি তাঁহার পত্নীর

ষোড়শ লুইয়ের চরিত্র

১. Schevill—History of Europe.

দ্বারা প্রভাবিত হইতেন। ষোড়শ লুই ভাল মানুষ হইলেও রাজকার্য চালাইতে হইলে চরিত্রে যে বলিষ্ঠতা এবং সাহস থাকা দরকার তাহা তাঁহার ছিল না। ফ্রান্সের সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় যে দুর্নীতি ও অপশাসনের পাঁক জন্মিয়াছিল তাহা দুই হাতে দৃঢ়তার সহিত সরাইবার মত ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। ঐতিহাসিক কোবান তাঁহাকে "মিস্ত্রি রাজা" (Mechanic king) বা "চাবি সারাইয়ালা রাজা" (Locksmith king)[১] বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। কারণ ষোড়শ লুই রাজকার্য অপেক্ষা ছোটখাট যন্ত্রপাতি ও চাবি তালা সারাই করিতে পটু ছিলেন।



মারিয়া এ্যান্টোনেট

অমিতব্যয়িতা

ষোড়শ লুই আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যোগ দিয়া বহু অর্থ ব্যয় করেন। ইহার ফলে ফরাসী রাজকোষ শূন্য হইয়া যায়। তাছাড়া রানী মারিয়া এ্যাণ্টোনেট ছিলেন অত্যন্ত অমিতব্যয়ী। তিনি রাজপ্রাসাদে বিরাট ভৃত্য বাহিনী রাখিতেন ও বহু অর্থ ব্যয় করিয়া ভোজ দিতেন। ইহার ফলে রাজকোষে অর্থের ঘাটতি পড়ে। এজন্য লোকে উপহাস করিয়া রাণীকে "ঘাটতি ভদ্র মহোদয়া" (Madame Deficit) আখ্যা দেয়।

সংস্কার নীতির ব্যর্থতা

শূন্য রাজকোষ, দুর্বল রাজস্ব নীতি লইয়া রাজ্য চালান অসম্ভব হইয়া পড়িলে ষোড়শ লুই টুর্গো (Turgot) নামক এক প্রতিভাশালী ব্যক্তিকে মন্ত্রী নিযুক্ত করেন। টুর্গো ব্যয়সংকোচ করিয়া ও অভিজাতগণের উপর বর্ধিত কর বসাইয়া ঘাটতি পূরণের চেষ্টা করেন। ইহাতে অভিজাতগণ রুষ্ট হয়। তাহাদের চাপে রাজা টুর্গোকে পদচ্যুত করেন। ইহার পর ষোড়শ লুই নেকারকে (Necker) মন্ত্রী নিযুক্ত করেন। নেকার রাজ পরিবারের বাড়তি ৫০০ কর্মচারীকে বরখাস্ত করিয়া ব্যয়-সংকোচ করেন। তিনি জমির নীলাম ডাকা বন্ধ করিয়া স্থায়ী খাজনা ধার্য করিবার ব্যবস্থা করেন। নেকারের সংস্কার সুবিধাভোগী অভিজাত শ্রেণীর স্বার্থে ঘা দিলে তাহাদের চাপে তিনি পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ইহার পর ক্যালোনকে (Calonne) মন্ত্রী নিয়োগ করা হয়। ক্যালোন রাজস্বের ঘাটতি মিটাইবার জন্য অভিজাতগণের অধিকৃত জমির উপর কর ধার্য করা এবং অবাধ বাণিজ্য নীতি প্রবর্তনের চেষ্টা করেন। ফলে ক্যালোনকেও



ষোড়শ লুই

১. Cobban—History of France.

মন্ত্রীসভা হইতে বিদায় লইতে হয়। ষোড়শ লুই উপায়ান্তর না দেখিয়া ১৭৮৭ খ্রীঃ ব্রিয়াঁকে (Brienne) অর্থমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। ব্রিয়াঁর পরামর্শে ষোড়শ লুই জাতীয় সভা বা States General-এর অধিবেশন আহবান করিলে বিপ্লব আরম্ভ হয়।

ফরাসী বিপ্লবের কারণ (Causes of the French Revolution): কোন সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা যখন বৃহত্তর জনসাধারণের অভাব-অভিযোগের প্রতিবিধানে ব্যর্থ হয় তখন এই সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনসাধারণের অসন্তোষ জমা হইতে থাকে। এই অসন্তোষ ধূমায়িত আগুনের ন্যায় ভিতরে ভিতরে জ্বলিতে থাকে। অবশেষে তাহা একদিন বিস্ফোরিত হয়। ইহার ফলে পুরাতন সমাজ ব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়ে। বিপ্লব কথাটির মধ্যে "প্লব" অর্থাৎ "এক লাফে অনেক দূর আগাইয়া যাওয়া" অর্থ নিহিত আছে।[1] কোন বিপ্লব কোনদিন কেবলমাত্র একটি কারণে ঘটে না। বিভিন্ন কারণের সমবায়ে বিপ্লবের সৃষ্টি হয়। ফরাসী বিপ্লবের জন্য দীর্ঘদিন ধরিয়া ক্ষেত্র প্রস্তুত হইতেছিল। জাতীয় সভা বা স্টেটস জেনারেলের আহবান উপলক্ষে ইহা আরম্ভ হয় মাত্র। কামানের নলের মধ্যে বারুদ জমা থাকিলে তাহাতে আগুনের পলিতা দিলে বিস্ফোরণ হয়। সেইরূপ ফরাসী বিপ্লবের ক্ষেত্র তৈয়ারী না থাকিলে জাতীয় সভা আহবানের ফলে বিপ্লব ঘটা সম্ভব ছিল না। এজন্য ফরাসী বিপ্লবকে "ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা তৈয়ারী করা বিপ্লব" (Most prepared event of history) বলা হয়। এই বিপ্লবের মূল কারণগুলিকে নিম্নলিখিত দিক হইতে আলোচনা করা যায়।

ফরাসী বিপ্লবের সম্মিলিত কারণ

রাজনৈতিক: ফ্রান্সের বুরবোঁ রাজবংশ স্বর্গীয় অধিকার নীতি (Divine Right of Monarchy) অনুযায়ী স্বৈরাচারী শাসন প্রতিষ্ঠা করে। রাজাই ছিলেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। ফরাসী রাজ চতুর্দশ লুই বলেন যে "The state ! It is myself" অর্থাৎ "রাজাই হইল রাষ্ট্র"। স্বর্গীয় অধিকার নীতি অনুযায়ী রাজা কোন প্রতিনিধি সভার নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করিতেন না। ফলে ১৬১৪ খ্রীঃ হইতে প্রায় ১৭৫ বৎসর ফ্রান্সের জাতীয় সভার অধিবেশন মুলতুবী রাখা হয়। রাজা সকল ক্ষমতা নিজ হাতে নেন। জাতীয় সভা না থাকার ফলে রাজা জনসাধারণের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। জনসাধারণের অভিযোগ রাজাকে জানান কষ্টসাধ্য হয়। দ্বিতীয়তঃ, জ্ঞানদীপ্তির প্রভাবে ইওরোপের অন্যান্য দেশে রাজাগণ কিছু কিছু সংস্কার কার্য করেন। কিন্তু ফরাসী রাজা পঞ্চদশ লুই ও ষোড়শ লুই পুরাতন স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম রাখেন। দীর্ঘ দিনের কুশাসনের ফলে ফ্রান্সের শাসন ব্যবস্থায় যে সকল দুর্নীতি দেখা দেয় তাহা সংস্কার করিবার কোন চেষ্টাই তাঁহারা করেন নাই। তৃতীয়তঃ, ফ্রান্সের রাজা নামেমাত্র স্বৈর শাসক ছিলেন। রাজা পঞ্চদশ লুই ছিলেন অলস ও কর্মবিমুখ। রাজা ষোড়শ লুই ছিলেন অকর্মন্য ও নিরীহ লোক। ফলে রাজার ঈপ্সিত ক্ষমতা তাঁহার রাজসভার

বুরবোঁ রাজতান্ত্রিক শাসনের দুর্বলতা

১. সংসদ বাংলা অভিধান।

পরিমণ্ডলের বাহিরে পৌঁছিত না। অভিজাতগণই রাজার নাম করিয়া শাসনকার্য চালাইত। অভিজাতগণ ছিল খুবই স্বার্থপর এবং দুর্নীতিপরায়ণ। ফরাসী শাসন ব্যবস্থার মূল ক্ষমতা ছিল ইনটেণ্ডেণ্ট (Intendent) নামক কর্মচারীদের হাতে। দুর্নীতিপরায়ণ অভিজাতগণ এই পদ অধিকার করিয়া জনসাধারণকে শোষণ করিত। চতুর্থতঃ, ফ্রান্সের বিচার ব্যবস্থাতেও দুর্নীতি ঢুকিয়াছিল। লেটারস ডি কেশেট (Letters de Cachet) নামক পরোয়ানা বলে যে কোন ব্যক্তিকে বিনা বিচারে বাস্তিল দুর্গে আটক রাখা যাইত। ফ্রান্সের শাসন ব্যবস্থা এমনই অকেজো ছিল যে কোন একটি গ্রাম হইতে একটি বাড়ী মেরামতের জন্য সরকারের অনুমতি চাহিলে পাঁচ বছরের আগে তাহা পাওয়া যাইত না। পঞ্চমতঃ, বুরবোঁ রাজাগণের ভ্রান্ত বৈদেশিক নীতির ফলে ফ্রান্সের বহু ক্ষতি হয়। অষ্ট্রিয়ার উত্তরাধিকারের যুদ্ধ ও সপ্তবর্ষের যুদ্ধে ফ্রান্সের পরাজয়ের ফলে ভারত ও আমেরিকায় ফ্রান্স তাহার সাম্রাজ্য বিস্তারের সুযোগ হারায়। ইওরোপেও ফ্রান্সের মর্যাদা বহুল পরিমাণে বিনষ্ট হয়। আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যোগ দিয়া ফ্রান্স তাহার লুপ্ত মর্যাদা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করে। কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন ফল হয় নাই। বৈদেশিক নীতির বিফলতার জন্য বুরবোঁ রাজতন্ত্র জনসাধারণের চক্ষে হেয় প্রতিপন্ন হয়।

সামাজিক ঃ ফ্রান্সের সামাজিক সংগঠন ছিল মধ্যযুগীয়। ফরাসী জনসাধারণকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হইত, যথা ধর্মযাজক সম্প্রদায় বা প্রথম শ্রেণী, অভিজাত সম্প্রদায় বা দ্বিতীয় শ্রেণী এবং সাধারণ লোক বা তৃতীয় শ্রেণী। মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবি, কৃষক ও শ্রমিক সকলেই তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রথম দুই শ্রেণী যথা ধর্মযাজক ও অভিজাতগণ ছিল বিশেষ সুবিধাভোগী। উচ্চ ধর্ম যাজকেরা দেশের ভূসম্পত্তির $\frac{1}{5}$ অংশের মালিক ছিলেন। কিন্তু এজন্য তাঁহারা সরকারকে নাষ্য ভূমিকর দিতেন না।

অভিজাতগণের বিশেষ অধিকার ভোগ

ফলে সকল করের বোঝা তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত মধ্যবিত্ত ও কৃষকগণকে বহিতে হইত। সরকারের সামরিক, অসামরিক বিভাগের উচ্চ ও মধ্য পদগুলি ছিল অভিজাতগণের একচেটিয়া অধিকারে। তৃতীয় শ্রেণীর কোন লোকের যতই যোগ্যতা থাকুক না কেন তাহাকে এই পদে নিযুক্ত করা হইত না। অভিজাতগণ রাজসভায় হাজিরা দিতেন। রাজার অনুগ্রহ পাইয়া তাঁহারা নানাবিধ পদ ও সুবিধা সুযোগ ভোগ করিতেন। সরকারী শাসন যন্ত্র ছিল অভিজাতগণের হাতে। ইহার সাহায্যে তাঁহারা তৃতীয় শ্রেণীকে দমাইয়া রাখিতেন।

এদিকে ব্যবসায়-বাণিজ্য বিস্তারের ফলে ফ্রান্সে একটি বিত্তবান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী অর্থ ও বিদ্যায় অভিজাতগণ হইতে শ্রেষ্ঠ ছিল। দার্শনিকগণের

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অসন্তোষ

মতবাদের সহিত ইহাদের পরিচয় ছিল। ফরাসী অভিজাতগণ তাহাদের বিশেষ অধিকার ক্ষুন্ন করিয়া মধ্যবিত্তগণকে তাহাদের সমান মর্যাদা দিতে একটুও রাজী ছিল না। ফলে মধ্যবিত্তশ্রেণী ফ্রান্সের সমাজ ব্যবস্থার বৈষম্য ভাঙিয়া, সমান অধিকার লাভের জন্য ব্যগ্র হয়। নেপোলিয়ন বলিয়াছিলেন যে "স্বাধীনতার দাবী ছিল বিপ্লবের গৌণ কারণ, অহমিকাবোধই বিপ্লবকে

ত্বরান্বিত করে।"[১] ঐতিহাসিক গুডউইন মন্তব্য করিয়াছেন যে "ফরাসী বিপ্লবের মুখ্য কারণ ছিল ফরাসী অভিজাতগণের প্রতিক্রিয়াশীল আকাঙ্ক্ষা।"[২]

অর্থনৈতিক ঃ ফরাসী বিপ্লবের অর্থনৈতিক কারণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কোন কোন ঐতিহাসিক অষ্টাদশ শতকের ফ্রান্সকে "ভ্রান্ত অর্থনীতির যাদুঘর"[৩] বলিয়াছেন। ফ্রান্সের অর্থনীতিতে তিনটি প্রধান ত্রুটি দেখা যায়—অমিতব্যয়িতা, অব্যাহতি ও দুর্নীতি (Extravagance, Immunity and corruption)। ফরাসী সরকারের বাজেটে আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী ছিল। সরকারের বহু ঋণ থাকায় এই ঋণের সুদ মিটাইতে প্রায় ৩২ কোটি লিভার ব্যয় হইত। তাছাড়া মোটা টাকা যুদ্ধের খরচ, কর্মচারীদের বেতন ও ভাতায় খরচ হইত। বহু কর্মচারী ছিল যাহাদের কোন কাজ ছিল না কেবল বেতন পাইত। রাজপ্রাসাদে অসংখ্য দাস-দাসী শুধু বিনা কারণে রাখা হইত। এই অমিতব্যয়ের ফলে রাজকোষের বেশীর ভাগ টাকা ব্যয় হইয়া যাইত। মাত্র ⅕ অংশ রাজস্ব জনসাধারণের উপকারের জন্য ব্যয় করার মত বাঁচিত। ফরাসী রাজারা এই সর্বনাশা অমিতব্যয় সংযত না করায় শাসন ব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়ে।

কর ব্যবস্থার ত্রুটি

রাজস্ব আদায় হইত প্রধানতঃ তৃতীয় শ্রেণী বা কৃষকদের নিকট হইতে। কিন্তু ফ্রান্সের কৃষকশ্রেণী বেষ্টনী আন্দোলনের (Enclosure movement) জন্য বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষের সুবিধার জন্য ছোট আকারের কৃষির জমিকে বড় খামারগুলির অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বেষ্টনী আইন করা হয়। এই আইনের ফলে দরিদ্র কৃষকের ক্ষুদ্র জমিগুলি বড় জমিদারদের কুক্ষিগত হয়। জমিদারগণ নানাবিধ বাজে অজুহাতে কৃষকদের উপর কর বসাইত। কৃষকদের বেগার খাটানও হইত। ফ্রান্সের কৃষকদের মধ্যে অধিকাংশ ছিল মেটায়ার বা ভাগচাষী। ইহাদের জমিতে কোন স্বত্ব ছিল না। জমিদারের দাবী মিটাইয়া ইহাদের হাতে শস্যের ২০ ভাগের মত থাকিত। ইহা দ্বারা সারা বৎসর সংসার খরচ চালান সম্ভব ছিল না। তাছাড়া খাদ্যের দাম বাড়ায় তাহাদের 'হা অন্ন' দশা হয়। ইহারা দলে দলে লুঠপাট, রাহাজানি আরম্ভ করে। বিপ্লবের সময় ইহারা গ্রামাঞ্চলে জমিদারের খামার পোড়াইয়া বিভীষিকা সৃষ্টি করে। ফ্রান্সের কর ব্যবস্থা ছিল খুবই ত্রুটিপূর্ণ। দেশের ভূসম্পত্তির শতকরা ৪০ ভাগ ছিল অভিজাতগণের দখলে, কিন্তু তাহারা ন্যায়সঙ্গত কর দিত না। উচ্চ ধর্ম যাজকেরা, যথা বিশপ প্রভৃতি পোইসীর চুক্তি (Contract of Poissy) অনুসারে স্বেচ্ছা কর দিতেন। তাঁহাদের নিকট হইতে সরকার নিয়মিতভাবে কর আদায় করিতে পারিত না। ইহার ফলে মধ্যবিত্ত ও কৃষকগণকে করের শতকরা ৯৬ ভাগ বোঝা বহিতে হইত। ফ্রান্সে একটি প্রবাদ ছিল যে, "অভিজাতেরা যুদ্ধ করে, ধর্ম যাজকেরা প্রার্থনা করে এবং সাধারণ লোকে কর দেয়" (The nobles fight, the clergy pray and the people pay)।

---

১. "Vanity made the Revolution, Liberty was only an excuse."

২, "The immediate cause of the French Revolution must be sought......in the reactionary aspiration of the French aristocracy."

৩. "A museum of Economic errors."

তদ্ব্পরি যে কর আদায় হইত তাহার অধিকাংশ কর্মচারীগণের মাহিনা খাতে এবং কর্মচারীগণের অসাধ্বতার জন্য নষ্ট হইত। সরকারের তহবিলে অল্প টাকাই জমা পড়িত। এদিকে মুদ্রাস্ফীতির ফলে দ্রব্যমূল্য বাড়িয়া যায়। ১৭৮৮ খ্রীঃ আগষ্ট মাসে চার পাউণ্ড রুটির দাম ছিল ৯ সু (sous)। ইহার পাঁচ মাস পরে ঐ রুটির দাম হয় ১৪½ সু (sous)। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও করের চাপে সাধারণ লোকের দুর্দশার একশেষ হয়। ফ্রান্সে অবাধ বাণিজ্য নীতি না থাকায় ব্যবসা-বাণিজ্যের ঘোর অসুবিধা দেখা দেয়। আভ্যন্তরীণ শুল্ক আইন অনুযায়ী দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্থানে স্থল শুল্ক আদায় করার ফলে মালের দাম অসম্ভব বাড়িয়া যায়। ব্যবসায়-বাণিজ্যে মন্দা দেখা দেয়।

দার্শনিকগণের প্রভাব ঃ ফরাসী দার্শনিকগণের রচনাও পরোক্ষভাবে ফরাসী বিপ্লবের ক্ষেত্র সৃষ্টি করে। মন্তেস্ক্যু তাঁহার পার্সিয়ার পত্রাবলী (Persian Letters) নামক গ্রন্থে সমসাময়িক ফরাসী শাসন ও সমাজ ব্যবস্থার ত্রুটি উদ্ঘাটন করেন। মন্তেস্ক্যু তাঁহার আইনের মর্ম (Spirit of Law) নামক গ্রন্থে সরকারী ক্ষমতাকে শাসন বিভাগ, বিচার বিভাগ ও আইন বিভাগ এই তিন ভাগে পৃথক করার জন্য বলেন। ফ্রান্সে রাজার হাতে এই তিনটি ক্ষমতাই কেন্দ্রীভূত ছিল। মন্তেস্ক্যুর সমালোচনা ফরাসী রাজতন্ত্রের এই দুর্বলতা উদ্ঘাটিত করে। ভলতেয়ার তাঁহার রচনাবলীর দ্বারা পোপতন্ত্র, যাজক ও অভিজাতগণের স্বার্থপরতাকে উদ্ঘাটন করেন।

রুশো তাঁহার সামাজিক চুক্তি (Sociale Contract) নামক গ্রন্থে প্রমাণ করেন যে রাষ্ট্র জনসাধারণের ইচ্ছার (General Will) দ্বারা গঠিত। জনসাধারণই হইল রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির উৎস। রাজা যদি তাঁহার কর্তব্য না করেন তবে তাঁহাকে জনসাধারণের ইচ্ছায় সরাইয়া দেওয়া যায়। রুশোর মতবাদ স্বর্গীয় অধিকার নীতির মূলে কুঠারাঘাত করে। এছাড়া দেনিস দিদেরো, ডি এলেমবার্ট প্রভৃতি চিন্তাবিদ বিশ্বকোষ (Eneyclopaedia) রচনা করিয়া দার্শনিক মতবাদ জনসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া দেন। কোয়েসনে প্রভৃতি অর্থনীতিবিদগণ ফিজিওক্র্যাটবাদ (Physiocrat) নামে অর্থনৈতিক মতবাদ প্রচার করেন। ফিজিওক্র্যাটগণ সংরক্ষণ নীতি, কর ব্যবস্থার সমালোচনা করিয়া অবাধ বাণিজ্য নীতি প্রচার করেন। দার্শনিকগণ প্রত্যক্ষভাবে বিপ্লবের কথা না বলিলেও পুরাতন ব্যবস্থার সমালোচনা দ্বারা ইঁহারা পুরাতন ব্যবস্থার প্রতি লোকের আস্থা নষ্ট করিয়া দেন। সুতরাং দার্শনিকগণ পরোক্ষভাবে বিপ্লবের পথ সৃষ্টি করেন। তাঁহারা যে নূতন সমাজ ব্যবস্থার কথা বলেন তাহা মধ্যবিত্তগণের মধ্যে বিশেষ সাড়া জাগায়।

দার্শনিকগণের দ্বারা পুরাতন ব্যবস্থার ত্রুটি প্রকাশ

অন্যান্য কারণ ঃ সপ্তদশ শতকের ইংলণ্ডের গৌরবময় বিপ্লব (১৬৮৮ খ্রীঃ) (Glorious Revolution) ফরাসী বিপ্লবের পশ্চাতে কাজ করিয়াছিল। এই বিপ্লবের ফলে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট সভা জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসাবে রাজার উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করে। গৌরবজনক বিপ্লবের গণতান্ত্রিক মতবাদ ইংলিশ চ্যানেলের দক্ষিণে ফ্রান্সে

সহজে ছড়ায়। আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র এবং আমেরিকার সংবিধানের প্রজাতান্ত্রিক আদর্শ ফ্রান্সে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। লাফায়েৎ প্রভৃতি ফরাসী নেতাগণ আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দিয়া আমেরিকার প্রজাতান্ত্রিক আদর্শে গভীরভাবে প্রভাবিত হন। আমেরিকার যুদ্ধে যোগ দিয়া ফরাসী সরকারের রাজকোষ শূন্যে হইয়া পড়িলে রাজা ষোড়শ লুই উপায়ান্তর না দেখিয়া জাতীয় সভা বা স্টেটস জেনারেলের অধিবেশন ডাকেন। ইহার ফলে রাজতন্ত্রের দুর্বলতা প্রকট হইয়া পড়ে। এই সুযোগে মধ্যবিত্তশ্রেণী, রাজার ও অভিজাতগণের ক্ষমতা সঙ্কোচনের চেষ্টা করিলে বিপ্লব আরম্ভ হয়।

ফরাসী বিপ্লবের পশ্চাতে দার্শনিকগণের প্রভাব (Influence of Philosophers behind the French Revolution) : অষ্টাদশ শতকের জ্ঞানদীপ্তির ফলে যে যুক্তিবাদের জাগরণ হয় তাহার প্রভাব ফরাসী দেশেও অনুভূত হয়। ফরাসী দার্শনিকগণ যুক্তিবাদের আলোকে প্রচলিত রাষ্ট্র, সমাজ ও অর্থনীতিকে যাচাই করেন। তাঁহারা ইহার বহু অসঙ্গতি দেখাইয়া দেন। দার্শনিকগণের রচনা পড়িয়া ফ্রান্সের উদারপন্থী অভিজাত ও মধ্যবিত্তগণ প্রচলিত রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার উপর আস্থা হারাইয়া ফেলেন। ইহার ফলে বিপ্লব ঘটে।

মন্তেস্ক্যুর মতবাদ

মন্তেস্ক্যু নামক ফরাসী দার্শনিক Spirit of Law বা আইনের মর্ম এবং Persian Letters বা পার্সিয়ার পত্রাবলী নামে দুইটি গ্রন্থ রচনা করেন। শেষের পুস্তকে তিনি প্রমাণ করেন যে ফরাসী অভিজাতগণ সমাজের অপর সকলকে ফাঁকি দিয়া বিশেষ সুবিধা ভোগ করিতেছে। রাজ পরিবার ও রাজসভা কিরূপে দুর্নীতির পাঁকে ডুবিয়াছে তাহাও তিনি দেখান। আইনের মর্ম গ্রন্থে তিনি ফ্রান্সের স্বৈরাচারী শাসন ও স্বর্গীয় অধিকার নীতির সমালোচনা করেন। তিনি প্রমাণ করেন যে যদি রাজার হাতে সরকারের সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকে তবে ব্যক্তি স্বাধীনতা নষ্ট হইবে। মন্তেস্ক্যু আইন বিভাগ, বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগকে পৃথক করার পরামর্শ দেন। মন্তেস্ক্যুর "আইনের মর্ম" গ্রন্থ এত জনপ্রিয় হয় যে ১৮ মাসে উহার ২২টি সংস্করণ বিক্রয় হইয়া যায়।

ভলতেয়ারের প্রভাব

ফ্রান্সের অপর বিখ্যাত চিন্তাবিদ ছিলেন ভলতেয়ার। তিনি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এবং জ্ঞানী ব্যক্তি। তাঁহার লেখনী ছিল ক্ষুরের ন্যায় ধারাল, ভাষা ছিল তীব্র ও রসাল। ভলতেয়ার তাঁহার প্রবন্ধগুলিতে চার্চ বা গীর্জার দুর্নীতি উদ্ঘাটন করেন। তিনি ক্যাথলিক গীর্জাকে "বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত উৎপাত" (Privileged nuissance) এবং গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের আড়ৎ বলিয়া অভিহিত করেন। ভলতেয়ার প্রচলিত সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাকেও আক্রমণ করেন। ভলতেয়ারের রচনার প্রভাবে গীর্জার প্রতি লোকের শ্রদ্ধা ও ভীতি কমিয়া যায়। লোকে স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করিতে সাহস পায়।

যুক্তিবাদী দর্শনের প্রধান পুরোহিত ছিলেন জাঁ জেকুইস রুশো। সমুদ্রে একপ্রকার পাখী দেখা যায় যেগুলি ঝড়ের আগে জাহাজের নিকট উড়িতে থাকে। এই পাখীগুলিকে

দেখিয়া নাবিকেরা ঝড় আসন্ন বুঝে। রুশো ছিলেন ফরাসী বিপ্লবের ঝড়ের পাখী। তাঁহার মতবাদ ছিল খুবই বৈপ্লবিক। "অসাম্যের মূলসূত্র" (Origin of Inequality) নামক গ্রন্থে রুশো দেখান যে মানুষ জন্মের সময় সকলের সহিত সমান অধিকার লইয়া জন্মায়। কিন্তু লোভী ও স্বার্থপর লোকের জন্য মানুষ সমাজে সমান অধিকার লাভে বঞ্চিত হয়। মানুষ স্বাধীনতার অধিকার লইয়া জন্মলাভ করে কিন্তু শেষ পর্যন্ত সর্বত্রই তাহার স্বাধীনতা নষ্ট হয়।[১] তাঁহার সামাজিক চুক্তি (Contract Sociale) নামক গ্রন্থে রুশো রাষ্ট্রের উৎপত্তির এক ইতিহাস-সম্মত ব্যাখ্যা করেন। রুশো একথা প্রমাণ করেন যে জনসাধারণের ইচ্ছা (General Will) হইতেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে। জনসাধারণই রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির উৎস। কোন রাজা ইহাকে অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। তিনি প্রচলিত স্বর্গীয় অধিকার নীতিকে ইতিহাসের প্রমাণ দ্বারা নস্যাৎ করিয়া দেন। রুশোর মতবাদই আধুনিক গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করে। সমকালীন যুগের জনমতের উপর রুশোর গভীর প্রভাব দেখা দেয়। দরিদ্র, অধিকারহীন জনগোষ্ঠী রুশোর মতবাদের আলোকে সমাজে তাহাদের মূল্য নির্ণয় করিতে শিখে। বিপ্লব আরম্ভ হইবার পর তাঁহারই মতবাদ বিপ্লবের গতির উপর বেশী প্রভাব বিস্তার করে।

রুশোর মতবাদ



রুশো

এছাড়া দেনিস দিদেরা ও ডি এলেমবার্ট প্রভৃতি লেখকেরা বিশ্বকোষ সম্পাদনা করিয়া দার্শনিক মতবাদ উহাতে সংকলন করেন। বিশ্বকোষের মাধ্যমে লোকসমাজে এই মতবাদ ছড়াইয়া যায়। ফিজিওক্র্যাট নামক এক শ্রেণীর অর্থনীতিবিদ প্রচলিত মার্কাণ্টাইলবাদ ও সংরক্ষণ নীতির ঘোর সমালোচনা করেন। কুয়েসনে নামক অর্থনীতিবিদ অবাধ বাণিজ্য, বেসরকারী শিল্প বিস্তারের দাবী জানান। মোট কথা ফিজিওক্র্যাট অর্থনীতিবিদগণ ফ্রান্সের প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অসারতা প্রমাণ করেন। এইভাবে ফরাসী দার্শনিকগণ ফ্রান্সের রাষ্ট্র, সমাজ ও অর্থনীতির ত্রুটি উদ্ঘাটন করেন।

অর্থনীতিবিদ ও বিশ্বকোষ প্রণেতাগণ

ফরাসী বিপ্লব ঘটিবার জন্য দার্শনিকগণের মতবাদ কতটা দায়ী ছিল ইহা লইয়া মতভেদ দেখা যায়। এক শ্রেণীর ঐতিহাসিক মনে করেন যে দার্শনিকগণের রচনাবলী বিপ্লবের আগুন জ্বালাইয়া দেয়।[২] কিন্তু মর্স ষ্টিফেনস প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ ফরাসী বিপ্লবের কারণ হিসাবে দার্শনিকগণের প্রভাবকে নগন্য বলিয়া মনে করেন। তাঁহার মতে "ফরাসী বিপ্লবের কারণ ছিল প্রধানতঃ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক, দার্শনিক ও সামাজিক

১. "Man is born free and everywhere he is in chains."

২. "The train loaded with philosophy was fired by finance." Lodge.

নহে" ।[১] দার্শনিকগণ প্রত্যক্ষভাবে বিপ্লবের কথা বলেন নাই এবং জনগণকে বিপ্লবের জন্য ডাক দেন নাই। তাঁহারা কেবলমাত্র পুরাতনতন্ত্রের দোষ ত্রুটিগুলি দেখাইয়া দেন। তাছাড়া দার্শনিকগণের রচনা সাধারণ লোকে পড়িত না। উহা মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবি লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ফ্রান্স অপেক্ষা ফ্রান্সের বাহিরে উহার পাঠকের সংখ্যা বেশী ছিল। সুতরাং সাধারণ লোকে দার্শনিকদের রচনা পড়িয়া বুরবোঁ শাসনের প্রতি আস্থা হারাইয়া ছিল ইহা মনে করা যায় না। এছাড়া দার্শনিকগণের মধ্যে মতপার্থক্য ছিল। মন্তেস্ক্যু নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের কথা বলেন। রুশো প্রজাতন্ত্রের কথা বলেন। রুশো রক্তাক্ত বিপ্লব ও হত্যাকে ঘৃণা করিতেন। সুতরাং দার্শনিকেরা পুরাতনতন্ত্রের সমালোচনা করিলেও প্রতিকারের পথ দেখান নাই। সুতরাং বিপ্লবের কারণ হিসাবে দার্শনিকগণের অবদান উল্লেখযোগ্য ছিল না বলিয়া অনেকে মনে করেন।

দার্শনিকগণের সীমাবদ্ধ প্রভাব

ঐতিহাসিক মাদেলাঁর (Madeline) অভিমত এ সম্পর্কে স্মরণ রাখা দরকার। দার্শনিকগণের সহিত বিপ্লবের প্রত্যক্ষ যোগ না থাকিলেও দার্শনিকগণের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। দার্শনিকগণের রচনা সকলে না পড়িলেও মুখে মুখে তাহা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। প্যারিসের চা খানা ও ক্লাবগুলির মধ্যে দার্শনিকদের মতবাদ আলোচিত হইত। দার্শনিকগণ প্রচলিত রাষ্ট্র, সমাজ ব্যবস্থার সমালোচনা করিয়া উহার ত্রুটি সম্পর্কে লোকের চোখ খুলিয়া দেন। পুরাতন ব্যবস্থার প্রতি জনগণের আস্থা নষ্ট হয়। চিরাচরিত ধারা যে ঠিক নয় একথা সকলে বুঝিতে পারে। ফরাসী মধ্যবিত্ত শ্রেণী দার্শনিক মতবাদের মদিরা আকণ্ঠ পান করিয়াছিল। দার্শনিকদের রচনা পড়িয়া এক স্বাধীন সমাজ গঠনের জন্য তাহারা প্রেরণা পায়। মন্তেস্ক্যুর আইনের মর্ম নামক গ্রন্থটির ১৮ মাসে ২২টি সংস্করণ বিক্রয় হয়। ইহা হইতে দার্শনিকদের জনপ্রিয়তা বুঝা যায়। মোট কথা দার্শনিকেরা বিপ্লব করিবার কথা প্রত্যক্ষভাবে না বলিলেও পুরাতনতন্ত্রের দুর্বলতা দেখাইয়া তাঁহারা বিপ্লবের ক্ষেত্র সৃষ্টি করেন। ম্যালেট ডু পানের মতে "দার্শনিকেরা যে বীজ বপন করেন তাহা উপযুক্ত জমিতে অংকুরিত হয়।[২]

দার্শনিকগণের পরোক্ষ প্রভাব

ফ্রান্সে প্রথম বিপ্লব ঘটিবার কারণ (Why did the Revolution break out in France ?)ঃ তুলনামূলকভাবে বিচার করিলে দেখা যায় যে ইওরোপের অন্যান্য দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা ফ্রান্স অপেক্ষা খারাপ ছিল। রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়ার সাধারণ লোকের অবস্থা ফরাসী তৃতীয় শ্রেণী অপেক্ষা খারাপ ছিল। বিপ্লব এই সকল দেশে না ঘটিয়া ফ্রান্সে কেন প্রথম ঘটে তাহা বিবেচনা করা দরকার। ফ্রান্সের মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল অবস্থাপন্ন ও সমাজ সচেতন। সুইডেন ও ইংলণ্ড ছাড়া ইওরোপের অন্য কোন দেশে ফ্রান্স অপেক্ষা প্রগতিশীল ও অধিকার সচেতন

১. "The cause of the movement was chiefly economical and political, not philosophical and social." Morse Stephens.

২. "The seed sowu by them fell upon fruitful soil."

মধ্যবিত্ত ছিল না। ফরাসী মধ্যবিত্তগণ দার্শনিকগণের মতবাদ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিল। অভিজাত শ্রেণীর অহংকার ও বিশেষ সুবিধাকে ইহারা ঘৃণা করিত। ফরাসী বিপ্লবে এই শ্রেণীই প্রধান নেতৃত্ব দেয়। ফরাসী দার্শনিকগণ ফ্রান্সের শাসন, সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ত্রুটি উদ্‌ঘাটন করেন। এই দার্শনিকগণের মতবাদ ফরাসী জনসাধারণের মধ্যে যেভাবে ছড়ায় ইওরোপের অন্য কোন দেশে তাহা হয় নাই। ইওরোপের অন্য কোন দেশে এত বেশী সংখ্যক চিন্তাশীল লোক একই সময়ে জন্মলাভ করে নাই। ফ্রান্সের রাজশক্তি ইওরোপের অন্যান্য রাজতন্ত্রের তুলনায় হীনবল হইয়া পড়িয়াছিল। অকর্মন্যতা, অমিতব্যয়িতা, সংস্কারবিমুখতার ফলে এই রাজতন্ত্রের প্রাণশক্তি নিস্তেজ হইয়া পড়ে। দুর্বল ও মার খাওয়া বৈদেশিক নীতি লোকচক্ষে বুরবোঁ রাজতন্ত্রকে হেয় করিয়া দেয়। ফলে ফ্রান্সের রাজতন্ত্র জনগণের আস্থা হারাইয়া ফেলে। ফ্রান্সের অভিজাত সমাজ ছিল বিশেষ সুবিধাভোগী ও স্বার্থপর সম্প্রদায়। ইওরোপের অন্যান্য দেশের অভিজাতগণ বিশেষ অধিকারের সহিত রাষ্ট্রের জন্য কিছু কর্তব্য কার্য করিত। ফ্রান্সের অভিজাতগণ কেবলমাত্র অধিকার ভোগ করিত। ইহার পরিবর্তে কর্তব্য করিত না। ফরাসী অভিজাতগণই বিপ্লব ঘটাইবার জন্য প্রাথমিকভাবে দায়ী ছিল। বিপ্লবের প্রথম দিকে তাহারা যদি রাজার নূতন সংস্কারগুলি মানিয়া লইত অথবা মধ্যবিত্তগণের দাবী মানিয়া লইত তবে বিপ্লব না ঘটিতেও পারিত। তাহা ছাড়া ফ্রান্সে আমেরিকার বিপ্লবের প্রভাব পড়ে। ইওরোপের অন্য কোন দেশে আমেরিকার বিপ্লবের ভাবধারা এত বেশী কার্যকরী ছিল না। এই সকল কারণে ফ্রান্সেই প্রথম বিপ্লব দেখা দেয়।

জাতীয় সভা আহ্বান ও ফরাসী বিপ্লব ঘটিবার জন্য বুরবোঁ রাজবংশের দায়িত্ব : অভিজাত শ্রেণীর বিদ্রোহ : ফরাসী বিপ্লবের শ্রেণী চরিত্র (The calling of the States General and the Responsibility of the Bourbon Monarchy for the outbreak of the French Revolution : Revolt of the Aristocracy : Class character of the French Revolution) : ঐতিহাসিক লাফারে ফরাসী বিপ্লবের বিস্তৃত পটভূমিকা আলোচনা করিয়া এই যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে "ফরাসী বিপ্লবের প্রাথমিক পর্যায়ে ফরাসী অভিজাতগণই বিপ্লব ঘটাইবার জন্য দায়ী ছিল।" রাজা যোড়শ লুই তীব্র অর্থ-সংকট ও ঘাটতির সম্মুখীন হইয়া প্রথম টুর্গোকে অর্থমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। টুর্গো সমগ্র অবস্থা দেখিয়া অভিজাতগণের উপর কর ধার্য করা এবং ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া ঘাটতি পূরণের পরামর্শ দেন। তিনি অবাধ বাণিজ্য চালু করার কথাও বলেন। তিনি বেগার খাটাইবার প্রথা বা কর্ভি (corvee) লোপ করেন। জমির অনুপাত অনুযায়ী সমানহারে কর ধার্যের জন্য তিনি পরামর্শ দেন। টুর্গোর সংস্কারগুলি কার্যকরী হইলে ফ্রান্সের সুবিধাভোগী অভিজাতগণের স্বার্থ নষ্ট হইত। অভিজাতগণ কম খাজনা দিয়া বেশী জমি ভোগ করিত। সুতরাং অভিজাতগণের চাপে ও রানী মারিয়া এ্যান্টোনেটের বিরোধিতার ফলে টুর্গোর সংস্কারগুলি বানচাল হইয়া

টুর্গোর সংস্কারের বিরুদ্ধে অভিজাতগণের বিরোধিতা

যায়। দুর্বল ও মেরুদণ্ডহীন রাজা ষোড়শ লুই ১৭৭৬ খ্রীঃ টুর্গোকে পদচ্যুত করিতে বাধ্য হন। তিনি অবশ্য শ্লেষের সঙ্গে বলেন যে "টুর্গোই একমাত্র প্রজার মঙ্গলের কথা ভাবিয়াছিলেন।" সংস্কারের দ্বারা পরিবর্তনের পথ বন্ধ করায় বিপ্লবের দ্বারা পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়।

টুর্গোর পতনের পর ফরাসী সরকারের অর্থসংকট ক্রমশঃ তীব্র আকার ধরে। অর্থমন্ত্রী নেকার ইহার সমাধানে বিফল হইলে, রাজা ষোড়শ লুই, ক্যালোনকে ১৮৭১ খ্রীঃ অর্থমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। ক্যালোন হিসাব করিয়া দেখেন যে সরকারকে এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইতে হইলে কয়েকটি ব্যবস্থা দৃঢ়হাতে করা দরকার, যথা—(১) সরকারের উচিত জাতীয় ঋণের কিছু টাকা নাকচ করিয়া দিয়া ব্যয়ভার কমান ; (২) অভিজাত ও উচ্চ ধর্মযাজক শ্রেণী যাহারা কর কম দিত অথবা আদৌ দিত না তাহাদের কর দানে বাধ্য করা। কিন্তু অভিজাতগণ দীর্ঘকাল ধরিয়া কমহারে অথবা আদৌ কর না দিয়া বিশেষ সুবিধা ভোগ করিত। তাহারা ক্যালোনের প্রস্তাব মানিয়া লইয়া বাড়তি কর দিতে গররাজী হয়।

ক্যালোনের সংস্কার নীতি

ক্যালোন অভিজাতগণের সমর্থন পাইবার আশায় রাজাকে "মুখ্য ব্যক্তিগণের এক সমিতি" (Council of Notables) আহবানের পরামর্শ দেন। ১৭৮৭ খ্রীঃ এই সমিতির অধিবেশন বসে। এই সমিতির সভ্যগণ ছিলেন প্রধানতঃ অভিজাত শ্রেণীর। "মুখ্য ব্যক্তিগণের সমিতি" অভিজাতগণের বিশেষ সুবিধা রক্ষা করাই উচিত কাজ মনে করে। রাজার আবেদনে এই সমিতি কর্ণপাত করে নাই। অধিকন্তু এই সমিতির চাপে মেরুদণ্ডহীন রাজা মন্ত্রী ক্যালোনকে বরখাস্ত করিয়া ব্রিয়াঁকে মন্ত্রী নিযুক্ত করেন।

মুখ্য ব্যক্তিগণের সভা আহ্বান

ব্রিয়াঁ বুঝিতে পারেন যে স্বার্থপর ও বিদ্রোহী অভিজাতগণ তাহাদের সুবিধা ছাড়িবে না। তাঁহার পরামর্শে মুখ্য ব্যক্তিগণের পরিষদ ভাঙিয়া দেওয়া হয়। ক্যালোনের প্রস্তাবিত সংস্কারগুলি পাশ করাইবার জন্য কোন উপায় না দেখিয়া, ব্রিয়াঁ ষোড়শ লুইকে জাতীয় সভার অধিবেশন ডাকিতে পরামর্শ দেন। মুখ্য ব্যক্তিগণের সভার অন্যতম সভ্য লাফায়েৎও অনুরূপ পরামর্শ দেন। ১৭৮৯ খ্রীঃ ১লা মে জাতীয় সভার অধিবেশন বসে।

জাতীয় সভা আহ্বান

অভিজাতগণের আশা ছিল যে জাতীয় সভার বৈঠকে তাহাদের বিশেষ অধিকার বজায় রাখিয়া বাড়তি করের বোঝা তাহারা মধ্যবিত্ত ও কৃষকগণের উপর চাপাইয়া দিতে পারিবে। জাতীয় সভায় ফ্রান্সের তিন শ্রেণীর যথা যাজক, অভিজাত ও সাধারণ শ্রেণীর আলাদাভাবে ভোট দেওয়ার নিয়ম ছিল। সুতরাং তৃতীয় শ্রেণীর সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকিলেও প্রতি শ্রেণীর পৃথক ভোট থাকার ফলে তৃতীয় শ্রেণীর গৃহীত প্রস্তাব অভিজাত শ্রেণী নাকচ করিতে পারিত।

জাতীয় সভায় অভিজাতগণের বিশেষ সুবিধা দাবী

জাতীয় সভার অধিবেশন বসিলে মধ্যবিত্তগণ, তৃতীয় শ্রেণীর মুখপাত্র হিসাবে শ্রেণী অনুযায়ী আলাদা ভোটদানের পরিবর্তে সকল শ্রেণীকে একযোগে মাথা পিছু ভোটদানের

অধিকার দিবার দাবী জানায়। এদিকে রাজা ও অভিজাতগণ পুরাতন নিয়ম অনুযায়ী শ্রেণী অনুযায়ী আলাদা ভোটদানের সিদ্ধান্ত বহাল রাখিতে চেষ্টা করেন। লাফায়েৎ, কনডরসেট, এ্যাবে সিয়েস, মিরাবু প্রভৃতি উদারপন্থী নেতা অভিজাত শ্রেণীর লোক হইলেও তৃতীয় শ্রেণীর দাবী সমর্থন করেন। এ্যাবে সিয়েস তাঁহার বিখ্যাত "নিয়োগকারী ক্ষমতাতত্ত্ব" (Constituent power Theory) প্রচার করেন। তিনি ইহা বলেন যে রাষ্ট্র জনগণের ইচ্ছায় প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস। জনগণই রাষ্ট্রের নিয়োগকারী। তৃতীয় শ্রেণীই যেহেতু জনসাধারণের প্রধান অংশ, তাহাদের হাতেই রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা নিহিত আছে।[১] সুতরাং তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধিগণ যাহা বলিবেন তাহাই জনগণের ইচ্ছার প্রকাশ মাত্র। জাতীয় সভা বলিতে তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধিগণকেই বুঝায়। সুতরাং তৃতীয় শ্রেণীর ইচ্ছাই জাতীয় সভার ইচ্ছা হইতে বাধ্য।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিদ্রোহ

তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধিদের মতিগতিতে আতঙ্কিত হইয়া রাজা ষোড়শ লুই জাতীয় সভার অধিবেশন ভাঙিয়া দেন। কিন্তু তাহারা রাজার এই সিদ্ধান্ত মানিতে অস্বীকার করে। তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধিগণ একযোগে টেনিস কোর্টের শপথ (Tennis Court Oath) নেয় যে তাহারা ফ্রান্সের জন্য নূতন সংবিধান রচনা না করিয়া জাতীয় সভা ত্যাগ করিবে না। রাজা জাতীয় সভা ভাঙিয়া দিলেও ইহা স্বীকার করা হইবে না। ইহার ফলে বিপ্লব আরম্ভ হয়। যদি রাজা ও অভিজাতগণ অবস্থা বুঝিয়া মধ্যবিত্তগণের দাবী মানিয়া লইতেন তবে ঘটনা অন্য পথে যাইত। সুতরাং বিপ্লব আরম্ভ হইবার জন্য অভিজাত শ্রেণী ও রাজার দায়িত্ব কম ছিল না।

রাজা ষোড়শ লুইয়ের অপদার্থতা এবং নেতৃত্ব দানে অক্ষমতা বিপ্লবকে ঘনাইয়া আনে। মধ্যবিত্তগণ প্রথমে রাজতন্ত্রকে আক্রমণ না করিয়া অভিজাতগণের "বিশেষ সুবিধা" গুলিকে আক্রমণ করে। তাহারা সকল শ্রেণীর সমান অধিকার দানের জন্য রাজার নিকট প্রার্থনা করে। রাজা ষোড়শ লুই যুগের হাওয়া ও দেয়ালের লিখন না পড়িয়া অভিজাত সমাজের পক্ষ নেন। তিনি অবস্থার গুরুত্ব বুঝিয়া মধ্যবিত্তদের নায্য দাবী সমর্থন করিতে অপারগ হন। এদিকে মন্ত্রী টুর্গো, নেকার ও ক্যালোনের সংস্কার নীতি বিফল হইলে সংস্কারের পথে ফ্রান্সে পরিবর্তন আনার সম্ভাবনা ব্যর্থ হয়। ইহার ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিপ্লবের পথে নামিতে বাধ্য হয়। ফিশারের মতে, "রাজা, অভিজাতগণের বিশেষ অধিকার সমস্যার সমাধান করিতে ব্যর্থ হওয়ার জন্যই বিপ্লব ঘটে।"[২]

ষোড়শ লুইয়ের অযোগ্যতা

সর্বশেষে বলা যায় যে মধ্যবিত্তগণ বিপ্লবের মাধ্যমে অভিজাতগণের ক্ষমতা ধ্বংস করিয়া ইহার পরিবর্তে ১৭৯১ খ্রীঃ মধ্যবিত্তগণের বিশেষ অধিকার কায়েম করে। ইহাতে সাধারণ লোকে ক্ষুব্ধ হয়। সাধারণ লোকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অধিকারের প্রতিবাদে

১. Lefebvre. P. 106-7.

২. "The Revolution came because the king failed to solve the question of privilege.". Fisher.

আগাইয়া আসিলে ফরাসী বিপ্লব আরও আগাইয়া যায়। জ্যাকোবিন দল এই সময় সাধারণ লোকের হইয়া বিপ্লবে নেতৃত্ব দেয়। ঐতিহাসিক লাফাব্রের মতে ইহার ফলে "গণবিপ্লব" (Popular Revolution) আরম্ভ হয়।

বিপ্লবের অগ্রগতি (Course of the Revolution) : রাজা ষোড়শ লুই তাঁহার সরকারের অর্থসংকট মোচনের জন্য ১৭৮৯ খ্রীঃ জাতীয় সভার অধিবেশন ডাকেন। জাতীয় সভায় ভোটদানের বিধি লইয়া তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধিগণের সহিত অপর দুই শ্রেণীর ঘোর মত-বিরোধ হয়। ইতিমধ্যে অর্থমন্ত্রী নেকার তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধিগণের ভোট সংখ্যা দ্বিগুণ করিয়া দিলে স্বভাবতই তৃতীয় শ্রেণীর ভোটাধিক্য স্থাপিত হয়।[১] ইহার পর তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধিগণ অধিকসংখ্যক ভোটাধিকার পাইয়া শক্তিশালী হয়। পুরাতন নিয়ম অনুসারে প্রতি শ্রেণী আলাদা সভায় বসিয়া ভোট দিলে তৃতীয় শ্রেণীর এই সংখ্যা গরিষ্ঠতা কাজে লাগিত না। কারণ তৃতীয় শ্রেণীর সভায় পাশ করা আইন অপর শ্রেণী তাঁহাদের সভায় নাকচ করিতে পারিত। এই অসুবিধা এড়াইয়া, অপর দুই শ্রেণীর উপর তাহাদের সংখ্যাধিক্য স্থাপনের জন্য তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধিরা অপর দুই শ্রেণীর সহিত একত্রে বসিয়া "এক মাথা, এক ভোট" নীতি অনুসারে ভোটদানের দাবী জানায়। সাধারণ লোকের মুখপাত্র হিসাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণী "কেহিয়ার্স" (Cahiers) বা "অভিযোগ তালিকা" পেশ করিয়া অভিজাতগণের বিশেষ অধিকার নাকচ করিবার জন্য দাবী জানায়। রাজা উপায়ান্তর না দেখিয়া হঠাৎ জাতীয় সভার অধিবেশন (২০শে জুন, ১৭৮৯ খ্রীঃ) রদ করেন। তিনি জন-প্রতিনিধিগণকে নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া যাইতে নির্দেশ দেন।

জাতীয় সভার অধিবেশন রদ

জাতীয় সভার অধিবেশন রদ করিলে, তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধিগণ রাজার আদেশ মানিতে অস্বীকৃতি জানায়। তাহারা বুঝিতে পারে যে রাজা অভিজাত শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করিতে চান। জাতীয় সভাগৃহ তালাবন্ধ থাকায়, তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধিগণ নিকটস্থ টেনিস ময়দানে সমবেত হইয়া কয়েকটি প্রস্তাব নেয়। এই প্রস্তাবগুলিকে "টেনিস কোর্টের শপথনামা" (Tennis Court Oath) বলা হয়। মিরাবু, এ্যাবে সিয়েস প্রভৃতি প্রগতিবাদী, উদারপন্থী অভিজাতগণ ইহাতে নেতৃত্ব দেন। টেনিস কোর্টের শপথনামায় বলা হয় যে "যতদিন না ফ্রান্সের একটি নূতন সংবিধান তৈয়ারী হয় ততদিন জাতীয় সভার অধিবেশন চলিবে।" ফ্রান্সের নূতন সংবিধান ঘোষণার জন্যও শপথ নেওয়া হয়।

টেনিস কোর্টের শপথনামা

ষোড়শ লুই পুনরায় জাতীয় সভার অধিবেশন ডাকিতে বাধ্য হন। তৃতীয় শ্রেণীর চাপে, রাজা শেষ পর্যন্ত জাতীয় সভার প্রতিনিধিগণকে একত্র বসিয়া, মাথা পিছু এক ভোট নীতি অনুযায়ী কাজ করিতে সম্মতি (২৭শে জুন) দেন। এইভাবে তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধিগণ সাফল্য লাভ করেন। ইহার পর জাতীয় সভার নাম পাল্টাইয়া সংবিধান সভা বা Constituent Assembly বা

সংবিধান পরিষদ গঠন

১. Lefebvr. P. 104.

National Assembly রাখা হয়। এই সভা সংবিধান রচনার কাজে হাত দেয় (পরে বিশদ বিবরণ দেখ)।

সংবিধান সভার অধিবেশন চলার সময় ফ্রান্সের সর্বত্র ব্যাপক দাঙ্গা-হাঙ্গামা আরম্ভ হয়। প্যারিস শহরের দরিদ্র, সর্বহারা শ্রেণী (Sans coulottes) এবং গ্রাম হইতে আগত দরিদ্র লোকেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অধিকার ভোগী আভিজাত শ্রেণীর উপর আক্রমণ চালায়। জাঁ পল ম্যারাট প্রভৃতি উগ্রপন্থী নেতাগণ জনতাকে ক্ষেপাইয়া তুলেন। প্যারিস নগরীর এই উগ্রপন্থী জনতাকে ইতিহাসে "প্যারিসিয়ান মব" (Parisian Mob) বা প্যারিসের জনতা বলা হয়। প্যারিসের জনতা ১৭৮৯ খ্রীঃ ১৪ই জুলাই বাস্তিল দুর্গ আক্রমণ করিয়া এক খণ্ডযুদ্ধের পর বাস্তিল দুর্গ অধিকার করে। বাস্তিল দুর্গে বন্দী বহু লোককে তাহারা মুক্ত করিয়া দেয়।

বাস্তিল অধিকার ; প্যারিসের জনতা

বাস্তিল দুর্গকে স্বৈরতন্ত্রের প্রতীক হিসাবে গণ্য করা হইত। ইহার পতনের ফলে স্বৈরতন্ত্রের ও অভিজাততন্ত্রের পতনের সূচনা হয়। বিপ্লবী নেতাগণ শান্তি-শৃংখলা রক্ষার জন্য "ন্যাশন্যাল গার্ড" বা জাতীয় বাহিনী নামে একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করেন। লাফায়েৎ ইহার সেনাপতি নিযুক্ত হন। প্যারিস শহরের শাসনকার্যের জন্য একটি নির্বাচিত বিপ্লবী পরিষদ গঠিত হয়। উহার নাম হয় "প্যারিস কমিউন"। অন্যান্য শহরগুলিতেও এইরূপ স্থানীয় বিপ্লবী পরিষদ স্থাপিত হয়। গ্রামাঞ্চলে কৃষকগণ জমিদারগণের খামার, বাড়ী,

বাস্তিলের পতনের কারণ



বাস্তিল দুর্গ আক্রমণ

অফিস পোড়াইয়া দিয়া জমিদারগণের কর্মচারীগণকে বিতাড়িত করে। গ্রামাঞ্চলে

সামন্ততন্ত্র ভাঙিয়া পড়ে। ঐতিহাসিক গুডউইনের মতে "বাস্তিল দুর্গের পতনের ন্যায় অন্য কোন ঘটনার এত সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া দেখা যায় নাই।"[১]

প্যারিস শহরে জনতার উগ্রপন্থী কাজে ভয় পাইয়া ষোড়শ লুই সপরিবারে প্যারিস ছাড়িয়া ভার্সাই শহরে আশ্রয় নেন। এই সময় জাঁ পল ম্যারাট নামক এক সাংবাদিক জনতাকে রাজার বিরুদ্ধে ক্ষেপাইয়া তুলেন। খাবারের চড়া দাম, খাবারের অভাব, অর্থাভাব ও প্রচণ্ড গরমে "প্যারিসের জনতার" মেজাজ বিগড়াইয়া যায়। অক্টোবর মাসে কয়েক হাজার মহিলা ভার্সাই শহরে গিয়া ভার্সাই প্রাসাদ হইতে রাজা, রাণী ও বালক রাজপুত্রকে জোর করিয়া একটি ছ্যাকড়া গাড়ীতে করিয়া প্যারিসে ফিরাইয়া আনেন। তাঁহারা ধ্বনি দেন যে, "আমরা রাজকীয় রুটিওয়ালা, রুটিওয়ালার স্ত্রী ও পুত্রকে পাইয়াছি।" ঐতিহাসিক রাইকার ইহাকে রাজতন্ত্রের শবযাত্রা (Funeral march of the Monarchy) বলিয়াছেন। ইহার পর হইতে ঘটনার গতি রাজার নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলিয়া যায়।

ভার্সাই অভিযান

জাতীয় পরিষদ বা সংবিধান পরিষদের কার্যাবলী (Work of the National or Constiteunt Assembly): টেনিস কোর্টের শপথনামা গ্রহণের পর জাতীয় সভা, সংবিধান সভারূপে ফ্রান্সের জন্য এক নূতন সংবিধান রচনা করে। ১৭৯১ খ্রীঃ এই সংবিধান রচিত হয়। এই সংবিধান দ্বারা পুরাতনতন্ত্রকে ধ্বংস করিয়া ফ্রান্সে বিপ্লবের আদর্শকে রূপায়িত করিবার জন্য নূতন ব্যবস্থা ঘোষিত হয়।

এই সংবিধানের মুখবন্ধে "ব্যক্তি ও নাগরিকগণের অধিকার ঘোষণাপত্র" (Declaration of the Rights of Man and Citizen) দেওয়া হয়। এই ঘোষণাপত্রে ফরাসী বিপ্লবের বিখ্যাত তিনটি নীতি, যথা সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতাকে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণাপত্রে বলা হয় যে, (১) মানুষ মাত্রেরই স্বাধীনতা, সমান অধিকার, সম্পত্তির অধিকার ও নিরাপত্তা পাইবার অধিকার আছে। (২) আইনের চক্ষে সকল মানুষই সমান এবং বিনা বিচারে কাহাকেও শাস্তি দেওয়া যায় না। (৩) জনসাধারণই রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। (৪) সম্পত্তির অধিকারকে পবিত্র বলিয়া বলা হয়। (৫) বাক্‌স্বাধীনতা ও ব্যক্তি স্বাধীনতাকে মর্যাদা দেওয়া হয়। সকল লোকের স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশের অধিকার আছে।

ব্যক্তি ও নাগরিকের অধিকার ঘোষণা

নূতন সংবিধানে পুরাতনতন্ত্রের শোষণমূলক ব্যবস্থাকে লোপ করা হয়। ভূমিদাস বা সার্ফ ব্যবস্থা, সামন্ত কর, ধর্ম কর বা টাইদ, আভ্যন্তরীণ শুল্ক, জমিদার ও ধর্মযাজকগণের কর আদায় না দেওয়ার বিশেষ অধিকার প্রভৃতি বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা লোপ করা হয়। সংবিধান সভা স্বৈরতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র, যাজক শ্রেণীর প্রাধান্য, সামন্তপ্রথা, সামাজিক শোষণ ও অসাম্য প্রভৃতি পুরাতর অব্যবস্থা

পুরাতনতন্ত্র লোপ

১. No other single event of the Revolution had so far-reaching result as the fall of Bastille." Godwin—French Revolution.

দূর করে। রাজার স্বৈরাচারী ক্ষমতা লোপ করা হয়। মন্তেস্ক্যুর মতবাদ অনুযায়ী সরকারী ক্ষমতাকে ভাগ করিয়া এবং রাজার ক্ষমতাকে খর্ব করিয়া গণতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করে।

নূতন সংবিধানে শাসন বিভাগকে আইন ও বিচার বিভাগ হইতে পৃথক করা হয়। শাসন বিভাগের কর্তা হিসাবে রাজা থাকেন। কিন্তু তাঁহার স্বৈরাচারী ক্ষমতাকে বিশেষভাবে সঙ্কোচন করা হয়। রাজার আইন রচনা, আইন সভার উপর নিয়ন্ত্রণ, স্বর্গীয় অধিকার দাবী নাকচ করা হয়। রাজা একজন নির্দিষ্ট বেতনভোগী নিয়মতান্ত্রিক শাসকে পরিণত হন। রাজা অবশ্য আইনসভার পাশ করা আইনকে "মূলতুবীনামা" (Suspensive Veto) দ্বারা কিছুদিনের জন্য মুলতুবী রাখিতে পারিতেন। শাসন বিভাগের প্রধান কর্মচারীগণকে গণভোটে নির্বাচিত করার ব্যবস্থা হয়। ইহার ফলে রাজা এই সকল কর্মচারীগণকে নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা হারান। রাজা যদিও শাসন বিভাগের আইনমাফিক কর্তা থাকেন, তাঁহার প্রকৃত ক্ষমতা বলিতে কিছুই থাকিল না।

রাজার ক্ষমতা

নূতন সংবিধান অনুসারে ফ্রান্সে একটি এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার ব্যবস্থা করা হয়। এই সভা জনগণের তরফে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হয়। আইন রচনার একচেটিয়া ক্ষমতা আইনসভার হাতে দেওয়া হয়। শাসন বিভাগের কাজে হস্তক্ষেপের অধিকারও আইনসভাকে দেওয়া হয়। আইন-সভার সদস্য পদ-প্রার্থীগণ একবার সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হইলে পুনরায় নির্বাচিত হইবার অধিকার হারান। সংবিধান সভার সদস্যগণও আইনসভায় নির্বাচিত হইবার অধিকার হারান।

আইনসভার ক্ষমতা

ফ্রান্সের জনগণকে "সক্রিয়" ও "নিষ্ক্রিয়" এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যে সকল নাগরিক একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পত্তি কর সরকারকে আদায় দিতেন তাঁহাদের "সক্রিয়" নাগরিক আখ্যা দিয়া ভোটদানের অধিকার দেওয়া হয়। "নিষ্ক্রিয়" নাগরিকগণ ভোটাধিকারে বঞ্চিত হয়। যাঁহারা বৎসরে ৫২ লিভার কর সরকারকে দিতেন তাঁহাদের আইনসভার নির্বাচনে প্রার্থী হিসাবে দাঁড়াইবার অধিকার দেওয়া হয়।

আইনসভার গঠন

বিচার ব্যবস্থার সংস্কার করিয়া নির্বাচনের দ্বারা বিচারক নিয়োগ এবং জুরী নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। আইনের নিকট সকলকে সমান অধিকার দেওয়া হয়। নিম্ন আদালতের রায়ের উপর আপিল করার অধিকার দেওয়া হয়।

বিচার ব্যবস্থা

ফ্রান্সের পুরাতন প্রদেশগুলিকে ভাঙিয়া দিয়া সমগ্র দেশকে ৮৩টি ডিপার্টমেণ্ট বা প্রদেশে ভাগ করা হয়। প্রদেশগুলিকে নূতনভাবে জেলা ও মহকুমায় ভাগ করা হয়। প্রাদেশিক শাসনকর্তা বা গভর্ণরগণকে স্থানীয় জন-সাধারণের ভোটে নির্বাচিত হইলে নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা করা হয়।

প্রাদেশিক সংগঠন

"ধর্মযাজকগণের সংবিধান" (Civil Constitution of Clergy) নামে এক আইন

দ্বারা ফ্রান্সের গীর্জাকে সরকারের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। গীর্জার উপর পোপের আধিপত্য লোপ করা হয়। গীর্জার ভূসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। ধর্ম-যাজকগণকে স্থানীয় নির্বাচনের মাধ্যমে নিয়োগ করার ব্যবস্থা হয়। ধর্মযাজকগণকে সরকারি মাহিনা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। গীর্জার বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির পরিবর্তে এসাইন্যাট (Assignat) নামে এক প্রকার নোট চালু করিয়া বিপ্লবী সরকারের অর্থসংকট মোচনের ব্যবস্থা করা হয়।

ধর্ম সম্পর্কিত আইন

ঐতিহাসিক রাইকার (Riker) মন্তব্য করিয়াছেন যে, "সংবিধান সভা ভাঙার কাজে দক্ষতা দেখাইলেও গড়ার কাজে শিথিলতা দেখায়।"[১] পুরাতনতন্ত্র ভাঙিয়া দিয়া ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে সংবিধান এক প্রগতিশীল কাজ করে তাহাতে সন্দেহ নাই। ফ্রান্স হইতে স্বৈর শাসন, অভিজাততন্ত্র, সামন্ত শোষণ প্রভৃতি অন্যায় সংবিধান সভা দূর করে। কিন্তু পুরাতনতন্ত্র ধ্বংস করিয়া ইহার স্থলে নূতন ব্যবস্থা গড়ার কাজে বহু ত্রুটি দেখা দেয়। 'নাগরিকের অধিকার' ঘোষণার দ্বারা যদিও সকলের সমান অধিকারের কথা বলা হয়, কার্যক্ষেত্রে সকল নাগরিককে আইনসভার নির্বাচনে ভোটদানের অধিকার দেওয়া হয় নাই। সম্পত্তির ভিত্তিতে 'সক্রিয়' নাগরিকগণকে কেবলমাত্র ভোটাধিকার দেওয়ায় কেবলমাত্র বুর্জোয়া বা ধনিক শ্রেণীর প্রাধান্যই বজায় থাকে। দরিদ্র ও সর্বহারা শ্রেণী ভোটাধিকার না পাওয়ায় তাহাদের সমান অধিকারের দাবী নস্যাৎ হয়। ঐতিহাসিক টমসন এজন্য এই শাসনতন্ত্রকে "পাউণ্ড, শিলিং ও পেনীর" শাসনতন্ত্র বলিয়াছেন। মন্তেস্ক্যুর মতবাদকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া শাসন বিভাগকে আইন বিভাগ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক করার ফলে শাসন ব্যবস্থা অচল হইয়া পড়ে। শাসন বিভাগের বাস্তব প্রয়োজন মনে রাখিয়া আইনসভা আইন রচনা করিতে ব্যর্থ হয়। এদিকে আইনসভা দায়িত্বহীন ক্ষমতা পাইয়া ইহার অপব্যবহার করে। কথায় কথায় শাসন-কার্যে হস্তক্ষেপ করায় শাসন ব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়ে। আইনসভাই সংবিধানে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়। বুর্জোয়া শ্রেণী আইন সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাইয়া রাজাকে ক্ষমতাহীন রাখিয়া সকল ক্ষমতা নিজ হাতে নেয়। প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণকে ভোটের দ্বারা নিয়োগ করায় তাহাদের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ নষ্ট হয়। প্রাদেশিক শাসন কর্তারা নিজ নিজ এলাকায় প্রায় স্বয়ং-স্বাধীন হইয়া পড়েন। ফলে দেশের ঐক্য বিপন্ন হইয়া পড়ে। মিরাবু মন্তব্য করেন যে "দেশকে ভাঙিয়া দেওয়ার ইহা অপেক্ষা ভাল ব্যবস্থা

সংবিধানের ত্রুটি


মিরাবু

১. "The Constituent Assembly was quick to destroy but slow to construct". Rikar.

আর হইতে পারে না।"[১] চার্চকে জাতীয়করণ করায় ধর্মপ্রাণ লোকেরা খুবই অসন্তুষ্ট হন। ষোড়শ লুই ইহার তীব্র বিরোধীতা করেন। বিচারকগণকে নির্বাচনের দ্বারা নিয়োগ করায় বিচারকগণের নিরপেক্ষতা নষ্ট হয়। আইনসভার পুরাতন সভ্য পুনরায় নির্বাচিত হইতে নিষিদ্ধ হওয়ায় পুরাতন অভিজ্ঞ লোকের দ্বারা আইনসভা চালান সম্ভব হয় নাই। সর্বশেষে বলা যায় যে, অতি অল্পকালের মধ্যে এই সংবিধান অকার্যকরী প্রমাণিত হয়। মোট কথা এই সংবিধান কেবলমাত্র বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা দেয়। সাধারণ লোকে ভোটাধিকারে বঞ্চিত হইবার ফলে এই সংবিধান জন সমর্থন পায় নাই।

প্রথম আইনসভার শাসনকাল, ১৭৯১-৯২ খ্রীঃ জিরণ্ডিষ্ট দল (Legislative Assembly : The Girondists): ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে সংবিধান রচিত হইবার পর এই নূতন সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচনের ফলে আইনসভা বা লেজিসলেটিভ এ্যাসেম্বলী (Legislative Assembly) গঠিত হয়। নূতন আইনসভায় ৭৪৫ জন সভ্য ছিল। আইনসভার সভ্যগণ চারিটি দলে বিভক্ত ছিল যথা, (১) দক্ষিণপন্থী বা সংবিধানপন্থী দল। ইহারা সংবিধান মানিয়া চলার পক্ষপাতী ছিল। ইহারা সভার অধ্যক্ষের ডানদিকে বসিত বলিয়া ইহাদের নাম হয় (Rightist) বা দক্ষিণপন্থী। (২) মধ্যপন্থী বা মডারেটগণ সভার মধ্যস্থলে বসিত। ইহাদের নাম হয় সেণ্টার বা মধ্যপন্থী। (৩) জিরণ্ডিষ্ট (Girondist) ও (৪) জ্যাকোবিন (Jacobin) দল অধ্যক্ষের বামদিকে বসিত বলিয়া ইহাদের নাম হয় বামপন্থী (Leftist)।

আইনসভার ভিত্তি স্থাপন

১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে সংবিধানে ফ্রান্সে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু বামপন্থীগণ রাজতন্ত্র বজায় রাখার পক্ষপাতী ছিল না। তাহারা রাজতন্ত্রের স্থলে রুশোর মতবাদ অনুযায়ী প্রজাতন্ত্র স্থাপনের জন্য আগ্রহী ছিল। বামপন্থী দলের মধ্যে ছিল জিরণ্ডিষ্টগণ। ফ্রান্সের 'জিরণ্ড' প্রদেশ হইতে ইহাদের নেতাগণ নির্বাচিত হয় বলিয়া ইহাদের জিরণ্ডিষ্ট বলা হইত। লেজিসলেটিভ এ্যাসেম্বলী ও পরবর্তী আইনসভা ন্যাশন্যাল কনভেনসনে ইহারা জ্যাকোবিন অপেক্ষা দলে ভারী ছিল। জিরণ্ডিষ্ট দলের সভ্যগণ প্রধানতঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্গত ছিল। ইহারা সম্পত্তির অধিকার রক্ষা ও আইনের সাহায্যে পরিবর্তন আনিবার কথা ভাবিত। জ্যাকোবিনগণের তুলনায় ইহাদের বৈপ্লবিক উগ্রতা ছিল কম। মাদাম রোল্যাণ্ড, ব্রিসো, কনডরসেট প্রভৃতি ছিলেন জিরণ্ডিষ্ট দলের নেতা।

জিরণ্ডিষ্ট দলের উৎপত্তি

জিরণ্ডিষ্ট দল বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে ইওরোপের রাজতান্ত্রিক দেশগুলির সহিত যুদ্ধ কামনা করিত। জিরণ্ডিষ্টগণ মনে করিত যে ইওরোপের রাজতন্ত্রগুলির সহিত প্রজাতন্ত্রবাদী ফ্রান্সের মিত্রতা কোনমতেই সম্ভব নয়। যুদ্ধ বাধিলে এই সকল দেশে ফরাসী বিপ্লবের স্বাধীনতার আদর্শ প্রচারিত হইবে বলিয়া তাহারা মনে করিত। ফ্রান্সের রাজতন্ত্রকে ধ্বংস করিয়া প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা

বৈদেশিক নীতি

১. "The dis-organisation of the kingdom could not have been better planned."

জিরণ্ডিস্ট ও জ্যাকোবিন উভয় দল কাম্য বলিয়া মনে করিত। এজন্য তাহারা রাজা ষোড়শ লুইকে নানা হামলার দ্বারা উৎখাত করিবার চেষ্টা চালায়।

আইন সভার সহিত রাজার বিরোধ

লেজিসলেটিভ এ্যাসেম্বলি বা প্রথম আইনসভার শাসনকালে গীর্জার জাতীয়করণ আইনের প্রয়োগে অনেক বাধা দেখা দেয়। বহু ধর্মযাজক এই আইন মানিতে অস্বীকার করে। রাজা ষোড়শ লুই এই আইনের উপর ভিটো প্রয়োগ করায় জিরণ্ডিস্টগণ খুবই ক্ষুব্ধ হয়। তাহারা রাজাকে 'বিশ্বাসঘাতক' বলিয়া অভিহিত করে।

বামপন্থী দলগুলির উগ্রতায় ষোড়শ লুই প্রাণভয়ে ভীত হইয়া পড়েন। তিনি স্বদেশ হইতে পলাইতে সংকল্প নেন। সপরিবারে ছদ্মবেশ ধরিয়া অষ্ট্রিয়ার দিকে পলাইতে গিয়া ষোড়শ লুই ভেরেন্নে শহরে ধরা পড়েন। বহু অপমান ভোগ করিয়া আবার তাঁহাকে রাজধানীতে ফিরিতে হয়। এদিকে জিরণ্ডিস্টগণের সন্দেহ হয় যে, ষোড়শ লুই নিজ দেশের বিরুদ্ধে অষ্ট্রিয়ার সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন। অষ্ট্রিয়ার সম্রাট লিওপোল্ড ছিলেন রাজা ষোড়শ লুইয়ের শ্যালক। তিনি পিলনিৎসের ঘোষণার দ্বারা ষোড়শ লুই ও তাঁহার পরিবারের ক্ষতি না করিবার জন্য বিপ্লবী ফরাসী সরকারকে সতর্ক করিয়া দিলে ফ্রান্সের বিপ্লবীগণ রাগে অগ্নিশর্মা হইয়া উঠেন। পিলনিৎসের ঘোষণার প্রতিবাদে আইনসভা (১৭৯২ খ্রীঃ) অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ষোড়শ লুই ভিটো প্রয়োগ করিয়া এই সিদ্ধান্ত মুলতুবী রাখিবার চেষ্টা করিলে উগ্রপন্থী জনতা তাঁহার রাজপ্রাসাদে হামলা চালায়। ইতিমধ্যে প্রাশিয়ার সেনাপতি ব্রান্সউইক ঘোষণাপত্র (Brunswick Manifesto) দ্বারা জানাইয়া দেন যে ফরাসী রাজ পরিবারের নিরাপত্তা নষ্ট হইলে তিনি প্যারিস শহরকে ধ্বংস করিয়া দিবেন। অষ্ট্রো-প্রাশিয় সেনাদল ফ্রান্সের অভিমুখে আগাইতে থাকে।

বৈদেশিক যুদ্ধ ঘোষণা রাজতন্ত্র লোপ

ব্রান্সউইক ঘোষণা বিপ্লবী ফ্রান্সের অহংকারে আঘাত দেয়। এই ঘোষণার ফলে উগ্রপন্থীগণের রাজার প্রতি সন্দেহ বাড়ে। প্যারিসের উত্তেজিত জনতা মনে করে যে ষোড়শ লুই গোপনে শত্রুপক্ষের সহিত যোগ দিয়াছেন। জনতা রাজপ্রাসাদ টুইলারিজ অধিকার করিয়া রাজার সুইস দেহরক্ষী বাহিনীকে হত্যা করে। রাজা ও রাণী প্রাণভয়ে আইনসভায় আশ্রয় নেন। এদিকে জনতা আইনসভা অবরোধ করিয়া রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ দাবী করে। শেষ পর্যন্ত আইনসভা রাজতন্ত্রের অবসান ঘোষণায় বাধ্য হয়। রাজা ও রাণী কারাগারে বন্দী হন। জ্যাকোবিন ও জিরণ্ডিস্টগণ ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করে। ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হইলে ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দের সংবিধান ও প্রথম আইনসভা আইনতঃ বাতিল হয়। সুতরাং প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করিয়া নূতন সংবিধান রচনার জন্য আইনসভার নূতন নির্বাচন হয়। এই নির্বাচনের ফলে ন্যাশন্যাল কনভেনশন বা জাতীয় আইনসভা গঠিত হয়। রাজতন্ত্রের পতনের ফলে প্রথম আইনসভার অধিবেশন হয়। বিপ্লবের প্রথম পর্যায় শেষ হইয়া দ্বিতীয় পর্যায় আরম্ভ হয়।

ব্রান্সউইক ঘোষণা : রাজতন্ত্র লোপ

ফরাসী রাজতন্ত্রের অবসানের কারণ (Factors that led to the abolition of the Monarchy)ঃ বিপ্লবের প্রথম দিকে ফ্রান্সের জনগণ রাজতন্ত্রের উচ্ছেদের পক্ষপাতী ছিলেন। প্রথমদিকে স্বৈরাচারী শাসন, অভিজাত শ্রেণীর শোষণ ও সামন্ত প্রথা প্রভৃতির বিরুদ্ধেই বিক্ষোভ দেখা দেয়। সকলে মনে করে যে স্বেচ্ছাচারী শাসনের অবসান ঘটাইয়া ইংলণ্ডের ন্যায় দায়িত্বশীল রাজতন্ত্র স্থাপন করিলেই কাজ চলিবে। এমন কি দার্শনিক মন্তেস্ক্যুর মতামতও এ বিষয়ে তাহাদের প্রভাবিত করে। ফলে ১৭৯১ খ্রীঃ সংবিধানে দায়িত্বশীল রাজতন্ত্র ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়। কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যে বিপ্লবের গতি এত দ্রুত চলে যে লোকে রাজতন্ত্রের প্রতি আস্থা হারাইয়া ফেলে। ইহার পরিবর্তে প্রজাতন্ত্র স্থাপনের জন্য আগ্রহ দেখা দেয়। বিপ্লবের গোড়ার দিকে দার্শনিক মন্তেস্ক্যুর মতবাদ প্রভাবশালী হইলেও, ক্রমে রুশোর প্রজাতান্ত্রিক আদর্শ জনপ্রিয় হইয়া উঠে। জ্যাকোবিন দল রুশোর আদর্শে উদ্দীপ্ত হইয়া প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংকল্প নেয়। ইহার ফলে রাজতন্ত্রের পতন ঘনাইয়া আসে।

এছাড়া কয়েকটি বাস্তব কারণে রাজতন্ত্রের অবসান সূচিত হয়। (১) রাজা ষোড়শ লুই অনিবার্য পরিবর্তনকে তখনও স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি সিভিল কনষ্টিটিউশান অফ চার্চ বা গীর্জার জাতীয়করণ আইনের বিরোধিতা করিয়া লোকের অশ্রদ্ধা লাভ করেন। এইভাবে জনসাধারণের ইচ্ছা ও দাবীর বিরোধিতা করায় লোকে রাজতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা হারায়। (২) এমিগ্রে বা দেশত্যাগী অভিজাতরা বিদেশে ফ্রান্সের বিপ্লবী সরকারের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে। তাহারা দেশে রাজতন্ত্রের স্বৈর শাসন ফিরাইয়া আনিয়া তাহার আড়ালে অভিজাতদের লুপ্ত ক্ষমতা ফিরাইবার চেষ্টা চালায়। লোকে সন্দেহ করে যে এই সকল দেশত্যাগীর সহিত রাজার যোগাযোগ আছে। বিশেষতঃ ষোড়শ লুইয়ের ভ্রাতা ডিউক অফ আর্টোইস ছিলেন দেশত্যাগীদের নেতা। রাজা প্রকাশ্যে তাহাদের নিন্দা না করায় লোকের সন্দেহ বদ্ধমূল হয়। (৩) রাজা ভীত হইয়া দেশ হইতে পলাইবার চেষ্টা করিলে লোকে মনে করে যে তিনি বিপ্লবী সবকারের শত্রুদেশ অষ্ট্রিয়ার সাহায্য পাইবার চেষ্টায় আছেন। এদিকে তাঁহার শ্যালক অষ্ট্রিয়ারাজ ফরাসী বিপ্লবীদের সতর্ক করিয়া দিলে বিপ্লবী নেতাদের সন্দেহ বদ্ধমূল হয়। তাহারা মনে করে যে রাজা গোপনে বিপ্লবী সরকারের বিরুদ্ধে বিদেশীশক্তি যথা অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন। আসলে রাজা নির্দোষ ছিলেন। কিন্তু যতই অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া রাজার প্রাণরক্ষার জন্য তাহাদের হুমকী দেয় ততই ফ্রান্সের রাজার প্রতি লোকে বিদ্বেষী হইয়া উঠে। (৪) ইতিমধ্যে অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিপ্লবী ফ্রান্স হারিতে আরম্ভ করিলে সকল রাগ রাজার উপর পড়ে। কেহ কেহ বলে যে রাজা রণকৌশল শত্রুদের নিকট ফাঁস করিয়া দিতেছেন। জনসাধারণের এই ধারণাকে কাজে লাগাইয়া জ্যাকোবিন দল রাজতন্ত্র উচ্ছেদের কাজে নামিয়া পড়ে। ইহার ফলে রাজতন্ত্রের পতন ঘটে।

ন্যাশন্যাল কনভেনশন বা জাতীয় প্রতিনিধি সভা, ১৭৯২—৯৫ খ্রীঃ জ্যাকোবিন দল (National Convention : The

Jacobins) : ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হইলে নূতন আইন সভার জন্য প্রাপ্তবয়স্কের ভোটের ভিত্তিতে নির্বাচন করা হয়। এই ভোটে যে আইনসভা গঠিত হয় ইহার নাম হয় ন্যাশন্যাল কনভেনশন বা জাতীয় প্রতিনিধি সভা। এই সভাকে ফ্রান্সের প্রজাতন্ত্রী সংবিধান গঠন করিবার দায়িত্ব লইতে হয়। জাতীয় প্রতিনিধি সভার (National Convention) শাসনকালে ফরাসী বিপ্লবের সুদূর-প্রসারী অগ্রগতি ঘটে। জাতীয় প্রতিনিধি সভায় জিরণ্ডিষ্ট, জ্যাকোবিন প্রভৃতি বামপন্থী দলগুলি প্রাধান্য বিস্তার করে। জাতীয় প্রতিনিধি সভা প্রথমেই সরকারীভাবে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করে। রুশোর দার্শনিক মতবাদের প্রভাবে জিরণ্ডিষ্ট ও জ্যাকোবিন দল প্রজাতন্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ইহার পর প্রতিনিধি সভা রাজা ষোড়শ লুইয়ের বিচার আরম্ভ করে। উগ্রপন্থী জ্যাকোবিন দল রাজাকে দন্ড দিতে আগ্রহ জানায়। ফ্রান্সের শত্রু-দেশ অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে ষোড়শ লুইকে অভিযুক্ত করা হয়। তাছাড়া আইনসভার সদস্যগণকে উৎকোচদানের অভিযোগও তাঁহার বিরুদ্ধে আনা হয়। ১৭৯৩ খ্রীঃ ২১শে জানুয়ারী রাজার মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী করা হয়। তাঁহাকে হত্যার সময় ষোড়শ লুই যে ধীর স্থির ভাব ও আত্মমর্যাদা দেখান তাহা দ্বারা তিনি সকলের নিকট প্রশংসা লাভ করেন।

প্রজাতন্ত্র ঘোষণা : ষোড়শ লুইয়ের প্রাণদণ্ড

ইতিমধ্যে জিরণ্ডিষ্টগণের সহিত জ্যাবোবিন দলের তীব্র মতভেদ ঘটে। জিরণ্ডিষ্টগণ বৈদেশিক যুদ্ধের পক্ষপাতী ছিল। তাহারা মনে করিত যে ইহা দ্বারা ইওরোপে ফরাসী বিপ্লবের আদর্শ প্রচার করা সম্ভব হইবে। জ্যাকোবিন দল ছিল বৈদেশিক যুদ্ধের বিরোধী। দ্বিতীয়তঃ, জিরণ্ডিষ্ট দল আইন সঙ্গত পন্থায় কাজ করা পছন্দ করিত। অপরদিকে জ্যাকোবিনগণ মনে করিত যে জনসাধারণের ইচ্ছাই হইল আইন। সুতরাং প্যারিসের বিপ্লবী জনসাধারণের সাহায্যে তাহারা আইনসভার সিদ্ধান্তকে নাকচ করার চেষ্টা করে। ইতিমধ্যে বৈদেশিক যুদ্ধ আরম্ভ হয়। জিরণ্ডিষ্ট সেনাপতি ডুমারিয়ে এই যুদ্ধে পরাস্ত হইলে জিরণ্ডিষ্ট দলের জনপ্রিয়তা নষ্ট হয়। এই সযোগে, সন্ত্রাসের রাজত্বের সাহায্যে ও উগ্রপন্হী জনতার সাহায্যে জ্যাকোবিনগণ সংখ্যাগুরু জিরণ্ডিষ্ট-গণকে ১৭৯৩ খ্রীঃ আইনসভা হইতে বহিস্কার করিয়া আইনসভায় একচ্ছত্র ক্ষমতা লাভ করে।

রাজার প্রাণদণ্ডের প্রতিবাদে দক্ষিণ ফ্রান্সের লা ভেণ্ডি, লায়নস, বোর্দো প্রভৃতি স্থানে প্রজাতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দেয়। গোলমালের সুযোগ লইয়া এক শ্রেণীর লোক আইন ভঙ্গ, কর দানে অস্বীকৃতি ও সেনাদলে যোগদানে অসম্মতি জানায়। ফ্রান্সের সর্বত্র ঘোর অরাজকতা দেখা দেয়। এই অরাজকতাকে দমন করিয়া প্রজাতান্ত্রিক সরকারের কর্তৃত্ব স্থাপন করিবার জন্য জাতীয় প্রতিনিধি সভা একটি সংকটকালীন ব্যবস্থা গ্রহণ করে। উহা "সন্ত্রাসের রাজত্ব" বা রেইন অফ টেরর (Reign of Terror) নামে পরিচিত। জাতীয় প্রতিনিধি সভা কয়েকজন ব্যক্তির একটি নির্বাচিত সমিতিকে মাসিক ভিত্তিতে শাসন কার্য চালাইবার চূড়ান্ত দায়িত্ব

সন্ত্রাসের রাজত্ব গঠন

ও জনসাধারণের উপর দণ্ডমুণ্ডের ক্ষমতা দেয়। এই সমিতিতে ৯—১২ জন সভ্য থাকিত। এই নির্বাচিত সমিতির নাম হয় "জন নিরাপত্তা সমিতি" (Committee of Public Safety)। এই সমিতি তাহার অধীনস্থ বিভিন্ন সংস্থার (বিশদ বিবরণ পরে পৃষ্ঠা ৬০ দেখ) সাহায্যে দেশদ্রোহী, প্রতিবিপ্লবী ও সন্দেহভাজন ব্যক্তিগণকে আটক করিয়া প্রাণদণ্ড দেয়। ডাঃ গিলোটিন নামে এক ব্যক্তি পাইকারীহারে শিরচ্ছেদের জন্য একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। গিলোটিনের নাম অনুযায়ী এই যন্ত্রের নাম হয় গিলোটিন যন্ত্র। এই যন্ত্রের সাহায্যে বহু লোকের শিরশ্ছেদ করা হয়। ডাণ্টন বা দাঁতো (Danton) ছিলেন প্রথম দিকে সন্ত্রাসের প্রধান পরিচালক। পরে রোবসপিয়ের ইহার প্রধান পরিচালক হন। জ্যাকোবিন দল "সন্ত্রাসের রাজত্ব" দ্বারা সকল প্রকার বিদ্রোহ দমাইয়া দেয় এবং জনসাধারণকে বিপ্লবী সরকারের প্রতি আনুগত্য জানাইতে বাধ্য করে। রোবসপিয়েরের মৃত্যুর পর সন্ত্রাসের রাজত্বের অবসান হয়।

জ্যাকোবিন দল ও জাতীয় প্রতিনিধি সভার সংস্কার কার্য

জাতীয় প্রতিনিধি সভা এক হাতে সন্ত্রাস সৃষ্টি করিলেও অপর হাতে বহু বৈপ্লবিক সংস্কার ব্যবস্থা চালু করে। এক কথায় বিপ্লবের প্রকৃত কাজ এই প্রতিনিধি সভার আমলেই কিছুটা করা হয়। ১৭৯১ খ্রীঃ সংবিধানে বুর্জোয়া শ্রেণী, অভিজাতগণের হাত হইতে ক্ষমতা কাড়িয়া লইলেও জনসাধারণকে ক্ষমতার অংশীদার না করিয়া নিজহাতে তাহা রাখে। ন্যাশন্যাল কনভেনশন বা জাতীয় প্রতিনিধি সভা বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রাধান্য ধ্বংস করিয়া সর্বসাধারণের ভোটাধিকার ও সরকার গঠনের ক্ষমতা চালু করে। স্বদেশ-ত্যাগী অভিজাতগণের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া দরিদ্রগণের মধ্যে বিলি করা হয়। বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির জন্য জমিদারগণকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া নিষিদ্ধ করা হয়। খাদ্যদ্রব্যের উর্ধতম দাম বাঁধিয়া দেওয়া হয়। সকল শ্রেণীর লোককে সমান হারে কর দিতে বাধ্য করা হয়। পুরাতন ওজন ও মাপ উঠাইয়া দশমিক প্রথায় মাপ এবং দশমিক মুদ্রা চালু করা হয়। সমগ্র দেশের জন্য একই প্রকার আইন চালু করা হয়। নিগ্রো দাস প্রথা এবং ঋণ পরিশোধে অসমর্থ হইলে কোন ব্যক্তির কারাদণ্ড প্রথার লোপ করা হয়। রাষ্ট্র ও রাজনীতি হইতে ধর্মকে পৃথক করিয়া ধর্ম নিরপেক্ষতার আদর্শ চালু করা হয়। কোন লোকের জমকালো পোষাক পরা এবং কোন ব্যক্তিকে "মহাশয়" সম্বোধন করা নিষিদ্ধ করা হয়। বিপ্লবীগণের মতে এই প্রথা ছিল অভিজাততন্ত্রের প্রতীক। কাহাকেও মসিঁয়ে বা মহাশয় না বলিয়া "নাগরিক" বা Citizen বলিয়া সম্বোধন করার আদেশ দেওয়া হয়। ন্যাশন্যাল কনভেনশন একটি নূতন সংবিধানের খসড়া ১৭৯৩ খ্রীঃ রচনা করে। কিন্তু এই সংবিধান শেষ পর্যন্ত কার্যকরী করা সম্ভব হয় নাই।

বৈদেশিক নীতি

বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রেও ন্যাশন্যাল কনভেনশন উল্লেখযোগ্য কাজ করে। ফ্রান্সের বিপ্লবী সেনাদল ভল্মীর (Valmy) যুদ্ধে প্রাশিয়ার সেনাদলকে হঠাইয়া বেলজিয়ামে ঢুকিয়া পড়ে। অষ্ট্রিয়ানগণ বহুকাল ধরিয়া বেলজিয়ামগণের উপর রাজত্ব করিত। অষ্ট্রিয়ার কবলমুক্ত হইয়া বেলজিয়ামের অধি-বাসীগণ বিপ্লবী ফরাসী সেনাদলকে মুক্তিদাতা হিসাবে অভিনন্দন জানায়। ফরাসী নৌ

বাহিনী জোর করিয়া সেল্ট নদীর মোহানা খুলিয়া দেয়। ইহার ফলে বেলজিয়াম সমুদ্র-পথে বাণিজ্য করিবার সুযোগ পায়। এদিকে ফ্রান্সের ন্যাশন্যাল কনভেনশন বা প্রতিনিধি সভা "ভ্রাতৃত্বের ঘোষণা" (Edict of Fraternity) জারী করিয়া ইওরোপের জনসাধারণকে রাজতান্ত্রিক শাসন হইতে মুক্ত করার সংকল্প ঘোষণা করে। জনসাধারণকে "স্বাধীনতা, সাম্য ও গণতন্ত্র" লাভের জন্য সহায়তা দিতে ফ্রান্স আশ্বাস দেয়।

বিপ্লবী ফ্রান্স রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিলে এবং সেল্ট নদীর অবরোধ খুলিয়া দিলে ইওরোপের রাজতান্ত্রিক দেশগুলি রুষ্ট হয়। ইংলণ্ড, হল্যাণ্ড, স্পেন, সার্ডিনিয়া, অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া একযোগে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে "প্রথম শক্তি জোট" (First Coalition) (১৭৯২ খ্রীঃ) গঠন করে। ফরাসী প্রজাতন্ত্রকে উচ্ছেদ করা ছিল এই শক্তি জোটের লক্ষ্য। কিন্তু ফরাসী সেনাপতি কার্ণোত (Carnot) প্রাশিয়াকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া বাসেলের সন্ধি (১৭৯৫ খ্রীঃ) (Treaty of Basel) স্বাক্ষরে বাধ্য করেন। ফলে প্রাশিয়া যুদ্ধ ত্যাগ করে। স্পেনও ফ্রান্সের নিকট পরাস্ত হয়। কেবলমাত্র ইংলণ্ড ও অষ্ট্রিয়া অপরাজিত থাকে। এইভাবে জাতীয় প্রতিনিধি (National Convention) ফ্রান্সের বিপ্লবকে দৃঢ় ও শক্তিশালী করে।

প্রথম শক্তি জোটের সহিত যুদ্ধ

সন্ত্রাসের রাজত্ব ও উহার গুরুত্ব (The Reign of Terror and its importance)ঃ ন্যাশন্যাল কনভেনশন বা জাতীয় প্রতিনিধি সভার শাসনকালে বিপ্লবী ফ্রান্স এক সংকটের সম্মুখীন হয়। ইওরোপের প্রধান রাজতান্ত্রিক শক্তিগুলি প্রজাতন্ত্রী ফ্রান্সকে ধ্বংস করিবার জন্য "প্রথম শক্তি জোট" বা First Coalition গঠন করে। এই শক্তি জোটের সম্মিলিত আক্রমণের সম্মুখে বিপ্লবী ফরাসী সরকারের ঝড়ের আগে কুটার ন্যায় উড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা ছিল। ফ্রান্সের ভিতর বিপ্লবী সরকারের বিরুদ্ধে লা ভেন্ডি, লায়নস প্রভৃতি স্থানে প্রতি-বিপ্লব দেখা দেয়। প্রতিবিপ্লবীগণ প্রজাতন্ত্রকে ধ্বংস করিয়া রাজতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালায়। বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সের সাধারণ লোকের মধ্যেও আইন শৃংখলা না মানিবার প্রবণতা বাড়ে। লোকে নিজ ইচ্ছামত কাজ করিতে থাকে। সরকারকে কর দেওয়া বহু লোক বন্ধ করে। বিপ্লবী সরকারের আইনকে লোকে অগ্রাহ্য করে। দেশরক্ষার জন্য ফরাসী নাগরিকেরা সৈন্যদলে যোগ দিতে অস্বীকৃতি জানায়। ইহার ফলে ফ্রান্সে এক অরাজক অবস্থা দেখা দেয়। দেশের ভিতরে ও বাহিরে এই যুগপৎ সংকট দেখা দিলে ন্যাশন্যাল কনভেনশন জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে। ন্যাশন্যাল কনভেনশন একটি জরুরী অবস্থাকালীন শাসন ব্যবস্থাও গঠন করে। এই শাসন ব্যবস্থাকে সন্ত্রাসের রাজত্ব বা Reign of Terror বলা হয়। বিপ্লবী সরকারের নেতাগণ মনে করিতেন যে দেশে শৃংখলা স্থাপন করিতে না পারিলে বিপ্লবকে রক্ষা করা যাইবে না। দেশে শৃংখলা স্থাপনের জন্য দরকার হইলে নিষ্ঠুরতা ও কঠোরতা অবলম্বন করিতে হইবে। নতুবা জনসাধারণের মনে সরকারের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভয়ের উদ্রেক করা যাইবে না। এই সংকট সময়ে যাহারা বিপ্লবী সরকারের বিরোধিতা

ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সমস্যা : সন্ত্রাসের রাজত্বের উৎপত্তি

করিয়া জাতীয় একতা নষ্ট করিয়াছিল তাহাদের ধ্বংস করা উচিত মনে করা হয়। ডাণ্টন (Danton) বলেন যে "রাষ্ট্রের উচিত ভয়ঙ্কর হওয়া যাহাতে জনসাধারণ রাষ্ট্রের প্রতি ভয়ঙ্কর না হইতে পারে।"

জাতীয় প্রতিনিধি সভা নয় হইতে বার জনের একটি নির্বাচিত সমিতিকে ফ্রান্সে শাসন পরিচালনা ও শৃংখলা স্থাপনের জন্য চূড়ান্ত ক্ষমতা দান করে। এই সমিতির নাম হয় "জন নিরাপত্তা সমিতি" (Committee of Public Safety)। জন নিরাপত্তা সমিতি তাহার অধীনে "সাধারণ নিরাপত্তা সমিতি" (Committee of General Security), বিপ্লবী বিচার্যলয় (Revolutionary Tribunal) প্রভৃতি কার্যনির্বাহক পরিষদ গঠন করে। সাধারণ নিরাপত্তা সমিতি সন্দেহভাজন ব্যক্তিগণের তালিকা তৈয়ারী করিত এবং বিপ্লবী বিচারালয় তাহাদের বিচার করিত। "সন্দেহ ভাজনদের আইন" (Law of Suspects) অনুযায়ী রাজতন্ত্রের প্রতি অনুগত এই সন্দেহে যে কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা যাইত। সন্দেহভাজন ব্যক্তি গ্রেপ্তার হইলে সাধারণতঃ দণ্ডিত হইত। তাহাদের পক্ষে ছাড়া পাইবার সম্ভাবনা খুবই কম ছিল। বিচারাধীন ব্যক্তির প্রাণদণ্ড দেওয়া ছিল বিপ্লবী বিচারালয়ের চলতি ব্যবস্থা।

সন্ত্রাসের শাসনতন্ত্র



রোবসপিয়ের

১৭৯৩ খ্রীঃ হইতে ১৭৯৪ খ্রীঃ এই এক বৎসরকাল সন্ত্রাসের রাজত্ব ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। এই সময় জ্যাকোবিন নেতা রোবসপিয়ের ছিলেন সন্ত্রাসের পরিচালক। রাজতন্ত্রী সন্দেহে বহু লোককে গিলোটিনে হত্যা করা হয়। বহু মৃতদেহ প্যারিসের নিকটস্থ সীন নদীতে নিক্ষেপ করা হয়। ফলে সীন নদীর জল দূষিত হইয়া যায়।[১] গ্রামাঞ্চলেও বহু লোক নিহত হন এবং অনেকক্ষেত্রে নির্দোষীরাও সন্ত্রাসের কবলে প্রাণ দেন। রানী মেরী এ্যাণ্টওনেট, মাদাম রোল্যাণ্ড প্রভৃতির প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। প্রতিদ্বন্দ্বী জিরণ্ডিস্ট দলের বহু নেতা সন্ত্রাসের কবলে প্রাণ দেন। সন্ত্রাসের রাজত্বকালে জ্যাকোবিন নেতাগণের মধ্যে পরস্পরের প্রতি রেষারেষি দেখা দেয়। ফলে ডাণ্টন (Danton) প্রভৃতি বিখ্যাত বিপ্লবী নেতাগণ গিলোটিনে প্রাণ দেন। বিপ্লব এইভাবে নিজ সন্তানগণকে গিলিয়া ফেলে।[২] ডাণ্টনের মৃত্যুর পর রোবসপিয়ের সন্ত্রাসের প্রধান পুরুষ হইয়া দাঁড়ান। তাঁহার নির্দেশে বহু লোক নিহত হয়। কিন্তু তাঁহার বিরোধীদের নির্দেশে রোবসপীয়েরের প্রাণদণ্ত দেওয়া হয়। রোবসপিয়রের মৃত্যুর পর সন্ত্রাসের রাজত্বের অবসান হয়।

সন্ত্রাসের কার্যাবলী

১. Robinson and Beard—Documents of Modern European History. Vol. I.

২. "The Revolution devonred its own children".

সন্ত্রাসের রাজত্বের বিরুদ্ধে একথা বলা হয় যে ব্যক্তি-স্বাধীনতা স্থাপনের জন্য ফরাসী বিপ্লব হয়, সন্ত্রাসের রাজত্ব অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য সেই ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে গলা টিপিয়া হত্যা করে। সন্ত্রাসের রাজত্ব ছিল গণতান্ত্রিক আদর্শের বিরোধী। বিনা বিচারে এবং বিনা দোষে বেশ কিছু লোককে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। তাছাড়া বিপ্লবী নেতারা নিজ নিজ স্বার্থ পূরণের জন্য সন্ত্রাসকে ব্যবহার করেন। তাঁহারা মিথ্যা অজুহাতে প্রতিদ্বন্দ্বী নেতাদের নিহত করার জন্য সন্ত্রাসকে কাজে লাগান। এইভাবে মাদাম রোল্যাণ্ড, ডাণ্টন প্রভৃতির মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। ইহা ছিল নিকৃষ্ট অত্যাচার। সন্ত্রাসের রাজত্বের অত্যাচারের ফলে সারা ইওরোপে বিপ্লব সম্পর্কে এক ঘৃণা ও ভীতি দেখা দেয়। অনেকে মনে করে যে 'বিপ্লব' মানেই হইল অরাজকতা। বার্কের ন্যায় উদারপন্থী লোকেরাও সন্ত্রাসের রাজত্বের বিভীষিকায় হতাশা বোধ করেন।

সন্ত্রাসের রাজত্বের সমালোচনা

সন্ত্রাসের রাজত্বের পক্ষে বলা যায় যে ইহা ছিল একটি "আপতকালীন স্বৈরশাসন"।[1] বহিঃশত্রুর আক্রমণ, আভ্যন্তরীণ প্রতি-বিপ্লব, অরাজকতা এবং সাধারণ লোকের শৃংখলা-হীনতাকে দমন করিবার জন্য এছাড়া আর কোন পথ ছিল না। ডাণ্টন বলেন যে, "যদি স্বতঃ-প্রণোদিত হইয়া লোক সরকারের প্রতি আনুগত্য না জানায় তবে তাহাদের ভয় দেখাইয়া আনুগত্য দিতে বাধ্য করিতে হইবে।" স্বাধীনতাকে স্থায়ীভাবে রক্ষার জন্য কিছুদিনের জন্য, অস্থায়ীভাবে ব্যক্তি স্বাধীনতাকে বলি দিতে হয়। খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধিকারী, মুনাফা বাজ, কর ফাঁকিদাতা ও প্রতিষ্ঠা বিপ্লবীগণকে দমনের এছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। ফলে বিপ্লব রক্ষা পায়।[2] প্রগতিশীল সংস্কার প্রবর্তনে সন্ত্রাসের শাসন সহায়তা করে। কারণ সন্ত্রাসের শাসনকালেই একমাত্র Law of Maximum দ্বারা দ্রব্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ, দশমিক প্রথায় ওজন ও মুদ্রা, দেশত্যাগী অভিজাতগণের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা, ভূমিহীনগণের মধ্যে ভূমি বণ্টন, সকলকে নায্যহারে কর দানে বাধ্য করা প্রভৃতি প্রগতিশীল সংস্কার চালু করা সম্ভব হয়। এই সংস্কারগুলিই আসলে ফরাসী বিপ্লবের সুফল জনসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া দেয়।

সন্ত্রাসের রাজত্বের পক্ষে যুক্তি

সন্ত্রাসের প্রবর্তনের বিপ্লবের রক্ষা

অনেক লেখক সন্ত্রাসের শাসনের হত্যালীলাকে বাড়াইয়া বলেন। সাধারণ নিরীহ লোকেরা প্রধানতঃ সন্ত্রাসের কবলে পড়ে নাই। যে সকল লোক বিপ্লবী সরকারের বিরোধিতা করিত না সন্ত্রাস তাহাদের স্পর্শ করে নাই। দুএকজন নিরীহ লোক মারা পড়িলেও বেশীর ভাগ নিরীহ লোক নিরাপদে দিন যাপন করে। ঐতিহাসিক রবিনসন ও বিয়ার্ডের মতে সন্ত্রাসের রাজত্বে ফরাসীগণ আমোদ-আহ্লাদে দিন কাটাইত। অপেরা হলগুলি দর্শকে পূর্ণ থাকিত।

হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে অতিশয়োক্তি

---

১. Dictatorship of distress.

২. "The Terror saved the Revolution". Riker.

সন্ত্রাসের শাসনের প্রধান ত্রুটি এই ছিল যে সন্ত্রাসের প্রয়োজন ফুরাইয়া গেলেও রোবসপিয়েরের জেদে ইহা কিছুদিন চালান হয়। রোবসপিয়েরের ব্যক্তিগত ইচ্ছা পূরণের জন্য আরও অতিরিক্ত ১৩৭৬ জন ব্যক্তিকে অকারণে প্রাণ দিতে হয়। তাছাড়া ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা পূরণের জন্যও সন্ত্রাসের অপব্যবহার করা হয়। উপসংহারে বলা যায় যে সন্ত্রাসের রাজত্বের বহু ত্রুটি থাকিলেও ইহা বিপ্লব ও তাহার আদর্শকে রক্ষা এবং অরাজকতাকে দমন করে তাহাতে সন্দেহ নাই।

সন্ত্রাসের অপব্যবহার

ডাইরেক্টরীর শাসনকাল, ১৭৯৫-১৭৯৯ খ্রীঃ (The Directory)ঃ জাতীয় প্রতিনিধি সভা (National Convention) ১৭৯৫ খ্রীঃ এক সংবিধান রচনা করে। এই সংবিধানে পাঁচ জন ডাইরেক্টর বা পরিচালকের হাতে ফ্রান্সের শাসনভার দেওয়া হয়। ফ্রান্সে দুইকক্ষ বিশিষ্ট একটি আইনসভার ব্যবস্থা করা হয়। ডাইরেক্টরী বা পরিচালক সমিতির শাসনকালে প্রগতিবাদী বিপ্লবীগণের প্রভাব একেবারেই লোপ পায়। এক নূতন ধনিক শ্রেণী এই সময় প্রাধান্য লাভ করে। এই ধনিক শ্রেণী কনট্রাক্ট, ব্যবসায়, ফাটকাবাজী ও দুর্নীতির দ্বারা অর্থ লাভ করিয়াছিল।[১] এই নূতন ধনিক শ্রেণীর মধ্যে দার্শনিক মতবাদের প্রভাব দেখা যায় না। এই নূতন ধনিক শ্রেণীর সহিত ভূতপূর্ব জমিদার শ্রেণীও যোগ দেয়। ইহার ফলে পরিচালক সমিতির বা ডাইরেক্টরীর শাসন খুবই দুর্নীতিপূর্ণ হইয়া পড়ে।

ডাইরেক্টরী শাসনতন্ত্রঃ বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রাধান্য

ডাইরেক্টরী বা পরিচালক সমিতি শক্ত হাতে আইন-শৃংখলা স্থাপনের চেষ্টা চালায়। সন্ত্রাসের রাজত্বের সময় হইতে কিছুসংখ্যক চালচুলোহীন ভাবঘুরে গুণ্ডাদল সর্বত্র সন্ত্রাস সৃষ্টি করিয়াছিল। ডাইরেক্টরী বা পরিচালক সভা ইহাদের শায়েস্তা করে। ব্যাবেউফ (Babeuf) নামক জনৈক বিপ্লবী সাম্যবাদী সম্পত্তির পুর্ণবণ্টন, সম্পত্তির জাতীয়করণ প্রভৃতি আদর্শ প্রচার করেন। তিনি প্যান্থেয়ন ক্লাব (Pantheon Club) নামে এক দল গড়েন। ডাইরেক্টরীর নির্দেশে সেনাপতি হোসে (Hoche) এই দলকে দমন করেন। ক্লিসিয়ান্ দল (Clichian Party) নামে অপর একটি রাজনৈতিক দলও বিশৃংখলার সৃষ্টি করিতেছিল। ডাইরেক্টরী এই দলকে দমন করে।

বিদ্রোহ দমন

ফ্রান্সে মুদ্রাস্ফীতির ফলে জনসাধারণের কষ্টের অবধি ছিল না। মুদ্রাস্ফীতি রোধে ব্যর্থ হইয়া ডাইরেক্টরী সরকারী ঋণপত্র নাকচ করিয়া দেয় এবং এ্যাসাইন্যাট নামক কাগজের নোট বাতিল করিয়া দেয়। কিন্তু এত করিয়াও ডাইরেক্টরী শাসন ব্যবস্থাকে দৃঢ় করিতে বিফল হয়। ডাইরেক্টরীর সভ্যগণ নিজেরাই দুর্নীতিগ্রস্ত ছিলেন। এদিকে বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে ডাইরেক্টরীর অযোগ্যতা প্রমাণিত হয়।

ডাইরেক্টরীর দুর্নীতিময় শাসন

ডাইরেক্টরী শাসনকালে প্রথম শক্তিসংঘের অবশিষ্ট সদস্য অস্ট্রিয়া ও ইংলণ্ডের সহিত বিপ্লবী ফ্রান্সের যুদ্ধ চলিতে থাকে। ইতালীর রনাঙ্গনে নূতন পরিকল্পনায় অষ্ট্রিয়ার

১. Madelin—French Revolution.

বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইবার জন্য উদীয়মান সেনাপতি নেপোলিয়ন বোনাপার্টকে পাঠান হয়। নেপোলিয়ন নূতন রণকৌশল খাটাইয়া লোদী, আর্কোলা ও রিভোলীর যুদ্ধে অষ্ট্রিয় বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেন। অষ্ট্রিয়া শেষ পর্যন্ত ক্যাম্পোফোর্মিওর (Treaty of Campoformio) ১৭৯৭ খ্রীঃ সন্ধি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হয়। রাইন নদীকে ফ্রান্সের সীমানারূপে অষ্ট্রিয়া স্বীকার করে। ইতালীর পুনর্গঠন অষ্ট্রিয়া মানিয়া লয়। ইহার পর নেপোলিয়ন পোপের সেনাদলকে পরাজিত করেন। নেপোলিয়ন ইতালীর মুক্ত অঞ্চল লইয়া কয়েকটি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এই প্রজাতন্ত্রগুলিকে ফ্রান্সের তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করেন।

ইতালীর যুদ্ধ : নেপোলিয়নের জয়লাভ

ইতালী জয় করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিলে ফরাসী জনসাধারণ নেপোলিয়নকে অভূতপূর্ব সম্বর্ধনা জানায়। নেপোলিয়নের জনপ্রিয়তায় ঈর্ষা-কাতর ডাইরেক্টরগণ, তাঁহাকে ভূমধ্যসাগরের অপর পারে মিশর বা ইজিপ্ট জয়ের জন্য আদেশ দেন। নেপোলিয়নও আশা করেন যে মিশরের পথে ভারত আক্রমণ করা সহজ হইবে। ভারত ছিল ইংরাজের শক্তির উৎস। সুতরাং ইংরাজকে ভারত জয় করিয়া ভাতে মারা যাইবে। অপরদিকে পরিচালক সভার আশা ছিল যে মিশর অভিযানে নেপোলিয়ন ব্যর্থ হইলে তাঁহার জনপ্রিয়তা ধ্বংস হইবে। নেপোলিয়ন মিশরে নামিয়া পিরামিডের যুদ্ধে জয়লাভ করেন। কিন্তু ইংরাজ নৌ সেনাপতি নেলসন নীল নদের যুদ্ধে ফরাসী নৌবহর ধ্বংস করেন। ইহার ফলে ফ্রান্সের সহিত নেপোলিয়নের যোগাযোগ ছিন্ন হয়। ডাঙায় যেমন মাছ খাবি খায় নেপোলিয়ন সরবরাহের অভাবে সমুদ্রের অপর পারে সেইরূপ বিপাকে পড়েন। শেষ পর্যন্ত নেপোলিয়ন মিশর অভিযান ত্যাগ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসেন।

মিশর অভিযান

এদিকে পরিচালক সভার দুর্নীতিপূর্ণ শাসনে লোকে অতিষ্ঠ হইয়াছিল। নেপোলিয়ন এই সুযোগে ডাইরেক্টরী ভাঙিয়া দিয়া ১৭৯৯ খ্রীঃ ক্ষমতা অধিকার করেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নেপোলিয়ন ও ফরাসী বিপ্লব

(Napoleon and the French Revolution)

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট : প্রথম জীবন ও ক্ষমতা লাভ

(Napoleon Bonaparte : Early life and rise to power) : ইতিহাসে মাঝে মাঝে এমন ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায় যিনি নিজ ধীশক্তি ও কর্মক্ষমতার পরিচয় দিয়া ইতিহাসে স্থায়ী আসন লাভ করেন। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ছিলেন এইরূপ একজন ব্যক্তি। প্রাচীন রোমের জুলিয়াস সিজারের ন্যায় নেপোলিয়ন সামরিক শক্তিকে আশ্রয়

করিয়া ইতিহাসের প্রাঙ্গনে পা ফেলেন। ফ্রান্সের শাসন ক্ষমতা লাভ করিবার পর তিনি শাসন সংস্কার, যুদ্ধ জয়, বিপ্লবের আদর্শ বিস্তার, ইওরোপের পুনর্গঠণ প্রভৃতি মৌলিক কাজ করিয়া ইওরোপে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। নেপোলিয়ন ইওরোপের পুরাতনতন্ত্রকে ধ্বংস করিয়া ফেলেন। ঐতিহাসিক রেড্ডাওয়ের মতে, "যেখানেই নেপোলিয়নের সেনাদল যায় সেখানে আর আগের অবস্থা ফিরিয়া আসে নাই।[১]

ইতিহাসে নেপোলিয়নের স্থান

ভূমধ্যসাগরের কর্সিকা দ্বীপে একটি বনেদী পরিবারে ১৭৬৯ খ্রীঃ ১৫ই আগষ্ট নেপোলিয়নের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম ছিল চার্লস ও মাতার নাম ছিল লেটিসিয়া। কর্সিকা দ্বীপ ফ্রান্সের অধীনে আসায় নেপোলিয়ন ফরাসী নাগরিকত্ব লাভ করেন। তবে জন্মসূত্রে নেপোলিয়নের দেহে ইতালীর রক্ত ছিল। তাঁহার পূর্বপুরুষগণ ছিলেন ইতালীয় এবং তাঁহার মাতৃভাষা ছিল ইতালীয়। নেপোলিয়ন ফরাসী সামরিক কলেজে ছাত্র হিসাবে ভর্তি হন এবং অধ্যাপকগণের প্রশংসা পান। কিন্তু বংশ কৌলিন্য না থাকায় প্রথম দিকে তিনি সেনাবিভাগের সাধারণ লেফটন্যাণ্ট বা সহকারী পদে যোগ দেন।

প্রথম জীবন

নেপোলিয়নের মাতৃভূমি কর্সিকাকে ফরাসী সরকার দেশের অন্যান্য অংশের সহিত সমান মর্যাদা দিলে তিনি মনে প্রাণে ফরাসী সরকারের প্রতি আনুগত্য দেখান। নেপোলিয়ন ফরাসী দার্শনিকগণের রচনার সহিত পরিচিত ছিলেন। সুতরাং বিপ্লবের ভাবাদর্শের প্রতি তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ ছিল। জাতীয় প্রতিনিধি সভার (National convention) শাসনকালে ১৭৯৩ খ্রীঃ ইংরাজ নৌবহর ফ্রান্সের তুলোঁ বন্দরে অতর্কিত আক্রমণ চালায়। কিন্তু নেপোলিয়ন কামান দাগিয়া ইংরাজ নৌবহরকে হঠাইয়া দিলে সরকারের নিকট সম্মান পান। ১৭৯৫ খ্রীঃ এক উচ্ছৃংখল জনতা জাতীয় প্রতিনিধি সভার শাসনব্যবস্থাকে ধ্বংস করিবার জন্য প্যারিসে আক্রমণ চালায়। সেই সময় ফরাসী সেনাদল প্যারিস হইতে দূরে বৈদেশিক যুদ্ধে ব্যস্ত ছিল। নেপোলিয়ন অপূর্ব কৌশলে কামান দাগিয়া এই উচ্ছৃংখল জনতাকে ছত্রভঙ্গ করেন। ইহার ফলে দক্ষ সেনাপতিরূপে তিনি খ্যাতিলাভ করেন। তিনি ব্রিগেডিয়ারের পদে উন্নীত হন। ডাইরেক্টরী বা পরিচালক সভার শাসনকালে অন্যতম পরিচালক বা ডাইরেক্টর ব্যারাসের (Barras) সহিত তাঁহার পরিচয় হইলে নেপোলিয়নের চাকুরীতে উন্নতিলাভ সহজ হয়। এই সময় প্যারিসের সৌখীন সমাজে সুপরিচিতা জোসেফিন বুহার্নিস নামে এক সুন্দরী বিধবা ভদ্রমহিলার তিনি পাণিগ্রহণ করেন।

নেপোলিয়নের পদোন্নতি


নেপোলিয়ন বোনাপার্ট

১. "Wherever Napoleonic army went......things are not the same again." Reddaway.

নেপোলিয়নের সহিত যখন জোসেফিনের বিবাহ হয় তখন জোসেফিনের পূর্বতন বিবাহের সূত্রে এক পুত্র ও এক কন্যা ছিল।

ইতালীতে বিজয় অভিযান ; নেপোলিয়নের সামরিক প্রতিভার বিকাশ

এদিকে প্রথম শক্তিসংঘের (First Coalition) সভ্য অষ্ট্রিয়া ও সার্ডিনিয়ার সহিত বিপ্লবী ফরাসী সরকারের ঘোর যুদ্ধ চলিতেছিল। ইতালীয় রণাঙ্গণে ফরাসী বাহিনী অষ্ট্রিয় সেনাদলের হাতে মার খাইয়া হতবল হইয়া পড়ে। খাদ্য, পোষাক ও রসদের অভাবে সেনাদলের মনোবল ভাঙিয়া পড়ে। এই সংকটের সময় দেশরক্ষা মন্ত্রী যুদ্ধবিশারদ কার্ণোত, নেপোলিয়নকে ইতালীয় রণাঙ্গণে প্রধান সেনাপতি হিসাবে নিযুক্ত করেন। নেপোলিয়ন ইতালীতে তাঁহার সামরিক প্রতিভার প্রথম পরিচয় দেন। তিনি লোদী, উল্‌ম ও আর্কোলার যুদ্ধে সার্ডিনিয়া ও অষ্ট্রিয়ার বাহিনীকে পর্যুদস্ত করিয়া অষ্ট্রিয়ার সম্রাটকে ক্যাম্পোফোর্মিওর সন্ধি স্বাক্ষরে বাধ্য করেন। (বিস্তৃত শর্ত পূর্বে ৫৮ পৃঃ দেখ)। অষ্ট্রিয়া প্রথম শক্তিসংঘ ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়।

মিশর অভিযান

ইহার পর তিনি প্রথম শক্তিসংঘের অবশিষ্ট একমাত্র শক্তি ইংলণ্ডের দিকে নজর দেন। ভারতবর্ষ ছিল ইংলণ্ডের সম্পদ ও শক্তির উৎস। ভারতবর্ষ জয় করিলে ইংরাজের আস্ফালন বন্ধ হইবে একথা নেপোলিয়ন বুঝিতে পারেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি সসৈন্যে মিশরে অবতরণ করেন। নেপোলিয়নের উদ্দেশ্য ছিল মিশরের পথে আরবদেশ দিয়া ভারতে অভিযান করা। তিনি পিরামিডের যুদ্ধে মিশরীয়গণকে পরাজিত করেন। মিশরীয়গণকে স্বপক্ষে আনিবার জন্য তিনি প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার চর্চায় উৎসাহ দেন। নেপোলিয়নের নিযুক্ত প্রত্নতত্ত্ববিদগণ বিখ্যাত রসেটা প্রস্তর (Rosetta Stone) আবিষ্কার ও পাঠোদ্ধার করেন। যাহা হউক ইংরাজ সেনাপতি নেলসন নীলনদের যুদ্ধে ফরাসী নৌবহর ধ্বংস করিলে নেপোলিয়নের সহিত স্বদেশের সংযোগ ও সরবরাহ বিচ্ছিন্ন হয়। ডাঙ্গায় মাছ যেমন খাবি খায় সেইরূপ নেপোলিয়নের সেনাদল ফ্রান্স হইতে রসদ ও সরবরাহ না পাইয়া ধুঁকিতে থাকে। নেপোলিয়ন বাধ্য হইয়া মিশর অভিযান পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসেন।

কনস্যুলেট স্থাপন

স্বদেশে ফিরিবার পর তিনি জনমতকে স্বপক্ষে পান। এই সুযোগে তিনি ডাইরেক্টরী বা পরিচালক সভাকে পদচ্যুত করিয়া কনসুলেট নামক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। নেপোলিয়ন স্বয়ং প্রথম কনসালের পদ গ্রহণ করেন।

নেপোলিয়নের কনসাল হইতে সম্রাট পদ লাভ (From the Consulate to the Empire)ঃ ডাইরেক্টরী বা পরিচালক সভার পতন হইলে (১৭৯৯ খ্রীঃ) কনসুলেটের (Consulate) শাসন আরম্ভ হয়। কনসুলেটের শাসনতন্ত্র নেপোলিয়ন গণভোটে পাশ করাইয়া নেন। কনসুলেটের শাসন চালাইবার জন্য তিনজন কনসাল দশ বৎসরের জন্য নিযুক্ত হন। কনসালগণ আপাততঃ দশ বৎসরের জন্য কাজ করার দায়িত্ব পান। প্রথম কনসালের

কনস্যুলেটের শাসনতন্ত্র

নেপোলিয়ান কোন পর্যায়ে সম্রাট হন ?

হাতেই সর্বময় ক্ষমতা ন্যস্ত হয়। প্রথম কনসাল সেনাবিভাগ, বৈদেশিক দপ্তর ও আইনের খসড়া রচনারও দায়িত্ব পান। নেপোলিয়ন প্রথম কনসালের পদ গ্রহণ করেন। প্রথম কনসাল হিসাবে নেপোলিয়ন শাসন বিভাগের কর্ণধার হন। অপর দুইজন কনসাল তাঁহার সহকারী হিসাবে কাজ করিবার দায়িত্ব পান।

আইন সভা

কনসুলেটের শাসনতন্ত্রে আইন সভাকে চারিটি কক্ষে ভাগ করা হয়, যথা কাউন্সিল অফ ষ্টেট, ট্রিবিউনেট, লেজিসলেটিভ বডি এবং সেনেট। কাউন্সিল ও সেনেটের সভ্যগণ কনসালের দ্বারা মনোনীত হইতেন। লেজিসলেটিভ বডি ও ট্রিবিউনেটের সভ্যগণ পরোক্ষভাবে মনোনীত হইতেন। তবে নির্বাচনের দ্বারা সভ্য তালিকা প্রস্তুত হইত। তাহা হইতে তাঁহাদের মনোনীত করা হইত। কাউন্সিল অফ ষ্টেট প্রথম কনসালের পরামর্শ লইয়া আইনের খসড়া তৈয়ারী করিত, ট্রিবিউনেট এই খসড়া আলোচনা করিত, লেজিসলেটিভ বডি এই খসড়া গ্রহণে ভোট দিয়া সম্মতি বা অসম্মতি জানাইতে পারিত। আইনটি গৃহীত হইবার পর সিনেট ইহার বৈধতা পরীক্ষা করিত। যদি সিনেট মনে করিত যে ইহা বৈধ নয়, তবে ইহা নাকচ হইয়া যাইত। সিনেটের সভ্যগণ প্রথম কনসালের মনোনীত লোক ছিলেন। সুতরাং একমাত্র প্রথম কনসালের পরামর্শেই সিনেট চলিত। এইভাবে নেপোলিয়ন পরোক্ষ প্রভাব খাটাইয়া আইন সভাকে নিয়ন্ত্রণ করিতেন। আইন সভার আইন রচনার প্রকৃত স্বাধীনতা ছিল না।

প্রথম কনসালের ক্ষমতা

কনসুলেটের শাসনতন্ত্র আলোচনা করিয়া দেখা যায় যে ইহাতে আইনসভা থাকিলেও কার্যতঃ আইন রচনার সকল ক্ষমতা প্রথম কনসালের হাতে ছিল। তিনি ছিলেন একদিকে শাসন ক্ষমতার কর্ণধার। অপর দিকে বৈদেশিক নীতি, সমর বিভাগ, অর্থ বিভাগ ও বিচার বিভাগ তাঁহারই অঙ্গুলি হেলনে চলিত। তাছাড়া পরোক্ষভাবে তিনি আইনসভাকেও নিয়ন্ত্রণ করিতেন। সুতরাং প্রথম কনসাল প্রায় সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হন। ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম আদর্শ ছিল "Liberty" বা স্বাধীনতা বা গণতন্ত্র। কিন্তু কনসুলেটের শাসনতন্ত্রে প্রকৃতপক্ষে একনায়কতন্ত্র বা স্বৈরতন্ত্রই প্রতিষ্ঠিত হয়। নামে গণতন্ত্র রাখা হইলেও কার্যতঃ তাহা নস্যাৎ করা হয়।

কনসুলেটের অবসান সম্রাট পদগ্রহণ

ক্রমে নেপোলিয়ন নিজ ক্ষমতা আরও বাড়াইবার চেষ্টা করেন। তিনি দশ বৎসরের জন্য কনসালের পদকে যাবজ্জীবনের জন্য করার প্রস্তাব দেন। ১৮০২ খ্রীঃ গণভোটে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়। নেপোলিয়ন যাবজ্জীবন কনসাল পদ পান। নেপোলিয়নের উচ্চাকাঙ্খা ক্রমে বাড়িতে থাকে। কনসালের পদ অপেক্ষা বংশানুক্রমিক সম্রাট পদই তাঁহার কাম্য ছিল। অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ম্যারেঙ্গো (Marango) যুদ্ধ জয় করায় নেপোলিয়নের জনপ্রিয়তা আরও বাড়িয়া যায়। এই সময় নেপোলিয়নকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র হয়। এই সুযোগে নেপোলিয়ন জাতির নিকট প্রস্তাব দেন যে কনসালের পদ উঠাইয়া তাঁহাকে সম্রাট পদে নিযুক্ত করা হউক। প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ লোক এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিলে

নেপোলিয়ন ১৮০৪ খ্রীঃ সম্রাট উপাধি গ্রহণ করেন। এইভাবে বিপ্লবের চাকা পূর্ণ বেগে ঘুরিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসে। রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে ১৭৮৯ খ্রীঃ ফরাসী বিপ্লব আরম্ভ হয় এবং ১৮০৪ খ্রীঃ পুনরায় রাজতন্ত্র ফিরিয়া আসে।

নেপোলিয়নের সম্রাট পদ লাভের কারণ (Causes of Napoleon's election as Emperor) : ফরাসী বিপ্লবে রাজতন্ত্র ধ্বংস হয়। পুনরায় বিপ্লবী ফ্রান্স প্রজাতন্ত্রের স্থলে কেন নেপোলিয়নের রাজতন্ত্র গ্রহণ করে তাহা বিচার করা দরকার। নেপোলিয়ন কনসাল হিসাবে যে ক্ষমতা পান তাহা ছিল সম্রাট পদেরই নামান্তর। আজীবন কনসাল হিসাবে তিনি অনিবার্যভাবে সম্রাট পদ লাভের দিকে আগাইয়া চলেন। ইহারই স্বাভাবিক পরিণতি ছিল তাঁহার নিজেকে সম্রাট হিসাবে ঘোষণা। নেপোলিয়নের জীবনীকার ভিনসেণ্ট ক্রোনিন নেপোলিয়নের উচ্চাকাঙ্খার কথা বলিয়াছেন। নেপোলিয়নের ন্যায় উচ্চাকাঙ্খী লোক নিজেকে চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী না করিয়া থাকিতে রাজী ছিলেন না। দ্বিতীয়তঃ, নেপোলিয়ন বিপ্লবের অন্যতম আদর্শ Equality বা সাম্যের উপর তাঁহার শাসন সংস্কার স্থাপন করেন। সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিভেদ দূর করিয়া তিনি সাধারণ ফরাসীদের মনোহরণ করেন। বিপ্লবের কতকগুলি ভাল জিনিষকে স্থায়ী করিয়া তিনি তাহাকে আইনগত রূপ দেন। জন্ম কৌলিন্যের স্থলে কর্ম কৌলিন্যকে তিনি মর্যাদা দিয়া ফরাসী জাতির নিকট "বিপ্লবের সন্তান" বলিয়া পরিচিত হন। সুতরাং ফরাসীরা মনে করে নেপোলিয়নের শাসনে বিপ্লবের অন্ততঃ কিছু ভাল দিকগুলি স্থায়িত্ব পাইবে। তৃতীয়তঃ, ফ্রান্সে যে দুর্নীতি ও অরাজকতার বান ডাকে, নেপোলিয়ন তাহাকে দূর করিয়া শক্ত হাতে শাসন দণ্ড নেন। আইন শৃঙ্খলা ফিরাইয়া তিনি জাতির নিকট উপযুক্ত শাসক হিসাবে প্রতিষ্ঠা পান। এজন্য তাহারা তাঁহার সম্রাট পদ লাভে আপত্তি করে নাই। চতুর্থতঃ, ঐতিহাসিক রাইকার মনে করেন যে, সন্ত্রাসের রাজত্বের ভয়াবহ দিক ও ডাইরেক্টরীর দুর্নীতি শাসন সাধারণ লোকের মনে 'বিপ্লব' ও 'স্বাধীনতা' সম্পর্কে আগ্রহ নষ্ট করে। লোকে বিপ্লব, রক্তপাত ও দুর্নীতিতে ক্লান্ত হইয়া পড়ে ('People were tired of Revolution')। নেপোলিয়নের শক্ত শাসন ফ্রান্সে শান্তি ও স্থায়িত্ব আনিয়া দিবে বলিয়া তাহারা মনে করে। স্বাধীনতা বা গণতন্ত্র অপেক্ষা আইনের শাসন তাহারা আপাততঃ ভাল বলিয়া মনে করে। পঞ্চমতঃ, নেপোলিয়নের সামরিক যশ এবং তাঁহার ব্যক্তিগত প্রতিভা ফরাসীদের মোহিত করিয়াছিল। নেপোলিয়ন সমগ্র ইওরোপে ফ্রান্সের জয় পতাকা উড়াইয়া দিবেন এই ভাবনা ফরাসীদের গভীরভাবে প্রভাবিত করে। ইহার ফলে নেপোলিয়ন সহজে সম্রাট পদ লাভ করেন।

নেপোলিয়নের শাসন সংস্কার (Reforms of Napoleon) : নেপোলিয়ন বোনাপার্ট কেবলমাত্র প্রতিভাবান সমর-বিশারদরূপে ইতিহাসে আপন কীর্তি স্থাপন করেন নাই। শাসক, সংস্কারক ও সংগঠক রূপেও তিনি তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য তাঁহার জীবিতকালে ধ্বংস হয়, কিন্তু তাঁহার সংস্কারসমূহ তাঁহার কীর্তিকে অক্ষয় করিয়াছে। নেপোলিয়ন জানিতেন যে তরবারির সাহায্যে সিংহাসন লাভ করিলেও সংস্কার ও সুশাসনের দ্বারা তাহাকে স্থায়ী করিতে হয়।

তাঁহার ক্ষমতালাভের পূর্বেই ফ্রান্সের রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থায় পচন দেখা দেয়। বিপ্লবের নামে উচ্ছৃঙ্খলতা ফ্রান্সের জনজীবনকে বিপর্যস্ত করিয়া দিতেছিল। দুর্নীতি ও শৃঙ্খলতাহীনতা ফ্রান্সকে দ্রুত অবক্ষয়ের পথে লইয়া যাইতেছিল। নেপোলিয়ন বলেন যে "ফ্রান্স হইল একটি বিরাট গণতন্ত্র যাহাতে কোন শৃঙ্খলা নাই।"[১] নেপোলিয়ন উপলব্ধি করেন যে বিপ্লবকে জয়যুক্ত ও স্থায়ী করিতে হইলে রাষ্ট্রে শৃঙ্খলা স্থাপন একান্ত প্রয়োজন। বিপ্লবীগণের উগ্রপন্থী সংস্কার ফ্রান্সে যে অস্থিরতা সৃষ্টি করিয়াছে তাহাকে নিয়ন্ত্রণ না করিলে বিপর্যয় দেখা দিবে। পুরাতন ব্যবস্থার সহিত নূতন ব্যবস্থার সমন্বয়ের দ্বারা বিপ্লবকে স্থায়ীরূপ দিতে হইবে। তিনি বলেন যে, "গৌরবলিপ্সু ফরাসীগণ গৌরব পাইলে আর কিছু চাহে না।"[২]

শাসন সংগঠনের উদ্দেশ্য

ফরাসী বিপ্লবের তিনটি আদর্শ সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার মধ্যে তিনি স্বাধীনতার আদর্শকে বর্জন করেন। ইহার পরিবর্তে তিনি সাম্যের (Equality) আদর্শকে কার্যকরী করার চেষ্টা করেন। স্বাধীনতা কথাটির অর্থ ছিল ফরাসী জনগণের গণতান্ত্রিক শাসনের অধিকার। সন্ত্রাসের রাজত্বের যুগ হইতে স্বাধীনতার অপব্যবহার হওয়ায় ফ্রান্সে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। নেপোলিয়নের লক্ষ্য ছিল একটি কেন্দ্রীভূত উদারতান্ত্রিক স্বৈরশাসন প্রতিষ্ঠা। এজন্য তিনি স্বাধীনতার আদর্শকে বর্জন করেন। তিনি বলেন যে "ফরাসী জনগণ সাম্য চায়, স্বাধীনতা চায় না।"[৩]

সাম্যনীতি স্থাপন ও স্বাধীনতা নীতির অবলোপ

কেন্দ্রীভূত শাসন প্রবর্তন এবং নিজহস্তে সকল ক্ষমতা গ্রহণের জন্য তিনি কয়েকটি ব্যবস্থা করেন। প্রথম কনসালরূপে ও পরে সম্রাটরূপে নেপোলিয়ন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হন। কর্মচারী নিয়োগ, সেনাবিভাগ নিয়ন্ত্রণ, দেশরক্ষা, বৈদেশিক নীতি, শাসন সংগঠন, আইন রচনার প্রস্তাব, আইন সভার সভ্য মনোনয়ন প্রভৃতি সকল ক্ষমতাই প্রথম কনসালের হাতে থাকে। (বিশদ বিবরণ পূর্বে ৬৬ পৃঃ দেখ)। নেপোলিয়ন নির্বাচনের মাধ্যমে সরকারী কর্মচারী নিয়োগের বৈপ্লবিক প্রথা উঠাইয়া দেন। কর্মচারীদের নির্বাচনের বদলে মনোনয়ন ব্যবস্থা চালু করা হয়। কর্মচারী নিয়োগের ভার প্রথম কনসালের হাতেই থাকে। প্রাদেশিক গভর্ণর, প্রিফেক্টগণ তাঁহাদের কাজের জন্য প্রথম কনসালের নিকট দায়িত্ববদ্ধ থাকেন। প্রাদেশিক ও পৌরসভাগুলি বিপ্লবের সময় স্বায়ত্ব শাসনের যে সকল ক্ষমতা পাইয়াছিল তাহা লোপ করা হয়। প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসনের অধিকার লোপ করা হয়। ফলে প্রদেশগুলিতে কেন্দ্রের ক্ষমতা বিস্তৃত হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের শীর্ষদেশে বসিয়া নেপোলিয়ন সমগ্র দেশকে নিয়ন্ত্রণে আনেন। এই ভাবে নেপোলিয়ন "স্বাধীনতা" বা স্বায়ত্ব শাসনের অধিকার লোপ করেন।

কেন্দ্রীভূত শাসন গঠন ও মনোনয়ন ব্যবস্থা প্রচলন

---

১. "France is a vast democracy which has no discipline."

২. "Give them glory. They want nothingelse."

৩. "What the French people want is equality not liberty."

নেপোলিয়ন তাঁহার সমাজ সংস্কারের দ্বারা 'সাম্য' নীতিকে কার্যকরী করেন। বিপ্লবের আমলে অভিজাত শ্রেণীর বিশেষ অধিকার ও জমিদারী প্রথা বিলোপ প্রভৃতি হয়, বিপ্লবের আমলের আইনগুলি তিনি বজায় রাখেন। সরকারী ও সেনাবিভাগের পদে নিয়োগের জন্য যোগ্যতাকেই একমাত্র মূল্য দেওয়া হয়। বংশমর্যাদা ও অর্থবলকে মাপকাঠি না ধরিয়া যোগ্যতাকে মাপকাঠি গণ্য করিবার জন্য আইন করা হয়। কোড নেপোলিয়ন নামে এক আইন বিধি প্রচলন করিয়া সমাজে সাম্যকে প্রতিষ্ঠা করা হয়। কোড নেপোলিয়ন অনুযায়ী আইনের চক্ষে সকলকে সমান অধিকার দেওয়া হয়। ব্যক্তি স্বাধীনতা, সম্পত্তির অধিকার, সামাজিক সাম্য, ধর্মসহিষ্ণুতা, পারিবারিক শৃঙ্খলা প্রভৃতি সম্পর্কে আইন কোড নেপোলিয়নে রাখা হয়। রেজিষ্ট্রি বিবাহ ও ডাইভোর্স প্রথাও ইহাতে স্বীকৃত হয়।

সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা : কোড নেপোলিয়ন

নেপোলিয়ন কর ব্যবস্থার সংস্কার করেন। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীগণের দ্বারা কর আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। বাড়তি কর রহিত করা হয়। মুদ্রা ব্যবস্থার সংস্কার করিয়া দশমিক মুদ্রা ও মাপকে গ্রহণ করা হয়। ব্যাংক অফ ফ্রান্স প্রতিষ্ঠা করিয়া ১৮০০ খ্রীঃ এই ব্যাংকের হাতে মুদ্রা ব্যবস্থার দায়িত্ব দেওয়া হয়। এই ব্যাংক হইতে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীগণকে কম সুদে ঋণ দেওয়ার বিধি চালু করা হয়। নেপোলিয়নের অর্থনৈতিক সংস্কারের ফলে ফ্রান্সে স্বচ্ছলতা ফিরিয়া আসে। ১৭৮৯ খ্রীঃ একজন ফরাসী কৃষক ১০০ ফ্রাঁ রোজগার করিলে ১৯ ফ্রাঁ সঞ্চয় করিতে পারিত। নেপোলিয়নের আমলে জিনিষ-পত্রের দাম কমায় ১০০ ফ্রাঁর মধ্যে ৭৯ ফ্রাঁ লোকের হাতে জমে।

অর্থ নৈতিক সংস্কার

নেপোলিয়ন বহু জনহিতকর কাজও করেন। প্রাথমিক, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও লাইসি (Lycee) নামক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনর্গঠন করিয়া নূতন পাঠক্রম চালু করা হয়। কারিগরী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। ছাত্রগণের মনে দেশপ্রেম, কনসালের প্রতি আনুগত্য ও শৃঙ্খলাবোধ জাগাইবার দিকে নজর দেওয়া হয়। রাস্তাঘাট নির্মাণ, বেকার সমস্যার সমাধানের দিকেও নজর দেওয়া হয়।

জনহিতকর কাজ

নেপোলিয়নের অন্যতম উল্লেখযোগ্য সংস্কার ছিল কনকর্ডাট ১৮০১ খ্রীঃ (Concordat) স্থাপন। প্রথম সংবিধান সভা চার্চকে রাষ্ট্রায়ত্ত করায় পোপের সহিত বিবাদ বাধে। নেপোলিয়ন কনকর্ডাট বা মীমাংসা চুক্তি দ্বারা স্থির করেন যে—(১) পোপ চার্চের সম্পত্তির জাতীয়করণ মানিয়া লইবেন। (২) রাষ্ট্র বিশপগণকে মনোনয়ন করিবার পর পোপ তাঁহাদের নিযুক্ত করিবেন। (৩) ধর্মযাজকগণকে রাষ্ট্র বেতন দিবে। (৪) ক্যাথলিক ধর্মমতকে রাষ্ট্র জাতীয় ধর্ম হিসাবে স্বীকার করিবে। কনকর্ডাট স্বাক্ষরের ফলে ধর্ম ব্যবস্থায় শান্তি ফিরিয়া আসে। নেপোলিয়ন লিজন অফ অনার (Legion of honour) নামে খেতাব দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করেন।

কনকর্ডাট বা পোপের সহিত চুক্তিনামা

নেপোলিয়নের শাসন সংস্কার সম্পর্কে ঐতিহাসিক ফিশার মন্তব্য করিয়াছেন যে, "নেপোলিয়নের রাজ্যজয় ক্ষণস্থায়ী হইলেও তাঁহার অসামরিক সংস্কারগুলি গ্রানাইট পাথরের ভিত্তির উপর তৈয়ারী হয়।"[১] এই সংস্কারের দ্বারা তিনি পুরাতনতন্ত্রের মঙ্গলজনক ফলগুলির সহিত বিপ্লবের আমলের নবতন্ত্রের সমন্বয় সাধন করেন। ইহার ফলে ফ্রান্সে তথা ইওরোপে এক প্রগতিশীল ব্যবস্থা গড়িয়া উঠে। নেপোলিয়নের প্রতিভার শ্রেষ্ঠ স্বাক্ষর হিসাবে তাঁহার সংস্কারকে ধরা হয়। ইওরোপ বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে নেপোলিয়ন তাঁহার সংস্কারগুলি বিজিত দেশে চালু করায় ঐ সকল দেশের পুরাতন ব্যবস্থার ভিত ধসিয়া পড়ে। এজন্য রেড্ডাওয়ে মন্তব্য করিয়াছেন যে "যেখানেই নেপোলিয়নের সেনাদল গিয়াছিল সেখানেই আর আগের অবস্থা ফিরাইয়া আনা যায় নাই।"[২]

নেপোলিয়নের শাসন সংস্কারের গুরুত্ব

নেপোলিয়ন নিজে তাঁহার সংস্কারের গুণ ও ত্রুটি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তিনি বলেন যে, "আমি বিপ্লবের বরপুত্র ঃ আমি বিপ্লবকে ধ্বংস করিয়াছি"।[৩] অর্থাৎ ফরাসী বিপ্লবেব "স্বাধীনতা"র আদর্শকে বিসর্জন দিয়া তিনি যে স্বৈরতন্ত্র খাড়া করেন তাহার ফলে বিপ্লবের মূলনীতি বিনষ্ট হয়। অপরদিকে ফরাসী বিপ্লবের সাম্যনীতিকে গ্রহণ করিয়া তিনি বিপ্লবকে অংশতঃ রক্ষা করেন। ঐতিহাসিক ফিশারের মতে নেপোলিয়ন ছিলেন "বিপ্লবের সন্তান"।[৪] বিপ্লব না ঘটিলে তাঁহার ন্যায় সাধারণ লোক কখনও ফ্রান্সের শাসকের পদ পাইত না। তিনি সামাজিক সাম্য, সমান অধিকার প্রভৃতি দার্শনিকগণের ভাবধারার সহিত পরিচিত ছিলেন। তাঁহার সংস্কারের দ্বারা এই ভাবধারাকে তিনি স্থাপন করেন। কিন্তু বাস্তব প্রয়োজনে তিনি স্বাধীনতাকে বাদ দিয়া স্বৈরতন্ত্র কায়েম করেন। রাইকারের মতে "স্বৈরতন্ত্রের রথের চাকায় তিনি বিপ্লবের ঘোড়াকে যুড়িয়া দেন।"[৫] তবে নেপোলিয়ন স্বৈরাচারী শাসক হইলেও তাঁহার শাসন ছিল কার্যকরী ও দক্ষ। ডেভিড টমসনের মতে, "নেপোলিয়নের শাসন ছিল হিতকর, দক্ষ, পরিশ্রমী ও দৃঢ়" (The dictatorship of Napoleon in France was a utilitarian, efficient, industrious hard-headed government)।

স্বৈরতন্ত্র স্থাপন ও বিপ্লবের মূল্যবোধের প্রতি উদাসীনতা

নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য নীতি (The principles behind the Conquests of Napoleon) ঃ "১৭৯৯ খ্রীঃ হইতে ১৮১৪ খ্রীঃ পর্যন্ত ইওরোপের ইতিহাস হইল নেপোলিয়নের কর্মমুখর জীবনের কাহিনী।"[৬] প্রকৃতপক্ষে এই যুগের

১. "If the conquests of Napoleon were ephemiral, his civilian work in France was built upon granite." Fisher.

২. "Wherever Napoleonic army went, things were not the same again."

৩. "I am the Revolution ; I destroyed the Revolution."

৪. "Napolenn was the child of Revolution." Fisher.

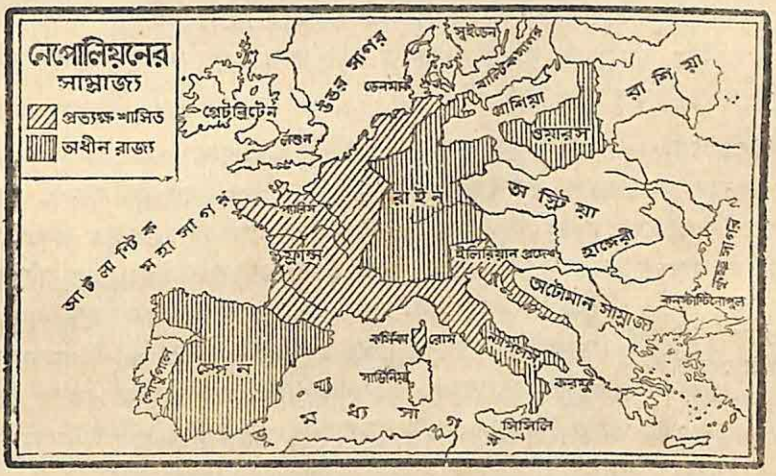
৫. "Napoleon harnessed the Revolution to the chariot of autocracy."

৬. "From 1799—1814 the history of Europe was the history of Fraace and the history of France was the biography of Napoleon Bonaparte". Reddaway.

ইওরোপের ইতিহাসকে "নেপোলিয়নের যুগ" (Age of Napoleon) বলা হয়।

নেপোলিয়নের যুগ : সাম্রাজ্যের মাধ্যমে বিপ্লবের বিস্তার

ফ্রান্সের রাষ্ট্র ব্যবস্থার কর্ণধার হইবার পর নেপোলিয়ন তাঁহার অসাধারণ রণ-পাণ্ডিত্য লইয়া ইওরোপ বিজয়ে দৃষ্টি দেন। ইওরোপের অধিকাংশ দেশগুলি একে একে তাঁহার অধীনতা অথবা "বশ্যতামূলক মিত্রতা" গ্রহণে বাধ্য হয়। নেপোলিয়নের এই বিজয় তাঁহাকে ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমর নায়কের মর্যাদা দিয়াছে। নেপোলিয়নের রাজ্য বিস্তার নীতির উদ্দেশ্য সম্পর্কে পাণ্ডিতেরা নানা প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন। কেহ কেহ মনে করেন যে নেপোলিয়ন ইওরোপে ফরাসী বিপ্লবের নবজাত ভাবধারাকে প্রচার ও



স্থাপন করিবার জন্যই সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। নেপোলিয়নের তরবারি ছিল আসলে বিপ্লবের অগ্নিময় তরবারি। তিনি বিজিত দেশে বৈপ্লবিক সংস্কার চালু করিয়া পুরাতন ব্যবস্থাকে ধ্বসাইয়া দেন। জার্মানী, ইতালীর জনগণ তাঁহাকে মুক্তিদাতা বলিয়া অভিনন্দন জানায়।

ফিশারের মতামত : বিপ্লবকে সাম্রাজ্যের স্বার্থে ব্যবহার

উপরোক্ত অভিমতকে ঐতিহাসিক ফিশার খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহার মতে নেপোলিয়ন বিজিত দেশের স্বাধীনতা হরণ করেন। তিনি যে শাসনতন্ত্র প্রবর্তন করেন তাহা দমনমূলক ও স্বৈরাচারী ছিল। নেপোলিয়ন বিজিত দেশের দরিদ্র শ্রেণীকে নিজপক্ষে আনিবার জন্য কিছু কিছু সংস্কার করেন। কিন্তু এই দেশগুলিকে তিনি ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী শোষণ হইতে মুক্তি দেন নাই। যুদ্ধের জন্য এই দেশগুলি হইতে অর্থ, সম্পদ ও জনবল তিনি ব্যবহার করেন। ডেভিড টমসন নামক ঐতিহাসিক মনে করেন যে নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য এই সকল আভ্যন্তরীণ বৈষম্যের জন্যই ধ্বংস হয় (The Napoleonic Empire was doomed because of its inherent and self-defeating contradictions)।

আসলে নেপোলিয়নের রাজ্যবিস্তার নীতি তাঁহার ক্ষমতাপ্রিয়তার নামান্তর মাত্র।

আলেকজাণ্ডার, সিজার প্রভৃতির ন্যায় বিজেতারূপে ইতিহাসে তাঁহার নাম অক্ষয় রাখিবার বাসনা তিনি পোষণ করিতেন। তবে তিনি সাধারণ রাজ্যলোভী বিজেতা ছিলেন না। তিনি রাজ্যজয়ের সহিত বিপ্লবের বাণীও ছড়াইয়া দেন। যে দেশেই নেপোলিয়নের ঈগল চিহ্নিত পতাকা উড়ে সে দেশেই নবজীবনের সঞ্চার হয়। নেপোলিয়নের ইওরোপীয় নীতির শোষণমূলক দিক শেষের দিকে প্রকাশিত হইলেও ইহার মঙ্গলজনক দিক ছিল ইহাতে সন্দেহ নাই। নেপোলিয়নের রাজ্যবিস্তার নীতির ফলে ইওরোপীয় জাতীয়তাবাদ শক্তিশালী হয়। তিনি ইতালী ও জার্মানীর যে পুনর্গঠন করেন তাহার ফলে পরোক্ষভাবে ইতালীয় ও জার্মান জাতীয়তাবাদ জোরদার হয়। নেপোলিয়নের পতনের পরেও তাঁহার নির্মিত রাস্তাঘাট, শহরের রাস্তায় আলোক স্তম্ভ, কোড নেপোলিয়ন ও সামাজিক সাম্য প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে স্থায়ী হইয়া যায়।

সাম্রাজ্যবাদের সহিত সমন্বয়। জাতীয়তাবাদের জাগরণ

ইওরোপে নেপোলিয়নের রাজ্যবিস্তার (Conquest of Europe)ঃ নেপোলিয়ন কনসাল পদ গ্রহণ করিয়াই বৈদেশিক নীতির দিকে নজর দেন। দ্বিতীয় ইওরোপীয় শক্তিজোটের সহিত তখনও বিপ্লবী ফ্রান্সের যুদ্ধ চলিতেছিল। নেপোলিয়ন কূটনীতি দ্বারা রাশিয়াকে যুদ্ধ ত্যাগ করাইতে সক্ষম হন। ইহার ফলে অষ্ট্রিয়া ও ইংলণ্ডকে যুদ্ধ চালাইতে হয়। নেপোলিয়ন তাঁহার নূতন রণকৌশল খাটাইয়া অষ্ট্রিয়াকে ১৮০০ খ্রীঃ ম্যারেঙ্গো (Marango) ও হোহেনলিণ্ডেনের (Hohenlinden) যুদ্ধে পরাস্ত করেন। হতোদ্যম অষ্ট্রিয়া ইহার ফলে ১৮০১ খ্রীঃ লুনভিলের সন্ধি (Treaty of Luneville) করিয়া যুদ্ধ ত্যাগ করে। ব্রিটিশ সরকার এককভাবে ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধ অসম্ভব দেখিয়া ১৮০২ খ্রীঃ এ্যামিয়েন্সের সন্ধি (Treaty of Amiens) স্থাপন করিয়া ফ্রান্সের সহিত শান্তি প্রতিষ্ঠা করে। এই সন্ধির দ্বারা সিংহল ও ত্রিনিদাদ ব্যতীত ফ্রান্সের সকল স্থান ইংলণ্ড ফিরাইয়া দেয়। ইওরোপ মহাদেশে ফ্রান্স যে সকল স্থান অধিকার করে যথা বেলজিয়াম প্রভৃতি তাহা কার্যতঃ ইংলণ্ড স্বীকার করিয়া নেয়।

দ্বিতীয় শক্তিসংঘ ধ্বংস এ্যামিয়েন্সের সন্ধি

এ্যামিয়েন্সের সন্ধি বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই। প্রজাতন্ত্রবাদী, বিপ্লবী ফ্রান্সের সহিত রাজভক্ত ইংলণ্ডের মনের মিল ছিল না। তাছাড়া উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক দ্বন্দ্ব ছিল। তাছাড়া ইংলণ্ডের নেতারা মনে করেন যে এই সন্ধির দ্বারা ইংলণ্ডের ক্ষতি হইয়াছে। ফলে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে চক্রান্ত আরম্ভ হয়। নেপোলিয়ন উপলব্ধি করেন যে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করিয়া ইংলণ্ড আক্রমণ না করিলে ইংলণ্ডকে পরাজিত করা যাইবে না। এই উদ্দেশ্যে তিনি এক বিরাট নৌ বাহিনী গঠন আরম্ভ করেন।

ইংলণ্ড অভিযানের ইচ্ছা

ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী উইলিয়াম পিট এই বিপদের মোকাবিলা করিবার জন্য প্রভূত অর্থ সাহায্য দিয়া অষ্ট্রিয়া, রাশিয়া ও সুইডেনের সহিত তৃতীয় শক্তি জোট (Third Coalition) গঠন করেন। অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়া একযোগে ফ্রান্সকে আক্রমণের তোড়জোড় করিলে নেপোলিয়ন বিদ্যুৎগতিতে অষ্ট্রিয়ার উপর ঝাঁপাইয়া পড়েন। তিনি উলমের

যুদ্ধে (১৮০৫ খ্রীঃ) (Battle of Ulm) অষ্ট্রিয়ার সেনাদলকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেন। নেপোলিয়ন অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে জয়লাভ করিলেও ব্রিটিশ নৌ শক্তির নিকট তাঁহার পরাজয় ঘটে। নেকড়ে যেমন ক্ষিপ্রতার সহিত শিকারের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে, ইংরাজ নৌ সেনাপতি নেলসন ট্রাফালগারে ফরাসী নৌবহরকে দেখিতে পাইয়া ইহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়েন। উন্নত রণকৌশল ও অভিজ্ঞ নাবিকের সাহায্যে নেলসন ফরাসী নৌবহরকে ট্রাফালগারের যুদ্ধে ধ্বংস করিয়া ফেলেন। সমুদ্রের অতল গভীরতায় ফরাসী নৌবহরের সমাধি হয়। ইংরাজ সেনাপতি নেলসন এই যুদ্ধে প্রাণ হারান। মৃত্যুর পূর্বে ইংলণ্ডের জয়লাভের সংবাদ পাইয়া তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলেন যে "এখন ব্রিটেন নিরাপদ হইল"।[১] ট্রাফালগারের নৌ যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে নেপোলিয়নের ভাগ্যরবিও ঢলিয়া পড়ে।

ইংলণ্ডের অস্ত্ররক্ষা—তৃতীয় শক্তিসংঘ গঠন

ট্রাফালগারের নৌযুদ্ধে ফ্রান্সের পরাজয়

নেপোলিয়ন বিপদের সময় ধীর ও স্থির হইয়া কাজ করিতে জানিতেন। তিনি অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়ার যুগ্ম বাহিনীকে অষ্টারলিজের যুদ্ধে (Battle of Austerlitz) শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করেন। অষ্টারলিজের পরাজয়ের ধাক্কায় তৃতীয় শক্তি জোট ভাঙিয়া যায়। অষ্ট্রিয়া, প্রেসবার্গের সন্ধি (১৮০৫ খ্রীঃ) (Treaty of Pressburg) দ্বারা ফ্রান্সের সহিত শান্তি স্থাপন করেন। অষ্টারলিজের পর ফ্রিড্‌ল্যাণ্ডের যুদ্ধে (Battle of Friedland) পরাজিত হইয়া রাশিয়া যুদ্ধ ত্যাগ করে। জেনার (Jena) যুদ্ধে প্রাশিয়া নেপোলিয়নের নিকট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। নেপোলিয়ন এই যুদ্ধে প্রাশিয়ার বিখ্যাত সেনাদলকে ধ্বংস করিয়া দেন। ইংলণ্ড ব্যতীত ইওরোপের সকল প্রধান শক্তি একে একে নেপোলিয়নের নিকট পরাস্ত হয়।

অষ্টারলিজ ও জেনার যুদ্ধে জয়লাভ

ফ্রিডল্যাণ্ডের যুদ্ধে পরাজয়ের পর, জার প্রথম আলেকজাণ্ডার নেপোলিয়নের সহিত শান্তি স্থাপনের জন্য আগ্রহ দেখান। পোল্যাণ্ডের সীমান্তে নীমেন নদীবক্ষে একটি জাহাজের উপর নেপোলিয়ন ও জার প্রথম আলেকজাণ্ডার পরস্পরের সহিত আলোচনায় বসেন। এই আলোচনার ফলে বিখ্যাত টিলজিটের সন্ধি (১৮০৭ খ্রীঃ) (Treaty of Tilsit) স্বাক্ষরিত হয়। নেপোলিয়ন ইওরোপে যে সকল রাজনৈতিক পুনর্গঠন করেন এই সন্ধি দ্বারা জার তাহা স্বীকার করিয়া নেন। মহাদেশীয় অবরোধ প্রথা (Continental System) অনুযায়ী রুশ বন্দরগুলিতে ইংরাজের বাণিজ্য বন্ধ করিতেও জার রাজী হন। রাশিয়া ও তুরস্কের মধ্যে ক্ষমতা ভাগে নেপোলিয়ন সম্মতি দেন। টিলজিটের সন্ধি দ্বারা নেপোলিয়ন গৌরবের সর্বোচ্চ সীমায় উঠেন। নেপোলিয়ন ইওরোপের একচ্ছত্র অধিপতি (The Lord of Europe) হিসাবে ক্ষমতা লাভ করেন। ইংলণ্ড ছাড়া প্রায় সমগ্র ইওরোপ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করে। কিন্তু সূর্য যেমন মধ্যগগনে পৌঁছিবার পর

রাশিয়ার সহিত টিলজিটের সন্ধি স্থাপন

---

১. "Now Britain is safe".

অস্তাচলের দিকে ঢলিয়া পড়ে, নেপোলিয়নের ভাগ্যরবি সেইরূপ টিলজিটের সন্ধির পর ঢলিয়া পড়ে।

টিলজিটের সন্ধির শর্ত (Terms of the Treaty of Tilsit): ১৮০৭ খ্রীঃ টিলজিটের সন্ধি দ্বারা একদিকে ফ্রান্স ও প্রাশিয়া এবং অপরদিকে ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। এই সন্ধির দ্বারা প্রাশিয়া, ফ্রান্সকে প্রচুর অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে দেয়। পোল্যান্ড ব্যবচ্ছেদ দ্বারা প্রাশিয়া যে সকল স্থান পাইয়াছিল তাহা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়। প্রাশিয়ার পশ্চিমাঞ্চলে এলব নদী পর্যন্ত ভূভাগ ফ্রান্সকে ছাড়িয়া দিতে হয়। নেপোলিয়ন এই স্থানগুলি লইয়া নিম্নলিখিতভাবে সংগঠন করেন। (১) এলব নদী পর্যন্ত প্রাপ্ত ভূভাগ লইয়া তিনি Kingdom of Westphalia গঠন করেন। এই রাজ্যের ভার নেপোলিয়নের কনিষ্ঠ ভ্রাতা জেরোমের উপর দেওয়া হয়। ইহা ফ্রান্সের একটি সামন্ত রাষ্ট্রে পরিণত হয়। (২) পোল্যান্ডের প্রাপ্ত স্থান লইয়া Grand Duchy of Warsaw নামে একটি ফ্রান্সের তাঁবেদার (client) রাজ্য গঠিত হয়। স্যাক্সীর ইলেক্টরকে ইহার দায়িত্ব দেওয়া হয়। (৩) অবশিষ্ট পোল্যান্ডের স্থান রুশ অধিকৃত পোল্যান্ডের সহিত যুক্ত হয়। (৪) ডানজিগ একটি স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়। ইহাও ছিল ফ্রান্সের তাঁবেদার রাজ্য। (৫) রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজান্ডার ইওরোপে নেপোলিয়ন যে সকল তাঁবেদার রাজ্য গঠন করেন, যথাঃ—(ক) কনফিডারেশন অফ রাইন; (খ) কিংডম অফ ওয়েষ্টফ্যালিয়া; (গ) কিংডম অফ ইটালী; (ঘ) কিংডম অফ ওয়ারস প্রভৃতি, সেগুলিকে স্বীকৃতি দেন। (৬) নেপোলিয়ন পশ্চিম ইওরোপে ও জার পূর্ব ইওরোপে আধিপত্য স্থাপনের জন্য চুক্তিবদ্ধ হন। (৭) রাশিয়া, ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে মহাদেশীয় অবরোধে যোগ দিতে স্বীকৃতি জানায়।

টিলজিটের সন্ধি দ্বারা নেপোলিয়ন প্রায় সমগ্র পশ্চিম ইওরোপের ভাগ্য নিয়ন্তায় পরিণত হন। ইংলণ্ড ব্যতীত তাঁহার আর কোন প্রতিপক্ষ ছিল না।

কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেমঃ (মহাদেশীয় অবরোধ প্রথা) (The Continental System): নেপোলিয়ন ১৮০৬ খ্রীঃ উপলব্ধি করেন যে সমগ্র ইওরোপ মহাদেশ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিলেও একমাত্র ইংরাজ জাতি তাঁহার বিরুদ্ধে অব্যাহতভাবে সংগ্রাম চালাইতেছে। ফ্রান্সকে পরাস্ত করিবার জন্য ইওরোপীয় শক্তিগুলিকে লইয়া ইংলণ্ড বারবার জোট গড়িতেছে। ইংলণ্ডের শক্তির উৎস ছিল তাহার অর্থনৈতিক সম্পদ। ভারত প্রভৃতি উপনিবেশ হইতে সম্পদ আহরণ করিয়া ইংলণ্ড ফাঁপিয়া উঠে। ইওরোপের বিভিন্ন দেশে তাহার পণ্য সামগ্রী বিক্রয় করিয়া ইংলণ্ড বাণিজ্য লক্ষ্মীর কৃপায় শ্রেষ্ঠ ধনশালী দেশে পরিণত হয়। নেপোলিয়ন বুঝিতে পারেন যে ইংলণ্ডের শক্তির উৎস হইল তাহার শিল্প ও বাণিজ্য। তিনি ইংরাজ জাতিকে "দোকানদারের জাতি" (A nation of shopkeepers) বলিয়া ব্যঙ্গ করিতেন। তিনি মনে করেন যে যদি ইওরোপ মহাদেশে ইংলণ্ডের বাণিজ্য বন্ধ করা যায় তবে ইংরাজ জাতির শক্তি বিনষ্ট হইবে। ফ্রান্সের নৌবল না থাকায় তাহার পক্ষে ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়া ইংলণ্ড আক্রমণ করা সম্ভব ছিল না।

কণ্টেনেণ্টাল সিষ্টেমের উদ্দেশ্য

এজন্য নেপোলিয়ন ইংলণ্ডের বাণিজ্য বন্ধ করিয়া ইংরাজ জাতিকে "ভাতে মারিবার" সংকল্প নেন। এই সংকল্পকে কাজে পরিণত করিবার জন্য নেপোলিয়ন যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তাহাকে কন্টিনেন্টাল সিস্টেম বা "মহাদেশীয় অবরোধ নীতি" বলা হয়। সামরিক কারণ ছাড়া অপর একটি কারণে নেপোলিয়ন কন্টিনেন্টাল সিস্টেম চালু করেন। ইওরোপের বাণিজ্য ইংলণ্ডের হাত হইতে ফ্রান্সের হাতে কাড়িয়া লইবার বাসনাও তাঁহার ছিল। ফ্রান্সকে একটি সম্পদশালী দেশে পরিণত করার ইচ্ছাও তাঁহার ছিল।

অর্থনৈতিক যুদ্ধ; ইংলণ্ডের বাণিজ্য ধ্বংসের চেষ্টা

নেপোলিয়ন বার্লিনের হুকুমনামা (১৮০৬ খ্রীঃ) (Berlin Decree) দ্বারা ঘোষণা করেন যে ইংলণ্ডে তৈয়ারী জিনিষ ইওরোপের কোন দেশে ঢুকিতে দেওয়া হইবে না। ইওরোপের কোন দেশ ইংলণ্ড ও তাহার উপনিবেশের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে পারিবে না। মিলানের হুকুমনামা (১৮০৭ খ্রীঃ) (Milan Decree) দ্বারা নেপোলিয়ন আরও আদেশ দেন যে সমগ্র ইংলণ্ডকে অবরুদ্ধ করা হইল। যদি অন্য কোন নিরপেক্ষ দেশের জাহাজ ইংলণ্ডে নোঙ্গর করে তবে সেই জাহাজকে বাজেয়াপ্ত করা হইবে। নিরপেক্ষ দেশগুলিও এই আদেশ মানিতে বাধ্য থাকিবে। ওয়ারশ ও ফণ্টেনব্লুর হুকুমনামা দ্বারা (Warsaw and Fontainebleau Decrees) বলা হইল যে ইংলণ্ডের জাহাজ হইতে যে সকল মাল আটক করা হইবে তাহা পোড়াইয়া ফেলা হইবে। এইভাবে নেপোলিয়ন ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে মহাদেশীয় অবরোধ চালু করেন।

বার্লিন ও মিলান হুকুমনামা: অবরোধ প্রথা

ব্রিটিশ সরকার নেপোলিয়নকে পাল্টা আঘাত দিবার জন্য অর্ডারস ইন কাউন্সিল নামক এক ঘোষণা (১৮০৭ খ্রীঃ) জারী করেন। এই ঘোষণায় বলা হয় যে ইংরাজ নৌবহর, ফ্রান্স ও তাহার মিত্রশক্তির বন্দরগুলি পাল্টা অবরোধ করিবে। ফ্রান্স বা তাহার মিত্রশক্তির বন্দরে অন্য কোন নিরপেক্ষ দেশের জাহাজ পাঠাইতে হইলে ইংলণ্ডকে সেলামী দিতে হইবে। মোট কথা ইহা দ্বারা ফ্রান্সের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য নিষিদ্ধ করা হইল।

ইংলণ্ডের প্রত্যাঘাত অর্ডারস ইন কাউন্সিল

নেপোলিয়নের মহাদেশীয় অবরোধ নীতি ছিল কাগজের যুদ্ধ। ইওরোপের বিশাল উপকূলে পাহারা দিয়া ইওরোপে ইংরাজ জাহাজের প্রবেশ বন্ধ করা দুর্বল ফরাসী নৌ-বাহিনীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। ফলে নেপোলিয়নের আদেশ কার্যকরী করা ফ্রান্সের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। নিরপেক্ষ দেশগুলিও নেপোলিয়নের আদেশে বিরক্ত হয়। এদিকে ইংরাজ জাহাজগুলি নেপোলিয়নের অধিকৃত দেশ বাদ দিয়া নিরপেক্ষ দেশগুলিতে ব্রিটিশ মাল আমদানী করিতে থাকে। নিরপেক্ষ দেশ হইতে চোরা পথে এই মাল ইওরোপের সর্বত্র ছড়াইয়া যায়। এদিকে ফ্রান্সকে জব্দ করিবার জন্য ইংরাজ নৌবাহিনী ফ্রান্সে কোন দেশের মাল আমদানী বন্ধ করিয়া দেয়। বৈদেশিক মালের সরবরাহ বন্ধ হইলে ফ্রান্স ও তাহার মিত্র শক্তিগুলির দুরবস্থার একশেষ হয়।

কন্টিনেন্টাল সিস্টেমের দুর্বলতা

শিল্প বিপ্লবের পর ইংলণ্ড কল-কারখানার সাহায্যে মাল উৎপাদন করিয়া ইওরোপকে

যোগান দিত। ইংলণ্ড হইতে মাল আমদানী নিষিদ্ধ হইলে ইওরোপের লোকের দুঃখ-কষ্ট বাড়ে। ফলে নেপোলিয়নের জনপ্রিয়তা নষ্ট হয়। তাছাড়া তুরস্কের সাম্রাজ্য ছিল নেপোলিয়নের অবরোধ নীতির বাহিরে। ইংলণ্ড তুরস্কে মাল পৌঁছাইয়া দিলে তুরস্ক হইতে উহা ইওরোপের ভিতর যাইতে থাকে। ইওরোপে ব্রিটিশ মালের চোরা চালান জোর চলিতে থাকে। ফলে নেপোলিয়নের অবরোধ নীতি ক্রমশঃ বিফল হয়।

নেপোলিয়ন উপলব্ধি করেন যে কণ্টিনেণ্টাল প্রথাকে সফল করিতে হইলে যে সকল দেশ তাঁহার অবরোধ নীতি মানিবে না সেই দেশগুলিকে ফরাসী সেনাদল দিয়া অধিকার করা দরকার। নতুবা তাঁহার অবরোধ নীতি ব্যর্থ হইবে। রোমের পোপ, পর্তুগাল ও স্পেন কণ্টিনেণ্টাল প্রথা মানিতে অস্বীকার করিলে নেপোলিয়ন এই সকল দেশ অধিকার করিতে বাধ্য হন। তিনি রোমের পোপকে বন্দী করেন। ইহার ফলে ইওরোপের ধর্ম-প্রাণ ক্যাথলিকগণ ক্ষেপিয়া যায়। নেপোলিয়ন স্পেনের মধ্য দিয়া পর্তুগালে সেনা পাঠাইবার চেষ্টা করিলে স্পেন ও পর্তুগালের সহিত তাঁহার যুদ্ধ বাধিয়া যায়। ইহার ফলে পেনিনসুলার যুদ্ধ আরম্ভ হয়। নেপোলিয়ন শত চেষ্টা করিয়াও স্পেনকে দমাইতে ব্যর্থ হন। এই যুদ্ধে তাঁহার বহু ক্ষয়-ক্ষতি হয়। নেপোলিয়নের সম্মান বিনষ্ট হয়। এদিকে রাশিয়ার জারও কণ্টিনেণ্টাল প্রথা অগ্রাহ্য করিয়া ইংলণ্ডের বাণিজ্যের জন্য রুশ বন্দর খুলিয়া দেন। ফলে রাশিয়ার সহিত নেপোলিয়নের মন কষাকষি হয়। নেপোলিয়ন রাশিয়া আক্রমণ করিলে রুশ যুদ্ধে তাঁহার সেনাদল ধ্বংস হইয়া যায়। ইতিমধ্যে জার্মানীতে বিদ্রোহ দেখা দেয়। এইভাবে মহাদেশীয় অবরোধ চালু করিতে গিয়া নেপোলিয়নের পতনের পথ রচিত হয়। এজন্য কণ্টিনেণ্টাল প্রথাকে নেপোলিয়নের 'মহাভুল' (Blunder) হিসাবে গণ্য করা হয়।

কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেমের কুফল : স্পেনের যুদ্ধ

পেনিনসুলার যুদ্ধ বা স্পেনের উপদ্বীপের যুদ্ধ (Peninsular War) ঃ পর্তুগাল ও স্পেন নেপোলিয়নের মহাদেশীয় অবরোধ নীতি মানিতে অসম্মত হইলে, নেপোলিয়ন এই দুইটি দেশকে শায়েস্তা করিতে মনস্থ করেন। তিনি স্পেনের মধ্য দিয়া পর্তুগালে সেনা পাঠাইলে স্পেনবাসীগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠে। স্পেনকে দমন করিবার জন্য নেপোলিয়ন স্পেনের বুরবোঁ রাজা ফার্দিনান্দকে বিতাড়িত করিয়া তাঁহার নিজ ভ্রাতা যোসেফ বোনাপার্টকে স্পেনের সিংহাসনে বসান। ইহাতে স্পেনবাসীগণের আত্মমর্যাদায় ও স্বাধীনতায় আঘাত পড়ে। স্পেন বাসীদের মতামত গ্রাহ্য না করিয়া নেপোলিয়ন একজন বিদেশীকে স্পেনের সিংহাসনে বসাইয়া দিলে স্পেনবাসীরা ক্ষিপ্ত হয়। ফলে স্পেনে জাতীয় বিক্ষোভ দেখা দেয়। স্পেনের প্রতি প্রদেশে জুণ্টা (Junta) নামে প্রতিরোধ সমিতি গড়িয়া উঠে। এদিকে স্পেনের দেশপ্রেমিকেরা ইংলণ্ডের সাহায্য চায়। ইংলণ্ডের বৈদেশিক মন্ত্রী জর্জ ক্যানিং ঘোষণা করেন যে ইওরোপের যে কোন দেশ নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে বাধা দিলে সেই দেশকে ইংলণ্ড সাহায্য দিবে। একদল ইংরাজ সেনা বিখ্যাত ইংরাজ সেনাপতি আর্থার ওয়েলেসলি বা ডিউক অফ ওয়েলিংটনের নেতৃত্বে

স্পেনের সহিত যুদ্ধের কারণ

পর্তুগালে অবতরণ করে। এইভাবে স্পেনের বিদ্রোহ এক জাতীয় যুদ্ধে পরিণত হয়। এ পর্যন্ত নেপোলিয়ন ইওরোপের রাজাদের কেবলমাত্র বেতনভোগী সেনাদলের সহিত লড়াই করিয়া জয়লাভ করিয়াছিলেন। স্পেনে তিনি একটি জাতীয় প্রতিরোধের সম্মুখীন হন। একটি জাতি দৃঢ়প্রতিজ্ঞা লইয়া বাধা দিলে তাহাকে দমন করা সহজ কাজ ছিল না। স্পেনের জাতীয় যুদ্ধ পেনিনসুলার যুদ্ধ বা স্পেনের উপদ্বীপের যুদ্ধ নামে খ্যাত হয়। ইহা ১৮০৮-১৮১৩ খ্রীঃ পর্যন্ত চলে।

ডিউক অফ ওয়েলিংটন ভিমিয়েরোর যুদ্ধে (Vimiero) ফরাসীগণকে হঠাইয়া অধিকার করেন। স্পেনবাসীগণ নেপোলিয়নের ভ্রাতা যোসেফকে বিতাড়িত করে। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া নেপোলিয়ন স্বয়ং যুদ্ধ চালাইয়া স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদ অধিকার করেন। ফরাসী সেনাপতি সোল্ট (Soult) করুণার (Corunna) যুদ্ধে ইংরাজ সেনাপতি স্যার জনমুরকে নিহত করেন। কিন্তু নেপোলিয়ন রাশিয়ার যুদ্ধে জড়াইয়া পড়িলে স্পেনের উপর তাহার হাত আলগা হইয়া যায়। এই সুযোগে ডিউক অফ ওয়েলিংটন টলভেরার যুদ্ধে ফরাসী বাহিনীকে পরাস্ত করেন। ইহার পর ইংরাজ ও স্পেনীয় সেনাদল গেরিলা কায়দায় লড়াই চালাইয়া টরেস ভেদ্রার (Line of Torres Vedra) আড়ালে আশ্রয় নেয়। নেপোলিয়ন তাঁহার শ্রেষ্ঠ সেনাপতি ও সেনাদল পাঠাইলেও স্পেনের যুদ্ধে জয়লাভ করা সম্ভব হয় নাই। এদিকে দীর্ঘকাল যুদ্ধ চলিবার ফলে বহু অর্থ ও সেনা নষ্ট হয়। রাশিয়ার যুদ্ধে নেপোলিয়ন ব্যস্ত থাকায় স্পেনে সর্বশক্তি নিয়োগ করিতে অক্ষম হন। এই সুযোগে ১৮১৩ খ্রীঃ ভিক্তোরিয়ার (Vitoria) যুদ্ধে ফরাসী সেনাপতি মার্শাল জোদাঁকে পরাস্ত করিয়া ইংরাজ সেনাপতি ডিউক অফ ওয়েলিংটন মাদ্রিদ অধিকার করিলে ফরাসীগণের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে। স্পেনের যুদ্ধকে নেপোলিয়নের পতনের দ্বিতীয় ধাপ বলিয়া গণ্য করা হয়। নেপোলিয়ন নিজেই স্বীকার করেন যে, "স্পেনের ক্ষতই আমাকে ধ্বংস করে"।[১] স্পেনের জাতীয়তাবাদী প্রতিরোধের দৃষ্টান্ত ইওরোপের অন্যান্য দেশ যথা জার্মানী প্রভৃতিকে অনুপ্রাণিত করে। ফলে নেপোলিয়ন ইওরোপে জাতীয় প্রতিরোধের সম্মুখীন হন।

স্পেনের যুদ্ধ : নেপোলিয়নের বিফলতা

নেপোলিয়নের রাশিয়া অভিযান (The Russian campaign of Napoleon): ১৮০৭ খ্রীঃ টিলজিটের সন্ধির পর হইতে জার প্রথম আলেকজান্ডারের সহিত নেপোলিয়নের সম্পর্কে তিক্ততা দেখা দেয়। নেপোলিয়ন জারকে তুরস্কের বিরুদ্ধে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেও তাহা রাখিতে পারেন নাই। জার বুঝিতে পারেন যে নেপোলিয়ন তাঁহার নিজ স্বার্থে তাঁহাকে ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু রাশিয়ার স্বার্থরক্ষার জন্য নেপোলিয়ন কিছু করিবেন না। রাশিয়ার সীমান্তবর্তী পোল্যাণ্ডে নেপোলিয়ন 'গ্রাণ্ড ডাচি অফ ওয়ারস' নামে একটি ফরাসী ঘেঁসা তাঁবেদার সরকার স্থাপন করিলে জারের আশংকা বাড়ে। ফরাসী আশ্রিত পোল্যাণ্ড রাশিয়া মোটেই পছন্দ করিত না। এই স্থান হইতে রাশিয়া আক্রমণ করা সহজসাধ্য ছিল। এছাড়া জারের ভগ্নীপতি

১. "The Spanish ulcer ruined me."

ওল্ডেনবার্গের ডিউককে বিতাড়িত করিয়া তাঁহার রাজ্য নেপোলিয়ন অধিকার করিলে জার রুষ্ট হন। ইংরাজ ও প্রাশিয়ার নেতাগণ নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদানের জন্য জারের দরবারে ঘোর প্রচার চালাইলে রুশ জনমত নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যায়। এদিকে কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেম বা মহাদেশীয় অবরোধ প্রথার জন্য ইংলণ্ডের মালপত্র রাশিয়ায় আসা বন্ধ হইলে রাশিয়ার প্রজাগণের দুঃখ-দুর্দশা বাড়ে। ইহাতে বিরক্ত হইয়া জার অবরোধ ভাঙিয়া রুশ বন্দরে ইংলণ্ডের জাহাজ ভিড়িতে অনুমতি দেন। ইহাতে নেপোলিয়ন রুষ্ট হইয়া রাশিয়া আক্রমণ করেন।

রাশিয়ার সহিত সন্ধি ভঙ্গের কারণ

১৮১২ খ্রীঃ ছয় লক্ষ সৈন্য লইয়া নেপোলিয়ন রাশিয়ায় ঢুকিয়া পড়েন। রাশিয়ানগণ "পোড়া মাটি নীতি" (Scorched earth policy) অনুযায়ী খাদ্যশস্য, ঘরবাড়ী পোড়াইয়া ও ধ্বংস করিয়া ফরাসী সেনাদের সহিত যুদ্ধ এড়াইয়া পিছাইয়া যায়। ক্রমে নেপোলিয়ন রাশিয়ার মস্কো নগরীর উপকণ্ঠে উপস্থিত হন। এই স্থানে বেরোডিনো (Borodino) নামক এক গ্রামে রুশ বাহিনীর সহিত ফরাসী বাহিনীর এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। নেপোলিয়ন বোরোডিনোর যুদ্ধে জিতিলেও তাঁহার এই জয়ের কোন দাম ছিল না। এই যুদ্ধে নেপোলিয়নের বহু ক্ষয়ক্ষতি হয়। মূল রুশ বাহিনী নেপোলিয়নের নিকট আত্মসমপর্ণ না করিয়া অক্ষতভাবে পিছু হটিয়া যায়। ইহার পর নেপোলিয়ন মস্কো নগরী অধিকার করেন। মস্কো অধিকার করিলেও জার নেপোলিয়নের সহিত সন্ধি স্থাপনে অস্বীকার করেন।

বেরোডিনোর যুদ্ধ পোড়ামাটি নীতি

রুশ সেনাপতি কুটুজফের উদ্দেশ্য ছিল রাশিয়ার প্রচণ্ড শীত ও বরফ পাতে নেপোলিয়নের সেনাদলকে নাস্তানাবুদ করা। এই উদ্দেশ্যে তিনি নেপোলিয়নকে বাধা না দিয়া দেশের ভিতর টানিয়া আনেন। এদিকে তিনি ফরাসীদের রসদ ও সরবরাহ বিনষ্ট করিতে আরম্ভ করেন। নেপোলিয়ন বুঝিতে পারেন যে আর অধিক দিন অপেক্ষা করিলে সরবরাহ বিপন্ন হইবে। শীতে ফরাসী সেনাদল কাবু হইয়া পড়িবে। সুতরাং ১৮১২ খ্রীঃ অক্টোবর মাসে তিনি মস্কো হইতে স্বদেশে ফিরিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু পথে প্রচণ্ড বরফ পাতে, দুর্গম রাস্তার কষ্টে ও রুশ সেনার পাল্টা আক্রমণে তাঁহার বহু সৈন্য ধ্বংস হইয়া যায়। প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ ফরাসী সেনা মারা পড়ে। অবশিষ্ট ৫০ হাজার সেনাসহ দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় নেপোলিয়ন স্বদেশে ফিরিয়া আসেন।

মস্কো অভিযানের বিফলতা

মস্কো অভিযানের ফলাফল ছিল সুদূর-প্রসারী। এই যুদ্ধে নেপোলিয়ন ব্যর্থতা বরণ করায় নেপোলিয়ন যে অপরাজেয় নহেন ইহা সকলে বুঝিতে পারে। ইওরোপের অপর শক্তিগুলি নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে পুনরায় চতুর্থ শক্তিজোট গঠন করে। এই শক্তিজোট ইওরোপকে নেপোলিয়নের হাত হইতে মুক্ত করিতে প্রতিজ্ঞা নেয়। এছাড়া জার্মানী প্রভৃতি দেশগুলি নেপোলিয়নের পরাজয় প্রত্যক্ষ করিয়া নেপোলিয়নের হাত হইতে মুক্ত হইবার জন্য জাতীয় সংগ্রামের প্রস্তুতি চালায়।

ফলাফল

নেপোলিয়নের পতন (The Fall of Napoleon): মস্কো অভিযানের বিফলতা সমগ্র ইওরোপে নেপোলিয়নের মর্যাদা বিনষ্ট করে। ইওরোপীয় শক্তিগুলি নেপোলিয়নের বিপদের সুযোগে পুনরায় সংঘবদ্ধ হয়। ১৮১৩ খ্রীঃ চতুর্থ শক্তিজোট গঠিত হয়। ইংলণ্ড, রাশিয়া, অষ্ট্রিয়া, সুইডেন প্রভৃতি ইহাতে প্রধান অংশ নেয়।

লাইপজিগের যুদ্ধ নেপোলিয়নের পরাজয় ; এলবা দ্বীপে নির্বাসন

নেপোলিয়নের কবল হইতে জার্মানীর মুক্তির জন্য প্রাশিয়ার নেতৃত্বে এক ব্যাপক প্রস্তুতি আরম্ভ হয়। প্রাশিয়ারাজ তৃতীয় ফ্রেডারিক উইলিয়াম উদার-তান্ত্রিক শাসন সংস্কার চালু করায় জার্মান জাতির মনে নবীন উদ্যম জাগে। শিলার, ফিক্টে প্রভৃতি সাহিত্যিক ও দার্শনিকদের প্রভাবে জার্মান জাতীয়তাবাদের জাগরণ হয়। শার্ণহোষ্ট প্রাশিয়ার সেনাদলকে ফরাসীদের আদর্শে নূতন করিয়া গড়েন। ষ্টাইন প্রভৃতি উদারপন্থী প্রশাসকেরা সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার দ্বারা জার্মান জাতির মনে ঐক্য বাড়ান। ইহার ফলে ফরাসী শাসনের বিরুদ্ধে জার্মানীতে প্রতিরোধ জাগিয়া উঠে। ইতিমধ্যে অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়ার সেনাদলও জার্মানীতে সমবেত হয়। জার্মানীতে মুক্তি সংগ্রাম (War of Liberation) আরম্ভ হয়। লাইপজিগের (Leipzig) যুদ্ধে (১৮১৩ খ্রীঃ) তিনদিন অবিশ্রাম সংঘাতের পর নেপোলিয়ন পরাজিত হন। নেপোলিয়ন জার্মানী হইতে পিছু হটিয়া ফ্রান্সে আত্মরক্ষার জন্য সরিয়া আসেন। কিন্তু নেপোলিয়নের সৈন্যসংখ্যা কমিয়া গিয়াছিল। ফরাসী জনসাধারণ তাঁহার স্বৈরাচারী শাসনে বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়ে। লাইপজিগের পরাজয়ের পর তাঁহার সমর্থনে তাহারা আগাইয়া আসে নাই। ইওরোপীয় শক্তি জোটের আক্রমণে ৩১শে মার্চ, ১৮১৪ খ্রীঃ ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের পতন হয়। এই পরাজয়ের পর নেপোলিয়ন ফণ্টেনব্লুর সন্ধি (Treaty of Fontainebleau) স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হন। এই সন্ধির দ্বারা নেপোলিয়ন ফরাসী সিংহাসন ত্যাগ করেন। বুরবোঁ বংশীয় অষ্টাদশ লুইকে ন্যায্য অধিকার নীতি অনুযায়ী ফ্রান্সের সিংহাসন দেওয়া হয়। নেপোলিয়নকে ভূমধ্যসাগরের এলবা দ্বীপের রাজা হিসাবে স্বীকার করা হয় এবং তাঁহাকে উপযুক্ত মাসোহারা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। নেপোলিয়নকে ফ্রান্স হইতে এলবায় পাঠান হয়। এই দ্বীপের চার দিকে ব্রিটিশ নৌবহর পাহারা রাখে।

এলবা হইতে পলায়ন ; ওয়াটার্লুর যুদ্ধ ; নেপোলিয়নের চূড়ান্ত পরাজয়

কিন্তু দীপ যেমন নিবিয়া যাইবার আগে শেষবারের মত উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিয়া উঠে, নেপোলিয়ন চূড়ান্ত পরাজয়ের আগে আর একবার তাঁহার উচ্চাকাঙ্খার পরিচয় দেন। এলবা দ্বীপে দশমাস কাটাইবার পর ব্রিটিশ নৌ বাহিনীর নজর এড়াইয়া তিনি পুনরায় ফ্রান্সে ফিরিয়া আসেন। নেপোলিয়ন ফিরিয়া আসিলে ফরাসী জনগণ তাঁহার সমর্থনে জয়ধ্বনি দেয় এবং তাঁহার সেনাদলে ভর্তি হয়। নেপোলিয়নের ভয়ে রাজা অষ্টাদশ লুই ফ্রান্স হইতে দ্রুত পলায়ন করেন। নেপোলিয়ন পুনরায় ফরাসী সিংহাসনে বসেন। কিন্তু মিত্রশক্তি নেপোলিয়নকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য ফ্রান্সকে

চতুর্দিক হইতে ঘিরিয়া ধরে। ইংরাজ সেনাপতি ডিউক অফ ওয়েলিংটন বেলজিয়ামের পথে ফ্রান্সে ঢুকিবার জন্য আগাইয়া আসেন। ওয়াটালুর্ গ্রামে (Waterloo) তিনি নেপোলিয়নের সম্মুখীন হন। ডিউক অফ ওয়েলিংটনের সহিত প্রাশিয়ার সেনাপতি ব্লুকার (Blucher) সসৈন্যে যোগ দেন। ওয়াটালুর্র যুদ্ধে নেপোলিয়ন চূড়ান্তভাবে পরাজিত হন এবং তাঁহার সেনাদল বন্দী হয়। নেপোলিয়ন ১৫ই জুলাই, ১৮১৫ খ্রীঃ ব্রিটিশ নৌসেনাপতি এ্যাডমিরাল হেওয়ার্ডের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। ইংরাজ সরকার নেপোলিয়নকে সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসিত করিয়া নজরবন্দী রাখেন। এই স্থানে ১৮২১ খ্রীঃ নেপোলিয়নের মৃত্যু হয়। নেপোলিয়ন এলবা হইতে পলাইয়া ওয়াটালুর্র যুদ্ধ পর্যন্ত মোট "একশত দিন রাজত্ব" করেন। এজন্য ইহাকে "হাণ্ড্রেড ডেইজ" বা একশত দিবস বলা হয়। ওয়াটালুর্র যুদ্ধের ফলে "নেপোলিয়নের যুগের" (Era of Napoleon) অবসান হয়।

নেপোলিয়নের পতনের কারণ (Csuses of the downfall of Napoleon) ঃ ফরাসী বিপ্লব-তরঙ্গের চূড়ায় আরোহণ করিয়া নেপোলিয়ন ফ্রান্সের ইতিহাসের প্রাঙ্গণে আসেন। ১৭৯৯ খ্রীঃ হইতে প্রায় সাত বৎসর কাল তিনি রাজ্য বিস্তার, শাসন সংস্কার, সামরিক বিজয় প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রে অপরিসীম সফলতা লাভ করেন। ১৮০৭ খ্রীঃ পর হইতে নেপোলিয়নের ভাগ্যরবি ধীরে ধীরে অস্তাচলে ঢলিয়া পড়ে। ওয়াটালুর্র যুদ্ধে (১৮১৫ খ্রীঃ) পতনের পর নেপোলিয়ন ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চ হইতে চিরদিনের মত প্রস্থান করেন। নেপোলিয়নের পতনের কারণ তাঁহার সাম্রাজ্য ও শাসন নীতির মধ্যেই নিহিত ছিল।

সাফল্যের চূড়া হইতে বিফলতার গহ্বরে পতন

নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যের ভিত্তি ছিল দুর্বল ও স্ববিরোধী।[১] নেপোলিয়ন তাঁহার রাজ্য জয়ের সময় ইওরোপের স্বৈরাচারী রাজবংশগুলির হাত হইতে ইওরোপবাসীকে মুক্ত করার আশ্বাস দেন। কিন্তু এই সকল দেশে তাঁহার আধিপত্য স্থাপিত হইলে পুরাতন রাজবংশ অপেক্ষা তিনি অধিকতর স্বৈরাচার চালান। জাতীয়তাবাদের ঘোষণা দ্বারা তিনি ইওরোপের বিভিন্ন জাতিগুলির মনে যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া দেন তাহার পরিপূরণ করা তাঁহার সাধ্য ছিল না। নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যই ছিল জাতীয়তাবাদের পরিপন্থী। তাঁহার সাম্রাজ্যের এই স্ববিরোধ তাঁহার ধ্বংস ডাকিয়া আনে। দ্বিতীয়তঃ, নেপোলিয়ন তাঁহার অধিকৃত রাজ্যে ঘোর শোষণ নীতি চালান। সাম্রাজ্যের অধীনস্থ জাতিগুলির নিকট বাধ্যতামূলক কর আদায় করিয়া, তাঁহার সেনাদলে তাহাদের যোগদান করিতে বাধ্য করিয়া তিনি বিদেশীয় প্রজাগণের নিকট রক্তশুল্ক (Blood tax) আদায় করেন। ফলে জার্মানী, ইতালী প্রভৃতি স্থানে নেপোলিয়নের শাসন ঘৃণিত হয়। তৃতীয়তঃ, তিনি নিজ স্বৈরতন্ত্রকে রক্ষার জন্য জনগণকে ব্যবহার করিতেছেন একথা সকলেই বুঝিতে পারে।

স্বৈরাচারী শাসন ও সাম্রাজ্যবাদ

---

১. "The Napoleonic Empire was doomed because of its inherent and self defeating contradictions." D. Thomson.

বিপ্লবের ভাবধারা অনুযায়ী জনগণের মঙ্গল করা তাঁহার লক্ষ্য নয় ই
ইহার ফলে প্রজা সাধারণের শ্রদ্ধা তিনি হারাইয়া ফেলেন।

নেপোলিয়ন যে বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন তাহার ঐক্য রক্ষা না। নেপোলিয়নের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও আত্মবিশ্বাস এমনই অভ্রভেদী ছিল যে বিশাল সাম্রাজ্যকে বশে রাখার অসুবিধার কথা তিনি একেবারেই ভুলিয়া যান। ডেভিড টমসনের মতে নেপোলিয়ন যে সাম্রাজ্য জয় করেন তাহাকে স্থায়ী করার মত কোন সংগঠন তিনি গঠন করিতে পারেন নাই। শেষ পর্যন্ত তিনি বিজিত দেশগুলিতে নিজ ভ্রাতা বা আত্মীয়-স্বজনকে রাজা হিসাবে স্থাপন করেন। ইহার ফলে ঐ সকল দেশে বিদ্রোহ দেখা দেয়। স্পেনের সিংহাসনে তাঁহার ভ্রাতা যোসেফ বোনাপার্টকে বসাইলে স্পেনবাসীগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। রাজমিস্ত্রী ইমারত তৈয়ারী করিবার সময় যেমন ইটের মাঝে মাঝে সুরকী, চুণ দিয়া তাহাকে পোক্ত করে, তিনি বিভিন্ন দেশে নিজের হাতের লোককে সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহার ক্ষমতা স্থায়ী করার ব্যর্থ চেষ্টা করেন।[১] কিন্তু ভিত্তি দুর্বল থাকায় এই ইমারত পড়িয়া যায়।

সাম্রাজ্যের সংগঠনের দুর্বলতা

নেপোলিয়নের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল গগনস্পর্শী এবং আত্মবিশ্বাস ছিল অপরিমেয়। মানুষের ক্ষমতার যে একটা সীমা আছে তাহা তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন। শেষের দিকে তাঁহার অহংকার এমনই বাড়িয়া যায় যে তিনি শত্রুপক্ষের ক্ষমতাকে তুচ্ছজ্ঞান করেন। তিনি সর্বদাই মনে করিতেন যে তিনি ভুল করিতে পারেন না। শত্রুপক্ষকে হেয়জ্ঞান করার ফলে শত্রুপক্ষের শক্তি সম্পর্কে তাঁহার ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়। তাছাড়া নেপোলিয়ন অনেকক্ষেত্রে বিচারবুদ্ধির অভাব দেখান। রাশিয়া অভিযান তাঁহার বিচারশক্তির অভাব প্রমাণ করে। রাশিয়ায় তাঁহার পরাজয়ের পরও নেপোলিয়ন নিজ শক্তি সম্পর্কে অহংকারে মত্ত থাকেন। লাইপজিগের যুদ্ধে নেপোলিয়ন পরাস্ত হইবার পর মিত্রশক্তি মীমাংসা প্রস্তাব পাঠাইলে তিনি ক্ষমতার মোহে তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া মারাত্মক ভুল করেন।

উচ্চাকাঙ্খা, অহংবোধ ও বাস্তবতার অভাব

রণকৌশলের ক্ষেত্রে নেপোলিয়ন অনেক প্রকার উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দেন একথা সত্য। কিন্তু তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী সেনাপতি ডিউক অফ্ ওয়েলিংটন ও ব্লুকার তাঁহার রণ-কৌশল তাঁহারই বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেন। নেপোলিয়নের সামরিক সাফল্যের মূল কারণ ছিল ঝটিকা আক্রমণ দ্বারা শত্রু সেনার ধ্বংস সাধন। দীর্ঘস্থায়ী ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চালাইতে তিনি বিশেষ সক্ষম ছিলেন না। স্পেন, রাশিয়া ও জার্মানীর দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে জড়াইয়া পড়িয়া তিনি মহাভুল করেন। কারণ এই দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ চালাইবার মত লোকবল ও সম্পদ তাঁহার ছিল না। দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে জয়লাভ করিবার মত রণকৌশল তিনি প্রয়োগ করিতে পারেন নাই।

নেপোলিয়নের রণ-কৌশল শত্রুপক্ষের অনুসরণ

---

১ "It did not last long enough even for the mortar of a common code of law......which he injected into its joints......" D. Thomson—Europe since Napoleon.

হয় নাই। ১৮৪৮ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের পর ফ্রান্সে পুনরায় প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়। তৃতীয়তঃ, ফরাসী বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সের সমাজ ও অর্থনীতিতে বহু সুদূর-প্রসারী পরিবর্তন ঘটে। অভিজাত ও যাজক শ্রেণীর প্রাধান্য বিনষ্ট হয়। সমাজে সকল মানুষের সমান অধিকারের দাবী স্বীকৃত হয়। সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যক্তি স্বাধীনতা ও ব্যক্তির অধিকার স্থাপিত হয়। বিপ্লবের পরে এই অধিকারগুলিকে বিনষ্ট করা বুরবোঁ সরকারের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। চতুর্থতঃ, ফরাসী বিপ্লবে সামন্ততন্ত্র ধ্বংস হইলে জমিগুলি সাধারণ লোকের মধ্যে বিতরিত হয়। ইহাকে বিপ্লবকালীন ভূমি ব্যবস্থা বলা হয়। বিপ্লবের সময় যে ভূমি ব্যবস্থা চালু হয় তাহা স্থায়ী হইয়া যায়।[১]

গণতান্ত্রিক আদর্শের জাগরণ

ফরাসী বিপ্লবের লিবার্টি (Liberty) বা গণতান্ত্রিক আদর্শ জনসাধারণের মনে স্থায়ী আসন পায়। ন্যাশন্যাল কনভেনশনের শাসনকালে ফ্রান্সে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার চালু হয়। বিপ্লবের পরে এই ভোটাধিকার রদ করা হইলেও ফরাসী জনসাধারণ ইহার আবেদন ভুলে নাই। ১৮৪৮ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের পর ফ্রান্সে স্থায়ীভাবে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার চালু হয়। ফরাসী বিপ্লবের বাক্ স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সম্পত্তির অধিকার, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, নেপোলিয়নের আইনাবলী (Code Napoleon), ধর্ম-সহিষ্ণুতা এবং ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ ফরাসী জাতির ধ্যান-ধারণাকে প্রভাবিত করে। ১৮৩০ খ্রীঃ জুলাই বিপ্লব এবং ১৮৪৮ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী বিপ্লবকে ফরাসী বিপ্লবের অনুসৃতি বলা যায়।[২]

ইওরোপের উপর ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব (Impact of the French Revolution on Europe) : ফ্রান্সের বাহিরে সমগ্র ইওরোপে ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব বিশেষভাবে অনুভূত হয়। গ্রীক পুরাণের কাহিনী হইতে জানা যায় যে জ্ঞান ও উদ্ভাবনী শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবী মিনার্ভা পূর্ণ মূর্তিতে স্বর্গের অধিপতি জুপিটারের মস্তক হইতে জন্মলাভ করেন। ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারা মিনার্ভার ন্যায় ফরাসী দার্শনিকগণের মস্তিষ্ক হইতে উদ্ভূত হইয়া সমগ্র ইওরোপকে প্রভাবিত করে। ডেভিড টমসনের মতে ইওরোপে ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারার প্রভাব কম বৈপ্লবিক ছিল না। প্রায় একশত বৎসর ইওরোপের সমাজ ব্যবস্থাকে ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারা প্রভাবিত করিয়াছিল।[৩] ষোড়শ শতকের রিফর্মেশন বা ধর্ম সংস্কার আন্দোলন যেরূপ ইওরোপের জীবন প্রবাহকে আলোড়িত করিয়াছিল, ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারা অনুরূপ আলোড়ন সৃষ্টি করে।[৪]

ইওরোপে বিপ্লবের ভাবধারার ব্যাপকতা

---

১. Lipson—Europe in the 19nth and 20th centuries. P, 12.

২. "The First Revolution was directed against arbitrary monarchy, the second against aristocratic privilege, the third against middle class governments"—Lipson.

৩. "Until 1914 the French Revolution could be regarded as the most important event in the life of modern Europe "—D. Thomson.

৪. David Thomson—Europe since Napoleon.

বিপ্লবের প্রথম দিকে সমগ্র ইওরোপে বিপ্লবের ভাবধারা দারুন আশাবাদ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। ইংলণ্ডের খ্যাতনামা কবি শেলী এই পটভূমিকায় তাঁহার বিখ্যাত কবিতা "ওড টু দি ওয়েষ্ট উইণ্ড" রচনা করেন। ইংরাজ মনীষী বার্ক ফরাসী বিপ্লবের প্রশস্তি গাহেন। ফরাসী বিপ্লবের মানব অধিকারের ঘোষণা এবং ফ্রাটারনিটি বা ভ্রাতৃত্বের আদর্শ সমগ্র ইওরোপে সাড়া তুলে। আমেরিকার লেখক টম পেইন ও ইংরাজ দার্শনিক জেরোমি বেন্থামকে বিপ্লবী ফ্রান্স নাগরিক অধিকার দিলে এই সকল দেশে নূতন আশাবাদ জাগিয়া উঠে। শতাব্দীর পরিকীর্ণ রাজতান্ত্রিক ভগ্নস্তূপের আবর্জনা সরাইয়া মানুষ নূতন জীবন লাভের স্বপ্ন দেখিতে আরম্ভ করে। ফরাসী বিপ্লবের বিশ্বজনীন আবেদন (universal appeal) বিভিন্ন দেশের উদারপন্থী ও প্রগতিবাদীগণকে প্রভাবিত করে। ঐ সকল দেশের রাষ্ট্র চিন্তায় নূতন জাগরণ ঘটে।

উদারতন্ত্র ও আশাবাদের জাগরণ

বিপ্লবের পরবর্তী পর্যায়ে ফ্রান্সে সন্ত্রাসের রাজত্ব, ব্যক্তি স্বাধীনতার বিলোপ, অরাজকতা দেখা দিলে ইওরোপের প্রগতিবাদীরা হতাশ হইয়া পড়েন। এমনকি ইংরাজ মনীষী এডমাণ্ড বার্ক ফরাসী বিপ্লব সম্পর্কে তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টাইতে বাধ্য হন। এদিকে বিজিত দেশগুলিতে ফরাসী সরকারের শোষণ নীতির ফলে ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন দেশে বিপ্লবের ভাবমূর্তি বিনষ্ট হয়। বিপ্লবের আদর্শের কথা বলিলেও ফরাসী দেশ সাম্রাজ্যবাদ নীতি লইয়াছে ইহা স্পষ্ট হইয়া যায়।

বিপ্লবের আতিশয্যে বিপ্লবের প্রতি ঘৃণার উদয়

তবুও ইওরোপে ফরাসী বিপ্লব কিছু স্থায়ী ফল রাখিয়া যায়। বিপ্লবের সন্তান নেপোলিয়ন বিজিত দেশগুলিতে নানাবিধ সংগঠন চালু করেন। জার্মানী ও ইতালীতে নেপোলিয়নের সংগঠন কার্য এই দুই দেশের ভবিষ্যৎ ইতিহাসকে প্রভাবিত করে। নেপোলিয়ন তাঁহার সংগঠনের জন্য ফরাসী বিপ্লবের জাতীয়তাবাদী আদর্শকে কাজে লাগান। ঐতিহাসিক সি. ডি. হ্যাজেনের মতে (C. D. Hazen) ঝড়ে যেমন বাড়ির টালি খুলিয়া পড়ে সেইরূপ নেপোলিয়নের আক্রমণে পুরাতন রাজবংশগুলির পতন ঘটে। নেপোলিয়ন জার্মানীর ৩০০ রাজ্যকে ভাঙিয়া ৩৯টি রাজ্যে পরিণত করেন এবং জার্মানীর বৃহত্তর অংশকে লইয়া কনফেডারেশন অফ রাইন বা রাইন রাষ্ট্রসংঘ নামে এক রাজ্য গঠন করেন। অনুরূপভাবে তিনি ইতালীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিকে ভাঙিয়া দিয়া ইতালীর ঐক্যের পথও প্রশস্ত করেন। নেপোলিয়নের সংগঠনের ফলে ইওরোপে জাতীয়তাবাদী ভাবধারা জাগিয়া উঠে। পরবর্তীকালে এই ভাবধারা ইওরোপে আলোড়ন তুলে। শেষ পর্যন্ত প্রথম মহাযুদ্ধের পর ১৯১৯ খ্রীঃ ভার্সাই সন্ধিতে ইহা স্বীকৃত হয়। এই বৈপ্লবিক ঘটনার সূত্রপাত বিপ্লবের সন্তান নেপোলিয়নই করেন। ঐতিহাসিক রেড্ডাওয়ে এজন্য মন্তব্য করিয়াছেন "যেখানেই নেপোলিয়নের সেনাদল গিয়াছিল সেখানে আর আগেকার অবস্থা ফিরাইয়া আনা সম্ভব হয় নাই।" (Wherever Napoleonic army went, things were not the same again)।

নেপোলিয়নের জার্মানী ও ইতালীতে পুনর্গঠন

ঐতিহাসিক ফিশার মন্তব্য করিয়াছেন যে "আধুনিক ভাবধারার তরবারি হিসাবে নেপোলিয়ন কাজ করেন।"[১] তিনি ইওরোপের বিভিন্ন দেশে সামাজিক সাম্য, কোড নেপোলিয়ন, ভূমি ব্যবস্থার সংস্কার প্রভৃতি যে ব্যবস্থা চালু করেন তাহা পুরাতনতন্ত্রকে ঝাঁঝরা করিয়া দেয়। নেপোলিয়নের বিজয় অপেক্ষা তাঁহার সংস্কার অনেক বেশী বৈপ্লবিক ছিল। নেপোলিয়ন সর্বত্র পদদলিত সাধারণ শ্রেণীর লোককে তুলিয়া ধরেন এবং সমাজে তাহার যোগ্যস্থানে বসাইবার চেষ্টা করেন। এই জাগরণ ইওরোপের জমিদারী ও গীর্জা শাসিত সমাজকে ভাঙিয়া ফেলে।

ইওরোপে নেপোলিয়নের সংস্কার ব্যবস্থার চলন

সর্বশেষে বলা যায় যে ফরাসী ভাবধারা ঊনবিংশ শতকের ইওরোপের ইতিহাসকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। শিল্প বিপ্লব ও ফরাসী বিপ্লব এই দুই বিপ্লবের তরঙ্গাঘাতে পুরাতন ইওরোপের তটরেখা ধ্বসিয়া পড়ে এবং নূতন কনটুর বা তটরেখা গড়িয়া উঠে। ডেভিড টমসন অভিমত দিয়াছেন যে ফরাসী বিপ্লব না ঘটিলেও ইওরোপের পুরাতনতন্ত্র ভাঙিয়া পড়িত। ডেভিড টমসনের এই অভিমত যুক্তিগ্রাহ্য নহে। ইতিহাসে কি হইতে পারিত তাহা না ভাবিয়া যাহা ঘটিয়াছে তাহাকেই গণনা করা উচিত। সুতরাং ফরাসী বিপ্লবের গহ্বরে নূতন ইওরোপের জন্ম হয় এ কথা বলা যায়।

ইওরোপে নূতন যুগের পদধ্বনি

পঞ্চম অধ্যায়

ভিয়েনা কংগ্রেসে ইওরোপের পুনর্গঠন ও মেটারনিকৃতন্ত্র

(Reconstruction of Europe at Vienna Congress and the Metternich System)

ভিয়েনা কংগ্রেস বা ভিয়েনা সম্মেলন, ১৮১৫ খ্রীঃ (The Congress of Vienna) : ১৮১৩ খ্রীঃ লাইপজিগের যুদ্ধে নেপোলিয়নের পরাজয় হইলে নেপোলিয়নকে এলবা দ্বীপে নির্বাসিত করা হয়। নেপোলিয়ন ইওরোপে পুরাতন রাজবংশগুলিকে হঠাইয়া নিজ সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। নেপোলিয়নের পতনের পর ইওরোপের পুনর্গঠনের জন্য অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা নগরীতে এই ইওরোপীয় মহা-সম্মেলন বা কংগ্রেস (১৮১৪ খ্রীঃ) আহবান করা হয়। ইওরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ এই সম্মেলনে যোগ দেন। প্রচুর জাঁকজমক ও আড়ম্বরের মধ্যে সম্মেলনের কাজ আরম্ভ হয়। রাজা, মহারাজা, মন্ত্রী ও কূটনৈতিকগণ, সেনাপতি ও সাংবাদিক প্রায় সকল শ্রেণীর লোক ভিয়েনা কংগ্রেসে যোগ দেন। ইওরোপের সকল দেশের প্রতিনিধি যোগ দেওয়ায় ইহা এক আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলনে পরিণত হয়। কেবলমাত্র

আন্তর্জাতিক বৈঠক বৃহৎ চতুঃশক্তির প্রাধান্য

---

১. "Napoleon was the sword of modern ideas." Fisher.

পোপ ও তুরস্কের সুলতান এই সম্মেলনে আহূত হন নাই। ইওরোপের সকল দেশের প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগ দিলেও নেপোলিয়ন বিজয়ী চারিটি শক্তি যথা ইংলণ্ড, রাশিয়া, অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া এই সম্মেলনের প্রধান ক্ষমতার অধিকারী হয়।

ভিয়েনা সম্মেলনের নেতৃবর্গ

ভিয়েনা সম্মেলনে যে রাজনীতিজ্ঞগণ প্রধান ভূমিকা নেন তাঁহাদের নাম উল্লেখ করা দরকার। রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজাণ্ডার স্বয়ং ভিয়েনা সম্মেলনের আলোচনা সভায় যোগ দেন। জার প্রথম আলেকজাণ্ডার ছিলেন উদার মতাবলম্বী ও আদর্শবাদী লোক। "নেপোলিয়নের বিজেতা" রূপে তিনি ভিয়েনা সম্মেলনে বিশেষ সমাদর লাভ করেন। অষ্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী মেটারনিক ছিলেন একজন ধুরন্ধর কূটনীতিজ্ঞ। তাঁহার সুদর্শন চেহারা, আকর্ষনীয় বাচনভঙ্গী, আইনের সূক্ষ্ম জ্ঞান ও বিভিন্ন ভাষায় কথা বলিবার শক্তি তাঁহাকে প্রায় একটি রোমাণ্টিক ব্যক্তিত্বে পরিণত করে। তিনি ছিলেন ঘোর রক্ষণশীল ও পুরাতনপন্থী। তাঁহার চিন্তাধারা ভিয়েনা সম্মেলনের সিদ্ধান্তকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী কাসলরি ইওরোপে শক্তিসাম্য স্থাপনের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। ফ্রান্সের মন্ত্রী ট্যালির‍্যাণ্ড ছিলেন অত্যন্ত ধূর্ত, তীক্ষ্ম বুদ্ধি লোক। ঐতিহাসিক শেভিল তাঁহাকে "পাঁকাল মাছের ন্যায় পিচ্ছিল" (Slippery like an eel) বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। ট্যালিরাণ্ডের লক্ষ্য ছিল বৃহৎ শক্তি চতুষ্টয়ের অন্তর্বিরোধের সুযোগে ফ্রান্সের স্বার্থ রক্ষা করা।

ভিয়েনা সম্মেলনের আদর্শবাদ

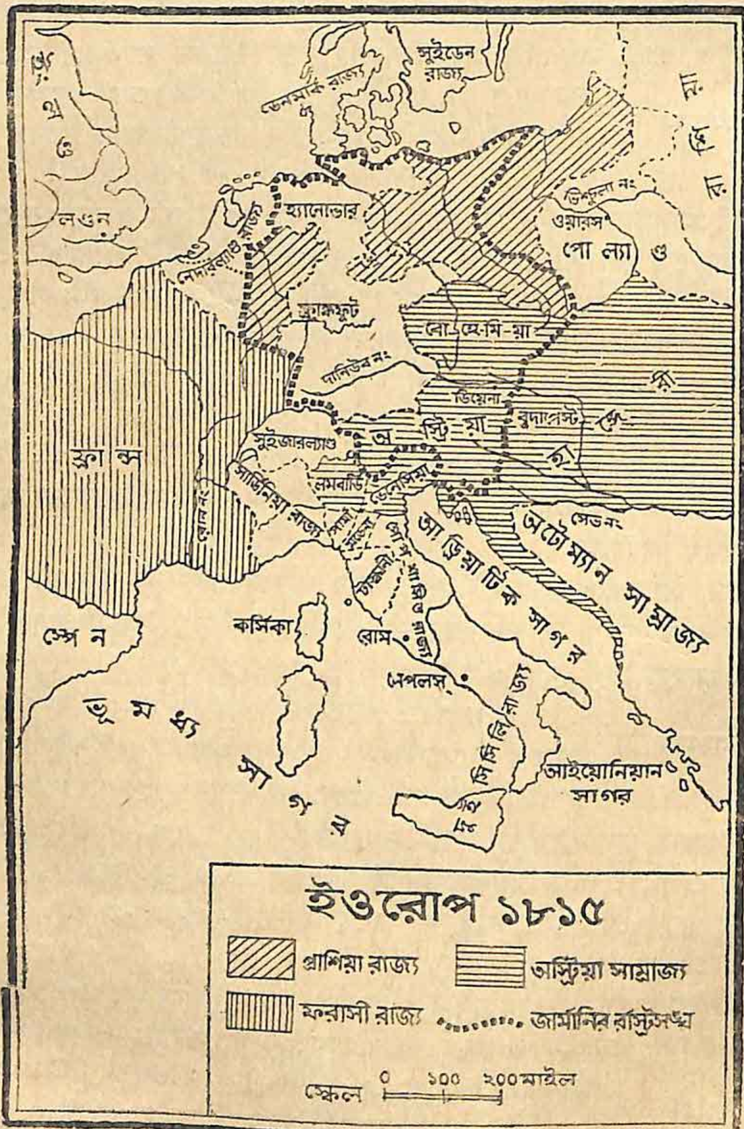
ভিয়েনা সম্মেলনের প্রাক্কালে বিজয়ী বৃহৎ শক্তিবর্গ উচ্চ আদর্শ ও বাক্যজালের কুহেলিকা সৃষ্টি করেন। "ইওরোপীয় সমাজ ব্যবস্থার পুনর্গঠন ; ইওরোপের রাজনৈতিক ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবন ; ন্যায় ও সততার ভিত্তিতে ইওরোপের পুনর্গঠন ; শান্তি স্থাপন" প্রভৃতি উচ্চ আদর্শের কথা তাঁহারা ঘোষণা করেন। কিন্তু বাস্তবপক্ষে এই সকল ঘোষণা ছিল কথার কথা মাত্র। বৃহৎ শক্তিগুলি ছিল রক্ষণশীল। ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারাকে গ্রহণ করিয়া ইওরোপের পুনর্গঠন করার জন্য তাঁহাদের আদৌ ইচ্ছা ছিল না।[১] ভিয়েনা কংগ্রেসের সম্পাদক জেন্তস্ (Gentz) এজন্য মন্তব্য করেন যে "ভিয়েনা বৈঠকে সুবর্ণযুগ সৃষ্টির জন্য আশ্বাস দেওয়া হইলেও বৃহৎ শক্তিগুলির আসল উদ্দেশ্য ছিল নিজ নিজ স্বার্থ রক্ষা করা এবং পুরাতন ব্যবস্থাকে ফিরাইয়া আনা।"

ন্যায্য অধিকার নীতির প্রয়োগ

ভিয়েনা সম্মেলনের প্রতিনিধিবর্গ দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর ইওরোপের রাজনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য তিনটি নীতি গ্রহণ করেন, যথা, নায্য অধিকার (Legitimacy), শক্তিসাম্য (Balance of Power) ও ক্ষতিপূরণ (Compensation)। নায্য অধিকার নীতির অর্থ ছিল এই যে নেপোলিয়ন যে সকল রাজবংশকে তাহাদের বংশানুক্রমিক সিংহাসন ও রাজ্য হইতে বঞ্চিত করেন সেই রাজবংশগুলির পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা। নায্য অধিকার নীতি অনুযায়ী ১৭৮৯ খ্রীঃ ইওরোপের যে সকল দেশে যে রাজবংশ অধিষ্ঠিত ছিল এবং নেপোলিয়ন

১. D. Thomson—Europe since Napoleon. P. 71-72.

যাহাদের বিতাড়িত করিয়াছিলেন, সেই দেশে সেই রাজবংশকে স্থাপন করা হয়। প্যারিসের দ্বিতীয় সন্ধি দ্বারা বুরবোঁ রাজবংশীয় অষ্টাদশ লুইকে ফরাসী সিংহাসন দেওয়া হয়। বিপ্লবের প্রাক্কালে ফ্রান্সের যে বৈধ সীমানা ছিল তাহা ফ্রান্সকে ফিরাইয়া দেওয়া হয়



নিজ সীমানার বাহিরে যে সকল স্থান ফ্রান্স জয় করিয়াছিল তাহা ফ্রান্স ছাড়িয়া দেয়। নেপোলিয়ন বিভিন্ন বিজিত দেশ হইতে যে সকল শিল্প ও ঐতিহাসিক নিদর্শন লইয়া আসেন তাহা ফিরাইয়া দেওয়া হয়। নায্য অধিকার নীতি অনুযায়ী হল্যাণ্ডের সিংহাসন অরেঞ্জ রাজবংশকে, স্পেনের সিংহাসন বুরবোঁ বংশের অপর শাখাকে, ইতালীর পিডমণ্ট

রাজ্য স্যাভয় রাজবংশকে, পোপের রাজ্য পোপকে, দক্ষিণ ইতালীর নেপলস্ ও সিসিলি রাজ্য বুরবোঁ বংশের অপর শাখাকে ফিরাইয়া দেওয়া হয়। জার্মানীর ক্ষেত্রে নায্য অধিকার নীতির প্রয়োগে শিথিলতা দেখান হয়। নেপোলিয়ন জার্মানীর ৩০০টি রাজ্য ভাঙিয়া যে পুনর্গঠন করেন তাহা একেবারে উড়াইয়া দেওয়া সম্ভব ছিল না। জার্মান জাতীয়তাবাদের জাগরণের ফলে জার্মানীতে পুরাপুরি নায্য অধিকার স্থাপন করা সম্ভব হয় নাই। শেষ পর্যন্ত জার্মানীকে ৩৯টি রাজ্যে বিভক্ত করা হয় এবং ৩৯টি রাজ্যকে লইয়া একটি বুন্ড বা শিথিল যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়। অষ্ট্রিয়া উহার সভাপতির পদ পায়। ইতালীর ক্ষেত্রেও নায্য অধিকার নীতিকে শিথিলভাবে প্রয়োগ করা হয়। বেলজিয়াম ও নরওয়ের ক্ষেত্রে নায্য অধিকার নীতির ব্যতিক্রম করা হয়।

শক্তিসাম্য নীতির প্রয়োগ

শক্তিসাম্য নীতির অর্থ ছিল ফ্রান্স যাহাতে পুনরায় ইওরোপ আক্রমণ করিতে না পারে এজন্য ক্ষমতার বণ্টন করা। বাগানের চারিদিকে যেরূপ লোকে বেড়া দেয় সেইরূপ ফ্রান্সের চারিদিকে শক্তিশালী রাষ্ট্র স্থাপন করিয়া ফ্রান্সের সহিত শক্তির ভারসাম্য রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। এই নীতি অনুসারে ফ্রান্সের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে বেলজিয়ামকে হল্যাণ্ডের সহিত সংযুক্ত করিয়া নেদারল্যাণ্ড রাজ্য গড়া হয়। ফ্রান্সের পূর্ব সীমান্তে জার্মানীর রাইন জেলাগুলিকে প্রাশিয়ার সহিত সংযুক্ত করা হয়। ফ্রান্সের দক্ষিণ-পূর্বে তিনটি ক্যাণ্টন বা জেলাকে সুইজারল্যাণ্ডের সহিত ও ফ্রান্সের দক্ষিণ সীমান্তে স্যাভয় ও জেনোয়াকে সার্ডিনিয়া রাজ্যের সহিত সংযুক্ত করা হয়। ইওরোপের কোন শক্তি যাহাতে অপর শক্তি অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাশালী না হয় সেদিকেও দৃষ্টি দেওয়া হয়।

ক্ষতিপূরণ নীতির প্রয়োগ

ক্ষতিপূরণ নীতি অনুযায়ী নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যে সকল শক্তিগুলি দীর্ঘকাল যুদ্ধ করিয়াছিল তাহাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। অষ্ট্রিয়া উত্তর ইতালীর লম্বার্ডি, ভেনেশিয়া প্রদেশ ক্ষতিপূরণ হিসাবে পায়। এছাড়া টাইরল, সালজবার্গ ও ইলিরিয়া প্রদেশও অষ্ট্রিয়াকে দেওয়া হয়। প্রাশিয়া পায় স্যাক্সনীর ২/৫ অংশ, পোল্যাণ্ডের ১/৪ অংশ এবং পমিরেনিয়া প্রদেশ। রাশিয়া ক্ষতিপূরণ হিসাবে ফিনল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ডের ৩/৪ অংশ ও বেসারাবিয়া প্রদেশ পায়। ইংলণ্ড ইওরোপের বাহিরে ক্ষতিপূরণ নেয়। মাল্টা, আইওনিয়ান দ্বীপপুঞ্জ, হেলিগোল্যাণ্ড, ট্রিনিদাদ, মরিশাস, সিংহল, উত্তমাশা অন্তরীপ প্রভৃতি স্থান ইংলণ্ড লাভ করে। সুইডেন ক্ষতিপূরণ হিসাবে নরওয়ে পায়। এইভাবে ভিয়েনা সম্মেলনে ইওরোপের রাজনৈতিক পুনর্গঠন করা হয়।

ভিয়েনা চুক্তির সমালোচনা

ভিয়েনা সম্মেলনে বৃহৎ শক্তিবর্গ বহু উচ্চ আদর্শের কথা ঘোষণা করিলেও কার্যক্ষেত্রে তাহারা অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল ও সংকীর্ণ নীতি অনুসরণ করে। ইওরোপীয় জাতিগুলি নেপোলিয়নের ব্যবস্থার পরিবর্তে যখন এক উন্নততর ব্যবস্থার আশা করে তখন তাহাদের উপর ন্যায্য অধিকার নামে পুরাতন রাজ-বংশগুলিকে চাপাইয়া দেওয়া হয়। এই পুরাতন রাজবংশগুলি ছিল স্বৈরতান্ত্রিক

১. "It undermined the dynamism of nationalism"—D. Thomson.

শাসনে বিশ্বাসী। ফরাসী বিপ্লবের উদারতন্ত্রের হাওয়া ইহাদের স্পর্শ করে নাই। নায্য অধিকার প্রভৃতি ইতিহাসের বাতিল করা নীতিকে ব্যবহার করায় এই চুক্তির ভিত্তি দুর্বল হইয়া যায়। ভিয়েনা সম্মেলনের নেতৃবর্গ ফরাসী বিপ্লব-প্রসূত গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করেন। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে এই দুই ভাবধারা ইতিহাসের নিয়মে জাগিয়া উঠিয়াছে। ইতিহাসের এই ইঙ্গিত না বুঝিয়া তাঁহারা মহা ভুল করেন। ইহার ফলে স্বল্পকালের মধ্যেই ভিয়েনা চুক্তি ভাঙিয়া পড়ে। ভিয়েনা চুক্তির ১৫ বৎসরের মধ্যে ফ্রান্সে স্বৈরাচারী বুরবোঁ বংশের শাসন লোপ পায়। সুতরাং ভিয়েনা চুক্তি ছিল একটি অস্থায়ী ব্যবস্থা মাত্র।

জাতীয়তাবাদের প্রতি উপেক্ষা

ভিয়েনা চুক্তিতে জাতীয়তাবাদকে সম্পূর্ণ নস্যাৎ করা হয়। নরওয়েকে সুইডেনের সহিত, ফিনল্যাণ্ডকে রাশিয়ার সহিত যুক্ত করা হয়। পোল্যাণ্ডকে বিভক্ত করিয়া রাশিয়া ও প্রাশিয়ার সহিত যোগ করা হয়। বেলজিয়ামকে হল্যাণ্ডের সহিত যুক্ত করা হয়। এই সকল দেশগুলির জাতীয়তাবাদ, সংস্কৃতি, ভাবধারা ও অর্থনীতি ছিল সংযুক্ত দেশগুলি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। কিন্তু এই দেশগুলির স্বার্থের কথা ভাবিয়া কেবলমাত্র শক্তিসাম্য ও বৃহৎ শক্তির স্বার্থের কথাই ভাবা হয়। জাতীয়তাবাদকে এইরূপ অগ্রাহ্য করা ছিল চুক্তি স্থাপনকারীগণের ঘোর অদূরদর্শিতা। ফলে ঊনবিংশ শতকের জাগ্রত জাতীয়তাবাদের প্লাবনে ভিয়েনা চুক্তি বালির বাঁধের ন্যায় ভাঙিয়া পড়ে। ১৮৩০ খ্রীঃ বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন হয়। ১৮৫৯ খ্রীঃ বিভক্ত ইতালী ঐক্যবদ্ধ হয় এবং ১৮৬৬ খ্রীঃ বিভক্ত জার্মানী ঐক্যবদ্ধ হয়। তাছাড়া ভিয়েনা সম্মেলনে ইংলণ্ড, অষ্ট্রিয়া, রাশিয়া, প্রাশিয়া প্রভৃতি বৃহৎ চতুঃশক্তিই প্রাধান্য স্থাপন করে। তাহাদের স্বার্থরক্ষার জন্যই এই সন্ধি হয়। ভিয়েনা সম্মেলনের সকল সিদ্ধান্ত বৃহৎ চতুঃশক্তি গ্রহণ করে। ক্ষুদ্র দেশগুলির কোন বক্তব্য এই সম্মেলনে গ্রহণ করা হয় নাই। জার্মানী প্রভৃতি দেশের নাগরিকেরা নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার লড়াই করিলেও তাহাদের জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট করা হয়। এজন্য কেহ কেহ ভিয়েনা চুক্তিকে "ঘোর প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা" (Great deception and betrayal) বলিয়া অভিহিত করেন। ইতালীর রাজনৈতিক অস্তিত্ব লোপ করিয়া ইহাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে ভাগ করা হয়। ইহার ফলে এই চুক্তি স্থায়ী হয় নাই।

ভিয়েনা চুক্তির সমর্থনে বলা যায় যে জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র প্রভৃতি নবজাত ভাবধারাকে এই সময় গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ বিপ্লবের রক্তঝরা পথে জন্মলাভ করিয়াছিল। তখনও এই সকল ভাবধারার গঠনমূলক দিক প্রকটিত হয় নাই। নবজাত ভাবধারাকে গ্রহণ করিলে ইওরোপের পুনরায় ঘোর বিপ্লব ও অশান্তি দেখা দিত। ভিয়েনা সম্মেলনের নেতাগণের প্রধান লক্ষ্য ছিল ইওরোপে শান্তি স্থাপন করা। পুরাতন রাজবংশগুলিকে নিজ নিজ রাজ্যে স্থাপন করার ফলে ইওরোপে মোটামুটি শান্তি ফিরিয়া আসে। এই শান্তি প্রায় ৪০ বৎসরকাল স্থায়ী হয়। এই শান্তির সুযোগে সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান বিকশিত হয়। ইংরাজী সাহিত্যে শেলী, কীটস, বায়রণ প্রভৃতি ; ফরাসী সাহিত্যে ডুমা, বলজাক, হিউগো ; জার্মান সাহিত্যে গ্যেটে ও শিলার তাঁহাদের অপরূপ

সাহিত্য রচনা করেন। ইতিহাসে কোন চুক্তিই চিরস্থায়ী হয় না। কারণ ইতিহাস হইল পরিবর্তনশীল। সুতরাং ইতিহাসের নিয়মেই ভিয়েনা চুক্তি একদিন ক্ষয় পায়। নেপোলিয়নের সহিত যুদ্ধের সময় মিত্ররাষ্ট্রগুলি কয়েকটি গোপন চুক্তির দ্বারা তাহাদের মধ্যে রাজ্য ভাগ করিয়াছিল। এই গোপন চুক্তির ফলে ভিয়েনা সম্মেলনের নেতাগণের স্বাধীনভাবে কাজ করিবার উপায় ছিল না। ভিয়েনা চুক্তির আসল ত্রুটি ছিল ফ্রান্সকে কোণঠাসা করিয়া রাখা। ফ্রান্স এই কোণঠাসা অবস্থা মানিয়া নেয় নাই। ইহার ফলে ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন এই চুক্তি ভাঙিয়া ফেলেন। তবুও যুদ্ধক্ষত ইওরোপে অর্ধ শতাব্দীর শান্তি স্থাপন করিয়া ভিয়েনা চুক্তি উল্লেখযোগ্য কাজ করে। মোটামুটিভাবে ইহা ছিল একটি "যুক্তিপূর্ণ ও রাজনৈতিক বিজ্ঞতা সম্মত সন্ধি"।[১]

ভিয়েনা চুক্তির কৃতিত্ব

মেটারনিক প্রথা বা মেটারনিকতন্ত্র (Metternich System): ইতিহাসের গতি-পরিস্থিতি অথবা ব্যক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় ইহা লইয়া মতভেদ দেখা যায়। তবে ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। মাঝে মাঝে এমন ব্যক্তির উদয় হয় যাঁহারা নিজ বুদ্ধিবলে ইতিহাসের গতিকে নিয়ন্ত্রণ করেন। ১৮১৫-১৮৪৮ খ্রীঃ ইওরোপের ইতিহাসে অষ্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স ক্লেমেন্স ফন মেটারনিকের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। এজন্য ১৮১৫—১৮৪৮ খ্রীঃকে "মেটারনিকের যুগ" বা Era of Metternich বলা হইয়া থাকে।

১৭৭৩ খ্রীঃ জার্মানীর রাইনল্যাণ্ড অঞ্চলে মেটারনিকের জন্ম হয়। তিনি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র। পাঠ সাঙ্গ করিয়া অষ্ট্রিয়া সরকারের পররাষ্ট্র বিভাগে তিনি যোগ দেন। দীর্ঘ ৪০ বৎসরকাল (১৮০৯—১৮৪৮ খ্রীঃ) তিনি একাদিক্রমে অষ্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। তিনি নিজেকে "নেপোলিয়ন বিজেতা" (Conqueror of Napoleon) বলিয়া দাবী করিতেন।

মেটারনিকের পূর্ব জীবন

মেটারনিক ছিলেন সুদর্শন, মার্জিতরুচি, আভিজাত্যপূর্ণ ও বাকচাতুর্যে পারদর্শী। তাঁহার ব্যক্তিত্ব ছিল মধুর এবং বুদ্ধি ছিল তীক্ষ্ম। তিনি ছিলেন চতুর, ষড়যন্ত্র-পরায়ণ ও অহঙ্কারী।[২] তিনি নিজেকে প্রচণ্ড প্রাজ্ঞ লোক (oracle) বলিয়া মনে করিতেন। ভিয়েনা সম্মেলনে তিনি তাঁহার কূটনৈতিক দক্ষতার পরাকাষ্ঠা দেখান। মাছ যেমন অবলীলাক্রমে জলে ঘোরাফেরা করে তিনি সেইরূপ ভিয়েনা সম্মেলনের কূটনৈতিক ঘূর্ণি জলে সাঁতার কাটিতেন।[৩] তিনি ছিলেন "কূটনীতির যাদুকর" (Prince of diplomacy).

মেটারনিকের চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব

মেটারনিক তাঁহার ব্যক্তিত্বের দ্বারা ইওরোপীয় রাজনীতিকগণের উপর তাঁহার নৈতিক

১. "On the whole, it was a reasonable and statesmanlike arrangement."—D. Thomson.

২. "Humility is hardly a proper weakness for a primate."

৩. "He swam like a fish in the sparkling whirlpool at Vienna"—Ketelbey.

কর্তৃত্ব (Moral dictatorship) স্থাপন করেন। তিনি ছিলেন রক্ষণশীলতার (conservatism) ঘোর সমর্থক। বিপ্লবের পূর্বে ইওরোপে যে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র ও সামন্ততন্ত্র ছিল, তিনি তাহাকেই পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা চালান।

মেটারনিকের মতবাদ

তাঁহার নীতিকে মেটারনিক সিস্টেম বা মেটারনিকতন্ত্র বলিয়া আখ্যা দেওয়া হয়। মেটারনিকের মতবাদের একটি ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা ছিল। অষ্ট্রিয়ার হ্যাপসবার্গ সাম্রাজ্য ছিল অনেকগুলি জাতি ও ভাষাভাষীর সমন্বয়ে গঠিত। নবজাত গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী ভাবধারা প্রবল হইলে হ্যাপসবার্গ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে স্বায়ত্বশাসনের দাবী উঠিবার সম্ভাবনা ছিল। ইহার ফলে এই সাম্রাজ্য ভাঙিয়া পড়িত। হ্যাপসবার্গ সাম্রাজ্যের ঐক্য রক্ষার জন্য মেটারনিক পুরাতনতন্ত্র বা রক্ষণশীলতার ঘোর সমর্থক হন। তিনি জানিতেন পরিবর্তন স্বীকার করিলেই সাম্রাজ্য ভাঙিয়া যাইবে। এই কারণে মেটারনিক গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের বিরোধিতা করেন। মড়ক বা মহামারী যেমন একটি গৃহ হইতে প্রতিবেশী গৃহে ছড়াইয়া পড়ে সেইরূপ ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারা এক দেশ হইতে অন্য দেশে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। প্রতিবেশী দেশে গণতন্ত্র জয়লাভ করিলে অষ্ট্রিয়াতে তাহা অনুপ্রবেশ করিবার সম্ভাবনা ছিল। কেবলমাত্র অষ্ট্রিয়াতে এই ভাবধারা দমাইয়া রাখিলে পরিত্রান পাওয়া যাইবে না বলিয়া তিনি মনে করিতেন। এই কারণে তিনি সমগ্র ইওরোপের উপর তাঁহার রক্ষণশীল নীতি স্থাপন করার চেষ্টা করেন।

মেটারনিক ইওরোপের সর্বত্র পুরাতন রাজতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্র প্রভৃতিকে কায়েম রাখার চেষ্টা করিতেন। তিনি কোন রকম পরিবর্তন বা সংস্কারের বিরোধী ছিলেন।

মেটারনিকের মতবাদের বৈশিষ্ট্য

তিনি বলিতেন "রাজত্ব করুণ পরিবর্তন করিবেন না" (Govern and change nothing)। একবার পরিবর্তন আরম্ভ করিলে আর ইহাকে থামান যাইবে না বলিয়া তিনি মনে করিতেন। এজন্য সর্বত্র স্থিতাবস্থা বা Status quo বজায় রাখাই ছিল তাঁহার নীতি। তিনি দমন নীতির দ্বারা বৈপ্লবিক ভাবধারাকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করেন। এজন্য মেটারনিকের মতবাদকে রক্ষণশীল মতবাদ বলা হয়। জার্মানীর উপর অষ্ট্রিয়ার প্রাধান্য বজায় রাখাও ছিল তাঁহার লক্ষ্য।

মেটারনিক তাঁহার মতবাদকে কার্যকরী করার জন্য অষ্ট্রিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন। অষ্ট্রিয়ার উদারপন্হী অধ্যাপক ও ছাত্রগণকে তিনি দমন করেন। ইতিহাস, রাষ্ট্র বিজ্ঞান ও দর্শন শাস্ত্র পড়া তিনি বন্ধ করেন। সংবাদপত্রের স্বাধীন মতামত প্রকাশ বন্ধ করেন। অষ্ট্রিয়ায় শিল্প কলা, শিক্ষা সব কিছুই নিয়ন্ত্রণ

অষ্ট্রিয়া ও জার্মানীতে মেটারনিক নীতি

করা হয়। অধ্যাপক হেইজের মতে কেবলমাত্র সংগীতের উপর মেটারনিক নিয়ন্ত্রণ খাটাইতে পারেন নাই। অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের বিভিন্ন জাতির লোকের মধ্যে ভেদনীতি খাটাইয়া তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের আধিপত্য দৃঢ় করেন। তিনি চেক জাতির উপর জার্মান পুলিশ, ইতালীয়গণের উপর হাঙ্গেরীয় পুলিশ লেলাইয়া দেন। ফলে এই জাতিগুলির মধ্যে ঐক্য নষ্ট হয়।

পোল্যাণ্ডের অভিজাতগণের বিরুদ্ধে পোল্যাণ্ডের কৃষকগণকে তিনি কাজে লাগান। জার্মানীতে তাঁহার মতবাদকে কায়েম করিবার জন্য মেটারনিক জার্মান রাষ্ট্রসংঘকে কাজে লাগান। তিনি জার্মানীর জাতীয়তাবাদী ছাত্র আন্দোলনকে দমাইবার জন্য কার্লসবাডের হুকুমনামা পাশ করেন। ইহার বলে জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়গুলির স্বাধীনতা খর্ব করা হয়। জার্মান প্রগতিশীল ও উদারনৈতিক মতবাদের কণ্ঠরোধ করা হয়। সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রিত হয়। জার্মানীর পার্লামেণ্টগুলিতে স্বাধীন আলোচনার অধিকার সংকুচিত করা হয়। জার্মানীর সংবিধানের ত্রয়োদশ ধারাকে মুলতুবী রাখা হয়। মেটারনিক প্রাশিয়াকেও তাঁহার রক্ষণশীল নীতি মানিয়া চলিতে বাধ্য করেন।



মেটারনিক

মেটারনিক ভিয়েনা সম্মেলনে মোটামুটিভাবে পুরাতনতন্ত্র কায়েম করেন। ন্যায্য অধিকার নীতি ছিল তাঁহার প্রধান সহায়। এই নীতির সাহায্যে সর্বত্র তিনি পুরাতন রাজবংশগুলির শাসন স্থাপন করেন। তিনি ইওরোপীয় শক্তি সমবায়ের দ্বারা সর্বত্র স্থিতাবস্থা বজায় রাখা এবং বিপ্লবকে দমনের প্রচেষ্টা চালান। ট্রপোর বৈঠকে (১৮২০ খ্রীঃ) তিনি ট্রপোর ঘোষণাপত্র (Protocol of Troppeau) দ্বারা প্রজাগণের সরকার পরিবর্তনের অধিকার হরণ করেন এবং স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র কায়েম রাখার চেষ্টা করেন। এমন কি কোন দেশে বিপ্লব ঘটিলে সেই দেশে শক্তি সমবায়ের হস্তক্ষেপের আইনও চালু করা হয়। এই আইনের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের তীব্র প্রতিবাদ তিনি নস্যাৎ করিয়া দেন। ট্রপোর ঘোষণাপত্র অনুসারে অষ্ট্রিয়ার সেনাদল ইতালীর নেপলস ও পিডমণ্টে প্রজাবিদ্রোহ দমন করে। তাঁহার নির্দেশে ফরাসী সেনাদল স্পেনের প্রজা বিদ্রোহ দমন করে। এইভাবে মেটারনিক ইওরোপের সকল দেশে স্বৈর শাসন কায়েম রাখেন।

ইওরোপীয় নীতি

শেষ পর্যন্ত মেটারনিক তাঁহার নীতিকে স্থায়ী করিতে পারেন নাই। ভেরোনার বৈঠকে (১৮২২ খ্রীঃ) ইংলণ্ডের বিরোধিতার ফলে এবং আমেরিকার মনরো নীতির ধাক্কায় শক্তি সমবায় ভাঙিয়া পড়ে। শক্তি সমবায় ভাঙিয়া গেলে ইওরোপের অন্যদেশে হস্তক্ষেপের সুযোগ মেটারনিক হারাইয়া ফেলেন। ইতিমধ্যে ১৮৩০ খ্রীঃ জুলাই বিপ্লবের আঘাতে ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের পুরাতনতন্ত্র ভাঙিয়া যায়। জুলাই বিপ্লবে ফ্রান্সে বুরবোঁ বংশের পতন ঘটিলে পশ্চিম ইওরোপে উদারতন্ত্রের হাওয়া প্রবলবেগে ঢুকিতে থাকে। অবশেষে ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের (১৮৪৮ খ্রীঃ) ধাক্কায় মেটারনিকের নিজ দেশ অষ্ট্রিয়া ও জার্মানীতে মেটারনিকতন্ত্রের পতন হয়। মেটারনিক স্বদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া ইংলণ্ডে আশ্রয় নেন। মেটারনিকতন্ত্রের পতন হইলেও

মেটারনিকের বিফলতা

মেটারনিক পরাজয় স্বীকার করিতে রাজী ছিলেন না। গর্বিত ও অনুতাপহীন মেটারনিক তখনও বলেন যে "আমি এই পৃথিবীতে হয় অনেক আগে আসিয়া গিয়াছি অথবা অনেক পরে আসিয়াছি।"[১]

মেটারনিকতন্ত্রের সমর্থনে বলা যায় যে ফরাসী বিপ্লবের সময় ইওরোপে যে অরাজকতা দেখা যায় মেটারনিক অন্ততঃ তাহার হাত হইতে ত্রিশ বৎসরের জন্য ইওরোপকে রক্ষা করেন। এই ত্রিশ বৎসর শান্তি বজায় রাখার ফলে ইওরোপের সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞানে অগ্রগতি ঘটে। তাছাড়া মেটারনিক ছিলেন অষ্ট্রিয়ার মন্ত্রী। অষ্ট্রিয়ার স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করা ছিল তাঁহার কর্তব্য। অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের ঐক্য রক্ষার জন্য তিনি রক্ষণশীল নীতি চালু করেন। মেটারনিক ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারার ঐতিহাসিক মূল্য বুঝিতেন না এমন নহে। মনে মনে তিনি তাহা বুঝিতেন। কিন্তু অষ্ট্রিয়ার ঐক্য রক্ষার জন্য তিনি ইহার বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন যে, "একটি ভঙ্গুর কাঠামোকে রক্ষার জন্য আমার গোটা জীবন দিলাম।"[২] কেহ কেহ বলেন যে মেটারনিক তাঁহার প্রভু অষ্ট্রিয়ার সম্রাট ফ্রান্সিস যোসেফের নির্দেশেই রক্ষণশীলতা চালু করেন। সুতরাং ইহাকে মেটারনিক প্রথা বা মেটারনিকতন্ত্র না বলিয়া ফ্রান্সিস যোসেফ প্রথা বলা উচিত।

মেটারনিকের সমর্থনে যুক্তি

যাহা হউক একথা অবশ্যই সত্য যে মেটারনিকতন্ত্র ছিল নেতিবাচক, দমনমূলক ও ভঙ্গুর। ইহা দ্বারা জনসাধারণের আশা-আকাঙ্খাকে দমাইয়া রাখা গেলেও জনসাধারণের অসন্তোষের সমাধান ইহার দ্বারা করা যায় নাই। জনগণের অবরুদ্ধ অসন্তোষ ফেব্রুয়ারী বিপ্লবে দাবানলের ন্যায় জ্বলিয়া উঠে। মেটারনিকতন্ত্র ছিল রক্ষণশীল, গতিহীন ও ইতিহাসের ধারার বিরোধী। মেটারনিক ভুলিয়া যান যে, "তিনি বার্ধক্য দশাগ্রস্থ হইলেও, পৃথিবী প্রতিদিন নবযৌবন লাভ করিতেছিল। তিনি প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় তাঁহার নীতি চালু রাখেন।"[৩]

মেটারনিকের ত্রুটি

ইওরোপীয় শক্তি সমবায় (The Concert of Europe) : ভিয়েনা সম্মেলনের নেতৃবর্গ বুঝিয়াছিলেন যে নেপোলিয়নের পতন ঘটিলেও ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারা সক্রিয় রহিয়াছে। ইহার প্রভাবে ফ্রান্সে এবং ইওরোপের কোন দেশে বিপ্লব দেখা দিলে ভিয়েনা চুক্তি ভাঙিয়া পড়িবে এবং ইওরোপের শান্তি বিপন্ন হইবে। এই সম্ভাবনা রোধ করিয়া ইওরোপে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্য তাঁহারা ইওরোপীয় শক্তিবর্গকে লইয়া একটি শক্তি সংঘ বা শক্তি সমবায় গঠনের পরিকল্পনা করেন।

রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজাণ্ডার পবিত্র চুক্তি (Holy Alliance) নামক একটি পরিকল্পনা দ্বারা আন্তর্জাতিক শক্তি সমবায় গঠনের প্রথম চেষ্টা করেন। এই চুক্তি দ্বারা জার খ্রীস্টধর্মের নৈতিক আদর্শের আলোকে ইওরোপের শাসন ব্যাবস্থাকে পরিশুদ্ধ করার

---

১. "I have come in this world either too early or too late."

২. "I am giving my life to support a tottering structure."

৩. "He forgot that while he was growing old, the world was renewing its youth ; He outlived his necessity."

কথা বলেন। জার আলেকজাণ্ডার মনে করিতেন যে ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম কারণ ছিল ইওরোপীয় রাজাগণের স্বার্থপরতা ও প্রজাগণের অবস্থার প্রতি উদাসীনতা। তিনি এজন্য ইওরোপীয় রাজাগণকে এক খ্রীষ্টিয় ভ্রাতৃসংঘের বন্ধনে আবদ্ধ হইবার কথা বলেন। ইওরোপীয় রাজাগণ যাহাতে প্রজাগণকে সন্তানের ন্যায় ও রাজাগণ পরস্পরকে ভ্রাতার ন্যায় দেখেন সেজন্য তিনি আবেদন জানান। তিনি তাঁহাদের খ্রীষ্টধর্মের "ন্যায়, দয়া ও শান্তি" (Justice, charity and peace) এই তিনটি নীতি মানিয়া চলার কথাও বলেন। অষ্ট্রিয়া, রাশিয়া ও প্রাশিয়া পবিত্র চুক্তির প্রধান স্বাক্ষরকারী হয়। কিন্তু ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী ক্যাসলরি এই চুক্তি গ্রহণে অসম্মতি জানাইয়া মন্তব্য করেন যে "পবিত্র চুক্তি হইল উচ্চ দরের রহস্যময় পাগলামির নামান্তর মাত্র।"[১] অষ্ট্রিয়ার মিটারনিক মন্তব্য করেন যে "পবিত্র চুক্তি হইল ধর্মের আবরণে রাজনৈতিক মতলব"[২] এবং "উচ্চ শব্দকারী শূন্য কুম্ভ মাত্র"। ইংলণ্ড, অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশের বিরোধিতার ফলে পবিত্র চুক্তি ব্যর্থ হয়। তবে ভুলক্রমে ইহার নাম শক্তি সমবায়ের সহিত জড়াইয়া ফেলা হয়।[৩] পবিত্র চুক্তির বিফলতার জন্য জারের ধর্মপ্রবণতা ও রাশিয়ার প্রতি ইওরোপীয় শক্তিগুলির ঈর্ষা দায়ী ছিল। এছাড়া জারের বাস্তবতার অভাব ও গভীর আদর্শবাদ পবিত্র চুক্তির বিফলতার জন্যও দায়ী ছিল।

পবিত্র চুক্তি

পবিত্র চুক্তির বিফলতার পর মেটারনিক চতুঃশক্তি সন্ধি (Quadruple Alliance) নামে এক সন্ধি রচনা করেন। ইহার উপর ভিত্তি করিয়া ইওরোপীয় শক্তি সমবায় গঠিত হয়। চতুঃশক্তি সন্ধির উদ্দেশ্য ছিল ইওরোপে শান্তি রক্ষা, ভিয়েনা চুক্তিকে রক্ষা করা এবং ইওরোপে স্থিতাবস্থা বজায় রাখা। ইওরোপের সমস্যাবলী আলোচনার জন্য মাঝে মাঝে স্বাক্ষরকারী দেশগুলির বৈঠক বা কংগ্রেস আহ্বানের ব্যবস্থাও ইহাতে করা হয়। ইংলণ্ড, অষ্ট্রিয়া, প্রাশিয়া ও রাশিয়া ছিল চতুঃশক্তি সন্ধির প্রধান পৃষ্ঠপোষক। চতুঃশক্তি সন্ধিকেই ইওরোপীয় শক্তি সমবায়ের প্রকৃত ভিত্তি বলা যায়।

চতুঃশক্তি সন্ধি

শক্তি সমবায়ের কার্যকলাপ (The Activities of the Concert of Europe) : চতুঃশক্তি সন্ধি অনুযায়ী শক্তি সমবায়ের প্রথম বৈঠক ১৮১৮ খ্রীঃ এ-লা-শাপেলে (Aix-la-chapelle) বসে। এ-লা-শাপেলের বৈঠকে সভ্যগণ একমত হইয়া ফ্রান্সকে শক্তি সমবায়ের পঞ্চম সভ্য হিসাবে গ্রহণ করে। ফ্রান্সের যোগদানের ফলে চতুঃশক্তি সমবায় পঞ্চশক্তি সমবায়ে পরিণত হয়। এই বৈঠকে নরওয়ের উপর সুইডেনের রাজার অত্যাচার, মোনাকোর রাজার বিরুদ্ধে প্রজাবর্গের অভিযোগ সম্পর্কে সভ্যগণ একমত হইয়া সিদ্ধান্ত নেন। তাঁহারা সুইডেনের ও মোনাকোর রাজাকে প্রজাগণের প্রতি ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করার নির্দেশ দেন। এইভাবে কিছুদিনের জন্য বৃহৎ শক্তিগুলি শক্তি সমবায়ের মধ্যে একমত হইয়া কাজ করে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে বৃহৎ

১. "A piece of sublime mysticism and nonsense."

২. "A political intention under religious garb" aud "Loud sounding nothing."

৩. D. Thomson—Europe since Napoleon. P. 76.

শক্তিগুলির নিজ নিজ স্বার্থের সম্পর্কিত বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ হইলে তাহাদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। দক্ষিণ আমেরিকায় স্পেনের বিদ্রোহী উপনিবেশগুলিকে স্পেনের হাতে ফিরাইয়া দেওয়া, ভূমধ্যসাগরে আরব জলদস্যুগণের দমন প্রভৃতি ব্যাপারে শক্তি সমবায়ের বৈঠকে ইংলণ্ড আপত্তি জানায়। ফলে কংগ্রেসের সভ্যগণের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। ঐতিহাসিক কেটেলবি মন্তব্য করিয়াছেন যে এই মতভেদ "কনসার্টের বাঁশীর গায়ে প্রথম ছিদ্র হিসাবে দেখা দেয়" (First rift in the lute)। ট্রপোতে (Troppeau) শক্তি সমবায়ের দ্বিতীয় অধিবেশন ১৮২০ খ্রীঃ বসিলে শক্তি সমবায়ের অন্তর্বিরোধ আরও প্রকট হইয়া উঠে। ইওরোপে রক্ষণশীলতাকে স্থাপন করিবার জন্য ট্রপোর বৈঠকে মেটারনিক একটি প্রস্তাব দেন। ইহার নাম ছিল ট্রপোর ঘোষণাপত্র (Protocol of Troppeau)। এই ঘোষণাপত্রে বলা হয় যে বিপ্লবের দ্বারা এবং প্রজাগণের চাপে রাজতন্ত্রের ক্ষমতা কমান চলিবে না। যদি কোন দেশে এই ঘটনা ঘটে তবে শক্তি সমবায় সেই দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া স্থিতাবস্থা ফিরাইয়া আনিবে। ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী ক্যাসলরি এই প্রস্তাবের ঘোর বিরোধিতা করেন। তিনি জানাইয়া দেন যে অত্যাচারী রাজার বিরুদ্ধে প্রজাগণের বিদ্রোহ করার মৌলিক অধিকার আছে। তাছাড়া ইংলণ্ডের মতে কোন দেশের সার্বভৌম অধিকার ভাঙিয়া সেই দেশে শক্তি সমবায়ের হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করা যাইবে না। ইংলণ্ডের প্রতিবাদ সত্ত্বেও ট্রপোর ঘোষণাপত্র অষ্ট্রিয়া, প্রাশিয়া ও রাশিয়ার সংখ্যাগুরু ভোটে শক্তি সমবায়ে গৃহীত হয়। ট্রপোর ঘোষণাপত্রের জোরে ইওরোপে মেটারনিকতন্ত্র কায়েম হয়। শক্তি সমবায় একটি প্রতিক্রিয়াশীল স্বৈরতন্ত্রের তল্পীবাহী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।

শক্তি সমবায়ের পাঁচটি বৈঠক ও ইংলণ্ডের সহিত বিভেদ

অষ্ট্রিয়ার লাইব্যাক শহরে শক্তি সমবায়ের তৃতীয় অধিবেশন ১৮২১ খ্রীঃ বসে। এই বৈঠকে জানা যায় যে ইতালীর নেপলস রাজ্যে প্রজা বিদ্রোহ দেখা দিয়াছে। যেহেতু ট্রপোর ঘোষণাপত্র অনুসারে প্রজা বিদ্রোহ ছিল বেআইনী, সেহেতু ইহা দমাইবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। শক্তি সমবায় স্থির করে যে নেপলসের উদারতান্ত্রিক বিপ্লব দমনের ভার অষ্ট্রিয়াকে দেওয়া হইবে। অষ্ট্রিয়া সরকার নেপলসের বিদ্রোহ দমন করিয়া ইতালীতে রক্ষণশীলতাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করে। লাইব্যাকের বৈঠকে রাশিয়া গ্রীসের বিদ্রোহের প্রশ্ন তুলিবার চেষ্টা করিলে মেটারনিক কৌশলে রাশিয়াকে আপাততঃ নিরস্ত করেন। শক্তি সমবায়ের চতুর্থ বৈঠক ১৮২২ খ্রীঃ ভেরোনা শহরে বসে। ইতিমধ্যে ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী ক্যাসলরির মৃত্যু হয়। ইংলণ্ডের নূতন বৈদেশিক মন্ত্রী ক্যানিং মনে করিতেন যে শক্তি সমবায়ের দ্বারা ইংলণ্ডের স্বার্থ ও মর্যাদা নষ্ট হইতেছে। এজন্য তিনি শক্তি সমবায়ের সহিত ইংলণ্ডের সম্পর্ক ছিন্ন করার পক্ষপাতী ছিলেন। ভেরোনার বৈঠকে শক্তি সমবায় ইংলণ্ডের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া স্পেনের উদারনৈতিক বিপ্লব দমনের জন্য ফ্রান্সকে দায়িত্ব দেয়। ইহাতে ইংলণ্ড বিশেষ অসন্তুষ্ট হয়। ভেরোনা বৈঠকে ইংলণ্ডের আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া স্পেনের আমেরিকার উপনিবেশের প্রশ্ন পুনরায় তোলা হইলে, ইংলণ্ড ভেরোনা বৈঠক ত্যাগ করে। অতঃপর ইংলণ্ড কার্যতঃ শক্তি সমবায়ের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন

করে। ক্যানিং আরও এক ধাপ আগাইয়া স্পেনের আমেরিকার উপনিবেশের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেন। শক্তি সমবায় যাহাতে দক্ষিণ আমেরিকায় হস্তক্ষেপ না করিতে পারে এজন্য তিনি ব্রিটিশ নৌ-বাহিনী নিয়োগ করেন। এদিকে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি মনরো তাঁহার বিখ্যাত মনরো নীতি (১৮২২ খ্রীঃ) (Monroe Doctrine) ঘোষণা করিয়া বলেন যে "আমেরিকা কেবলমাত্র আমেরিকাবাসীদের জন্য। আমেরিকায় বহিঃশক্তির হস্তক্ষেপ সহ্য করা হইবে না।" ইহার অর্থ ছিল যে দক্ষিণ আমেরিকায় শক্তি সমবায়ের হস্তক্ষেপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাধা দিবে। ইহার ফলে শক্তি সমবায় দক্ষিণ আমেরিকা হইতে হাত গুটাইতে বাধ্য হয়। ক্যানিংয়ের বিরোধিতা ও মনরো নীতি শক্তি সমবায়ের সমাধি রচনা করে। ক্যানিং শক্তি সমবায়কে ব্যঙ্গ করিয়া বলেন যে "আমি পুরাতন পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষা করিবার জন্য একটি নূতন পৃথিবী স্থাপন করিলাম।"[১] ক্যানিংয়ের এই বক্রোক্তিতে ক্রুদ্ধ হইয়া মেটারনিক তাঁহাকে "ক্ষতিকারক উল্কাপিণ্ড" (Malovolent meteor) বলিয়া অভিহিত করেন। ভেরোনা বৈঠকের পর (১৮২৮ খ্রীঃ) ইওরোপীয় শক্তি সমবায় কার্যত ভাঙিয়া পড়ে। সেণ্ট পিটার্সবার্গে শক্তি সমবায়ের শেষ অধিবেশন ১৮২৪ খ্রীঃ বসে। ইংলণ্ড এই বৈঠক বর্জন করে। গ্রীসের বিদ্রোহের প্রশ্নে অষ্ট্রিয়ার সহিত রাশিয়ার মত বিরোধের জন্য এই বৈঠক ভাঙিয়া যায়। ইহার পর শক্তি সমবায়ের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়।

শক্তি সমবায়ের গুরুত্ব

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইওরোপীয় শক্তি সমবায়ের কিছু গুরুত্ব ছিল। অষ্টাদশ শতকে বল প্রয়োগের দ্বারা বৈদেশিক নীতি পরিচালনার রেওয়াজ ছিল। এই শতকে আন্তর্জাতিক আইন ও ন্যায্য অধিকার মান্য করার পরিবর্তে কয়েক ব্যাটেলিয়ন সৈন্যকে অনেক বেশী দাম দেওয়া হইত। ফ্রেডারিক দি গ্রেট ও নেপোলিয়ন ন্যায় নীতিকে অগ্রাহ্য করিয়া বাহুবলের পরাকাষ্ঠা দেখান। জোর যার মুল্লুক তার ইহাই ছিল অষ্টাদশ শতকের নিয়ম। বাহুবলকে মাপকাঠি হিসাবে গ্রহণ করায় অষ্টাদশ শতকে বহু যুদ্ধ-বিগ্রহ বাধে। ইহার ফলে আন্তর্জাতিক অরাজকতা দেখা দেয়। বাহুবল নীতির বিপজ্জনক পরিণাম ইওরোপের শক্তিগুলি ক্রমে উপলব্ধি করে। নেপোলিয়নের পতনের পর ইওরোপের শক্তিগুলি বাহুবলের পরিবর্তে পরস্পরের মধ্যে আলাপ-আলোচনা ও মীমাংসার দ্বারা আন্তর্জাতিক বিরোধ নিষ্পত্তির নূতন পথ গ্রহণ করে। শক্তি সমবায় ছিল এই নূতন নীতির পরীক্ষাগার। শক্তি সমবায়ের এই আদর্শ পরবর্তী যুগে লীগ অফ নেশনসে রূপায়িত হয়।

ইওরোপীয় শক্তি সমবায়ের বিফলতার কারণ

(Causes of the failure of the Concert of Europe) : ইওরোপীয় শক্তি সমবায়ের গঠন ও ইহার নীতির মধ্যেই ইহার ধ্বংসের বীজ নিহিত ছিল। নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্র ইংলণ্ড এবং স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্র অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়াকে লইয়া শক্তি সমবায় গঠিত হইয়াছিল। নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পক্ষে জনমত অগ্রাহ্য করিয়া বৈদেশিক নীতি পরিচালনা

১. "I have brought a New World into existence to redress the balance of the Old."

করা কষ্টসাধ্য ছিল। ইংলণ্ডের পার্লামেন্টে বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে মন্ত্রীসভাকে সমালোচনা করা হইত। এই সমালোচনা অগ্রাহ্য করা ব্রিটিশ মন্ত্রী সভার পক্ষে সহজ ছিল না। স্বৈরতান্ত্রিক দেশ যথা অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়ায় পার্লামেন্ট না থাকায় সেই দেশগুলি জনমত অগ্রাহ্য করিতে পারিত। সুতরাং শক্তি সমবায়ে অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি স্বৈরশাসিত রাষ্ট্রের নীতি মানিয়া ইংলণ্ডের পক্ষে এক সাথে চলা সম্ভব ছিল না। যদি ইংলণ্ড মেটারনিকের দমন নীতি সমর্থন করিত তবে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে সমালোচনার ঝড় উঠিত। এই কারণে ইংলণ্ড ট্রপোর ঘোষণা-পত্রের বিরোধিতা করে। দ্বিতীয়তঃ, শক্তি সমবায় প্রধানতঃ নেপোলিয়নের পুনরাক্রমণের সম্ভাবনার বিরুদ্ধে গঠিত হইয়াছিল। কিছুদিনের মধ্যে নেপোলিয়নের পুনরাক্রমণের সম্ভাবনা লোপ পাইলে শক্তি সমবায়ের প্রয়োজনীয়তা উবিয়া যায়। নেপোলিয়নের আক্রমণের ভয়ে বৃহৎ শক্তি যে একতা দেখায় তাহা শীঘ্র ভাঙিয়া পড়ে। "শক্তি সমবায় ছিল ইওরোপীয় ঐক্যের ক্ষীয়মান স্ফুলিঙ্গ মাত্র।"[১] তৃতীয়তঃ, মেটারনিক শক্তি সমবায়কে রক্ষণশীলতা ও স্বৈরতন্ত্রের বাহনে পরিণত করায় ইহার প্রাণশক্তি স্তিমিত হইয়া পড়ে। ইতিহাসের গতি গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের পক্ষে যাইতেছিল। শক্তি সমবায় ইতিহাসের স্রোতের বিরুদ্ধে যাইতে অক্ষম হয়।

সভ্যগণের স্বার্থগত বিরোধ: ইংলণ্ডের বিরোধিতা

চতুর্থতঃ, ইওরোপীয় শক্তি সমবায়ের সভ্যগণের মধ্যে পারস্পরিক ঈর্ষা ও পরস্পর বিরোধী স্বার্থের সংঘাত এই প্রতিষ্ঠানের পতন ডাকিয়া আনে। সদস্যগণের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও ক্ষমতার লড়াই শক্তি সমবায়কে দুর্বল করিয়া দেয়। মেটারনিক অষ্ট্রিয়ার স্বার্থের জন্য শক্তি সমবায়ের উপর তাঁহার রক্ষণশীল মতবাদকে চাপাইয়া দেন। ইংলণ্ড তাহার বাণিজ্যের স্বার্থে শক্তি সমবায়ের নীতির বিরোধিতা করে। পঞ্চমতঃ, শক্তি সমবায়ের পতনের জন্য ইংলন্ডের নীতি বিশেষ দায়ী ছিল। ইংলণ্ডের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ক্যানিং মনে করিতেন যে যুদ্ধের সময় শক্তিজোট দরকার। তিনি শান্তির সময়ে শক্তি সমবায় রাখার বিরোধী ছিলেন। ক্যানিং মনে করিতেন যে শক্তি সমবায় থাকার কালে ইংলন্ড তাহার বৈদেশিক নীতি স্বাধীনভাবে চালাইতে পারিতেছে না। ইংলণ্ড শক্তি সমবায়ে অপমানিত হইতেছে। সুতরাং তিনি শক্তি সমবায় হইতে ইংলণ্ডকে বিচ্ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত নেন। ইংলণ্ডের বিরোধিতা শক্তি সমবায়ের পতন ত্বরান্বিত করে। সর্বশেষে আমেরিকার মনরো নীতির ফলে আমেরিকা মহাদেশে শক্তি সমবায়ের হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ হয়। শক্তি সমবায়ের পক্ষে মনরো নীতির বিরোধিতা করা সম্ভব ছিল না।

———

১, "A fading speak from a glowing inspiration of what had been, for a short time, a single-mined Europe." Ketelbey.

ষষ্ঠ অধ্যায়

ফ্রান্সে জুলাই ও ফেব্রুয়ারী বিপ্লব

(The July and February Revolution in France)

ফ্রান্সে জুলাই বিপ্লব, ১৮৩০ খ্রীঃ বুরবোঁ রাজবংশের পতন (The July Revolution in France, 1830 : The fall of the Restored Bourbon Dynasty) : নেপোলিয়নের পতনের পর ন্যায্য অধিকার নীতি অনুযায়ী ফ্রান্সের সিংহাসনে বুরবোঁ রাজবংশকে পুনঃস্থাপন করা হয়। ষোড়শ লুইয়ের ভ্রাতা অষ্টাদশ লুই (Louis XVIII) নাম লইয়া ফ্রান্সের সিংহাসনে বসেন। কিছুকাল রাজত্ব করিয়া অষ্টাদশ লুইয়ের মৃত্যু হইলে, তাঁহার ভ্রাতা দশম চার্লস ফরাসী সিংহাসনে বসেন। দশম চার্লস মাত্র সাত বৎসর রাজত্ব করিবার পর ১৮৩০ খ্রীঃ ৩০শে জুলাই এক বিপ্লবের ফলে সিংহাসন হারান। ফ্রান্সের সিংহাসন হইতে চিরতরে বুরবোঁ রাজবংশকে বিদায় লইতে হয়। ফ্রান্সে বংশানুক্রমিক রাজবংশের অবসান হয়।

জুলাই বিপ্লবের কারণ (Causes of the July Revolutiou) : ফ্রান্সের সমকালীন ইতিহাসের মধ্যে জুলাই বিপ্লবের বীজ লুক্কাইত ছিল। ফরাসী বিপ্লবের ফলে ফরাসী জাতির সমাজ ব্যবস্থা ও জীবন দর্শন সম্পূর্ণভাবে পাল্টাইয়া যায়।

পরস্পর বিরোধী ভাবধারার সংঘাত দক্ষিণ ও বামপন্থী মতবাদ

ঐতিহাসিক হ্যাজেন মন্তব্য করিয়াছেন যে "ফ্রান্সের ন্যায় অপর কোন দেশে এত ব্যাপক ও আমূল পরিবর্তন দেখা যায় নাই।"[১] ফরাসী বিপ্লবের পরে ফ্রান্সে বিপ্লবের ভাবধারা অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় প্রবাহিত ছিল। অনুকূল পরিবেশে তাহা আবার দুইকূল ছাপাইয়া উঠে। ১৮১৫ খ্রীঃ পর ফ্রান্সের সমাজ ব্যবস্থায় একটি সংঘাতপূর্ণ অবস্থা দেখা দেয়। দেশত্যাগী অভিজাতগণ যাহারা বিপ্লবের সময় দেশত্যাগ করিয়াছিল তাহারা নেপোলিয়নের পতনের পর ফিরিয়া আসে। জাহাজের তলায় ফুটা হইয়া জল ঢুকিলে জাহাজের খোলের ভিতরের ইঁদুরগুলি যেমন প্রাণের ভয়ে জাহাজ হইতে লাফ দিয়া পড়ে (Rats leave the sinking ship) তেমনই দেশের বিপদের দিনে ইহারা দেশ ছাড়িয়া যায়। কিন্তু বিপদ কাটিয়া গেলে ইহারা ফিরিয়া আসে। এই সকল দেশত্যাগী অভিজাতগণ (emigrees) ছিল খুবই উগ্রপন্থী রক্ষণশীল। বিপ্লবের আমলে ইহাদের বাজেয়াপ্ত ভূ-সম্পত্তি ও লুপ্ত অধিকার ইহারা পুনরায় দাবী করে। বিপ্লবের আমলে ভূমি ও সমাজ ব্যবস্থায় যে পরিবর্তন হয় তাহাকে ইহারা উড়াইয়া দিতে বদ্ধপরিকর ছিল। উগ্র রাজতন্ত্রী-গণ পুরাতনতন্ত্রকে কায়েম করার সংকল্প নেয়। ইহারা উগ্র রাজতন্ত্রী দল (Ultra Royalist Party) নামে একটি দল গড়ে। অষ্টাদশ লুইয়ের ভ্রাতা ডিউক অফ আর্টয়িস ছিলেন এই দলের নেতা। এই দল দক্ষিণ ফ্রান্সে এক হত্যাকাণ্ড চালায়।

---

১. "No country in Europe had undergone between 1789-1848 sweeping and so vital transformation as had France." Hazen.

ইহাকে হোয়াইট টেরর বা "শ্বেত সন্ত্রাস" বলা হয়। দক্ষিণ ফ্রান্সে নেপোলিয়নের সমর্থক ছিল খুব বেশী। শ্বেত সন্ত্রাস দ্বারা এই সকল সমর্থকদের নির্বিচারে হত্যা করা আরম্ভ হয়। এমন কি নেপোলিয়নের প্রতি বিশ্বস্ত সেনাপতি নে (General Ney) কেও হত্যা করা হয়। এদিকে উগ্র রাজতন্ত্রী দলের বিপরীত মেরুতে ছিল উদারপন্থী দল ও প্রজাতন্ত্রী দল। ফ্রান্সের মধ্যবিত্ত শ্রেণী এই দলগুলি গড়িয়া বিপ্লবের ভূমি ব্যবস্থা ও সামাজিক পরিবর্তনকে রক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেয়। উদারপন্থীরা বিপ্লবের পরিবর্তন গুলিকে যে কোন উপায়ে রক্ষা করিতে সংকল্প নেয়। ফলে রক্ষণশীলতা বনাম উদার-তন্ত্রের সংঘাতের ফলে ফ্রান্সে জুলাই বিপ্লব অনিবার্য হইয়া পড়ে।

অষ্টাদশ লুই এই সংঘাত এড়াইবার জন্য একটি মধ্যপন্থী নীতি নেন। তিনি ১৮১৪ খ্রীঃ একটি চার্টার বা সনদ দ্বারা কতক পরিমাণে উদারনৈতিক শাসন প্রবর্তন করেন। কিন্তু এই সনদ দ্বারা সম্পত্তিশালী লোকেদের ভোটাধিকার দেওয়া হয়। ফ্রান্সের তিন কোটি লোকের মধ্যে মাত্র এক লক্ষ লোক ভোটাধিকার পায়। নূতন সনদে রাজার ক্ষমতা তিনি অব্যাহত রাখেন। তবে বাস্তব অবস্থা বুঝিয়া তিনি কিঞ্চিৎ উদারতা দেখান। তিনি বিপ্লবের সময় নির্বাসিত জীবন কাটাইয়া বহু কষ্ট ভোগ করেন। এই কারণে প্রজাদের চটাইয়া তিনি সিংহাসন হারাইতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তিনি বলিতেন যে "সিংহাসন হইল সকল আসন অপেক্ষা আরামপ্রদ ঃ ইহা হারাইয়া আমি পুনরায় ভ্রমণ করিতে চাহি না।"[1] ঐতিহাসিক কোবানের (Cobban) মতে মধ্যপন্থাকে সফল করিতে হইলে অষ্টাদশ লুইয়ের উচিত ছিল উগ্র রাজতন্ত্রীদের দমন করা। কিন্তু বার্ধক্যবশতঃ তিনি নিজে শাসনকার্যে নজর দিতে পারিতেন না। ফলে তাঁহার যুবতী উপপত্নী মাডাম ডি শায়লা (Madame de Cayla) এবং মন্ত্রী ভিলেলের (Villele) হাতে সকল ক্ষমতা পড়ে। ভিলেলে ধাপে ধাপে পুরাতনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা চালান। অষ্টাদশ লুইয়ের ১৮২৪ খ্রীঃ মৃত্যু হইলে ফ্রান্সে মধ্যপন্থা স্থায়ী হইবার শেষ আশা বিলুপ্ত হয়। ইহার ফলে বিপ্লব ত্বরান্বিত হয়।

অষ্টাদশ লুইয়ের মধ্য পন্থা ও ইহার বিফলতা

অষ্টাদশ লুইয়ের ভ্রাতা দশম চার্লস সিংহাসনে বসিয়াই মধ্যপন্থা নীতিকে বিসর্জন দেন। ভিলেলের 'ধীরে চল' নীতিতে অসন্তুষ্ট হইয়া তিনি তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া পলিগন্যাক নামক একজন গোঁড়া রক্ষণপন্থীকে প্রধানমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করেন। দশম চার্লস ছিলেন উগ্র রাজপন্থী (Ultra Royalist) দলের পৃষ্ঠপোষক। ফ্রান্সের সমাজ ব্যবস্থায় বিপ্লবের ফলে যে সকল পরিবর্তন স্থায়ী হইয়া যায় তাহার সহিত কিছুতেই আপোষ করিতে তিনি রাজী ছিলেন না। তিনি এমন একজন গোঁড়া রক্ষণশীল ছিলেন যে মেটারনিকের ন্যায় রক্ষণশীলও তাঁহার উগ্রতায় স্তম্ভিত হইয়া যান। দশম চার্লস ইতিহাস হইতে কোন

দশম চার্লসের উগ্র দক্ষিণপন্থী নীতি

১. "The throne is the softest of all chairs : I do not like to go back in my travels again."

শিক্ষা নেন নাই।[১] তিনি কায়মনোবাক্যে স্বৈরশাসন স্থাপনের জন্য চেষ্টা করেন। তিনি বলেন যে "বরঞ্চ কাঠ চিরিয়া অন্ন যোগাড় করিব। কিন্তু ইংলণ্ডের রাজার মত ঠুঁটো জগন্নাথ হইব না।" দশম চার্লসের হঠকারী নীতি বুরবোঁ রাজবংশের পতন ত্বরান্বিত করে।

দশম চার্লসের মন্ত্রী পলিগন্যাক যাজকশ্রেণী ও অভিজাতগণের সহায়তায় পুরাতনতন্ত্র কায়েম করার পন্থা নেন। এজন্য তিনি কয়েকটি প্রতিক্রিয়াশীল আইন পাশ করেন।

প্রতিক্রিয়াশীল আইন রচনা ও জুলাই অর্ডিন্যান্স

দেশত্যাগী জমিদারগণকে তাহাদের বাজেয়াপ্ত জমিদারীর জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আইন করা হয়। ক্ষতিপূরণের হার এত বেশী ছিল যে সাধারণ রাজস্ব হইতে ইহা দেওয়া সম্ভব হয় নাই। সুতরাং জাতীয় ঋণের উপর সুদের হার কমাইয়া উদ্বৃত্ত টাকা জমিদারগণকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ইহা ছাড়া ধর্মযাজকগণের স্বার্থ রক্ষা ও শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্মযাজকগণের প্রাধান্য স্থাপনের জন্যও আইন করা হয়। উগ্রপন্থী জেসুইট সম্প্রদায়কে আগে বেআইনী ঘোষণা করা হইয়াছিল। দশম চার্লস পুনরায় তাহাদের সমর্থন করেন। জেসুইটরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের মতামতের উপর কড়া নজর রাখে। কোন অধ্যাপক স্বাধীন মত প্রকাশ করিলে তাঁহাকে চাকুরী হইতে বহিষ্কার করা হয়। ইহার ফলে ফ্রান্সে মধ্যযুগের ধর্মীয় গোঁড়ামি ফিরিয়া আসিতে আরম্ভ করে। ইতিমধ্যে দশম চার্লস ১৮১৪ খ্রীঃ সনদকে বানচাল করিবার সংকল্প নেন। এই উদ্দেশ্যে ২৫শে জুলাই ১৮৩০ খ্রীঃ জুলাই অর্ডিন্যান্স জারী করা হয়। এই অর্ডিন্যান্সের দ্বারা (১) সদ্য নির্বাচিত আইনসভাকে ভঙ্গ করা হয়। (২) ভোটাধিকারের আইন পাল্টাইয়া ভোটাধিকার সংকোচন করা হয়। (৩) সংবাদপত্রের কণ্ঠ রোধ করা হয়। (৪) নূতন নির্বাচনের আদেশ দেওয়া হয়। এক কথায় অষ্টাদশ লুই ১৮১৪ খ্রীঃ চার্টার দ্বারা যেটুকু অধিকার দিয়াছিলেন, দশম চার্লস তাহা নস্যাৎ করিয়া দেন।

জুলাই অর্ডিন্যান্স জারী হইলে ফ্রান্সে স্বৈরতন্ত্র স্থাপিত হইতেছে একথা উদারপন্থী দল বুঝিতে পারে। তাহারা জনসাধারণকে প্রতিরোধের জন্য ডাক দেয়। প্যারিসের

জুলাই বিপ্লব

রাস্তায় অবরোধ গড়িয়া উঠে। সরকারী সেনাদলও সরকারের পক্ষ ছাড়িয়া জনতার সামিল হয়। অবস্থা প্রতিকূল দেখিয়া দশম চার্লস পদত্যাগ করেন। তিনি ইংলণ্ডে পলায়ন করেন। শোনা যায় যে তাঁহার পিতৃ-পুরুষের সিংহাসন হারাইয়া এই সময় তিনি অঝোরে কাঁদিতেছিলেন। যুগ ধর্ম না বুঝিয়া চলিবার ফলে তাঁহার পতন ঘটে। ইহার পর অর্লিয়েন্স বংশীয় লুই ফিলিপ নিয়মতান্ত্রিক রাজা হিসাবে ফ্রান্সের সিংহাসনে বসেন।

জুলাই বিপ্লবের ফলাফল (Results of the July Revolution) : ফ্রান্সের ইতিহাসে জুলাই বিপ্লব (১৮৩০ খ্রীঃ) এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসাবে স্থান

১. "He learnt nothing and saw nothing."

পাইয়া থাকে। জুলাই বিপ্লবে বুরবোঁ বংশের পতন ঘটে এবং অর্লিয়েন্স বংশীয় লুই ফিলিপ (Louis Phillippe) সিংহাসনে বসেন। ভিয়েনা সম্মেলনে ন্যায্য অধিকার বা বংশানুক্রমিক সিংহাসনে বসাইবার অধিকার স্বীকৃত হইয়াছিল। ন্যায্য অধিকার অনুসারে বুরবোঁ বংশ ফ্রান্সে শাসন করিবার অধিকারী ছিল। কিন্তু জুলাই বিপ্লবে বুরবোঁ বংশকে পদচ্যুত করিয়া অর্লিয়েন্স বংশীয় লুই ফিলিপকে সিংহাসনে বসাইলে ন্যায্য অধিকার নীতির পতন ঘটে। ফ্রান্সের সিংহাসনে বংশানুক্রমে শাসনের অধিকার লোপ পায়। জনগণের ইচ্ছায় রাজা সিংহাসনে বসিবেন এই নীতিই জয়যুক্ত হয়। এক কথায় রাজার স্বর্গীয় অধিকারের স্থলে জনগণের স্বর্গীয় অধিকার স্বীকৃত হয়। দ্বিতীয়তঃ, স্বৈরাচারী বুরবোঁ বংশের স্থলে ফিলিপের নিয়মতান্ত্রিক শাসন স্থাপিত হয়। লুই ফিলিপ সংবিধান মানিয়া নিয়মতান্ত্রিক রাজা হিসাবে শাসন করিবার শপথ নেন। ভোটাধিকার বাড়ান হয়। তৃতীয়তঃ, অভিজাত ও যাজক শ্রেণীর ক্ষমতা লোপ পায়। মধ্যবিত্ত শ্রেণী ক্ষমতা লাভ করে। ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও ধর্ম-নিরপেক্ষতা স্থাপিত হয়। এক কথায় বলা যায় যে উগ্র রাজতন্ত্রী দল ফ্রান্সে পুরাতনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যে চেষ্টা চালায় তাহার অবসান ঘটে। ফ্রান্সে উদারতন্ত্র স্থাপিত হয়। ঐতিহাসিক লিপসন ফ্রান্সের জুলাই বিপ্লবকে ইংলণ্ডের "গৌরবজনক বিপ্লবের" (Glorious Revolution) সহিত তুলনা করিয়াছেন। ফ্রান্সের বাহিরে ইওরোপের বিভিন্ন দেশে জুলাই বিপ্লবের ঢেউ ছড়াইয়া পড়ে। বেলজিয়াম হল্যাণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বেলজিয়ামের স্বাধীনতা ঘোষণা করে। বেলজিয়াম জাতীয়তাবাদীগণ তাঁহাদের জাতীয়তাবাদের সমর্থনে ফ্রান্সের সহায়তা ভিক্ষা করে এবং ফরাসী সেনাগণ বেলজিয়ামে ডাচ হস্তক্ষেপ নিরোধ করে।[১] শেষ পর্যন্ত ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের যৌথ প্রচেষ্টায় লণ্ডন বৈঠকে এক চুক্তি (১৮৩১ খ্রীঃ) স্বাক্ষরিত হয়। ইহার ফলে বেলজিয়াম স্বাধীনতা লাভ করে। জার্মানীর বিভিন্ন স্থানে জুলাই বিপ্লবের প্রভাবে অস্থিরতা দেখা দিলে মেটারনিক কার্লসবাড ঘোষণা-নামা পুনরায় জারী করিয়া উহা স্তব্ধ করিয়া দেন। জুলাই বিপ্লবের ফলে প্রাশিয়ায় একটি উদারনৈতিক শাসনতন্ত্র চালু হয়। জুলাই বিপ্লবের প্রেরণায় মধ্য ইতালীতে জাতীয়তা-বাদী বিপ্লব দেখা দেয়। মডেনা ও অন্যান্য রাজ্যের স্বৈরাচারী শাসকগণ বিতাড়িত হন। কিন্তু অষ্ট্রিয়ার সামরিক হস্তক্ষেপে বিদ্রোহ প্রশমিত হয়। জুলাই বিপ্লবের ঢেউ পূর্ব ইওরোপের পোল্যাণ্ডে পৌঁছাইলে পোলগণ স্বাধীনতা লাভের জন্য রাশিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। কিন্তু রুশ সেনাদল পোল্যাণ্ডের বিদ্রোহকে দমাইয়া দেয়।

ফ্রান্সের ইতিহাসে জুলাই বিপ্লবের প্রভাব

ফ্রান্সের বাহিরে জুলাই বিপ্লবের প্রভাব

জুলাই বিপ্লবের প্রভাবে ইংলণ্ডে সর্বসাধারণের ভোটাধিকার লাভের জন্য চার্টিষ্ট আন্দোলন (Chartist movement) নামে এক গণ আন্দোলন দেখা দেয়। এই

১. David Thomson. P. 249.

But there is also a different view about French intervention. See C. D. Hazen.

আন্দোলনের ফলে ইংলণ্ডে ১৮৩২ খ্রীঃ ভোটাধিকার আইন পাশ হয়। জুলাই বিপ্লবের প্রভাবে স্পেন ও সুইজারল্যাণ্ডে উদারনৈতিক শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হয়। এইভাবে জুলাই বিপ্লব ইওরোপের বিভিন্ন দেশে পুরাতনতন্ত্রকে নড়াইয়া দেয়। ইহার আঘাতে ভিয়েনা চুক্তির ভিত্তি নড়বড়ে হইয়া যায়। ফ্রান্স ও বেলজিয়ামে এই সন্ধির ভিত্তি ধ্বংস হইয়া যায়। গ্রীসের জাতীয়তাবাদী যুদ্ধ জোরদার হয়। ঐতিহাসিক ডেভিড টমসনের মতে এই বিপ্লবের ফলে ইওরোপ দুইটি আদর্শগত শিবিরে বিভক্ত হয়। রাইন নদীর পূর্বদিকস্থ ইওরোপে মোটামুটিভাবে জুলাই বিপ্লবের পরেও রক্ষণশীলতা কায়েম থাকে। কিন্তু রাইন নদীর পশ্চিম দিকস্থ ইওরোপ যথা ফ্রান্স, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ উদারতন্ত্রবাদী হইয়া উঠে।

পুরাতনতন্ত্র ও ভিয়েনা চুক্তির ভিত্তি দুর্বল হইয়া পড়া

১৮৪৮ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী বিপ্লব (The February Revolution of France, 1848)ঃ জুলাই বিপ্লবের ফলে (১৮৩০ খ্রীঃ) অর্লিয়েন্স বংশীয় লুই ফিলিপ ফ্রান্সের সিংহাসনে বসেন। জুলাই বিপ্লবে তাঁহার রাজতন্ত্র স্থাপিত হয় বলিয়া ইহাকে "জুলাই রাজতন্ত্র" (July Monarchy) বলা হয়। উদারতন্ত্রী (Liberal) দলের মনোনীত ব্যক্তি হিসাবে লুই ফিলিপ ফ্রান্সের সিংহাসনে বসেন। যে পার্লামেণ্ট তাঁহাকে নির্বাচন করে তাহার ৪৩০ জন সভ্যের মধ্যে ২১৯ জন তাঁহার পক্ষে ভোট দেয়। তিনি সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হন নাই। তাছাড়া সিংহাসনে তাঁহার বংশানুক্রমিক দাবীও ছিল না। এই কারণে প্রথম হইতে তাঁহার রাজতন্ত্রের পশ্চাতে একটি অবৈধতার ছাপ ছিল। যাহারা আইনের মর্যাদায় বিশ্বাস করিত তাহাদের চক্ষে লুই ফিলিপ ছিলেন বেআইনী শাসক।

দুর্বল ভিত্তি

লুই ফিলিপের ব্যক্তিত্বের কোন আকর্ষণ ছিল না। তাঁহার চালচলন ছিল সাদামাটা। তাঁহার না ছিল চটক, না ছিল পাণ্ডিত্য। তিনি গণভোটের সাহায্যে নিজ জনপ্রিয়তা বাড়ান নাই। সুতরাং ব্যক্তিত্ব ও জনপ্রিয়তার অভাবে তাঁহার রাজতন্ত্র লোকচক্ষে হেয় হইয়া পড়ে। এছাড়া ফ্রান্সের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি তাঁহার ঘোর বিরোধী ছিল। প্রজাতন্ত্রবাদীরা রাজতন্ত্র উচ্ছেদ করিয়া প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালায়। মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল এই দলের সমর্থক। সমাজতন্ত্রবাদীগণ তাঁহার শ্রমিক বিরোধী, ধনীঘেঁষা অর্থনীতির জন্য তাঁহার পতন কামনা করে। নায্যপন্থীরাও তাঁহাকে অবাঞ্ছিত মনে করে। বোনাপার্টবাদী দল তাঁহার নিস্ক্রিয় বৈদেশিক নীতির দরুণ তাঁহার উচ্ছেদ কামনা করে। প্রজাতন্ত্রী দলের সহিত এই দলগুলি যোগ দিলে লুই ফিলিপের পতন ত্বরান্বিত হয়।

রাজনৈতিক দলের বিরোধিতা

এদিকে লুই ফিলিপের অর্থনীতি ও বৈদেশিক নীতি তাঁহার বিরুদ্ধে জনমতকে প্রভাবিত করে। কাশিমীর পেরিয়ার ও গিজো প্রভৃতি রক্ষণশীল নেতার প্রভাবে লুই ফিলিপ স্থিতাবস্থা নীতির ভক্ত হইয়া পড়েন। এই সকল নেতা বলিতে থাকেন যে লুই ফিলিপ ১৮১৪ খ্রীঃ সনদ মানিয়া কাজ করিতেছেন। সুতরাং আর কোন সংস্কার বা পরিবর্তনের দরকার নাই। সনদটিকে বজায় রাখিয়া শাসনকার্য চালাইলেই চলিবে।

ফলে শিল্প বিপ্লবের ফলে শ্রমিকদের কম মজুরী ও বেশী খাটুনী খাটান হইলে লুই ফিলিপ এ বিষয়ে শ্রমিকদের দুরবস্থার প্রতিকারের জন্য কিছু করিতে নারাজী হন। ফলে শ্রমিকদের কষ্টের একশেষ হয়। কিন্তু লুই ফিলিপ হস্তক্ষেপ না করার নীতি লইয়া ধনী মিল মালিকদের স্বার্থরক্ষা করেন। ফলে লায়ন্স (Lyons) শহরে কয়েকবার শ্রমিক বিদ্রোহ ঘটে। সমাজতন্ত্রীদল লুই ফিলিপের সরকারের নাম দেয় "বুর্জোয়া রাজতন্ত্র"। তাহারা ইহার পতন কামনা করে। বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে লুই ফিলিপের একমাত্র লক্ষ্য ছিল যে কোন মূল্যে ফ্রান্সের সহিত অন্য দেশের শান্তি রক্ষা করা এবং ইংলণ্ডের সহিত মিত্রতা রক্ষা করা। তিনি গৌরব পিয়াসী ফরাসী জনগণের গৌরব পিপাসা মিটাইবার জন্য জোরালো বৈদেশিক নীতি গ্রহণে অসম্মত হন। ইহার ফলে পার্লামেন্টে তিনি নিন্দিত হন। ফরাসী জনগণ তাঁহার উপর আস্থা হারাইয়া ফেলে। তিনি বেলজিয়াম ও মিশরে ফরাসী প্রভাব স্থাপনের সুবর্ণ সুযোগ ইংলণ্ডের চাপে হেলায় ত্যাগ করিলে ফরাসী পত্র-পত্রিকা তাঁহার নীতিকে ঘোর সমালোচনা করে। তিনি মরক্কোতে ফরাসী প্রভাব বিস্তারের সুযোগও ত্যাগ করেন। তিনি অনুরূপভাবে ইংলণ্ডের চাপে স্পেনের উত্তরাধিকারীণি রাজকন্যার সহিত তাহার পুত্রের বিবাহ নাকচ করেন। লোকে তাঁহার বৈদেশিক নীতিকে "বন্ধ্যা ও নিস্ফলা" নীতি বলে। বোনাপার্টিষ্ট দল তাঁহার বৈদেশিক নীতির বিরুদ্ধে জোর প্রচার চালায়।

দুর্বল অর্থ ও বৈদেশিক নীতি

লুই ফিলিপ সংবিধান মানিয়া চলিলেও গণতন্ত্রের নীতি অনুসারে আইনসভাকে মন্ত্রী নির্বাচনের অধিকার দেন নাই। তিনি সর্বদাই বিশেষ অধিকার বলে মন্ত্রী নিয়োগ বা পদচ্যুত করেন। এইভাবে তিনি একের পর এক মন্ত্রী-সভাকে ভাঙিয়া দেন। তাছাড়া তিনি সেপ্টেম্বর আইন (September Laws) দ্বারা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সংকুচিত করেন। সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনা দণ্ডনীয় অপরাধে পরিণত হয়। জুরীর দ্বারা বিচার উঠাইয়া দেওয়ার ফলে যে কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সরাসরি দণ্ডিত করার ব্যবস্থা করা হয়। লুই ফিলিপ দমন নীতির সাহায্যে তাঁহার বিরোধীদের স্তব্ধ করিয়া দেওয়ার চেষ্টা করেন। ইহার ফলে তাঁহার শাসন সম্পর্কে ঘৃণা দেখা দেয়।


লুই ফিলিপ

ইতিমধ্যে তিনি গুইজো নামক এক ব্যক্তিকে মন্ত্রীসভা গঠনের ভার দেন। গুইজো (Guizot) ছিলেন বিদ্বান ও সুবক্তা। তিনি লুই ফিলিপের আস্থাভাজন লোক ছিলেন। গুইজোর মতামত লুই ফিলিপের খুবই মনোমত হয়। গুইজো বলেন যে সংবিধানে রাজার পদ যখন আছে তখন রাজার ক্ষমতা থাকিতে বাধ্য। (Throne is not an empty chair) "সিংহাসন শুধুমাত্র একটি খালি চেয়ার নহে।" আইন সভার ক্ষমতা

থাকিলেও, রাজার ক্ষমতা আছে। গুইজো আইন সভায় (Chambers) রাজার সমর্থক বাড়াইবার জন্য নির্বাচনে কারচুপি ও নির্বাচিত সভ্যদের হাত করার ব্যবস্থা করেন। নির্বাচনের সময় টাকা ছড়াইয়া তিনি রাজার সমর্থকদের নির্বাচিত করেন। নির্বাচিত সদস্যদের নগদ টাকা, কনট্রাক্ট প্রভৃতি দিয়া রাজার অনুকূলে আনেন। লোকে ঠাট্টা করিয়া ইহাকে "Payes Legal" বা আইন সঙ্গত উৎকোচ বলিতে থাকে। এইভাবে আইন সভার অধিকাংশ সভ্য রাজার পক্ষভুক্ত হইলে আইন সভার স্বাধীন চরিত্র বিনষ্ট হয়। লুই ফিলিপ যাহা বলেন আইন সভা তাহাই সমর্থন করে। আইন সভার সভ্যরা প্রজাদের প্রতিনিধি না হইয়া রাজার দরবারী সদস্যে পরিণত হন। স্বাধীনচিত্ত থিয়ার্স (Thiers) নামে এক সদস্য এজন্য তাহাদের ধিক্কার দিয়া বলেন যে, "ফরাসী আইনসভা হইল একটি বাজার, যেখানে সভ্যগণ বিবেক বিনিময় করেন"। এইভাবে সংবিধানের আড়ালে লুই ফিলিপ স্বৈর শাসন স্থাপন করেন।

লুই ফিলিপের বুর্জোয়া অর্থনীতি, স্বশাসন ও বৈদেশিক নীতির ব্যর্থতা ফরাসী জাতিকে হতাশ করে। এই সরকার সম্পর্কে লোকে আগ্রহ হারাইয়া ফেলে। ফরাসী কবি ও দার্শনিক লা মার্টিন বলেন যে "ফ্রান্স ক্লান্ত ও বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছে" (France is bored)।

লুই ফিলিপের মন্ত্রী গুইজো নির্বাচনে দুর্নীতি সৃষ্টি করিলে ইহার প্রতিবিধানের জন্য উদারনৈতিক দল ভোটাধিকার বাড়াইবার দাবী জানায়। ইহার ফলে প্যারিসে দারুন উত্তেজনা দেখা দেয়। উদারনৈতিক দল ভোটাধিকার বাড়াইবার দাবীতে ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৮৪৮ খ্রীঃ প্যারিসের ময়দানে এক জমায়েত করে। গুইজো এই সভা নিষিদ্ধ করিলে, জনতা ক্ষিপ্ত হইয়া "গুইজো নিপাত যাক" ধ্বনি দিয়া গুইজোর গৃহ আক্রমণ করে। সশস্ত্র রক্ষীগণের সহিত জনতার সংঘর্ষ হয়। কিছু লোক নিহত হয়। ইতিমধ্যে প্রজাতন্ত্রী ও সমাজতান্ত্রিক দল, ছাত্র ও শ্রমিকেরা এই বিপ্লবে যোগ দেয়। অবস্থা আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গেলে লুই ফিলিপ পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। এইভাবে ফ্রান্সে জুলাই রাজতন্ত্রের পতন ঘটে।

ভোটাধিকার সম্প্রসারণের দাবী ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা; ফেব্রুয়ারী বিপ্লব

লুই ফিলিপের শাসননীতির বিফলতা কেবলমাত্র এই বিপ্লবের জন্য দায়ী ছিল না। ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারা ফ্রান্সের জনমানসে গভীর অস্থিরতা সৃষ্টি করে। যতদিন না এই ভাবধারা ফ্রান্সে স্বীকৃতি পায় ততদিন বারে বারে পুরাতন ব্যবস্থাকে ফেলিয়া দেওয়ার চেষ্টা চলে। ডেভিড টমসনের ভাষায় বলা যায় যে, "যেমন পুরাতন বোতল নূতন টগবগে মদ্যকে ধরিয়া রাখিতে পারে না, বোতল ফাটিয়া যায়, সেইরূপ রাজতন্ত্র ও রক্ষণশীলতা নূতন ভাবধারার আঘাত সহ্য করিতে পারে নাই।"

ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারার প্রভাব

লুই ফিলিপের মন্ত্রী গুইজোর দুর্নীতিময় শাসনের অবসান এবং পার্লামেণ্টে নির্বাচনের ভোটাধিকার বাড়াইবার দাবী জানাইয়া উদারনৈতিক দল ১৮৪৮-এর ২২শে ফেব্রুয়ারী প্রথম সশস্ত্র বিপ্লব আরম্ভ করে। পরদিন ফ্রান্সের প্রজাতন্ত্রী দল এই বিপ্লবে

যোগ দেয়। উদারতন্ত্রীগণের লক্ষ্য ছিল ফ্রান্সে পুনরায় একটি নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র স্থাপন। কিন্তু প্রজাতান্ত্রিক দল এই আদর্শে বিশ্বাস করিত না। তাহারা ফরাসী বিপ্লবের ত্রিবর্ণ পতাকা লইয়া প্রজাতন্ত্র ও প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার দাবী করে। উদারনৈতিক দল বিপ্লবের উপর নিয়ন্ত্রণ হারায়। প্রজাতন্ত্রীদের চাপে লুই ফিলিপ পদত্যাগ করেন। প্যারিসের জনতার সাহায্যে প্রজাতন্ত্রীরা ফ্রান্সে দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করে। সমাজতান্ত্রিক দল তাহাদের সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচীর ভিত্তিতে দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের সামিল হয়। ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সে দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র ও প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার স্থাপিত হয়। বেকারদের জন্য জাতীয় কর্মসংস্থা (National Workshop) স্থাপিত হয়। কিন্তু দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র ফ্রান্সে অধিকদিন স্থায়ী হয় নাই। প্রজাতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রীগণের অন্তর্বিরোধের ফলে দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র ক্ষয় পায়। এই সুযোগে বোনাপার্টিস্ট দলের নেতা লুই নেপোলিয়ন প্রজাতন্ত্রের সভাপতি নির্বাচিত হইয়া দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের উচ্ছেদ করেন। ঐতিহাসিক সি. ডি. হ্যাজেনের মতে "ফ্রান্সের ফেব্রুয়ারী বিপ্লব ছিল অসাধারণ দ্রুত, সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত এবং অত্যন্ত চরমপন্থী।"[১] যাহা হউক, ১৮৪৮ খ্রীঃ বিপ্লবের ফলে ফরাসী প্রজাতন্ত্র একেবারেই ধ্বংস হয়।

ফ্রান্সের বাহিরে জার্মানীর প্রাশিয়া, ব্যাভেরিয়া প্রভৃতি স্থানে, অষ্ট্রিয়ায় ও অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের বোহেমিয়া, হাঙ্গেরী, উত্তর ইতালিতে এবং অবশিষ্ট ইতালীতে ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের প্রভাবে বিরাট অভ্যুত্থান ঘটে। গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ এই বিপ্লবের অভিঘাতকে প্রবল শক্তিশালী করে। মেটারনিকতন্ত্রের পতন ঘটে (বিস্তারিত বিবরণ সপ্তম অধ্যায় পৃঃ ১১১ দেখ)। ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের আঘাতে ভিয়েনা চুক্তির বহু অংশে ফাটল ধরে। ইওরোপে পুরাতনতন্ত্রের পতন আসন্ন হয়।

১৭৮৯ খ্রীঃ ফরাসী বিপ্লব; ১৮৩০ খ্রীঃ জুলাই বিপ্লব; ১৮৪৮ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের তুলনা (Comparison between the Revolution of 1789, 1830 and 1848): ফ্রান্সে এক পুরুষের মধ্যে তিনটি বিপ্লব ঘটে। বহু লোক নিজ জীবনে মহান ফরাসী বিপ্লব; নেপোলিয়নের উত্থান-পতন; জুলাই বিপ্লব ও বুরবোঁ শাসনের অবসান; ফেব্রুয়ারী বিপ্লব ও রাজতন্ত্রের পতন প্রত্যক্ষ করে। ফ্রান্স যেন দৈত্যের ন্যায় লম্বা পা ফেলিয়া ইতিহাসের আঙিনায় দ্রুত আগাইতে থাকে। ফ্রান্সের এই তিনটি বিপ্লবের মধ্যে সঙ্গতি ও পার্থক্য উভয়ই দেখা যায়। কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন যে ১৭৮৯ খ্রীঃ বিপ্লবে যে পরিবর্তনের সূচনা দেখা দেয় ১৮৪৮ খ্রীঃ বিপ্লবে তাহা পূর্ণতা লাভ করে। সমুদ্রের তরঙ্গ যেমন উপকূলে বার বার আছড়াইয়া পড়ে, বিপ্লবের তরঙ্গ এইরূপ বার বার ফ্রান্সে আছড়াইয়া পড়ে এবং পুরাতন তন্ত্রের এই রেখাকে ক্ষয় করিয়া দেয়। ১৭৮৯ খ্রীঃ বিপ্লবে সামন্ত প্রথা, ক্যাথলিক গীর্জা, অভিজাততন্ত্রের পতন ঘটে। কিন্তু ১৮১৫ খ্রীঃ ভিয়েনা চুক্তির দ্বারা তাহাকে ফ্রান্সে পুনরায় ফিরাইয়া আনা হয়। ১৮৩০ খ্রীঃ জুলাই বিপ্লব পুনরায় এই প্রথাগুলিকে

১. "The Revolution of 1848 was extra ordinarily swift, entirely unexpected and extremely radical"—C. D. Hazen.

ধ্বংস করে। মধ্যবিত্ত বা বুর্জোয়া শ্রেণী জুলাই বিপ্লবে ক্ষমতা পায়। বুর্জোয়া শ্রেণী তাহাদের হাতে ক্ষমতা রাখিবার জন্য সম্পত্তির ভিত্তিতে ভোটের ব্যবস্থা করে। দরিদ্র সম্পত্তিহীন লোকেরা ভোটের অধিকারে বঞ্চিত হয়। নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র দ্বারা মধ্যবিত্ত শ্রেণী ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত করে। কিন্তু বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এই স্বার্থপর ব্যবস্থা ১৮৪৮ খ্রীঃ বিপ্লবে ধ্বংস হয়। ১৮৪৮ খ্রীঃ বিপ্লবে প্রজাতন্ত্র ও সর্বসাধারণের ভোটাধিকার স্থাপিত হইলে সমাজে খাটিয়া খাওয়া মধ্যবিত্ত, কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র রাজনৈতিক অধিকার পায়। ফ্রান্সে প্রকৃত গণতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপিত হয়। এই দিক হইতে এই তিন বিপ্লবের মধ্যে একটি ঐক্য দেখা যায়।

তবে এই তিন বিপ্লবে তিন শ্রেণী ক্ষমতা পায়। ১৭৮৯ খ্রীঃ বিপ্লব ছিল অভিজাতদের বিরুদ্ধে বুর্জোয়াদের সংগ্রাম ; ১৮৩০ খ্রীঃ বিপ্লব ছিল মূলতঃ তাহাই। তবে তাহাতে সাধারণ লোকেও যোগ দেয়। ১৮৪৮ খ্রীঃ বিপ্লব ছিল বুর্জোয়াতন্ত্রের বিরুদ্ধে সাধারণ লোকে স্বাধিকার স্থাপন। ইহাই ছিল এই তিন বিপ্লবের শ্রেণীচরিত্র।

সর্বশেষে এই তিন বিপ্লব ছিল ইওরোপে নব সমাজ গঠনের ধাপ। শিল্প বিপ্লব, গণতান্ত্রিক বিপ্লব নব ইওরোপকে নূতন ভাবে উদ্দীপ্ত করে।

গ্রীসের স্বাধীনতার যুদ্ধ (The Greek war of Independence) : গ্রীসদেশেই ইওরোপের প্রাচীন সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল। প্রাচীন গ্রীসের দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য ইওরোপের পুনর্জাগরণ বা রেনেসাঁসের ক্ষেত্র সৃষ্টি করে। প্রাচীন যুগে গ্রীস এত উন্নতি করিলেও ষোড়শ শতকে গ্রীস স্বাধীনতা হারাইয়া তুরস্কের অধীন হইয়া যায়। দীর্ঘকাল তুরস্কের অধীন থাকিবার পর অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে গ্রীক জাতির রেনেসাঁস বা জাগরণ ঘটে। গ্রীক সাহিত্যের মাধ্যমে গ্রীসের লুপ্ত জাতীয়তাবাদ আবার নবজীবন পায়। স্বাধীনতা-কামী খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী গ্রীক জাতি ইসলাম ধর্মাবলম্বী তুরস্কের হাত হইতে মুক্তি লাভের জন্য চঞ্চল হইয়া উঠে। তাছাড়া তুর্কীগণ ছিল প্রাচ্য দেশীয় ও গ্রীকগণ ছিল পাশ্চাত্য-দেশীয়। ধর্মগত ও সভ্যতাগত পার্থক্যের জন্য গ্রীকগণ তুরস্কের শাসনকে সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিল না। যদিও তুর্কী সরকার গ্রীকগণের প্রতি উদার ব্যবহার করিত এবং গ্রীকগণকে মোটামুটি স্বায়ত্বশাসন দেয় তবুও গ্রীকগণ পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্য ব্যগ্র হয়। 'ফিলকে হেটাইরিয়া' নামে এক গুপ্ত সমিতির মাধ্যমে গ্রীসের স্বাধীনতা লাভের জন্য সংগঠনের কাজ চলে। গ্রীকরা আশা করে যে তাহাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে তাহারা রাশিয়ার সাহায্য পাইবে। কারণ জারের বহুমন্ত্রী ও রাশিয়ার গণ্যমান্য লোকেরা ফিলকে হেটাইরিয়ার সভ্য ছিলেন।

গ্রীক জাতীয়তাবাদের উদ্ভব

গ্রীসের অন্তর্গত মোলদাভিয়ার শাসনকর্তা আলেকজাণ্ডার হিপসিল্যাণ্টি ১৮২১ খ্রীঃ তুরস্কের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম যুদ্ধ ঘোষণা করেন। রাশিয়ার জার তুরস্কের বিরোধী ছিলেন। তিনি স্বভাবতই গ্রীসের প্রতি সহানুভূতি দেখান। হিপসিল্যাণ্টির আশা ছিল যে তিনি গ্রীসের স্বাধীনতা যুদ্ধে রাশিয়ার জারের সামরিক সহায়তা পাইবেন। কিন্তু ইওরোপের রক্ষণশীল রাষ্ট্রগুলি

মোলদাভিয়ার বিদ্রোহ

ও শক্তি সমবায়ের চাপের ফলে রাশিয়ার জার গ্রীস হইতে হাত গুটাইতে বাধ্য হন। ইহার ফলে তুর্কীগণ মোলদাভিয়ার বিদ্রোহ দমন করেন।

ইহার পর গ্রীসের মোরিয়া প্রদেশে এক ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দেয়। এই বিদ্রোহ ক্রমে সমগ্র গ্রীসে ছড়াইয়া পড়ে। এই বিদ্রোহ খ্রীষ্টান ও মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক যুদ্ধের রূপ নেয়। গ্রীকগণ কিছুসংখ্যক তুর্কীকে হত্যা করিলে তুর্কীগণ প্রতিশোধের জন্য গ্রীক গীর্জার প্রধান পুরোহিত প্যাট্রিয়ার্ককে হত্যা করিয়া তাঁহার দেহ বস্ফোরাসের জলে ফেলিয়া দেয় এবং নারীগণকে ক্রীতদাসীতে পরিণত করে। ইতিমধ্যে তুরস্কের সুলতান গ্রীক বিদ্রোহ দমনের সংকল্প নেন। তিনি মিশরের শাসক মহম্মদ আলিকে তাঁহার সুশিক্ষিত সেনাদল লইয়া গ্রীক বিদ্রোহ দমনের জন্য নিয়োগ করেন। মহম্মদ আলির পুত্র ইব্রাহিম পাশা ১৮২৪ খ্রীঃ গ্রীসে আসিয়া প্রচণ্ড হত্যালীলা চালাইতে থাকেন। খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী গ্রীকগণের প্রাণহানিতে ইওরোপীয় খ্রীষ্টান জনমত বিক্ষুব্ধ হয়। তুরস্কের বিরুধে ইওরোপে বিরাগ দেখা দেয়। ইওরোপের বিভিন্ন দেশ হইতে স্বেচ্ছাসেবকগণ গ্রীসের সাহায্যে আসে। লর্ড বায়রণ স্বয়ং স্বেচ্ছাসেবক হইয়া গ্রীসের যুদ্ধে যোগ দেন। রাশিয়ার জার গ্রীসের পক্ষ লইয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে সামরিক হস্তক্ষেপের জন্য ব্যস্ত হন।

গ্রীসের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিস্তৃতি

এদিকে ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশগুলি মনে করে যে রাশিয়া একা তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামিলে তুরস্ক ধ্বংস হইবে এবং রাশিয়ার ক্ষমতা বাড়িবে। এজন্য ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া একযোগে লণ্ডনের চুক্তি দ্বারা ১৮২৭ খ্রীঃ স্থির করে যে গ্রীসকে স্বায়ত্ত শাসন দিতে তুরস্ককে বাধ্য করা হইবে। এই উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া এই ত্রিশক্তির নৌবাহিনী গ্রীসে উপস্থিত হয়। ইংরাজ সেনাপতি এ্যাডমিরাল কডরিংটনের হাতে ন্যাভারিনোর যুদ্ধে তুর্কী নৌবহর ধ্বংস হয়। তুরস্ক সম্পূর্ণ ধ্বংস হইলে পূর্ব ইওরোপে রাশিয়ার ক্ষমতা বাড়িবে বলিয়া ব্রিটিশ সরকার ভীত হন। এজন্য ন্যাভারিনোর যুদ্ধের পর ইংলণ্ড ও ফ্রান্স গ্রীস হইতে হাত গুটাইয়া নেয়। রুশ বাহিনী গ্রীসে একক যুদ্ধ চালাইয়া তুরস্ককে 'এ্যাড্রিয়ানোপলের সন্ধি ১৮২৮ খ্রীঃ স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করে। এই সন্ধি দ্বারা রাশিয়ার রক্ষণাধীনে গ্রীস স্বাধীনতা লাভ করে। মোলদাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া প্রদেশ রুশ আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হয়। দার্দানালিস প্রণালীতে রুশ জাহাজ চলাচলের দাবী স্বীকৃত হয়।

বৃহৎ শক্তির হস্তক্ষেপ : এ্যাড্রিয়ানোপলের সন্ধি

এ্যাড্রিয়ানোপলের সন্ধির দ্বারা পূর্ব ইওরোপে রাশিয়ার ক্ষমতা বাড়িয়া গেলে ইংলণ্ড ভীত হইয়া পড়ে। ইংলণ্ডের আশংকা হয় যে রাশিয়া তুরস্কের সাম্রাজ্য গ্রাস করিবে এবং ভূমধ্যসাগরে আধিপত্য স্থাপন করিবে। সুতরাং ইংলণ্ড, অস্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশ রাশিয়াকে এই সন্ধি পরিবর্তনের জন্য চাপ দেয়। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের ভয়ে রাশিয়া এ্যাড্রিয়ানোপলের সন্ধি পরিবর্তনে রাজী হয়। লণ্ডনের সন্ধি দ্বারা গ্রীস স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে

ইংলণ্ডের হস্তক্ষেপ লণ্ডনের সন্ধি

আত্মপ্রকাশ করে। ব্যাভেরিয়ার রাজবংশের একজন লোক গ্রীসের রাজা হন। এ্যাড্রিয়ানোপলের সন্ধির অন্যান্য শর্ত রাশিয়া ত্যাগ করে।

ফরাসী বিপ্লবের জাতীয়তাবাদী আদর্শ বলকান উপদ্বীপেও ছড়াইয়া যায়। গ্রীসের স্বাধীনতা যুদ্ধ বলকান উপদ্বীপে জাতীয়তাবাদী জাগরণের প্রথম প্রকাশ। গ্রীসের স্বাধীনতা লাভের ফলে বলকানের অন্যান্য দেশে তুরস্কের হাত হইতে স্বাধীনতা লাভের জন্য বিক্ষোভ আরম্ভ হয়। রাশিয়া বলকান জাতীয়তাবাদকে সমর্থন করিয়া এই সুযোগে ক্ষমতা বিস্তারের চেষ্টা করে। অপরদিকে ইংলণ্ড প্রভৃতি শক্তিগুলি তুরস্কের সাম্রাজ্যকে কায়েম রাখিয়া রাশিয়াকে ঠেকাইবার চেষ্টা করে। এইভাবে পূর্বাঞ্চল সমস্যার সৃষ্টি হয়।

গ্রীসের স্বাধীনতার যুদ্ধের গুরুত্ব

সপ্তম অধ্যায়

মধ্য শতাব্দীর জাতীয়তাবাদী বিপ্লব (১৮৪৮-৫০ খ্রীঃ)

(The Mid Century Nationalist Revolutions of 1848-50)

১৮৪৮ খ্রীঃ ইওরোপে ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের প্রসার (Spread of the February Revolution in Europe in 1848)ঃ ফ্রান্সে ১৮৪৮ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী বিপ্লব দেখা দিলে এই বিপ্লব ইওরোপের দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়ে। অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ যেমন খড়ের গাদায় বা ফোঁপরা কাঠের গাদায় পড়িলে বিরাট অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি হয় তেমনই ফ্রান্স হইতে বিপ্লবের স্ফুলিঙ্গ ইওরোপের ফোঁপরা কাঠের গাদায় পড়িয়া দাবানল সৃষ্টি করে।[১] সমগ্র মধ্য ইওরোপে বিপ্লব সহস্র ফণা তুলিয়া আত্মপ্রকাশ করে। হল্যাণ্ড হইতে হাঙ্গেরী, সিসিলি হইতে স্লেসউইগ সর্বত্রই বিপ্লব দেখা দেয়। ইওরোপের সমাজ জীবনে বারুদ জমা হইয়াছিল। ফেব্রুয়ারী বিপ্লব তাহাতে আগুনের পলিতার কাজ করে। স্বৈরাচারী শাসন, মেটারনিকতন্ত্র ও রক্ষণশীলতা ইওরোপে বিপ্লবের ক্ষেত্র তৈয়ারী করে। শিল্প-বিপ্লবের ফলে ধীরে ধীরে পুরাতন সমাজ ব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়িতেছিল। উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণী স্বৈরতান্ত্রিক শাসনে ক্লান্ত হইয়া পড়ে। তাহারা উদারতন্ত্র, ভোটাধিকার, ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও অবাধ বাণিজ্য প্রভৃতি দাবী জানায়। এদিকে ভিয়েনা কংগ্রেসের দ্বারা ইওরোপের অবদমিত জাতীয়তাবাদ আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজিতেছিল। জার্মানী, ইতালী ও হ্যাপসবার্গ সাম্রাজ্যে জাতীয়তাবাদ প্রবল ছিল। মেটারনিকতন্ত্রের পক্ষে ইহা দাবাইয়া

ইওরোপে বিপ্লব ছড়াইয়া পড়িবার কারণ

শিল্প-বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া

---

১. "The spark that flew from France fell upon the unsound timbers of Europe and caused a great conflagration". Ketelbey.

রাখা সম্ভব ছিল না। ফ্রান্সে ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের সুযোগে ইওরোপের উদারতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ সহস্র ফণা তুলিয়া জাগিয়া উঠে। প্রতিক্রিয়াশীলতা ও স্বৈরতন্ত্র কিছু দিনের জন্য মুখ থুবড়াইয়া পড়ে। এইজন্য ১৮৪৮ খ্রীঃ কে ঐতিহাসিকগণ "Year of Revolution" বা "বিপ্লবের বৎসর" বলিয়া অভিহিত করেন।

জাতীয়তাবাদ, উদারতন্ত্রের প্রভাব

ইওরোপের প্রায় ১৫টি স্থানে বিপ্লব ঘটে। এই বিপ্লবগুলি প্রধানতঃ নগরগুলিকে কেন্দ্র করিয়া ঘটে। প্যারিস, বার্লিন, ভিয়েনা, মিলান, বুডাপেস্ট, রোম প্রভৃতি নগরগুলিই ছিল বিপ্লবের প্রধান কেন্দ্র।

১৮৪৮ খ্রীঃ-এর বিপ্লবের প্রথম বিস্ফোরণ ফ্রান্সে দেখা যায়। লুই ফিলিপের বুর্জোয়া শাসনের অবসান ঘটে। ফ্রান্সে দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়। ফ্রান্সে সর্ব-সাধারণের ভোটাধিকার, ব্যক্তি স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়। সমাজতন্ত্রীগণের প্রভাবে কিছু কিছু সমাজতান্ত্রিক সংস্কারও চালু করা হয়। (বিস্তারিত বিবরণ পৃঃ ১০৩ দেখ)।

ফ্রান্সে ১৪৮৪ খ্রীঃ বিপ্লব

ফ্রান্স হইতে পূর্বদিকে রাইন নদী পার হইয়া প্রাশিয়ায় বিপ্লব ছড়াইয়া পড়ে। প্রাশিয়ার রাজধানী বার্লিনের রাস্তায় খণ্ডযুদ্ধে প্রায় ২০০ লোক নিহত হয়। ঝড়ের চাপে বাঁশ যেমন নুইয়া পড়ে এবং ঝড় চলিয়া গেলে সোজা হইয়া যায়, প্রাশিয়ার রাজা চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়াম, সেই নীতি লইয়া আপাততঃ জনতার দাবী মানিয়া নেন। তিনি নির্বাচিত পার্লামেণ্ট, ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রভৃতি দাবী স্বীকার করেন। এমন কি দরকার হইলে তিনি জার্মানীর ঐক্যের জন্য লড়িতে স্বীকৃতি দেন। প্রাশিয়ার অনুকরণে জার্মানীর ব্যাভেরিয়া, ব্যাডেন, স্যাক্সনী, হ্যানোভার, হেসি প্রভৃতি জার্মান রাষ্ট্রের অধিপতিগণও সাংবিধানিক শাসন ও উদারতন্ত্র গ্রহণ করেন। এইভাবে জার্মানীতে উদারতান্ত্রিক শাসন জোরদার হয়।

জার্মানীর উদারতন্ত্রী বিপ্লব

ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের সুযোগে জার্মান জাতীয়তাবাদীগণ জার্মানীকে এক ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করিবার জন্য আগাইয়া আসে। নেপোলিয়নের আক্রমণের সময় হইতে জার্মান জাতীয়তাবাদের জাগরণ ঘটিয়াছিল। জার্মান সাহিত্যিক গ্যেটে, শিলার প্রভৃতির রচনা, জার্মান লোক সাহিত্য, জার্মান দার্শনিক ফিশটে, হেগেল প্রভৃতির মতবাদ জার্মান জাতীয়তাবাদের উদ্ভবে সহায়তা করে। ভিয়েনা কংগ্রেসে স্থাপিত জার্মানীর ৩৯টি রাজ্যের বুন্ড সংবিধান পাল্টাইয়া ঐক্যবদ্ধ জার্মানীর নূতন সংবিধান গড়িবার জন্য জাতীয়তাবাদীগণ জার্মানীর ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরে এক সংবিধান সভা আহবান করে। এই সভার নাম ছিল ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেণ্ট। সর্বসাধারণের ভোটের ভিত্তিতে এই পার্লামেণ্ট গঠিত হয়। এই পার্লামেণ্ট জনগণই আহবান করে। কোন সরকার এই পার্লামেণ্ট আহবান করে নাই। এই কারণে ঐতিহাসিক কেটেলবি ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেণ্টকে "বিপ্লবী জাতীয়তাবাদের প্রস্ফুটিত কুসুম" (Flower of revolutionary patriotism) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই পার্লামেণ্ট

ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্ট

জার্মানীর বর্তমান সীমান্ত লইয়া এক ঐক্যবদ্ধ জার্মান জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। এই রাষ্ট্রের নিয়মতান্ত্রিক শাসক হিসাবে প্রাশিয়ার রাজা চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়ামকে মনোনীত করা হয়। তিনি ইংলণ্ডের রাজার ন্যায় নিয়মতান্ত্রিক রাজা থাকিবেন বলিয়া স্থির করা হয়। জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত পার্লামেণ্টকে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস বলিয়া বলা হয়। কিন্তু ফ্রাংকফুর্ট পার্লামেণ্ট সফলতার তট-রেখার নিকটে আসিয়া বিনষ্ট হয়। এই পার্লামেণ্টে কেবলমাত্র মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী-গণের প্রাধান্য থাকায় শ্রমিক ও কৃষকেরা শীঘ্রই এই পার্লামেণ্ট সম্পর্কে আগ্রহ হারায়। দ্বিতীয়তঃ, সভ্যগণ বৃথা তর্কে ও নীতিগত প্রশ্নে অযথা সময় নষ্ট করেন। ইতিমধ্যে বিপ্লবের উদ্যম ঝিমাইয়া পড়ে। তৃতীয়তঃ, এই পার্লামেণ্ট কোন সরকার কর্তৃক সমর্থিত না হওয়ায় ইহার নিজস্ব সেনা বা পুলিশ ছিল না। সুতরাং এই পার্লামেণ্টের মতকে কার্যকরী করা সম্ভব ছিল না। সর্বশেষে অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার বিরোধিতায় ফ্রাংকফুর্ট পার্লামেণ্ট ভাঙিয়া যায়। জার্মানীর গণতান্ত্রিক ঐক্যের স্বপ্ন ব্যর্থ হয়।

ইতিমধ্যে বিপ্লবের ঢেউ, জার্মানী ছড়াইয়া অষ্ট্রিয়ার হ্যাপসবার্গ সাম্রাজ্যে ঢুকিয়া পড়ে। ইহার ফলে মেটারনিকতন্ত্রের পতন ঘটে। অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় মধ্যবিত্ত ও ছাত্র সমাজ ভোটাধিকার ও সংবিধানের দাবীতে বিপ্লব আরম্ভ করে। মেটারনিক অষ্ট্রিয়া হইতে পলাইয়া ইংলণ্ডে আশ্রয় নেন। অষ্ট্রিয়ার সম্রাট একটি পার্লামেণ্ট আহবান করেন। অষ্ট্রিয়ার সম্রাট রাজধানী ভিয়েনা ছাড়িয়া ইনসব্রাক শহরে আশ্রয় নেন। অষ্ট্রিয়ার গণতান্ত্রিক বিপ্লব সফল হয়।

অষ্ট্রিয়ায় বিপ্লব

এদিকে অষ্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশে জাতীয়তাবাদী বিপ্লব মাথা তুলে। ইহার ফলে অষ্ট্রিয়ার সাম্রাজ্য ধ্বংসের সম্মুখীন হয়। (১) হাঙ্গেরীর জাতীয় নেতা লুই কসাথের (Louis Kossuth) নেতৃত্বে মডেয়ার-গণ (Magyar)[১] হাঙ্গেরীর স্বাধীনতা ঘোষণা করে। হাঙ্গেরীতে স্বতন্ত্র পার্লামেণ্ট, মন্ত্রীসভা ও ভোটাধিকার বহাল হয়। মার্চ সংবিধান (March Laws) দ্বারা হাঙ্গেরীর মডেয়ার জাতীয়তাবাদ স্বীকৃত হয়। (২) বোহেমিয়ায় সংখ্যা-গরিষ্ঠ চেক জাতিও বিদ্রোহ করে। বোহেমিয়ার রাজধানী প্রাগে (Prague) ফেব্রুয়ারী বিপ্লব দেখা দেয়। চেক জাতীয়তাবাদীগণ বোহেমিয়াকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করে। বোহেমিয়ায় ভোটাধিকার ও পার্লামেণ্ট স্থাপিত হয়। (৩) উত্তর ইতালীর মিলান নগরে ১৮৪৮ খ্রীঃ বিপ্লব ছড়াইয়া পড়ে। উত্তর ইতালী ছিল অষ্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যভুক্ত। ইতালীয় জাতীয়তাবাদীগণ অষ্ট্রিয়ার সেনাদলকে হঠাইয়া দেয়। অষ্ট্রিয়ার সেনাপতি রেডেটস্কি (Redetezky) কোয়াড্রিল্যাটার্যাল দুর্গে আত্মরক্ষা করেন। (৪) অষ্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যভুক্ত দক্ষিণ হাঙ্গেরীতেও একটি জাতীয়তাবাদী বিপ্লব ঘটে। দক্ষিণ হাঙ্গেরীর ক্রোট জাতি সেনাপতি জেলাকিকের (General Jellacic) নেতৃত্বে স্বতন্ত্র ক্রোট জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র স্থাপন করে। এইভাবে অষ্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যের পাঁচটি স্থানে বিপ্লব ঘটে।

অষ্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যের বিপ্লব

১. Magyar—উচ্চারণ ম্যাগিয়ার না হইয়া মডেয়ার হইবে Vide Oxford Dictionary.

ইতালীর জাতীয়তাবাদীগণ ইতালীকে বৈদেশিক শাসন হইতে মুক্ত ও ঐক্যবদ্ধ করিবার জন্য বিপ্লব ঘটান। সার্ডিনিয়ার রাজা চার্লস এলবার্ট জনসাধারণকে স্ট্যাটুটো (Statuto) নামে এক সংবিধান দান করেন। তিনি সার্ডিনিয়ার জাতীয় রাজতন্ত্রের অধীনে ইতালীকে ঐক্যবদ্ধ করিবার জন্য অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। কিন্তু অষ্ট্রিয়ার নিকট কাস্টোজার (Custozza) যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় তাঁহার প্রচেষ্টা বিফল হয়। এদিকে ইতালীয় প্রজাতন্ত্রবাদীগণ ম্যাৎসিনীর আদর্শে মধ্য ইতালীর রাজ্যগুলিতে বিপ্লব ঘটান। ম্যাৎসিনী তাঁহার ইয়ং ইতালী দলের সাহায্যে রোমে এক প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করেন। ম্যাৎসিনীর আশা ছিল যে এই প্রজাতন্ত্রের মাধ্যমে তিনি সমগ্র ইতালীকে ঐক্যবদ্ধ করিবেন।

ইতালীর জাতীয়তাবাদী বিপ্লব

বন্যার জল যেমন কিছুকাল সব ভাসাইয়া দিয়া ধীরে ধীরে সরিয়া যায়, তেমনই ফেব্রুয়ারী হইতে আগষ্ট, ১৮৪৮ খ্রীঃ বিপ্লব পূর্ণবেগে চলিবার পর ইহার স্রোতে ভাঁটা পড়ে। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি দমন নীতির দ্বারা বিপ্লবকে ধ্বংস করে। ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রীগণের গৃহযুদ্ধের ফলে বিপ্লবের ভাবাদর্শ নষ্ট হয়। সেই সুযোগে বোনাপার্টবাদী নেতা লুই নেপোলিয়ন ক্ষমতা দখল করেন। অষ্ট্রিয়ার সেনাপতি ভিণ্ডিসগ্রাৎস (Windisch Gratz), রাশিয়ার জার প্রথম নিকোলাসের সামরিক সাহায্য লইয়া ভিয়েনা ও অন্যান্য প্রদেশে বিদ্রোহ দমন করেন। অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যে রক্ষণশীল শাসন ব্যবস্থা আবার ফিরিয়া আসে। চেক, মডেয়ার প্রভৃতি জাতিগুলি পুনরায় অষ্ট্রিয়ার অধীনতা মানিতে বাধ্য হয়। জার্মানীতে অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া যৌথভাবে ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেণ্ট ভাঙিয়া দিয়া জার্মান জাতীয়তাবাদকে দমাইয়া দেন। অষ্ট্রিয়া উত্তর ইতালীর বিদ্রোহ দমন করে। ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন ম্যাৎসিনীর রোম প্রজাতন্ত্র ধ্বংস করেন। মাৎসিনীর বীর শিষ্য গ্যারিবল্ডী রোম প্রজাতন্ত্র রক্ষার জন্য বাধা দিয়া পরাস্ত হন। ইতালীর বিপ্লবের শেষ শিখা নিবিয়া যায়। এইভাবে অষ্ট্রিয়া, জার্মানী, ইতালী সর্বত্র প্রতিক্রিয়াশীলতার জয় হয়।

১৮৪৮ খ্রীঃ বিপ্লবের বিফলতা

১৮৪৮ খ্রীঃ বিপ্লবের প্রকৃতি ও ফলাফল (The Character and sequel of the Revolutions of 1848-50)ঃ ১৮৪৮ খ্রীঃ বিপ্লব ফ্রান্সে আরম্ভ হইলেও ভূমিকম্পের তরঙ্গের ন্যায় ইহা সমগ্র মধ্য ইওরোপে ছড়াইয়া পড়ে। ১৮৪৮ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী হইতে আগষ্ট মাস পর্যন্ত অন্ততঃ পক্ষে ইওরোপের ১৫টি স্থানে বিপ্লবের ঢেউ ছড়াইয়া পড়ে।

১৮৪৮ খ্রীঃ বিপ্লবে প্রধানতঃ ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারার প্রভাব দেখা যায়। ১৭৮৯ খ্রীঃ ফরাসী বিপ্লবের দুইটি প্রধান ভাবধারা ছিল যথা, উদারতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ। উদারতন্ত্রের অর্থ হইল সম্পত্তির ভিত্তিতে ভোটাধিকার স্থাপন, পার্লামেণ্ট কর্তৃক নির্বাচিত মন্ত্রীসভার দ্বারা শাসন পরিচালনা,

ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব

সম্পত্তির অধিকার রক্ষা, ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রভৃতির স্বীকৃতি। উদারতন্ত্রের মাধ্যমে বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্তগণ ক্ষমতা পায়।

উদারতন্ত্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রাধান্য

১৮৪৮ খ্রীঃ বিপ্লবে এই সকল আদর্শের বিশেষ প্রভাব দেখা যায়। প্রাশিয়া, ব্যাভেরিয়া প্রভৃতি দেশে সম্পত্তির ভিত্তিতে ভোটাধিকার দেওয়া হয়। ইহার ফলে বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীই রাজনৈতিক অধিকার পায়। ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হইলেও, এই প্রজাতন্ত্রে শ্রমিক বা কৃষক শ্রেণীর প্রাধান্য ছিল না। ১৮৪৮ খ্রীঃ বিপ্লবে ফ্রান্সের রাজনৈতিক ক্ষমতা বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাতে চলিয়া যায়। হাঙ্গেরী, বোহেমিয়া প্রভৃতি দেশে এই বিপ্লবে উদারতন্ত্রী মতবাদ প্রাধান্য পায়। অষ্ট্রিয়া বা ভিয়েনাতেও উদারতন্ত্র জয়যুক্ত হয়। সুতরাং ১৮৪৮ খ্রীঃ বিপ্লবকে উদারতন্ত্রী বিপ্লব বলা যায়। ইহা ছিল ফরাসী বিপ্লবের অনুসৃতি।

জাতীয়তাবাদের প্রভাব

ফরাসী বিপ্লবের অপর আদর্শ ছিল জাতীয়তাবাদ। ১৮৪৮ খ্রীঃ বিপ্লবে জাতীয়তাবাদের প্রভাব বিশেষভাবে দেখা যায়। ভিয়েনা চুক্তির দ্বারা জার্মানী, ইতালী প্রভৃতি দেশের জাতীয়তাবাদকে অগ্রাহ্য করিয়া এই দেশগুলিকে ব্যবচ্ছেদ করা হয়। ফেব্রুয়ারী বিপ্লবে জার্মানী ও ইতালীর অবদমিত জাতীয়তাবাদ আগ্নেয়গিরির স্ফুরণের ন্যায় জ্বলিয়া উঠে। অষ্ট্রিয়ার হ্যাপসবার্গ সাম্রাজ্যের প্রদেশগুলিতেও জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহ দেখা দেয়। জার্মান জাতীয়তাবাদের প্রভাবে জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেণ্ট আহূত হয়। অষ্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহ দেখা দেয়। অষ্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যের প্রদেশগুলিতে জার্মান শাসন মুক্ত হইয়া অধীনস্থ জাতিগুলি স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপনের চেষ্টা করে। বোহেমিয়ায় চেক, হাঙ্গেরীতে মডেয়ার, দক্ষিণ হাঙ্গেরীতে ক্রোট ও ইতালীতে ইতালীয় জাতীয়তাবাদ আত্মপ্রকাশ করে।

সুতরাং ১৮৪৮ খ্রীঃ বিপ্লব উদারতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদকে আশ্রয় করিয়া বিস্তার লাভ করে। এই বিপ্লবের ইহাই ছিল সাধারণ প্রকৃতি (Common element)। অর্থাৎ ফেব্রুয়ারী বিপ্লবে বিভিন্ন দেশে উদারতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ এই দুইটি আদর্শের সাধারণ প্রভাব সর্বত্র দেখা দেয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণীই এই বিপ্লবে মুখ্য ভূমিকা নেয়।

নগরকেন্দ্রিক বিপ্লব

১৮৪৮ খ্রীঃ বিপ্লব প্রধানতঃ শহরকে আশ্রয় করিয়া বিকাশ লাভ করে। গ্রামাঞ্চলে ইহার প্রভাব ছিল নগন্য। প্যারিস, বার্লিন, ভিয়েনা, মিলান, প্রাগ, বুডাপেষ্ট, আগ্রাম প্রভৃতি শহর ছিল ইহার পীঠভূমি। ১৮৪৮ খ্রীঃ বিপ্লবের অংশীদার ছিল প্রধানতঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণী। ইহারা প্রধানতঃ শহরবাসী ছিল। শিল্প বিপ্লবের ফলে নগরগুলিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দেয়। এজন্য এই বিপ্লব ছিল প্রধানতঃ নগরকেন্দ্রিক।

১৮৪৮ খ্রীঃ বিপ্লব ইওরোপের ইতিহাসকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। ফ্রান্সে সর্বসাধারণের ভোটাধিকার স্থাপিত হয়। ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্রের আদর্শ জনমানসে গভীর প্রভাব সৃষ্টি করে। জার্মানীতে জাতীয়তাবাদের প্রভাব জার্মানবাসীকে ঐক্যবদ্ধ হইতে

প্রেরণা দেয়। ১৮৪৮ খ্রীঃ জার্মানীর মানসিক ঐক্য স্থাপিত হয়। ইহার উপর ভিত্তি করিয়া বিসমার্ক পরে রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপন করেন। প্রাশিয়া, ব্যাভেরিয়া প্রভৃতি রাজ্যে এই বিপ্লবের ফলে উদারতন্ত্র স্থায়ী হয়। অষ্ট্রিয়ার মেটারনিকতন্ত্র ভাঙিয়া পড়ে। সামন্ততন্ত্র ও অভিজাত শাসনের অবসান হয়। ইতালীতে ম্যাৎসিনী যে উদ্দীপনা সৃষ্টি করেন তাহা কাভুরের সাফল্যের পথ রচনা করে। এই বিপ্লবের প্রভাবে ইংলণ্ডে শ্রমিক কল্যাণ আইন রচিত হয়। ১৮৪৮ খ্রীঃ বিপ্লব ইওরোপে রক্ষণশীলতাকে ধ্বংস করে। ইহা ভিয়েনা চুক্তিতে ফাটল ধরাইয়া দেয়। সাধারণ লোকের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটে। ঐতিহাসিক হেইজের মতে রাজনীতি অভিজাতগণের মুঠা হইতে সরিয়া গিয়া সাধারণ লোকের হাতে চলিয়া যায়। ১৭৮৯ খ্রীঃ ফরাসী বিপ্লবে যে পরিবর্তনের সূচনা হয়, ১৮৪৮ খ্রীঃ বিপ্লবে তাহা পরিণতি লাভ করে।[১]

ফলাফল

১৮৪৮ খ্রীঃ বিপ্লবের বিফলতার কারণ (Causes of the collapse of the Revolutions of 1848)ঃ ১৮৪৮ খ্রীঃ বিপ্লব ফ্রান্স ও অন্যান্য দেশে প্রাথমিক সাফল্যলাভ করিবার পর শেষ পর্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীলতার চাপে বিফল হয়। এই বিফলতার কারণ হিসাবে বলা যায় যে ফ্রান্সে প্রজাতান্ত্রিক সংবিধানের দুর্বলতা ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি বিপ্লবকে বিফল করিয়া দেয়। ফ্রান্সের বাহিরেও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থপরতার জন্য বিপ্লবের পশ্চাতে জনসাধারণের সমর্থন নষ্ট হয়। ঐতিহাসিক হেইজের মতে "১৮৪৮ খ্রীঃ বৈপ্লবিক আলোড়ন ছিল প্রধানতঃ একটি শহুরে মধ্যবিত্তগণের বিদ্রোহ"।[২] শহুরে মধ্যবিত্তশ্রেণী এই বিপ্লবে রাজনৈতিক ক্ষমতা গ্রাস করিয়া দরিদ্র শ্রমিক ও কৃষককে বঞ্চিত করে। ফলে গ্রামাঞ্চলের জনগণ ও শ্রমিক শ্রেণী এই বিপ্লব সম্পর্কে উৎসাহ হারাইয়া ফেলে। দ্বিতীয়তঃ, উগ্রপন্থী সমাজতান্ত্রিকগণ এই বিপ্লবে ব্যক্তিগত সম্পত্তি অধিকারের হুমকী দিলে গ্রামাঞ্চলের কৃষকগণ আতঙ্কিত হয়। তাহারা মনে করে যে বিপ্লবী নেতাগণ তাহাদের জমি বাজেয়াপ্ত করিবে।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থ-পরতা, গণ-সমর্থনের অভাব

বিপ্লবী নেতাগণের মধ্যে সংগঠন ও বাস্তববুদ্ধির অভাব বিপ্লবের পতন ত্বরান্বিত হয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিপ্লবের নেতৃত্ব লইলেও তাহারা সংখ্যায় অল্প ছিল। কৃষক ও শ্রমিকগণকে নিজ পক্ষে আনিবার চেষ্টা না করায় তাহারা দারুণ ভুল করে। এছাড়া বুদ্ধিজীবীগণ বিপ্লব সম্পর্কে এমনই রোমাণ্টিক ধারণা পোষণ করিতেন যে বিপ্লব সফল করিবার মত বাস্তববুদ্ধি তাঁহাদের ছিল না। লা মার্টিনের ন্যায় কবি, ম্যাৎসিনীর ন্যায় ভাববাদী, প্যালকির ন্যায় ঐতিহাসিক এই বিপ্লবের প্রেরণা দিলেও হাতে-কলমে ইহাকে সার্থক করার মত বুদ্ধি তাঁহাদের ছিল না।

বাস্তববুদ্ধির অভাব আদর্শবাদের প্রাবল্য

১. "1848 did for Europe what 1789 had done for France." Hayes.

২. "The revolutionary comotion of 1848......was primarily an urban and middle class affair." Hayes.

১৮৪৮ খ্রীঃ বিভিন্ন দেশে একই সময়ে বিপ্লব দেখা দিলেও সকল বিপ্লবীগণের মধ্যে কোন আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ও সংগঠন স্থাপিত হয় নাই। এক দেশে যখন বিপ্লবের বিরুদ্ধে দমন নীতি চলে অন্য দেশের বিপ্লবীগণ সেই সময় নিরপেক্ষ বা উদাসীন থাকে। আন্তর্জাতিক সংগঠনের অভাবে বিপ্লবীগণ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। ইহার ফলে অষ্ট্রিয়া সরকার একে একে বিপ্লবগুলিকে দমন করিতে সুযোগ পায়।

সংগঠনের অভাব

তাছাড়া রাজতান্ত্রিক সরকারগুলির সেনাদল বিপ্লবী সেনা অপেক্ষা রণকৌশলে দক্ষ ছিল। অভিজ্ঞ সেনাপতিগণ তাহাদের পরিচালনা করেন। জমিদার শ্রেণী ও ধর্মযাজকগণ বিপ্লবীগণের বিরুদ্ধে রাজশক্তির পক্ষ গ্রহণ করে। এছাড়া রাশিয়ার জার নিকোলাস বিপ্লব দমনে তাঁহার সেনাদল নিয়োগ করেন। ইহার ফলে ১৮৪৮ খ্রীঃ বিপ্লব বিফল হয়।

প্রতিক্রিয়াশীলতার শক্তি

অষ্টম অধ্যায়

পূর্বাঞ্চল সমস্যা ঃ বৃহৎ শক্তিগণের সম্পর্ক (১৮৫০-৭১ খ্রীঃ) ঃ ইতালী ও জার্মান ঐক্য আন্দোলন

(The Eastern Question : The Relations of Great Powers : Unification of Italy and that of Germany)

পূর্বাঞ্চল সমস্যা (The Eastern Question) ঃ উনবিংশ শতকের পূর্ব ইওরোপের রাজনৈতিক সমস্যাকে পূর্বাঞ্চল সমস্যা বা Eastern Question নামে অভিহিত করা হয়। পূর্বাঞ্চল সমস্যাকে বিশ্লেষণ করিলে ইহাতে নিম্নলিখিত দিকগুলি লক্ষ্য করা যায়, যথা, তুরস্কের সামরিক ও শাসনগত দুর্বলতা। তুরস্কের মধ্যযুগীয় সমাজ ও শাসন নীতির ফলে তুরস্ক দুর্বল হইয়া পড়ে। তাহার পুরাতনপন্থী সেনাগণ আধুনিক ইওরোপীয় সামরিক শক্তির নিকট নগণ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। তুরস্কের দুর্বলতার ফলে ইওরোপে তুরস্কের নাম হয় "ইওরোপের রুগ্ন মানুষ" (Sickman of Europe)। এই দুর্বল শক্তি লইয়া তুরস্কের পক্ষে পূর্ব ইওরোপীয় সাম্রাজ্য রক্ষা করা শক্ত হইয়া দাঁড়ায়। দ্বিতীয়তঃ, তুরস্কের দুর্বলতার সুযোগে রাশিয়া পূর্ব ইওরোপের বলকান অঞ্চলে নিজ ক্ষমতা প্রসারে আগ্রহ দেখায়। বলকান অঞ্চলের ভাষাগুলি রুশ ভাষা গোষ্ঠীর সহিত সম্পর্ক যুক্ত ছিল। বলকান অঞ্চলের অধিবাসীগণ ছিল খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী। ইহারা গ্রীক সম্প্রদায়ের খ্রীষ্টান ছিল। রাশিয়ার অধিবাসীগণও এই সম্প্রদায়ের খ্রীষ্টান ছিল।

পূর্বাঞ্চল সমস্যার চারিটি দিক

সুতরাং ইসলাম ধর্মাবলম্বী তুর্কীর হাত হইতে স্বজাতি ও স্বধর্মাবলম্বী খ্রীষ্টানগণকে রক্ষার নামে রাশিয়া নিজ ক্ষমতা বিস্তারের চেষ্টা করে। তৃতীয়তঃ, বলকান অঞ্চলে রুশ প্রভাব বিস্তারের সম্ভাবনায় ইংলণ্ড, অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশ আতঙ্কিত হয়। এই অঞ্চলে রাশিয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইলে অষ্ট্রিয়ার নিরাপত্তা বিপন্ন হইত। সমানভাবে ইহা ভূমধ্যসাগরে ইংলণ্ডের নৌ-আধিপত্য ও মিশরে বাণিজ্যিক স্বার্থ বিপন্ন হইত। এমতাবস্থায় ইংলণ্ড, অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি দাবী জানায় যে "তুরস্কের সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা" (Turkish integrity) বজায় রাখিতে হইবে। ইহার অর্থ ছিল যে রাশিয়াকে বলকান অঞ্চলে অনুপ্রবেশের সুযোগ দেওয়া হইবে না। চতুর্থতঃ, পূর্বাঞ্চল সমস্যার অপর একটি দিক ছিল বলকানের খ্রীষ্টান প্রজাগণের স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা বা বলকান জাতীয়তাবাদ। রাশিয়া বলকান জাতীয়তাবাদের প্রতি সমর্থন জানায়। কিন্তু ইওরোপীয় শক্তিগুলি ইহাতে আশঙ্কা বোধ করে। এইভাবে পূর্বাঞ্চল সমস্যা জটিল হইয়া দাঁড়ায়। এই সমস্যা ইওরোপের রাজনীতিকে প্রায় একশত বৎসর প্রভাবিত করে। পূর্বাঞ্চল সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়া গ্রীসের স্বাধীনতা যুদ্ধ, ক্রিমিয়ার যুদ্ধ, রুশ-তুরস্ক যুদ্ধ, বার্লিন চুক্তি, বলকান যুদ্ধ ঘটে। এজন্য একজন ঐতিহাসিক আক্ষেপ করিয়া বলেন যে, "পূর্বাঞ্চল সমস্যা মহা প্রলয়ের দিন পর্যন্ত মানবজাতিকে হতবুদ্ধি করিয়া রাখিবে।"[১]

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ (The Crimean War) : ক্রিমিয়ার যুদ্ধ ১৮৫৫ খ্রীঃ আরম্ভ হইলে ইওরোপের বৃহৎ শক্তিগুলি ইহাতে জড়াইয়া পড়ে। ইহার ফলে ইওরোপের শান্তি বিনষ্ট হয়। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের আপাতঃ কারণ ছিল গ্রোটোর গীর্জার চাবির (key of Grotto) অধিকার লইয়া ফ্রান্স ও রাশিয়ার দ্বন্দ্ব। খ্রীষ্ট ধর্মের প্রবর্তক যীশুখ্রীষ্টের জন্মস্থান হইল প্যালেষ্টাইন। যীশুখ্রীষ্টের যে স্থানে জন্ম হয় সেই স্থানে যে গীর্জা নির্মাণ করা হয় তাহাকে গ্রোটোর গীর্জা বলে। খ্রীষ্টানগণের নিকট এই গীর্জার চাবি অতি পবিত্র বস্তু হিসাবে বিবেচিত হয়। ফ্রান্স ছিল ক্যাথলিক গীর্জার পৃষ্ঠপোষক এবং রাশিয়া ছিল গ্রীক গীর্জার পৃষ্ঠপোষক। ফ্রান্স ও রাশিয়া নিজ নিজ সম্প্রদায়ের গীর্জার হাতে এই পবিত্র চাবির অধিকার রাখিতে ইচ্ছা করে। ইহার ফলে এই চাবির অধিকার লইয়া ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে মন কষাকষি বাড়ে। এদিকে প্যালেষ্টাইন ছিল তুরস্কের সুলতানের রাজ্যভুক্ত। সুতরাং আইনতঃ কাহাকে চাবির অধিকার দেওয়া হইবে তাহা স্থির করিবার অধিকার ও দায়িত্ব ছিল তুরস্কের সুলতানের।

গ্রোটোর চাবির সমস্যা

ফরাসী বিপ্লবের সময় ক্যাথলিক গীর্জার সমর্থক ফ্রান্স দুর্বল হইয়া পড়ে। তুরস্কের সুলতান এই সুযোগে ক্যাথলিক গীর্জার হাত হইতে গ্রোটোর চাবি লইয়া গ্রীক গীর্জাকে দেন। রাশিয়ার সমর্থনে গ্রীক গীর্জা এই চাবি কিছুকাল দখলে রাখে। এদিকে ফ্রান্সের সিংহাসনে তৃতীয় নেপোলিয়ন বসিলে ফ্রান্সের ক্ষমতা বাড়ে। ফ্রান্সের প্রভাবে, তুর্কী সুলতান গ্রোটোর

খ্রীষ্টীয় প্রজাগণের উপর রাশিয়ার দাবী

১. "This damned Eastern Question is destined to perplex the mankind up to the Day of judgment."

চাবি গ্রীক গীর্জার হাত হইতে লইয়া পুনরায় ক্যাথলিক গীর্জাকে দিয়া দেন। ইহাতে রাশিয়ার জার প্রথম নিকোলাস অত্যন্ত অপমানিত জ্ঞান করেন। তিনি সুলতানের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া গ্রোটোর চাবি ফেরৎ চান এবং তুরস্কের খ্রীষ্টান প্রজাগণের রক্ষণাবেক্ষনের অধিকার দাবী করেন। তিনি সুলতানের উপর চাপ সৃষ্টি করিবার জন্য তুর্কী সাম্রাজ্যের অন্তর্গত মোলদাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া প্রদেশ দখল করেন। তুরস্কের সাম্রাজ্যের একাংশ দখল করায় তুর্কী সুলতান রুষ্ট হন। তিনি রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন।

ইওরোপীয় শক্তিবর্গের বিরোধিতা

পূর্ব ইওরোপে রুশ ক্ষমতা বৃদ্ধি ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের স্বার্থ বিরোধী ছিল। সুতরাং ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও সার্ডিনিয়া রাশিয়ার বিরুদ্ধে তুরস্কের পক্ষাবলম্বন করে। ইংরাজ, ফরাসী সেনাদল রাশিয়াকে আক্রমণকারী ঘোষণা করিয়া তুরস্কের পক্ষ লইয়া রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামে। এইভাবে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ বাধে। সামান্য চাবি লইয়া এইরূপ বড় ধরণের একটি যুদ্ধ হওয়ায় ফ্রান্সের নেতা থিয়ার্স মন্তব্য করেন যে "কয়েকটি হতভাগ্য সন্ন্যাসীর হাতে একটি চাবি দেওয়ার জন্য ক্রিমিয়ার যুদ্ধ হয়।"

জারের তুরস্ক ব্যবচ্ছেদ নীতি

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ গ্রোটোর চাবির ন্যায় সামান্য কারণে ঘটিয়াছিল মনে করার কোন কারণ নাই। এই যুদ্ধের পশ্চাতে গুরুতর রাজনৈতিক কারণ নিহিত ছিল। ঐতিহাসিক টেম্পারলের মতে (Temperley) রাশিয়ার জার প্রথম নিকোলাস দীর্ঘ দিন ধরিয়া ইংলণ্ড ও রাশিয়ার মধ্যে তুরস্ক সাম্রাজ্যকে ভাগ করিবার মতলব করেন।[১] তিনি মনে করিতেন যে যদি ইংলণ্ড ও রাশিয়া আগ্রহ না দেখায় তবে ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন একাই তুরস্ক গ্রাস করিবেন। এইজন্য তিনি দুইবার যথা ১৮৪৪ খ্রীঃ ও ১৮৫৩ খ্রীঃ ব্রিটিশ সরকারের নিকট তুরস্ক ব্যবচ্ছেদের প্রস্তাব দেন। ব্রিটিশ সরকার এই প্রস্তাব সরাসরি নাকচ না করিয়া বলেন যে এখন তুরস্কের সাম্রাজ্যের ভাঙিয়া পড়িবার সম্ভাবনা নাই। ব্রিটিশ সরকার জারের প্রস্তাব সরাসরি নাকচ না করিয়া ধোঁয়াটে উত্তর দিলে জার নিকোলাসের মনে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়। তিনি মনে করেন যে তুরস্ককে পরাস্ত করিয়া কোণঠাসা করিলে ইংলণ্ড ইহার ব্যবচ্ছেদে আগ্রহ দেখাইবে। এই উদ্দেশ্যেই তিনি মোলদাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া অধিকার করেন।

ইংলণ্ডের নীতি

অপর দিকে ইংলণ্ড মনে করিত যে রাশিয়া তুরস্কের সাম্রাজ্য গ্রাস করিলে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সহিত ইংরাজদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইবে। এছাড়া মিশরে ব্রিটিশ প্রভাব নষ্ট হইবে। রাশিয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি ইওরোপের শান্তির পক্ষে বিঘ্নজনক ছিল। এজন্য ইংলণ্ড 'তুরস্কের সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা' রক্ষা করাই সমীচিন মনে করিত। এজন্য ব্রিটিশ সরকার জারের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে তাছাড়া ইংলণ্ডের রাজনীতিজ্ঞগণ মনে করিতেন যে রাশিয়া হইল ইওরোপে উদারপন্থার প্রধান শত্রু। এজন্য তাহারা রাশিয়ার ক্ষমতা নষ্ট করিতে ব্যগ্র হয়। লর্ড পামারষ্টোন

১. Temperley—England and the Near East. P. 251, 276.

স্বয়ং রাশিয়ার সহিত যুদ্ধের নীতি সমর্থন করেন। ফলে ইংলণ্ড ক্রিমিয়ার যুদ্ধ এড়াইবার চেষ্টা না করিয়া রাশিয়াকে এই যুদ্ধে জড়াইয়া ফেলে।

ফ্রান্সের সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন একটি বলিষ্ঠ বৈদেশিক নীতি দ্বারা ফ্রান্সে তাঁহার জনপ্রিয়তা বাড়াইবার কথা ভাবেন। গৌরব-পিয়াসী ফরাসী জাতিকে যুদ্ধ জয়ের তীব্র মদিরা পান করাইয়া তিনি আপনার সিংহাসনকে দৃঢ় করিবার কথা ভাবেন। তাছাড়া জার নিকোলাস তাঁহাকে অপমান করায় তিনি এই যুদ্ধের সুযোগে জারের উপর প্রতিশোধ লইতে চান। ঐতিহাসিক এ. জে. পি. টেইলারের মতে তৃতীয় নেপোলিয়নের আসল উদ্দেশ্য ছিল ভিয়েনা চুক্তিকে তছনছ করিয়া ইওরোপে ফ্রান্সের কর্তৃত্ব স্থাপন করা। রাশিয়া ছিল ভিয়েনা চুক্তির দৃঢ় সমর্থক। সেজন্য রাশিয়ার ক্ষমতা খর্ব করার কথা তিনি ভাবেন। এই কারণে চাবির ঘটনা উপলক্ষ করিয়া তিনি রাশিয়া আক্রমণ করেন। বলকান অঞ্চলে রাশিয়ার আধিপত্য স্থাপনের বিরুদ্ধে অষ্ট্রিয়াও বিরোধিতা করে। সার্ডিনিয়ার প্রধানমন্ত্রী কাভুর ইতালীর স্বাধীনতা যুদ্ধে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সহায়তা পাইবার আশায় ক্রিমিয়ার যুদ্ধে তাহাদের পক্ষ অবলম্বন করেন। এইভাবে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ বাধে।

তৃতীয় নেপোলিয়নের নীতি

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ অপরিহার্য ছিল কিনা ইহা লইয়া দুই রকম মত দেখা যায়। ঐতিহাসিক এ. জে. পি. টেইলারের মতে "এই যুদ্ধ ছিল অবধারিত" (The war was predestined)। কারণ রাশিয়া তুরস্ককে গ্রাস করার নীতি নেয়, অপর দিকে ইংলণ্ড তাহাতে বাধা দিতে বদ্ধপরিকর হয়। এদিকে তৃতীয় নেপোলিয়নও আভ্যন্তরীন কারণে যুদ্ধের জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠেন। অপর দিকে ঐতিহাসিক টেম্পারলির মতে "এই যুদ্ধ ছিল এক বিরাট ভুল, ইহা অপরিহার্য ছিল না"। যদি ব্রিটিশ সরকার প্রথম হইতে জার নিকোলাসকে "তুরস্কের অখণ্ডতা" নীতি সম্পর্কে দৃঢ় ও খোলাখুলি মত জানাইতেন তবে জার তুরস্ক ব্যবচ্ছেদের জন্য যুদ্ধের ঝুঁকি লইতেন না। লর্ড পামারষ্টোন রাশিয়াকে অপদস্থ করার জন্য মীমাংসা নীতি এড়াইয়া যুদ্ধ নীতি নেন। ইংলণ্ডের সংবাদপত্রগুলি তারস্বরে রাশিয়ার বিরুদ্ধে প্রচার চালায়। তৃতীয় নেপোলিয়নের চমকপ্রদ বৈদেশিক নীতির ঝোঁক এই যুদ্ধকে ত্বরান্বিত করে। যদি আন্তরিকভাবে চেষ্টা করা যাইত তবে এই যুদ্ধ এড়ান সম্ভব হইত।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধের অনিবার্যতা বিচার

ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ইঙ্গ-ফরাসী মিত্রশক্তি রাশিয়ার অন্তর্গত ক্রিমিয়া আক্রমণ করে। ব্যালাক্লাভার (Balaclava) রণক্ষেত্রে ৬০০ ইংরাজ সৈন্য রুশ কামান বাহিনীর বিরুদ্ধে অপূর্ব বীরত্ব দেখায়। ইঙ্কারম্যানের যুদ্ধেও রুশ বাহিনী পরাস্ত হয়। ইহার পর রুশ সেনাদল সেবাষ্টোপোল দুর্গে আত্মরক্ষা করে। এদিকে অষ্ট্রিয়াও রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামিবার উদ্যোগ করে। শেষ পর্যন্ত রাশিয়া প্যারিসের শান্তি বৈঠকে যোগ দেয় এবং প্যারিসের সন্ধি দ্বারা ক্রিমিয়ার যুদ্ধের অবসান হয়।

যুদ্ধের ঘটনা

প্যারিসের সন্ধি (Treaty of Paris) ১৮৫৬ খ্রীঃ দ্বারা স্থির হয় যে, (১) ইওরোপীয়

শক্তিগুলি তুরস্কের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য দায়ী থাকিবে। (২) তুরস্কের সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা হইবে না। (৩) সুলতান ধর্ম-নিরপেক্ষতা নীতি লইয়া তাঁহার খ্রীষ্টান প্রজাগণের ধর্মীয় অধিকার স্বীকার করিবেন এবং তুরস্কের উন্নতি ও শক্তি বৃদ্ধির জন্য আধুনিক সংস্কার ব্যবস্থা প্রচলন করিবেন। (৪) কৃষ্ণ সমুদ্র নিরপেক্ষ দরিয়া রূপে গণ্য হইবে। শান্তির সময় দার্দানালিস প্রণালী দিয়া যুদ্ধ জাহাজ চলাচল করিতে পারিবে না। (৫) রাশিয়া তুরস্ককে বেসারাবিয়া ফেরৎ দিবে। রাশিয়া তুরস্কের অন্যান্য অধিকৃত স্থান ছাড়িয়া দিবে। তুরস্কের খ্রীষ্টান প্রজাগণের উপর রক্ষণাবেক্ষণের দাবী রাশিয়া আর করিবে না। (৬) প্যারিসের সন্ধিতে সার্বিয়ার স্বাধীনতা স্বীকৃত হয় এবং মোলদাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া প্রদেশের স্বায়ত্ব শাসনের দাবীও স্বীকৃত হয়। প্যারিসের সন্ধির দ্বারা পূর্বাঞ্চল সমস্যার দুইটি মূল সমস্যা যথা তুরস্কের দুর্বলতা ও রুশ আগ্রাসী নীতিকে আপাতঃ সমাধান করা সম্ভব হয়। কিন্তু প্যারিসের সন্ধি অল্পকালের মধ্যেই ভাঙিয়া পড়ে। এই সন্ধির ২০ বৎসরের মধ্যে রাশিয়া পুনরায় তুরস্কের বিরুদ্ধে আগ্রাসী নীতি গ্রহণ করে এবং ১৮৭৭ খ্রীঃ তুরস্ক আক্রমণ করে। তুরস্কের সুলতানও আধুনিক সংস্কার দ্বারা দেশকে শক্তিশালী করিতে বিরত থাকেন। ফলে তুরস্কের দুর্বলতা থাকিয়া যায়। এদিকে প্যারিসের সন্ধিতে তুরস্কের স্বাধীনতা ও সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিলেও ১৮৭৮ খ্রীঃ বার্লিন চুক্তি দ্বারা ইওরোপীয় শক্তিগুলি তুরস্কের অংশ বিশেষ গ্রাস করে। ফলে যে সকল লক্ষ্য লইয়া প্যারিসের সন্ধি স্থাপিত হয় তাহা বিফল হয়। ক্রিমিয়ার যুদ্ধ ও প্যারিসের সন্ধি দ্বারা পূর্বাঞ্চল সমস্যা অমীমাংসিত থাকিয়া যায়। এই কারণে ক্রিমিয়ার যুদ্ধকে একটি অপ্রয়োজনীয় যুদ্ধ (useless war) বলা হয়।

প্যারিসের সন্ধি ও ক্রিমিয়ার যুদ্ধের বিফলতা

ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পরোক্ষ ফল ছিল সুদূর প্রসারী। ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন এই যুদ্ধে জিতিয়া ইওরোপে প্রায় সর্বেসর্বা হইয়া পড়েন। ফ্রান্স প্রথম শ্রেণীর শক্তির মর্যাদা পায়। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পর ইংলণ্ড মিত্রহীন হইয়া কিছুকাল হতোদ্যম হইয়া পড়ে। এই যুদ্ধে ইংরাজ সেনা পারদর্শিতা দেখাইতে না পারায় ইংলণ্ডের মর্যাদা নষ্ট হয়। ইংলণ্ড এই যুদ্ধে প্রভূত অর্থ ব্যয় করায় সরকারী কোষাগার শূন্য হইয়া যায়। রাশিয়া এই যুদ্ধে নিকট প্রাচ্যে বা বলকানে আঘাত খাইয়া কিছুদিনের জন্য ইওরোপ হইতে মুখ ফিরাইয়া নেয়। রাশিয়া ইহার পর দূর প্রাচ্যে সাইবেরিয়া অঞ্চলে এবং মধ্য এশিয়ার তাসখন্দ অঞ্চলে রাজ্য বিস্তারের দিকে নজর দেয়। ইহার ফলে চীন সীমান্ত ও আফগানিস্থান সীমান্তের দিকে রুশ শক্তি আগাইতে থাকে। রাশিয়া আফগানিস্থান অভিমুখে আগাইলে রুশ আক্রমণের আশঙ্কায় ভারতে ইংরাজ সরকার ভীত হয়। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে রাশিয়ার জার সরকার রাশিয়ার আভ্যন্তরীন সংস্কারের কাজে নজর দেন। রাশিয়ায় ভূমিদাস প্রথার অবসান ঘোষিত হয়। সার্ডিনিয়া এই যুদ্ধে ইঙ্গ-ফরাসী মৈত্রী লাভ করিয়া ইতালীর ঐক্য সাধনের পথে আগাইয়া যায়। অষ্ট্রিয়া এই যুদ্ধে রাশিয়ার

ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পরোক্ষ ফলাফল

বিরোধিতা করিয়া বিরাট ভুল করে। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের সময় অস্ট্রিয়ার বিরোধিতা রাশিয়া ক্ষমা করে নাই। ফলে কিছুদিন পর অস্ট্রিয়ার সহিত প্রাশিয়ার যুদ্ধ আরম্ভ হইলে রাশিয়া অস্ট্রিয়াকে সাহায্য না করিয়া নিরপেক্ষ থাকে। ফলে অস্ট্রিয়ার শোচনীয় পরাজয় ঘটে। ইহার ফলে জার্মানীর ঐক্য স্থাপন সম্ভব হয়। বলকান জাতীয়তাবাদ ক্রিমিয়ার যুদ্ধে জোরদার হয়। রুমানিয়া ও সার্বিয়ার স্বাধিকার লাভের পথ প্রশস্ত হয়। এই সকল কারণে ক্রিমিয়ার যুদ্ধকে "আধুনিক ইওরোপীয় ইতিহাসের জলবিভাজিকা" (Watershed of modern history) বলা হয়।

তৃতীয় নেপোলিয়ন ও ফ্রান্সের দ্বিতীয় সাম্রাজ্য, ১৮৫২—১৮৭০ খ্রীঃ (Napoleon III and the Second Empire of France) :

১৮৪৮ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সে দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম নেপোলিয়নের ভ্রাতুষ্পুত্র লুই নেপোলিয়ন সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পাইয়া প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। তৃতীয় নেপোলিয়ন নিজেকে তাঁহার পিতৃব্যের আদর্শের উত্তরাধিকারী মনে করিতেন। সুতরাং প্রথম নেপোলিয়নের পথ ধরিয়া তিনি দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র উচ্ছেদ করিয়া নিজেকে ফরাসী সম্রাট হিসাবে ঘোষণা করেন। ইহার ফলে ফ্রান্সে দ্বিতীয় সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়। লুই নেপোলিয়ন সম্রাট হইবার পর তৃতীয় নেপোলিয়ন উপাধি নেন।

তৃতীয় নেপোলিয়নের চরিত্র ও কৃতিত্ব

তৃতীয় নেপোলিয়নের শাসনকাল নানাদিক দিয়া ইওরোপের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে। "তৃতীয় নেপোলিয়ন যদিও নিজে বিপ্লবী ছিলেন না, তিনি ইওরোপে অনেকগুলি বিপ্লবের সৃষ্টি করেন"।[১] তৃতীয় নেপোলিয়ন জাতীয়তাবাদকে ইওরোপে জয়যুক্ত করেন। ভিয়েনা চুক্তির দ্বারা এই জাতীয়তাবাদ দমিত হইয়াছিল। তৃতীয় নেপোলিয়ন পুনরায় তাহাকে জাগাইয়া তুলেন। ইতালীর ও জার্মানীর ঐক্য আন্দোলনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকার দ্বারা তিনি ইওরোপের রাজনৈতিক মানচিত্র পাল্টাইয়া দেন। ইওরোপের দুই রক্ষণশীল শক্তি রাশিয়া ও অস্ট্রিয়াকে দুইটি যুদ্ধে যথা ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ও ইতালীর স্বাধীনতা যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তিনি ইওরোপের পুরাতন শক্তিসাম্য ভাঙিয়া ফেলেন। ঐতিহাসিক এ. জে. পি. টেলরের মতে ১৮১৫ খ্রীঃ ভিয়েনা চুক্তির দ্বারা অস্ট্রিয়া, রাশিয়া প্রভৃতি রক্ষণশীল রাষ্ট্রের দ্বারা যে শক্তিসাম্য স্থাপিত হয় তিনি তাহাকে ভাঙিয়া ফেলেন। ফলে ইওরোপের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সফল হইতে পারে। ফ্রান্সকে ভিয়েনা চুক্তির দ্বারা যেভাবে কোণঠাসা করিয়া রাখা হয় তাহা হইতে তিনি ফ্রান্সকে মুক্ত করেন। তাছাড়া তৃতীয় নেপোলিয়ন স্থিতাবস্থার ভক্ত ছিলেন না। তিনি ফ্রান্সে প্রগতিশীল সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার দ্বারা জনকল্যাণবাদী শাসননীতির পথ প্রদর্শন করেন। সবদিক হইতে বিচার করিলে তৃতীয় নেপোলিয়নের শাসনকালকে ইওরোপের ইতিহাসের একটি বিপ্লবের যুগ বলা যায়।

বিপ্লবের যুগ

---

১. "Though Napoleon III himself was not a revolutionary, he caused many revolutions in Europe".

তৃতীয় নেপোলিয়ন তাঁহার প্রথম জীবন বহু দুঃখ-কষ্টের মধ্যে কাটান। ওয়াটার্লু যুদ্ধের পর নেপোলিয়ন বংশের ভাগ্যরবি অস্তমিত হইলে, তিনি ইতালীতে কিছুকাল বিপ্লবী কার্বোনারী আন্দোলনে যোগ দেন। রাশিয়ার বিরুদ্ধে পোল্যাণ্ডের বিপ্লবী আন্দোলনেও তিনি যোগ দেন। ইহার পর তিনি ইংলণ্ডে কিছুকাল অবৈতনিক কনেষ্টেবলের কাজও করেন। ইংলণ্ডে থাকার সময় তিনি বোনাপার্টবাদ সম্পর্কে কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থগুলিতে তৃতীয় নেপোলিয়নের ভবিষ্যৎ শাসননীতির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। হিটলারের আত্মজীবনী মেইন-ক্যাম্পে যেমন তাঁহার ভবিষ্যৎ নীতির ছক দেওয়া ছিল, লুই নেপোলিয়নের Ideas of Napoleon গ্রন্থে তাঁহার ভবিষ্যৎ শাসন-নীতির ছক পাওয়া যায়। ব্যক্তিগত চরিত্রের দিক হইতে তিনি ছিলেন উদারপ্রাণ, অমায়িক স্বভাবের লোক। বংশানুক্রমিক রাজাদের ন্যায় তিনি অহংকারী ছিলেন না। নিপীড়িত জনতার জন্য সর্বদা তাঁহার মনের কোণে করুণা সঞ্চিত ছিল। তৃতীয় নেপোলিয়ন ভাগ্যান্বেষী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন সত্য। তথাপি তিনি মেটারনিকের ন্যায় রক্ষণশীল লোক ছিলেন না। শ্রমিক ও কৃষকের সমস্যার কথা তিনি ভাবিতেন। State Socialism বা রাষ্ট্রকে সমাজতন্ত্রের স্বার্থে ব্যবহার করার পথ তিনিই দেখান। এজন্য লোকে তাঁহাকে "অশ্বারোহী সেণ্ট সাইমন" (St. Simon on horseback) বলিয়া আখ্যা দেয়। সেণ্ট সাইমন ছিলেন ফরাসী সমাজতান্ত্রিক নেতা।

প্রথম জীবন ঃ তৃতীয় নেপোলিয়নের আদর্শ ও চরিত্র

নেপোলিয়নের ব্যক্তিত্বের ও চরিত্রের ত্রুটি লইয়া সমসাময়িক লেখকগণ কটাক্ষ করিয়াছেন। সাহিত্যিক ভিক্টর হিউগো, তাঁহাকে "আধ পাঁইট নেপোলিয়ন" (Half pint Napoleon) ও "ক্ষুদ্র বা পাতি নেপোলিয়ন" (Napoleon le petit) বলিয়া ব্যঙ্গ করিয়াছেন। একথা সত্য যে তৃতীয় নেপোলিয়ন প্রথম নেপোলিয়নের ন্যায় শ্রেষ্ঠ গুণের অধিকারী ছিলেন না। একমাত্র নেপোলিয়ন উপাধি ছাড়া আর কোন দিক হইতেই তিনি প্রথম নেপোলিয়নের উত্তরাধিকারী ছিলেন না। প্রথম নেপোলিয়নের মনীষা ও সামরিক গুণাবলী তাঁহার মধ্যে ছিল না। কিংলেকের মতে তিনি সর্বদাই একটি লক্ষ্য লইয়া চলিতেন। তাহা হইল ফ্রান্সের সিংহাসন লাভ। তিনি ছিলেন সাধারণ বুদ্ধির লোক। কোন উচ্চ আদর্শ বা আইডিয়া তাঁহার মাথায় ছিল না। তাঁহার মধ্যে কোন গঠনমূলক প্রতিভা ছিল না। তিনি বিনা কারণে নিজ উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্য ইওরোপকে যুদ্ধে নামাইয়া দেন। তিনি ছিলেন "ইওরোপের জ্বলন্ত মশাল" (Firebrand of Europe)। তিনি ফ্রান্সের প্রজাতন্ত্রকে ধ্বংস করেন।

কৃতিত্ব বিচার

তবে একথা সত্য যে সমকালীন লেখকেরা তাঁহার অহেতুক নিন্দা করিয়াছেন। ঐতিহাসিক হ্যাজেনের মতে তৃতীয় নেপোলিয়নের মস্তিষ্ক ছিল উদ্ভাবনী শক্তিতে পূর্ণ। খরগোসের গর্ত যেমন খরগোসের বাচ্চায় ভরা থাকে সেইরূপ তাঁহার মাথার কোষে কোষে নূতন নূতন পরিকল্পনা ভরা ছিল। কিন্তু ইহাকে কাজে পরিণত করার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। তিনি গণতন্ত্রের সহিত শৃংখলার সমন্বয় সাধনের পরীক্ষা চালান। ফ্রান্সে

গণতন্ত্রের নামে যে অরাজকতা দেখা দেয় তাহাকে শৃংখলাবদ্ধ করিয়া প্রগতিমূলক শাসনের কাজে তিনি লাগাইয়া দেন। তিনি দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র ধ্বংস করিলেও সর্বসাধারণের ভোটদানের পবিত্র অধিকার রক্ষা করেন। তিনি শ্রমিক ও কৃষকের উন্নতির জন্য বহু সংস্কার প্রবর্তন করেন। সেই যুগে আর কোন শাসক এইরূপ সাহসের সহিত বঞ্চিত মানুষের জন্য কাজ করেন নাই। তিনি ভিয়েনা চুক্তির রক্ষণশীল রাষ্ট্র প্রথাকে ভাঙিয়া ফেলেন। তিনি ইতালী ও জার্মানীর ঐক্য আন্দোলনের সক্রিয় সমর্থন করেন। তাঁহার চেষ্টায় ইওরোপের নূতন করিয়া রাজনৈতিক পুনর্গঠন হয়। তবে তাঁহার চরিত্র ও কাজের মধ্যে অসামঞ্জস্য ছিল। এজন্য তিনি নিন্দিত হন। প্রথম নেপোলিয়ন ছিলেন অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী। তৃতীয় নেপোলিয়নকে তাঁহার সহিত তুলনা করা উচিত নহে। তৃতীয় নেপোলিয়ন নিঃসন্দেহে আপন গুণে ইতিহাসের কৃতী পুরুষের স্থান পাইবার যোগ্য। আধুনিক যুগের ঐতিহাসিকেরা নিরপেক্ষ বিচারে তাঁহার কৃতিত্ব স্বীকার করেন। "সমকালীন ইতিহাস ও ঐতিহাসিকগণ তৃতীয় নেপোলিয়নের প্রতি সুবিচার করেন নাই।"[১]

তৃতীয় নেপোলিয়নের আভ্যন্তরীণ নীতি (Internal policy of Napoleon III)ঃ তৃতীয় নেপোলিয়নের আভ্যন্তরীণ শাসননীতিকে দুই ভাগে (**১৮৫২-৬০ খ্রীঃ** এবং **১৮৬০-৭০ খ্রীঃ**) ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগে তাঁহার নীতি ছিল স্বৈরতন্ত্রের মাধ্যমে সংস্কার সাধন (Despotism and reform)। তৃতীয় নেপোলিয়ন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হইলেও একটি গণতান্ত্রিক কাঠামো রক্ষা করিতেন। তিনি সেনেট, কাউন্সিল অফ ষ্টেট ও লেজিসলেটিভ বডি এই তিনটি কক্ষে আইন সভাকে ভাগ করেন। প্রথম দুইটি কক্ষের সভ্যগণ সম্রাটের মনোনয়নের মাধ্যমে এবং সর্বনিম্ন কক্ষের সভ্যগণ নির্বাচনের মাধ্যমে নিযুক্ত হইত। আইন রচনার অধিকার এই তিনটি কক্ষে ভাগ করিয়া দেওয়ার ফলে বস্তুত সম্রাটের নির্দেশেই আইন সভা চলিতে বাধ্য হইত। আইন রচনার আসল



তৃতীয় নেপোলিয়ন

ক্ষমতা সম্রাটের হাতেই থাকিত। তিনি সর্বসাধারণের ভোটাধিকার ব্যবস্থাও রাখেন। এই গণতান্ত্রিক আবরণের আড়ালে তিনি তাঁহার স্বৈরতন্ত্র কায়েম করেন। আইন সভায় সম্রাটের কাজের সমালোচনা করা যাইত না। সংবাদপত্রগুলি স্বাধীনভাবে সকল কথা লিখিতে পারিত না। সম্রাটের বিরুদ্ধবাদী ব্যক্তিদের বিনা বিচারে কারাদণ্ড দেওয়া হইত। তৃতীয় নেপোলিয়নের শাসনতন্ত্রকে এজন্য "উল্টা গণতন্ত্র" বা Inverted democracy বলা হয়। ইহা ছিল আসলে শৃংখলার (order) এবং কর্তৃত্বের

১. "History and historians have done scant justice to Napoleon III"—Riker.

(authority) সহিত গণতন্ত্রের (Liberty) সমন্বয়। তৃতীয় নেপোলিয়ন জনসাধারণের স্বাধীনতা হরণ করিলেও তিনি তাঁহার অগ্রগামী সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার দ্বারা এই ক্ষতি পূরাইয়া দেন। তিনি পিয়ের ব্রাদার্স প্রভৃতি ধনিক গোষ্ঠীর সহায়তায় ব্যাংক ব্যবসায়ের সম্প্রসারণ করেন। এই ব্যাংক হইতে সহজ সুদে ঋণ দেওয়ার ফলে দ্রুত কল-কারখানা বাড়ে। এই কারখানাগুলিতে হাজার হাজার বেকারের কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা হয়। ব্যাংক অফ ফ্রান্সেরও পুনর্গঠন করা হয়। রেল, কয়লা, লৌহ শিল্পের প্রসার ঘটাইয়া তৃতীয় নেপোলিয়ন শিল্প ও বাণিজ্যের বিরাট সম্প্রসারণ করেন। তাঁহার আমলে ২ হাজার মাইল রেলপথ ৬ হাজার মাইলে পরিণত হয়। বাষ্পচালিত জাহাজ অধিক সংখ্যায় নির্মিত হয়। ইহার ফলে দেশের সম্পদ ও সমৃদ্ধি বাড়ে। ফরাসী মূলধন ফ্রান্সের বাহিরে সুয়েজ খাল খননের কাজেও নিযুক্ত হয়। বহু ফরাসী কারিগর ইহাতে কাজ পায়। শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থার উন্নতিকল্পে তিনি শ্রমিকগণকে ধর্মঘট ও ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের অধিকার দেন।[১] তিনি শ্রমিকগণের কল্যাণের জন্য বিভিন্ন ধরণের বীমা প্রথা চালু করেন। ইহার মধ্যে বার্ধক্য বীমা, দুর্ঘটনা বীমার নাম উল্লেখযোগ্য। কৃষির উন্নতিকল্পে তিনি কৃষি ব্যাংক বা ক্রেডিট এগ্রিকোল (Credite Agricole) স্থাপন করেন। কৃষকেরা ইহা হইতে কম সুদে টাকা ধার করিয়া উন্নত ধরনের চাষ আবাদের কাজ করিতে পারিত। তিনি অবাধ বাণিজ্য নীতি লইয়া ইংলণ্ডের সহিত কবডেন চুক্তি (Cobden Treaty) করেন। পুরাতন প্যারিস শহরকে ভাঙিয়া দিয়া আধুনিক প্যারিস নগরের নির্মাণ আরম্ভ করা হয়। ব্যারণ হাউসম্যান নামক এক স্থপতি আধুনিক প্যারিস শহরের নকশা তৈয়্যরী করেন। মোট কথা তৃতীয় নেপোলিয়নের শাসন নীতির ফলে সকল শ্রেণীই উপকৃত হয়। প্যারিসে আন্তর্জাতিক মেলায় বিশ্বের লোক সমবেত হইয়া প্যারিস নগরীর সৌন্দর্যের ও রুচির প্রশংসা করে।

১৮৬০ খ্রীঃ পর নেপোলিয়নের শাসন নীতির দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ হয়। ১৮৬০ খ্রীঃ পর তাঁহার শাসন নীতিতে উদারতন্ত্রের ছোঁয়াচ দেখা যায়। তিনি ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রদ করেন। আইন সভায় স্বাধীন মতামত প্রকাশ, সংবাদপত্রের সমালোচনার অধিকার, মন্ত্রীসভাকে আইন সভার নিকট দায়িত্ববদ্ধ করার ব্যবস্থা করা হয়। সেনেটের অধিকার হ্রাস করা হয়। তৃতীয় নেপোলিয়ন মনে করিতেন যে এই শাসন নীতি গ্রহণ করিয়া তিনি তাঁহার পিতৃব্যের পদাংক অনুসরণ করিতেছিলেন।

বৈদেশিক নীতি (External Policy) ঃ তৃতীয় নেপোলিয়নের বৈদেশিক নীতি ইওরোপে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করে। জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকেরা মনে করেন গৌরব-পিয়াসী ফরাসী জাতিকে জাতীয় গৌরবের ঈষদুষ্ণ সুরা পান করাইবার জন্য তৃতীয় নেপোলিয়ন এক চমকপ্রদ বৈদেশিক নীতি গ্রহণ করেন। ঐতিহাসিক কোবান এই মতকে খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহার মতে তৃতীয় নেপোলিয়ন আসলে শান্তিবাদী

১. C. D. Hazen. P. 185.

ছিলেন।[১] পরিস্থিতির চাপে তিনি যুদ্ধ করিতে বাধ্য হন। তৃতীয় নেপোলিয়নের পররাষ্ট্র নীতির প্রধান লক্ষ্য ছিল ভিয়েনা চুক্তিকে ভাঙিয়া ফেলা। কারণ এই চুক্তি দ্বারা ফ্রান্সকে দমাইয়া রাখা হয়। ভিয়েনা চুক্তি ইওরোপেও জাতীয়তাবাদের অবদমন ঘটায়। তৃতীয় নেপোলিয়ন ইওরোপে জাতীয়তাবাদকে জাগাইয়া ভিয়েনা চুক্তি ভাঙিয়া ফেলিবার চেষ্টা করেন। ১৮৫২-১৮৬০ খ্রীঃ এই আট বৎসর তিনি বৈদেশিক নীতিতে অসাধারণ সাফল্য লাভ করেন। ১৮৬০ খ্রীঃ হইতে তিনি পদে পদে ব্যর্থতা বরণ করেন।

বৈদেশিক নীতির লক্ষ্য

তৃতীয় নেপোলিয়নের বৈদেশিক নীতির প্রথম উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল ক্রিমিয়ার যুদ্ধ। জার নিকোলাস মনে করিতেন যে তৃতীয় নেপোলিয়ন একজন ভুঁইফোড় রাজা। সুতরাং আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী তাঁহাকে "ভ্রাতা" সম্বোধন না করিয়া তিনি লুই নেপোলিয়ন নামে ডাকিয়া অপমান করেন। জার নিকোলাস তাঁহাকে অপদস্থ করায় এবং ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের হাত হইতে গ্রোটোর গীর্জার চাবি হস্তান্তর দাবী করায় তৃতীয় নেপোলিয়ন ক্রিমিয়ার যুদ্ধে যোগ দেন (বিস্তারিত বিবরণ পৃঃ ১১৬ দেখ)। এই যুদ্ধের পর ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে শান্তি বৈঠক বসিলে ফ্রান্সের মর্যাদা বাড়ে। তৃতীয় নেপোলিয়ন ইওরোপে বিশেষ প্রতিপত্তি পান। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পর তৃতীয় নেপোলিয়ন ইতালীর নেতা কাভুরের সহিত প্লোমবিয়ারের গোপন চুক্তি করেন। তৃতীয় নেপোলিয়নের উদ্দেশ্য ছিল ইতালীতে ভিয়েনা সন্ধি ভাঙিয়া ফেলা। ইতালীকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া ফ্রান্সের কর্তৃত্ব স্থাপন করার আশা তিনি করিতেন। ফরাসী সেনাদল ইতালীর জাতীয়তাবাদী যুদ্ধে যোগ দেয় এবং অষ্ট্রিয়াকে পরাজিত করে। ইওরোপীয় পরিস্থিতি ফ্রান্সের প্রতিকূলে যাইতেছে বুঝিয়া তিনি যুদ্ধ ত্যাগ করেন এবং অষ্ট্রিয়ার সহিত ভিল্লাফ্রাঙ্কার সন্ধি স্বাক্ষর করেন। পরবর্তীকালে তিনি ইতালীর নিকট হইতে স্যাভয় ও নিস লইয়া মধ্য ও দক্ষিণ ইতালীকে সার্ডিনিয়ার সহিত যুক্ত করায় সম্মতি দেন। নেপোলিয়নের হস্তক্ষেপের ফলে ইতালীর ঐক্য স্থাপন সম্ভব হয়।

ক্রিমিয়া ও ইতালীর যুদ্ধ

তৃতীয় নেপোলিয়নের হস্তক্ষেপের ফলে মোলদাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া প্রদেশ একত্রে স্বাধীন রুমানিয়া রাজ্যে পরিণত হয়। তিনি ১৮৬৩ খ্রীঃ পোল জাতীয়তাবাদীগণকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে উৎসাহ দেন। তিনি আলজেরিয়া, সেনেগলে ফরাসী উপনিবেশ স্থাপন করেন। ইন্দোচীনে ফরাসী উপনিবেশও তিনি স্থাপন করেন। মেক্সিকোর সিংহাসনে নিজ মনোনীত প্রার্থী বসাবার জন্য তিনি এক অভিযান পাঠাইলে তাহা বিফল হয়। মেক্সিকো অভিযানের পর তৃতীয় নেপোলিয়নের ভাগ্যরবি ঢলিয়া পড়ে। তিনি ফ্রান্সে জনপ্রিয়তা হারাইয়া ফেলেন। ইতিমধ্যে বিসমার্ক জার্মানীর ঐক্যের জন্য অষ্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধে লিপ্ত হন। তৃতীয় নেপোলিয়ন বিয়ারিজের সন্ধি দ্বারা এই যুদ্ধে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করেন। প্রতিবেশী জার্মানীর ক্ষমতা লাভ ফ্রান্সের পক্ষে বিশেষ উদ্বেগজনক ছিল। জার্মানীর

মেক্সিকো ও ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয় যুদ্ধ

১. Coban—History of France

উত্থানের ফলে ফ্রান্সের নিরাপত্তা বিপন্ন হয়। তাঁহার নিরপেক্ষতা নীতির জন্য তৃতীয় নেপোলিয়ন ফরাসী জাতীয়তাবাদীগণের ঘোর সমালোচনার সম্মুখীন হন। ফরাসী জনমতকে শান্ত করিবার জন্য তৃতীয় নেপোলিয়ন বিসমার্কের নিকট জার্মানী হইতে কিছু স্থান ক্ষতিপূরণ দাবী করেন। ইহার ফলে জার্মানীর সহিত তাঁহার দারুণ বিরোধ দেখা দেয়। নেপোলিয়ন বেলজিয়াম অথবা লাক্সেমবার্গ অথবা রাইনল্যান্ডে ক্ষতিপূরণ দাবী করেন। বিসমার্ক ইহা দিতে মৌখিক স্বীকার করিয়া নেপোলিয়নের নিকট হইতে লিখিত দাবী পাইবার পর ইহা নাকচ করেন। তিনি এই দাবীর চিঠিগুলি সংবাদপত্রে ছাপাইয়া দিলে নেপোলিয়নের সম্মানহানি হয়। ফরাসী জনমত যুদ্ধের জন্য উগ্র হইয়া উঠে। অবশেষে স্পেনের সিংহাসনে প্রাশিয় রাজবংশের দাবী লইয়া ফ্রাঙ্কো-জার্মান যুদ্ধ (১৮৭০ খ্রীঃ) বাধে। রাশিয়া ক্রিমিয়ার যুদ্ধে পরাজয়ের জন্য, অষ্ট্রিয়া ইতালীর যুদ্ধে পরাজয়ের জন্য নেপোলিয়নকে সাহায্য না করিয়া নিরপেক্ষ থাকে। নিজ বৈদেশিক নীতির ভুলে নেপোলিয়ন মিত্রহীন হইয়া পড়েন। ১৮৭০ খ্রীঃ সেডানের রণক্ষেত্রে নেপোলিয়নের প্রাশিয়ার নিকট পরাজয় ঘটে। সেডানের যুদ্ধে নেপোলিয়ন বন্দী হন। ফরাসী পার্লামেন্ট তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করে। এইভাবে নেপোলিয়নের দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে।

তৃতীয় নেপোলিয়ন বা দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের পতনের কারণ (Causes of the downfall of the Second Empire)ঃ প্রখ্যাত ঐতিহাসিক বেরী (Bury) তৃতীয় নেপোলিয়নের রাজত্বকালের ঘটনাবলী পর্যালোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে ১৮৬০ খ্রীঃ তৃতীয় নেপোলিয়ন তাঁহার জীবনের উন্নতির সর্বোচ্চ সীমায় উপনীত হন। ১৮৬০ খ্রীঃ পর্যন্ত তাঁহার সংস্কারগুলি জনপ্রিয় ছিল। বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রেও তিনি কোন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন নাই। কিন্তু ১৮৬০ খ্রীঃ পর তাঁহার স্বৈরাচারী শাসন জনপ্রিয়তা হারায়। ফরাসীদের নিকট জনপ্রিয়তা লাভের জন্য তিনি বৈদেশিক যুদ্ধে ঝুঁকিয়া পড়েন। কিন্তু মেক্সিকো অভিযানের বিফলতা তাঁহার জনপ্রিয়তা নষ্ট করে। অবশেষে বিসমার্কের কূটনীতির জালে তাঁহার পতন ঘটে।

১৮৬০ খ্রীঃ গুরুত্ব

তৃতীয় নেপোলিয়নের শাসনতন্ত্র ছিল খুবই ত্রুটিপূর্ণ। ইহা ছিল গণতন্ত্রের মোড়কে ভরা স্বৈরতন্ত্র। এই শাসনতন্ত্র ফরাসী জাতিকে সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র ধ্বংস করিয়া স্বৈরশাসন স্থাপনের জন্য জাতি তাঁহাকে ক্ষমা করে নাই। একমাত্র বোনাপার্টবাদী দল ছাড়া কোন রাজনৈতিক দল তাঁহাকে সমর্থন করিত না। তিনি সাংবাদিক, লেখক ও চিন্তাবিদ্‌দের নিজ পক্ষে আনিয়া তাঁহার শাসননীতির সমর্থনে প্রচার চালাইতে পারেন নাই। ঐতিহাসিক কেটেলবির মতে তৃতীয় নেপোলিয়নের নীতি ছিল "অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও বিশ্বাসের অযোগ্য।"[১] তিনি নেপোলিয়নের আদর্শ অনুসরণ করার চেষ্টা করিলেও নেপোলিয়নের ন্যায় তাঁহার যোগ্যতা ছিল না। ভিক্টর হুগোর

আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতির ব্যর্থতা

---

১. "Inconsistant and unreliable".

মতে তৃতীয় নেপোলিয়ন ছিলেন মহাবীর নেপোলিয়নের ক্ষুদ্র সংস্করণ বা "আধ পাঁইট নেপোলিয়ন"। নেপোলিয়নের প্রতিভার তিনি অধিকারী ছিলেন না। প্রথম নেপোলিয়ন তাঁহার বৈদেশিক নীতির দ্বারা ইওরোপে বেশ কয়েকটি ফরাসী তাঁবেদার রাষ্ট্র গড়েন। তৃতীয় নেপোলিয়ন তাঁহার বৈদেশিক নীতির দ্বারা ইতালী ও জার্মানীতে স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্র গড়িয়া ফেলেন। ঐক্যবন্ধ জার্মানী ছিল ফ্রান্সের নিরাপত্তার পক্ষে ক্ষতিকারক। নেপোলিয়ন তাঁহার স্বার্থপর নীতির দ্বারা ইতালীগণের আস্থা হারান। জার্মানীর বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ নীতি লইয়া তিনি জার্মানীর সহিত যুদ্ধে পতিত হন। তিনি তাঁহার বৈদেশিক নীতির জন্য অষ্ট্রিয়া, রাশিয়া, ইতালী প্রভৃতি দেশের বিরাগ ভাজন হন। জার্মান যুদ্ধের সময় তিনি সহায়তা চাহিলে এই শক্তিগুলি মুখ ফিরাইয়া নেয়। তিনি মিত্রহীন হইয়া সেডানের যুদ্ধে পরাস্ত হন। কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন যে বৈদেশিক নীতির বিফলতাই তৃতীয় নেপোলিয়নের পতনের জন্য দায়ী ছিল। তাঁহার হস্তক্ষেপ নীতি ইওরোপে তাঁহার বিরুদ্ধে ঘোর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ঐতিহাসিক কোবান এইমত অগ্রাহ্য করেন। তাঁহার মতে তৃতীয় নেপোলিয়নের স্বৈরশাসন ফ্রান্সে তাঁহার জনপ্রিয়তা বিনষ্ট করে। এজন্য তাঁহার পতন অবশ্যম্ভাবী ছিল। তাঁহার দুর্বল বৈদেশিক নীতি তাঁহার পতনকে ত্বরান্বিত করে মাত্র। যাহা হউক সাফল্য ও বিফলতা উভয় দিক বিচার করিয়া তৃতীয় নেপোলিয়নকে এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব বলা যায়। তিনি ছিলেন সমকালীন ইতিহাসের উপেক্ষিত ব্যক্তিত্ব ও কিছুটা ভাগ্য বিড়ম্বিত লোক।

ইতালীর ঐক্য প্রতিষ্ঠা (The Unification of Italy): উনবিংশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে ইওরোপে বহু সুদূর-প্রসারী পরিবর্তন ঘটে। মেটারনিক, জার নিকোলাস, ক্যাসলরি প্রভৃতি পুরাতনপন্থী রাজনীতিজ্ঞর স্থলে তৃতীয় নেপোলিয়ন, বিসমার্ক, কাভুর প্রভৃতি নূতন নেতার উদয় হয়। ইতালী ও জার্মানীতে ঐক্যবন্ধ জাতীয় রাষ্ট্র গঠিত হইলে ইওরোপের পুরাতন রাজনৈতিক ভারসাম্য পাল্টাইয়া যায়। ইতালীর ঐক্য আন্দোলন ছিল এই পরিবর্তনের প্রথম ধাপ।

নেপোলিয়নের ইতালী বিজয়ের আগে ইতালী অনেকগুলি রাজ্যে বিভক্ত ছিল। নেপোলিয়ন ইতালীকে নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া ঐক্যবন্ধ করিলে ইতালীবাসীগণ সর্বপ্রথম রাষ্ট্রীয় ঐক্যের কথা ভাবিবার সুযোগ পায়। নেপোলিয়নের মাধ্যমে ইতালীতে ফরাসী বিপ্লবের জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা ছড়াইয়া পড়ে। কোড নেপোলিয়ন প্রভৃতি আইন দ্বারা ইতালীতে নব ভাবধারা ঢুকিয়া পড়ে। কিন্তু নেপোলিয়নের পতনের পর ভিয়েনা চুক্তির দ্বারা ইতালীকে পুনরায় অনেকগুলি রাজ্যে বিভক্ত করা হয়। ইতালীর জাতীয়তাবাদকে অগ্রাহ্য করিয়া ইতালীর উপর অষ্ট্রিয়ার সর্বাত্মক প্রাধান্য স্থাপিত হয়। ইতালীর রাজনৈতিক অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। কেবলমাত্র ভূগোলের বইয়ে ইতালীর নামে খুঁজিয়া পাওয়া যাইত। মেটারনিক গর্ব করিয়া বলেন যে "ইতালী ভৌগোলিক নামে পরিণত হইয়াছে"।[১]

ইতালীয় জাতীয়তা-বাদের উদ্ভব

১. "Italy has become a geographical expression."

বৈদেশিক শাসন হইতে ইতালীর ম‌ুক্তির জন্য ইতালীতে কার্বোনারী (Carbonari) নামে এক বিপ্লবী আন্দোলন দেখা দেয়। কার্বোনারীগণ ধর্মীয় প্রথা অন‌ুযায়ী কার্বন বা কাঠকয়লা পোড়াইত বলিয়া কার্বোনারী নাম হয়। আসলে ধর্মীয় প্রথার আড়ালে ইহারা দেশের ম‌ুক্তির জন্য গোপন আন্দোলন চালাইত। কার্বোনারীগণের লক্ষ্য সম্পর্কে জানা যায় যে ইহারা ইতালীতে একটি প্রজাতন্ত্র স্থাপনের কথা ভাবে। কোন কোন কার্বোনারী নেতা পোপের অধীনে য‌ুক্তরাষ্ট্র স্থাপনের কথাও বলেন।[১] কার্বোনারীগণ ১৮২০ খ্রীঃ ও ১৮৩০ খ্রীঃ দ‌ুইটি বিদ্রোহ করে। কিন্তু অষ্ট্রিয়ার সামরিক হস্তক্ষেপে কার্বোনারী আন্দোলন দমিত হয়। সংগঠনের অভাব, জনসাধারণের সহযোগিতা লাভে ব্যর্থতা ও সামরিক দ‌ুর্বলতা কার্বোনারীগণের বিফলতার জন্য দায়ী ছিল।

কার্বোনারী বিদ্রোহ

যোসেফ ম্যাৎসিনী ও ইয়ং ইতালী আন্দোলন (Guiseppe Mazzini and the Young Italy Movement)ঃ কার্বোনারী আন্দোলনের বিফলতার পর ইতালীর জাতীয়তাবাদ যখন কিছ‌ুদিনের মত ক্ষীণ হইয়া পড়ে, সেই সময় যোসেফ ম্যাৎসিনী ইতালীর ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেন। অবদমিত ইতালীর জাতীয়তাবাদকে তিনি নিজ আদর্শ ও ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ন‌ূতন প্রাণশক্তি দেন। ম্যাৎসিনীকে এই কারণে ইতালীর ঐক্য আন্দোলনের "ভাব প‌ুর‌ুষ, দার্শনিক ও আত্মা"[২] বলা হয়।

১৮০৫ খ্রীঃ জেনোয়া শহরে এক চিকিৎসকের গৃহে ম্যাৎসিনীর জন্ম হয়। তিনি বাল্যকাল হইতে সাহিত্য রচনায় বিশেষ পারদর্শিতা দেখান। পরাধীন ইতালীর ম‌ুক্তি সাধনের জন্য তিনি প্রতিজ্ঞা নেন। কার্বোনারী সমিতির সহিত যোগ দিয়া কিছ‌ুকাল তিনি কারাবরণ করেন। কার্বোনারী আন্দোলনের অসারত্ব ব‌ুঝিতে পারিয়া তিনি ইহার সংশ্রব ত্যাগ করেন। তিনি বিপ্লবী রচনাবলী প্রকাশ করিয়া ইতালীর জনসমাজকে জাতীয় ভাবের দ্বারা প্রভাবিত করেন। ম্যাৎসিনী সর্বপ্রথম জাতিকে একথা ব‌ুঝাইতে সক্ষম হন যে ইতালীকে ম‌ুক্ত ও ঐক্যবদ্ধ করিতে হইলে ইতালীয়গণকে জাতীয়ভাবে ঐক্যবদ্ধ হইতে হইবে। আঞ্চলিক স্বার্থের কথা ভুলিয়া সমগ্র ইতালীর কথা ভাবিতে হইবে। তাঁহার উদ্দাম ও ধারাল লেখনী ইতালীয়দের মনে জাতীয় ঐক্যভাব সৃষ্টি করে। ম্যাৎসিনী জাতীয় উদ্দীপনাকে সংগঠিত করার জন্য ইয়ং ইতালী নামে এক

ইয়ং ইতালী দল



যোসেফ ম্যাৎসিনী

১. Bolton King. P. 19.

২. "A prophet, a philosopher and a spiritual force."

রাজনৈতিক সংস্থা গঠন করেন। ইতালীর সকল যুবককে ইহার সভ্য হইবার জন্য তিনি আহ্বান জানান। "স্বাধীনতা ও ঐক্য" (Unity and Independence) এই দুই আদর্শকে তিনি যুবশক্তির নিকট স্থাপন করেন। ম্যাৎসিনীর ইয়ং ইতালী দল এত জনপ্রিয় হয় যে ১৮৩৩ খ্রীঃ ইহার সভ্যসংখ্যা প্রায় ৬০ হাজারে পরিণত হয়। ইতালীর বিভিন্ন অঞ্চলে ইহার শাখা স্থাপিত হয়। গ্যারিবল্ডী, ব্যান্ডিরা প্রভৃতি দেশপ্রেমিকগণ এই দলের সভ্যপদ গ্রহণ করেন।

ইয়ং ইতালী দলের আদর্শ ও কর্মপন্থা ম্যাৎসিনী নির্দেশ করেন। ম্যাৎসিনী নিয়ম করেন যে ইয়ং ইতালী দলের সভ্যগণকে ৪৫ বৎসরের নিম্নে হইতে হইবে। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সভ্যগণকে দলভুক্ত করা হইবে। প্রতি সভ্য মাসে ৫০ সেণ্ট দলের তহবিলে চাঁদা দিবে। ম্যাৎসিনী ঘোষণা করেন যে ইতালীর স্বাধীনতা লাভের জন্য অষ্ট্রিয়াকে যুদ্ধের দ্বারা ইতালী হইতে বহিস্কার করিতে হইবে। ইতালীর স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করা হইবে না। ইতালীয়গণই ইতালীর ভাগ্য গঠন করিবে। যুবশক্তিই ইতালীকে মুক্ত করিবে। "শহীদের রক্ত ঝরিলে তবেই আদর্শবাদ তীব্র হইবে"। তিনি ঘোষণা করেন যে স্বাধীনতা লাভের পর ইতালী প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হইবে। স্বাধীন ইতালী হইবে "একটি ঐক্যবদ্ধ প্রজাতন্ত্র"। ম্যাৎসিনী রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার ঘোর বিরোধী ছিলেন।

ইয়ং ইতালী দলের আদর্শ

ম্যাৎসিনী কেবলমাত্র ভাবুক ছিলেন না। তাঁহার প্রেরণায় ইয়ং ইতালী দলের সভ্যগণ ইতালীর জনসমাজে ঐক্য ও স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করে। ম্যাৎসিনীর প্রভাবে ইতালীর ঐক্য আন্দোলন জাতীয় আন্দোলনে পরিণত হয়। প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক বিভেদ কাটাইয়া, ইহা সমগ্র ইতালীকে জাতীয় ঐক্যের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে।

গণ সংযোগ

১৮৪৮ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের সময় ইতালীর স্বাধীনতা আন্দোলন দুইটি ধারায় প্রবাহিত হয়। সার্ডিনিয়ার রাজা চার্লস এলবার্ট সার্ডিনিয়ার রাজবংশের অধীনে ইতালীকে ঐক্যবদ্ধ করিবার জন্য অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। তিনি কাস্টোজা ও নোভারার যুদ্ধে অষ্ট্রিয়ার নিকট পরাজিত হইলে রাজতন্ত্রের মাধ্যমে ইতালীর ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা আপাততঃ ব্যর্থ হয়। রাজতান্ত্রিক যুদ্ধ ব্যর্থ হইলে, ম্যাৎসিনী জনসাধারণের মুক্তিযুদ্ধ আরম্ভ করেন।[১] রোমে গণ বিপ্লব দেখা দিলে পোপ রোম হইতে পলায়ন করেন। ম্যাৎসিনী রোমে এক প্রজাতান্ত্রিক সরকার স্থাপন করেন। এই প্রজাতন্ত্রের অধীনে ম্যাৎসিনী সর্বসাধারণের ভোটাধিকার, মূল্য নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি প্রগতিশীল সংস্কারও চালু করেন। কিন্তু ম্যাৎসিনীর প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র অল্পদিন স্থায়ী হয়। ইওরোপীয় রাজাগণ ইতালীর প্রজাতন্ত্রকে স্বীকার করিতে রাজী ছিলেন না। তৃতীয় নেপোলিয়ন ঘোষণা করেন যে ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী ফ্রান্স পোপকে রোমে তাঁহার সিংহাসনে পুনঃ

১৮৪৮ খ্রীঃ ইয়ং ইতালী বিপ্লব ও স্বাধীনতার যুদ্ধ

১. "When the war fo the princes is over that of the peoples will now begin."

স্থাপিত করিবে। আসলে তৃতীয় নেপোলিয়ন ইতালীর প্রজাতন্ত্রকে ঘৃণা করিতেন। তিনি স্বয়ং ফ্রান্সের প্রজাতন্ত্রকে ধ্বংস করেন। তৃতীয় নেপোলিয়নের হুকুমে ফরাসী সেনাদল ম্যাৎসিনীর প্রজাতন্ত্রকে ধ্বংস করে। ম্যাৎসিনীর শিষ্য গ্যারিবল্ডী অপূর্ব বীরত্বসহ ফরাসীগণকে বাধা দিয়া পরাস্ত হন। ম্যাৎসিনীর বাস্তবতার অভাব তাঁহার মহান আদর্শকে বিফল করিয়া দেয়। তিনি যদি গোঁড়া প্রজাতন্ত্রবাদী না হইতেন তবে তিনি ইতালীর অন্যান্য জাতীয়তাবাদীর সাহায্য পাইতেন। কিন্তু প্রজাতন্ত্রের প্রতি নিষ্ঠার জন্য তিনি সার্ডিনিয়ার সাহায্য পান নাই। তাছাড়া ফ্রান্সের সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে ম্যাৎসিনীর সাফল্য লাভের সম্ভাবনা ছিল না।

ম্যাৎসিনীর কৃতিত্ব

ম্যাৎসিনীর বিফলতা ছিল এক মহান বিফলতা। তিনি ইতালীবাসীগণের মনে যে ভাবগত ঐক্য সাধন করেন সেই ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া কাভুর রাজনৈতিক ঐক্যের ইমারত নির্মাণ করেন। ম্যাৎসিনীর প্রবল আদর্শবাদ ইতালীতে যে জাগরণ আনে তাহা ছাড়া ইতালীর ঐক্য লাভ সম্ভব ছিল না। ম্যাৎসিনী ইতালীর মুক্তি আন্দোলনকে জাতীয় আন্দোলনে পরিণত করেন। প্রাদেশিকতায় আচ্ছন্ন ইতালীতে তিনি একতার আবেগ সৃষ্টি করেন। ম্যাৎসিনী ছিলেন ইতালীর জাতীয়তাবাদের প্রাণপুরুষ।

কাভুর ও ইতালীর ঐক্য (Cavour and the Unification of Italy) ঃ ম্যাৎসিনী ইতালীর ঐক্য আন্দোলনের ভাবযোগী ভাব-পুরুষ হইলেও কাউণ্ট কাভুর ছিলেন ইহার কর্মযোগী। ইয়ং ইতালী আন্দোলনের বিফলতার পর ইতালীয় জাতীয়তাবাদ যখন বদ্ধগলির মধ্যে পথ না পাইয়া মাথা কুটিতেছিল, তখন কাভুর তাহাকে নূতন পথে প্রবাহিত করেন। পিডমণ্টের এক অভিজাত পরিবারে ১৮১০ খ্রীঃ কাভুরের জন্ম হয়। তিনি পিডমণ্টের সামরিক বিভাগে ইঞ্জিনিয়ারের চাকুরী গ্রহণ করেন। ক্রমে সাংবাদিকতা, রাজনীতির প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন। কাভুর রিসঅর্গিমেণ্টো (Risorgimento) নামক এক পত্রিকার সম্পাদনা করিতেন। রেলপথ নির্মাণের ব্যাপারেও তাঁহার উৎসাহ ছিল। কাভুর বলিতেন যে রেলপথের মাধ্যমে ইতালীর ঐক্য বাড়িবে। এক অঞ্চলের লোক অপর অঞ্চলকে জানিতে পারিবে।

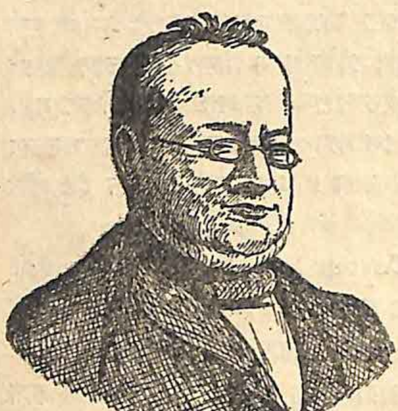
প্রথম জীবন

কাভুরের কর্ম পন্থা

পিডমণ্টের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হইবার পর কাভুর তাঁহার আদর্শকে বাস্তব রূপদানের কাজে হাত দেন। ম্যাৎসিনীর বিফলতা হইতে কাভুর শিক্ষা নেন। তিনি ঘোষণা করেন যে গুপ্ত আন্দোলন বা বিদ্রোহের দ্বারা ইতালীকে অষ্ট্রিয়ার হাত হইতে মুক্ত করা যাইবে না। একমাত্র যুদ্ধের দ্বারাই অষ্ট্রিয়াকে ইতালী হইতে বিতাড়িত করা সম্ভব। এজন্য বৈদেশিক সাহায্য লইতে হইবে। কারণ ইতালী নিজ শক্তির দ্বারা অষ্ট্রিয়াকে পরাজিত করিতে পারিবে না। তিনি ম্যাৎসিনীর প্রজাতন্ত্রবাদকে অবাস্তব বলিয়া মনে করিতেন। ইতালীকে সার্ডিনিয়া বা পিডমণ্টের রাজবংশের অধীনে ঐক্যবদ্ধ করার যৌক্তিকতা তিনি দেখান। তিনি বলেন যে ইতালীতে যতগুলি রাজবংশ ছিল তাহার মধ্যে একমাত্র এই রাজবংশের শিরায় ইতালীয় রক্ত প্রবাহিত

ছিল। এই রাজবংশ ইতালীর স্বাধীনতার জন্য আত্মত্যাগে প্রস্তুত ছিল। এই রাজবংশই একমাত্র সংবিধান মানিয়া নিয়মতান্ত্রিকভাবে ইতালীকে শাসন করিতে রাজী ছিল। রক্ষণশীল রাজতন্ত্র এবং প্রজাতন্ত্র এই উভয় মত এড়াইয়া নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রকেই কাভুর গ্রহণ করেন। এজন্য অনেকে কাভুরকে মডারেট বা নরমপন্থী বলেন। পিডমণ্টের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে কাভুর বহু প্রগতিশীল সংস্কার প্রবর্তন করেন। রেলপথ নির্মাণ, বাণিজ্য বৃদ্ধি, সামরিক সংগঠন, পার্লামেণ্ট স্থাপন করিয়া তিনি পিডমণ্ট রাজ্যের শাসন ব্যবস্থাকে ইতালীতে জনপ্রিয় করেন।

কাভুর ছিলেন বিসমার্কের ন্যায় ঘোর বাস্তববাদী বা Real Politic-এর ভক্ত। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে ইতালীর ঐক্য লাভ করিতে হইলে, অষ্ট্রিয়ার সহিত যুদ্ধ অনিবার্য। এই যুদ্ধে সাফল্যের জন্য তিনি ইংলণ্ড বা ফ্রান্সের মিত্রতা লাভের সংকল্প নেন। ক্রিমিয়ার যুদ্ধ বাধিলে, তিনি রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের পক্ষে যোগ দিয়া এই দুই দেশের সহানুভূতি পান। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পর প্যারিসের শান্তি বৈঠকে সার্ডিনিয়া যোগদান করে। এই আন্তর্জাতিক বৈঠকে তিনি ইতালীর উপর অষ্ট্রিয়ার অত্যাচারের প্রশ্ন তুলেন। ইহার ফলে ইংলণ্ড অষ্ট্রিয়ার খোলাখুলি সমালোচনা করে। কাভুর ইতালীর সমস্যাকে ইওরোপীয় সমস্যায় পরিণত করেন। প্যারিসের বৈঠকের পর তৃতীয় নেপোলিয়ন ইতালীর সমস্যার প্রতি আগ্রহ দেখান। কাভুর তৃতীয় নেপোলিয়নের সহিত প্লোমবিয়ারের গোপন চুক্তি (Pact of Plombiers) সম্পাদন করেন। এই চুক্তির দ্বারা তৃতীয় নেপোলিয়ন অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে সার্ডিনিয়াকে সামরিক সাহায্য দিতে স্বীকৃতি দেন। ইহার বিনিময়ে কাভুর তৃতীয় নেপোলিয়নকে স্যাভয় ও নিস ছাড়িয়া দিতে স্বীকৃতি দেন।



কাউণ্ট কাভুর

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ ও ইঙ্গ-ফরাসী সমর্থন লাভ

প্লোমবিয়ারের সন্ধির পর কাভুর সার্ডিনিয়ায় যুদ্ধ প্রস্তুতি চালান। ইহা লক্ষ্য করিয়া সার্ডিনিয়ার নূতন সেনাদলকে ভাঙিয়া দেওয়ার জন্য অষ্ট্রিয়া চরমপত্র দিলে কাভুর তাহা অগ্রাহ্য করেন। ফলে অষ্ট্রিয়া, সার্ডিনিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামিয়া পড়ে। ফরাসী ও সার্ডিনীয় বাহিনী প্লোমবিয়ারের সন্ধি অনুযায়ী অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামিয়া পড়ে। তাহারা ম্যাজেণ্টা, সলফেরিনোর যুদ্ধে অষ্ট্রিয় বাহিনীকে হঠাইয়া লম্বার্ডি অধিকার করে। ইতালীর সর্বত্র স্বাধীনতার আন্দোলন ছড়াইয়া পড়ে। মধ্য ইতালীর বিদেশী রাজাগণ জাতীয় বিপ্লবীগণের দ্বারা এই সময় ইতালী হইতে বিতাড়িত হয়। কিন্তু ইতালীর মুক্তিযুদ্ধ মাঝ পথে হঠাৎ থামিয়া যায়। তৃতীয় নেপোলিয়ন ইতালীর মুক্তিযুদ্ধ অসম্পূর্ণ রাখিয়া হঠাৎ অষ্ট্রিয়ার সহিত ভিল্লাফ্রাংকার সন্ধি করেন। এই

সন্ধির দ্বারা লম্বার্ডি ও মিলান সার্ডিনিয়ার সহিত যুক্ত হয়। অবশিষ্ট ইতালীতে স্থিতাবস্থা বহাল থাকে। ভিল্লাফ্রাংকার সন্ধি কাভুরের মনঃপূত না হওয়ায় তিনি বিরক্ত হইয়া কিছুদিনের জন্য পদত্যাগ করেন। কিন্তু সার্ডিনিয়ার রাজা ভিক্টর ইমানুয়েল এই সন্ধি গ্রহণ করেন।



ইতিমধ্যে অপ্রত্যাশিতভাবে মধ্য ইতালীর জনসাধারণ সার্ডিনিয়া রাজ্যের সহিত সংযুক্তির প্রস্তাব গ্রহণ করে। এই অঞ্চলে যে বিদেশী রাজাগণ রাজত্ব করিতেন তাহাদের ফিরাইয়া লইতে জনসাধারণ অস্বীকার করে। ইংলণ্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রী পামারষ্টোনও

সার্ডিনিয়ার সহিত মধ্য ইতালীর সংযুক্তি সমর্থন করেন। ইতিমধ্যে কাভুর প্রধানমন্ত্রীর পদে ফিরিয়া আসেন। তিনি তৃতীয় নেপোলিয়নকে স্যাভয় ও নিস নামক দুইটি স্থান ছাড়িয়া দিয়া এই প্রস্তাবের জন্য তাঁহার সমর্থন লাভ করেন। অষ্ট্রিয়া একাকী এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়া বাধা দিতে ব্যর্থ হয়। গণভোট দ্বারা মধ্য ইতালীর জনমত সার্ডিনিয়ার সহিত যোগদানের পক্ষে রায় দেয়। ফলে মধ্য ইতালীর রাজ্যগুলি সার্ডিনিয়ার সহিত সংযুক্ত হয়। মধ্য ইতালীর রোম নগরকে সংযুক্তির বাহিরে রাখা হয়।

মধ্য ইতালীর সংযুক্তি

এইবার ইতালীর স্বাধীনতার যুদ্ধ দক্ষিণ ইতালীর নেপলস ও সিসিলিতে আরম্ভ হয়। এই দুইটি প্রদেশে বুরবোঁ বংশীয় রাজা ফার্দিনান্দ রাজত্ব করিতেন। দেশপ্রেমিক ও বীর যোদ্ধা গ্যারিবল্ডী এক হাজার লালকোর্তা বাহিনী লইয়া নেপলসে অবতরণ করেন। ইংলণ্ড পরোক্ষভাবে এই মুক্তি অভিযানে সমর্থন জানায়। স্থানীয় অধিবাসীগণ দলে দলে তাঁহার পক্ষে যোগ দেয়। গ্যারিবল্ডী তাঁহার স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী দ্বারা সহজে সিসিলি ও নেপলস জয় করেন। গ্যারিবল্ডীর সাফল্য কাভুরের পক্ষে গুরুতর বিপদ সৃষ্টি করে। কাভুরের তোয়াক্কা না করিয়া গ্যারিবল্ডী তাঁহার বিজিত রাজ্য লইয়া একটি প্রজাতন্ত্রী প্রতিষ্ঠার কথা বলেন। যদি গ্যারিবল্ডী প্রজাতন্ত্র স্থাপন করিতেন তবে ইতালীতে সার্ডিনিয়ার রাজতন্ত্র ও গ্যারিবল্ডীর প্রজাতন্ত্র এই দুই ধরণের সরকার প্রতিষ্ঠিত হইত। ইতালীর ঐক্য বিনষ্ট হইত। ইতালীতে গৃহযুদ্ধ দেখা দিত। তাছাড়া ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ ইতালীতে প্রজাতন্ত্র সহ্য করিত না। ইতালীর স্বাধীনতা বিপন্ন হইত। তাছাড়া গ্যারিবল্ডী পোপের রাজ্য আক্রমণ করার কথা বলেন। ফ্রান্স পোপের সমর্থন করায় ফ্রান্সের সহিত ইতালীর যুদ্ধ বাধিয়া যাইত। কাভুর গ্যারিবল্ডীর দুঃসাহসিকতায় এজন্য মন্তব্য করেন যে "গ্যারিবল্ডীর সিংহের ন্যায় সাহসী হৃদয় থাকিলেও যাঁড়ের ন্যায় মস্তিষ্ক আছে।"[১] গ্যারিবল্ডীকে নিরস্ত করিয়া ইতালীতে রাজতান্ত্রিক ঐক্য রক্ষার জন্য কাভুর এক নির্মম সিদ্ধান্ত নেন। তিনি সার্ডিনিয়ার রাজা ভিক্টর ইমানুয়েলকে রোম ব্যতীত পোপের অবশিষ্ট রাজ্য অধিকার করিয়া দক্ষিণ ইতালীতে পাঠান। কেবলমাত্র রোম পোপের অধীনে থাকে। দক্ষিণ ইতালীতে গিয়া ভিক্টর ইমানুয়েল গ্যারিবল্ডীর বশ্যতা দাবী করেন। যদি গ্যারিবল্ডী এই দাবী না মানিতেন তবে গৃহযুদ্ধ বাধিত। কিন্তু গ্যারিবল্ডী আদর্শবাদ ও দেশপ্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া তাঁহার বিজিত রাজ্য রাজা ভিক্টর ইমানুয়েলের হাতে তুলিয়া দেন। কোন উপহার গ্রহণ না করিয়া তিনি শূন্য



গ্যারিবল্ডী

দক্ষিণ ইতালীর সংযুক্তি

১. "Garibaldi has the heart of a lion but brain of an ox."

হাতে তাঁহার বাসস্থানে ফিরিয়া যান। ইহার ফলে দক্ষিণ ইতালীর নেপলস ও সিসিলি সার্ডিনিয়ার সহিত সংয‍ুক্ত হয়। গণভোট দ্বারা এই সংয‍ুক্তি সমর্থিত হয়। এই ভাবে ইতালীর ঐক্য স্থাপনের কাজ আগাইয়া চলে। ইহার কিছ‍ুকাল পরে কাভ্যুরের ম‍ৃত্যু হয়।

তখনও পর্যন্ত ভিনিসিয়া ও রোম সংয‍ুক্ত ইতালীর বাহিরে ছিল। ১৮৬৬ খ্রীঃ অষ্ট্রো-প্রাশিয় য‍ুদ্ধে অষ্ট্রিয়া পরাজিত হইলে ভিনিসিয়া ইতালীর সহিত য‍ুক্ত হয়। ১৮৭০ খ্রীঃ ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয় য‍ুদ্ধের সময় ফরাসী সেনা রোম নগরী হইতে অপসারিত হইলে ইতালীয় সরকার রোম অধিকার করিয়া রোম নগরীকে ইতালীর রাজধানী বলিয়া ঘোষণা করে। ফলে কাভ্যুরের স্বপ্ন ঐক্যবদ্ধ ইতালী প‍ূর্ণতা পায়। ইতালীর ঐক্য সম্প‍ূর্ণ হয়। ইতালী কেবলমাত্র ভৌগোলিক নামে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে।

ভিনিসিয়া ও রোমের সংযুক্তি

কাভ্যুরের কৃতিত্ব (**Estimate of Cavour**) ঃ ইতিহাসে মাঝে মাঝে এমন ব্যক্তির পরিচয় পায় যাঁহারা নিজ প্রতিভার দ্বারা ইতিহাসে স্থান করিয়া নেন। কাভ্যুর হইল এইর‍ূপ একটি স্মরণীয় নাম। ম্যাৎসিনীর মধ্যে আদর্শবাদী প্রবল হইলেও বাস্তব ব‍ুদ্ধির অভাব ছিল। কাভ্যুর ছিলেন ঘোর বাস্তববাদী। ম্যাৎসিনী ছিলেন র‍্যাডিক্যাল (Radical) বা চরমপন্থী, কাভ্যুর ছিলেন মডারেট (Moderate) বা মধ্যপন্থী। ম্যাৎসিনীর আদর্শ ছিল প্রজাতন্ত্র ও সর্বসাধারণের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা ; ক্যভ্যুরের আদর্শ ছিল সাংবিধানিক বা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র, সম্পত্তির ভিত্তিতে ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা। ইতালীর ঐক্য আন্দোলন যখন ম্যাৎসিনীর ইয়ং ইতালী আন্দোলনের বিফলতার ফলে অবদমিত হইয়া পড়ে, কাভ্যুর তাহাকে বাস্তবব‍ুদ্ধির দ্বারা আবার সাফল্যের পথে পরিচালিত করেন। ম্যাৎসিনীর আদর্শ ছিল ইতালীর আত্মশক্তিতে দেশের ম‍ুক্তি স্থাপন। কাভ্যুর এই আদর্শের অসারতা ব‍ুঝিয়া বৈদেশিক সাহায্য ও য‍ুদ্ধের দ্বারা ইতালীর ঐক্য স্থাপন করেন। "ঐক্যবদ্ধ ইতালী কাভ্যুরের জীবন সাধনার ফলশ্র‍ুতি"।[১]

মধ্যপন্থা

কাভ্যুরের মধ্যে জন্মগত সাংগঠনিক প্রতিভা ছিল। তিনি সার্ডিনিয়া রাজ্যে যে উদারনৈতিক শাসন সংস্কার ও সামরিক সংগঠন করেন তাহা সকলের প্রশংসা পায়। রেলপথ নির্মাণ, বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ, সেনা ও নৌশক্তি সংগঠন দ্বারা তিনি প্রশাসক হিসাবে নাম করিয়া ফেলেন। তিনি পার্লামেণ্টারী শাসন ব্যবস্থায় দ‍ৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। সংয‍ুক্ত ইতালীকে তিনি এইর‍ূপ একটি শাসন ব্যবস্থার অধীনে আনিয়া তিনি ইতালীবাসীদের কৃতজ্ঞতা লাভ করেন।

সংগঠন

রাজনীতিজ্ঞ হিসাবে কাভ্যুর বিশেষ পারদর্শিতা দেখান। তিনি গোঁড়া আদর্শবাদের ভক্ত না হইয়া বাস্তব অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইয়া কাজ করিতেন। বিসমার্কের ন্যায় তিনি ছিলেন Real Politic বা স‍ুবিধাবাদী কূটনীতির ভক্ত। আন্তর্জাতিক রাজনীতির স‍ুযোগ লইয়া তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনের কৌশল তিনি জানিতেন। ইতালীর ম‍ুক্তি য‍ুদ্ধে

১. Italy as a nation is a legacy, the life work of Cavour.

অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ফ্রান্সের সামরিক সহায়তার প্রয়োজন তিনি জানিতেন। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে যোগ দিয়া তিনি ফ্রান্সের মিত্রতা লাভ করেন। প্যারিসের শান্তি বৈঠকে তিনি ইতালীর সমস্যার প্রতি ইওরোপীয় শক্তিগুলির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ইহার ফলে অষ্ট্রিয়া প্রায় মিত্রহীন হইয়া পড়ে। প্লমবিয়ারের সন্ধি দ্বারা ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নকে নিজ পক্ষে আনিয়া তিনি ফরাসী সেনাদল দ্বারা অষ্ট্রিয়াকে ইতালী হইতে বিতাড়িত করেন। তিনি তৃতীয় নেপোলিয়নকে স্যাভয় ও নিস ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার সহায়তায় উত্তর ও মধ্য ইতালীকে সার্ডিনিয়ার সহিত সংযুক্ত করেন। ইতিমধ্যে গ্যারিবল্ডী দক্ষিণ ইতালী জয় করিয়া প্রজাতন্ত্র স্থাপনের উদ্যোগ করিলে তিনি সার্ডিনিয়ার সেনাদল দ্বারা তাঁহাকে নিরস্ত করেন। কাভ্যুর জানিতেন যে প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হইলে ইওরোপীয় রাজাগণ ইতালীকে ধ্বংস করিয়া দিবে। এজন্য গ্যারিবল্ডীর হঠকারিতাকে তিনি দমন করেন। গ্যারিবল্ডী দক্ষিণ ইতালী সার্ডিনিয়ার রাজা ভিক্টর ইমানুয়েলকে ছাড়িয়া দেন। এইভাবে কাভ্যুর ইতালীর ঐক্য স্থাপন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর পামারষ্টোন মন্তব্য করেন যে "কাভ্যুর যে কাজ করিয়া গিয়াছেন তাহা প্রায় উপকথার মত এবং তাহা হইতে শিক্ষালাভ করা যায়।"[১] কাভ্যুরের মস্তিস্কই স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ ইতালী সৃষ্টি করে।

আন্তর্জাতিক নীতি

কাভ্যুরের নীতি ত্রুটিহীন ছিল না। তিনি উদারপন্হী হইলেও, ইতালীতে সর্ব-সাধারণের ভোটাধিকার প্রবর্তন করেন নাই। ধনী ব্যক্তিদের সম্পত্তির ভিত্তিতে ভোট দেওয়ার অধিকার তিনি দেন। ফলে কাভ্যুর প্রকৃত গণতন্ত্র স্থাপন করেন নাই। তিনি ম্যাৎসিনীর প্রজাতন্ত্রবাদকে বাদ দিয়া তিনি নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রবাদ গ্রহণ করেন। তৃতীয় নেপোলিয়নের সহায়তা লইবার জন্য তাঁহাকে মাঝে মাঝে বিপদগ্রস্থ হইতে হয়। কারণ তৃতীয় নেপোলিয়ন নিজ ইচ্ছায় যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া ভিল্লাফ্রাংকার সন্ধি করেন। ইহার ফলে ইতালীর মুক্তি-যুদ্ধ অর্ধপথে থামিয়া যায়। ভিল্লাফ্রাংকার সন্ধি ছিল কাভ্যুরের কূটনৈতিক ব্যর্থতার পরিচয়। তাছাড়া তৃতীয় নেপোলিয়নের সহায়তা পাইবার জন্য তাঁহাকে স্যাভয় ও নিস নামক দুইটি স্থান ছাড়িয়া দিতে হয়। মধ্য ইতালী যুক্ত হইবার পর দক্ষিণ ইতালী জয়ের জন্য কাভ্যুর কোন ব্যবস্থা করিতে বিফল হন। কাভ্যুরকে এই অচল অবস্থা হইতে গ্যারিবল্ডী উদ্ধার করেন। গ্যারিবল্ডী দক্ষিণ ইতালী অভিযান না করিলে এই অঞ্চল যুক্ত করা কাভ্যুরের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কাভ্যুরের পক্ষে সমগ্র ইতালী ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুকালে ভেনিসিয়া ও রোম ইতালীর জাতীয় রাষ্ট্রের বাহিরে থাকিয়া যায়। যাহাই হউক কাভ্যুরই আধুনিক ইতালীর স্রষ্টা ইহাতে সন্দেহ নাই। বিসমার্কের সহিত তুলনা করিলে কয়েকটি দিক হইতে কাভ্যুরের অধিক কৃতিত্ব দেখা যায়। বিসমার্ক প্রাশিয়ার শক্তির উপর নির্ভর করিয়া জার্মানীর ঐক্য স্থাপনের সুযোগ পান। কাভ্যুরের ক্ষেত্রে এরূপ কোন সুযোগ ছিল না। কারণ সার্ডিনিয়া রাজ্যের তেমন উল্লেখযোগ্য শক্তি ছিল না। বিসমার্ক ঐক্যবদ্ধ জার্মানীর উপর প্রাশিয়ার কর্তৃত্ব চাপাইয়া দেন। কাভ্যুর ইহা না করিয়া

কাভ্যুরের ত্রুটি

১. "Cavour left a name to point a moral and adorn a *tale.*"

সার্ডিনিয়াকে ইতালীর অন্যতম প্রদেশে পরিণত করেন। তিনি রোমকেই রাজধানী বলিয়া ঘোষণা করেন। বিসমার্ক জার্মানীতে স্বৈরাচারী শাসন স্থাপন করেন। কাভুর একটি উদারতান্ত্রিক শাসন স্থাপন করেন। কাভুর অবশ্য বিসমার্কের ন্যায় ধুরন্ধর ছিলেন না।

জার্মান জাতীয়তাবাদের উদ্ভব (Rise of German Nationalism) ঃ ১৬৪৮ খ্রীঃ ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধি দ্বারা জার্মানীকে ৩০০ টি রাজ্যে বিভক্ত করা হয়। তদবধি জার্মানী একটি ভৌগোলিক নাম হইলেও ইহার রাজনৈতিক অস্তিত্ব ছিল না বলিলেই চলে। ফরাসী বিপ্লবের যুগে নেপোলিয়ন জার্মানী জয় করিবার পর জার্মানীর ইতিহাসে নবযুগের সৃষ্টি হয়। নেপোলিয়ন জার্মানীর অধিকাংশ পুরাতন রাজবংশকে তাড়াইয়া দেন। তিনি অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়াকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া জার্মানীর উপর প্রায় সর্বময় ক্ষমতা পান। নেপোলিয়ন জার্মানীর পুনর্গঠন করিয়া ইহাকে মোট ৩৯টি রাজ্যে বিভক্ত করেন। তিনি জার্মানীর রাজ্যগুলিকে লইয়া রাইন রাষ্ট্রমণ্ডল বা কনফেডারেশন অফ দি রাইন নামে এক রাজ্য গঠন করেন। নেপোলিয়নের প্রভাবে জার্মানীতে জাতীয়তাবাদের জাগরণ ঘটে। ফরাসী বিপ্লবের জাতীয়তাবাদ জার্মান ছাত্র ও মধ্যবিত্ত সমাজে ছড়াইয়া পড়ে।

জার্মানীতে নেপোলিয়নের শাসন ও ফলাফল

নেপোলিয়নের প্রভাব ছাড়াও আরও একটি কারণে জার্মান জাতীয়তাবাদের উদ্ভব হয়। জার্মান অধ্যাপকমণ্ডলী জার্মান জাতির জাতীয়তার কথা যুবসমাজে প্রচার করেন। জেনা, লাইপজিগ, গটিংজেন বিশ্ববিদ্যালয় এই বিষয়ে বিশেষ ভূমিকা নেয়। সেবাষ্টিয়ান বাখ্ তাঁহার উন্মাদনাময় সঙ্গীতের মূর্ছনায় জার্মান জাতির প্রাণে নব আশার মুকুল ফোটান। হার্ডার তাঁহার লোকসাহিত্যের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদকে জাতির মর্মে ছড়াইয়া দেন। গ্যেটে তাঁহার পৃথিবী বিখ্যাত ফাউষ্ট নামক রচনার দ্বারা জার্মান সাহিত্যকে বিশ্বসভায় মর্যাদা দেন। ফিশ্‌টে (Fichte) নামক জার্মান দার্শনিক Address to the German Nation বা জার্মান জাতির প্রতি আবেদন নামক রচনায় জার্মানীর অধিবাসীদের মনে জাতীয়তাবাদ জাগাইয়া তুলেন। ষ্টাইন, হার্ডেনবার্গ প্রভৃতি জাতীয়তাবাদী সংস্কারকেরা জার্মান জাতির মনে প্রগতি ও ঐক্যের ভাব ছড়াইয়া দেন। লাইপজিগের যুদ্ধে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে সমগ্র জার্মান জাতির অভ্যুত্থান ছিল এই জাতীয়তাবাদের আত্মপ্রকাশ। ইহার ফলে জার্মান জাতির মনে ভাবগত ঐক্যবোধ গড়িয়া উঠে।

জার্মান বুদ্ধিজীবিগণের অবদান

মেটারনিকের চক্রান্তে ভিয়েনা কংগ্রেসে জার্মান জাতীয়তাবাদকে অবদমিত করা হয়। ভিয়েনা বৈঠকে জার্মানীকে ৩৯টি রাজ্যে বিভক্ত রাখা হয়। এই রাজ্যগুলির রাজাগণকে লইয়া একটি বুণ্ড (Bund) বা শিথিল রাষ্ট্রমণ্ডল গড়া হয়। অষ্ট্রিয়া ইহার সর্বেসর্বা থাকে।

ভিয়েনা চুক্তি

জার্মান জাতীয়তাবাদ ভিয়েনা চুক্তির পর অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় গভীরে প্রবাহিত

হইতে থাকে। অধ্যাপক, ছাত্র ও মধ্যবিত্ত সমাজ এই জাতীয়তাবাদকে সযত্নে লালন করে। জার্মান মধ্যবিত্তগণ জার্মানীর কৃত্রিম ভাগ উঠাইয়া অবাধ মাল চলাচলের দাবী জানায়।

সুপ্ত জাতীয়তাবাদ

এই বাস্তব অবস্থার পটভূমিকায় জার্মানীতে প্রাশিয়ার নেতৃত্বে ১৮১৮ খ্রীঃ একটি শিল্পসংঘ স্থাপিত হয়। ইহার নাম ছিল জোলভেরাইন (Zollverein)। জার্মান অর্থনীতিবিদ মাজেন (Maassen) ছিলেন ইহার উদ্ভাবন কর্তা। এই শিল্পসংঘের বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে জার্মানীর সকল দেশ ইহার সভ্য হইতে পারে। সভ্যদেশগুলির মধ্যে অবাধ বাণিজ্য স্থাপিত হয়। ক্রমে ক্রমে অষ্ট্রিয়া ব্যতীত জার্মানীর সকল দেশ জোলভেরাইনে যোগ দেয়। প্রাশিয়া এই সংঘকে স্থায়ী করিবার জন্য প্রভূত ত্যাগ স্বীকার করে। জোলভেরাইন স্থাপনের ফলে জার্মানীর অর্থনৈতিক ঐক্য স্থাপিত হয়। অষ্ট্রিয়াকে বাদ দিয়া প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মান রাষ্ট্রগুলি ঐক্যবদ্ধ হইতে শিক্ষা পায়। অর্থনৈতিক ঐক্য ক্রমে রাজনৈতিক ঐক্যের পথ তৈয়ারী করে।

জোলভেরাইন ও অর্থনৈতিক ঐক্য

জার্মান জাতীয়তাবাদকে মেটারনিক শত চেষ্টা করিয়াও দমাইতে পারেন নাই। যদিও তিনি কালর্সবাড হুকুনামা দ্বারা জার্মানীর ছাত্রসমাজ ও উদারতন্ত্রীগণকে দমন করেন, তবুও জাতীয়তাবাদের মূল গভীরে থাকিয়া যায়। জেনা বিশ্ব-বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করিয়া এক জাতীয়তাবাদী সংঘ স্থাপিত হয়। এই ছাত্ররা লুথারের জন্ম শত বার্ষিকী পালন উপলক্ষে ওয়ার্টবার্গ উৎসব পালন করে। ইহার ফলে জার্মানীতে জাতীয়তাবাদ তীব্র হইয়া উঠে। ১৮৪৮ খ্রীঃ জার্মানীতে বিপ্লব দেখা দিলে জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করিবার জন্য জাতীয়তাবাদীগণ ফ্রাংকফুর্ট (Frankfurt Parliament) শহরে এক জাতীয় সংবিধানসভা আহ্বান করে (বিশদ বিবরণ পৃঃ ১১০ দেখ)। এই পার্লামেণ্ট জার্মানীতে একটি নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়। প্রাশিয়ারাজ চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়ামকে জার্মান সম্রাটের পদ দেওয়া হয়। অষ্ট্রিয়া ব্যতীত সমগ্র জার্মানীকে এক ঐক্যবদ্ধ রাজ্যে পরিণত করার সংকল্প নেওয়া হয়। কিন্তু অষ্ট্রিয়া এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে। প্রাশিয়ারাজও এই প্রস্তাব নাকচ করেন। অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার সামরিক হস্তক্ষেপে ফ্রাংকফুর্ট পার্লামেণ্টের পতন ঘটে। ফ্রাংকফুর্ট পার্লামেণ্টের পতন ঘটিলেও জার্মানীর ঐক্যের আদর্শ অক্ষুণ্ণ থাকে।

ফেব্রুয়ারী বিপ্লব
ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেণ্ট

জার্মানীর ঐক্য স্থাপন: বিসমার্কের নেতৃত্ব (The Unification of Germany : The Leadership of Bismarck) : ফ্রাংকফুর্ট পার্লামেণ্টের বিফলতার পর জার্মানীর ঐক্য আন্দোলন বিসমার্কের নেতৃত্বে এক নূতন পথে চালিত হয়। প্রাশিয়ার পার্লামেণ্টে লিবারেল বা উদারপন্থী সভ্যগণের সহিত প্রাশিয়ারাজ প্রথম উইলিয়ামের বিরোধ দেখা দেয়। উদারনৈতিক সভ্যগণ প্রাশিয়ার সেনা সংগঠনের জন্য অর্থ বরাদ্দ করিতে অস্বীকার করে। এই সংকট সময়ে প্রথম উইলিয়াম বিসমার্ককে প্রধানমন্ত্রীর পদে (১৮৬২ খ্রীঃ) নিযুক্ত করেন। প্রধানমন্ত্রীর পদে

নিযুক্ত হইয়া বিসমার্ক উদারনৈতিক নেতাগণকে উদ্দেশ্য করিয়া তাঁহার বিখ্যাত "রক্ত ও লৌহ নীতি" ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন যে, "প্রাশিয়ার উদারতন্ত্রের দ্বারা জার্মান ঐক্য সাধিত হইবে না। প্রাশিয়ার সামরিক ক্ষমতাই জার্মানীকে পথ দেখাইবে। বক্তৃতা, বিতর্কের দ্বারা বা ভোটের দ্বারা জার্মানীর সমস্যা মিটাবে না। রক্ত ও লৌহ দ্বারাই এই সমস্যা মিটাইতে হইবে।"[১]

বিসমার্কের নিয়োগ

বিসমার্ক ইহার পর পার্লামেণ্টের অনুমতি ছাড়াই কর আদায় করিয়া সামরিক সংস্কারের কাজ করেন। বিসমার্ক পরিষ্কার জানাইয়া দেন যে অষ্ট্রিয়াকে জার্মানী হইতে বহিষ্কার করিয়া জার্মানীর উপর প্রাশিয়ার নেতৃত্ব স্থাপনের দ্বারা জার্মানীর ঐক্য সম্পন্ন হইবে। প্রাশিয়ার রাজবংশই একমাত্র জার্মানীর জাতীয়তাবাদকে সফল করিবার উপযুক্ত। এই রাজতন্ত্রের শক্তি খর্ব করার কোন প্রচেষ্টা বরদাস্ত করা হইবে না। তিনি জাতিকে স্মরণ করাইয়া দেন যে, এই রাজবংশের চেষ্টায় প্রাশিয়া বৃহৎ রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। জার্মানীকে প্রাশিয়ার ভাবধারায় প্রভাবিত করিতে হইবে। জার্মানীর মধ্যে প্রাশিয়া হারাইয়া গেলে চলিবে না।[২]

বিসমার্কের মতবাদ ঃ উদারপন্থীগণের সহিত বিরোধ



বিসমার্ক

বিসমার্ক যুদ্ধের দ্বারা জার্মানীর ঐক্য সাধনের কাজে নামিয়া পড়েন। শ্লেজভিগ ও হলষ্টিন প্রদেশ লইয়া জার্মানীর সহিত ডেনমার্কের বিরোধ দেখা দিলে বিসমার্ক এই বিরোধকে কাজে লাগান। এই প্রদেশ দুইটিতে জার্মান ও ডেনগণ বাস করিত। ১৮৫২ খ্রীঃ একটি সন্ধির দ্বারা স্থির হয় যে ডেনরাজ এই দুইটি প্রদেশের উপর রাজত্ব করিলেও তিনি এই দুই প্রদেশকে ডেনমার্কের অন্তর্ভূক্ত করিতে পারিবেন না। ডেনরাজ নবম ক্রিশ্চিয়ান (Christian IX) এই শর্ত ভাঙিয়া ১৮৬৩ খ্রীঃ প্রদেশ দুইটিকে ডেনমার্কের অন্তর্ভুক্ত করিলে, জার্মান জাতীয়তাবাদীগণ এই প্রদেশ দুইটির উদ্ধার দাবী করে। বিসমার্ক জার্মান জাতীয়তাবাদকে প্রাশিয়ার অনুকূলে আনিবার জন্য ডেনমার্কের বিরুদ্ধে ১৮৬৪ খ্রীঃ যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এই যুদ্ধের সময় পাছে অষ্ট্রিয়া পশ্চাদ্দিক হইতে প্রাশিয়াকে আক্রমণ করে, এজন্য তিনি এই যুদ্ধে অষ্ট্রিয়াকেও নিজ পক্ষভুক্ত করেন। ডেনমার্ক যুদ্ধে পরাজিত হইলে তিনি অষ্ট্রিয়াকে হলষ্টিন প্রদেশ দিয়া স্লেজভিগ প্রদেশ প্রাশিয়ার হাতে রাখেন। প্রাশিয়া কীয়েল বন্দর (kiel) ও তথায় একটি খাল খননের

ডেনমার্কের যুদ্ধ ও গ্যাষ্টিনের সন্ধি

---

১. "Germany does not look to Prussia's liberalism but to her power. Neither by debates, nor by majority votes will the great questions of the day decided but by blood and iron."

২. "Germany will be Prussianised, Prussia will not be Germanised".

অধিকার পায়। গ্যাষ্টিনের সন্ধি (Convention of Gastien) দ্বারা এই সর্ত স্থির হয়। এই সন্ধিতে আরও বলা হয় যে স্লেজভিগ সমস্যা অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া ভবিষ্যতে যৌথ-ভাবে সমাধান করিবে। এ বিষয়ে বাহিরের অন্য কোন সাহায্য লওয়া হইবে না। ঐতিহাসিক এ. জে. পি. টেইলারের মতে বিসমার্ক গ্যাষ্টিনের সন্ধির সর্ত এমনভাবে স্থির করেন যে ইহার প্রয়োগ লইয়া অষ্ট্রিয়ার সহিত প্রাশিয়ার বিরোধ বাধে। এই বিরোধের সুযোগ লইয়া অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রাশিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করার সুযোগ পায়। বিসমার্ক নিজেই বলেন যে, "অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার মধ্যের ফাটলগুলি আমি কাগজ দিয়া সাময়িক বন্ধ করিয়াছি এবং বড় ফাটল তৈয়ারীর ব্যবস্থা করিয়াছি।" বিসমার্ক এইভাবে গ্যাষ্টিনের সন্ধি দ্বারা অষ্ট্রিয়াকে ফাঁদে ফেলেন।

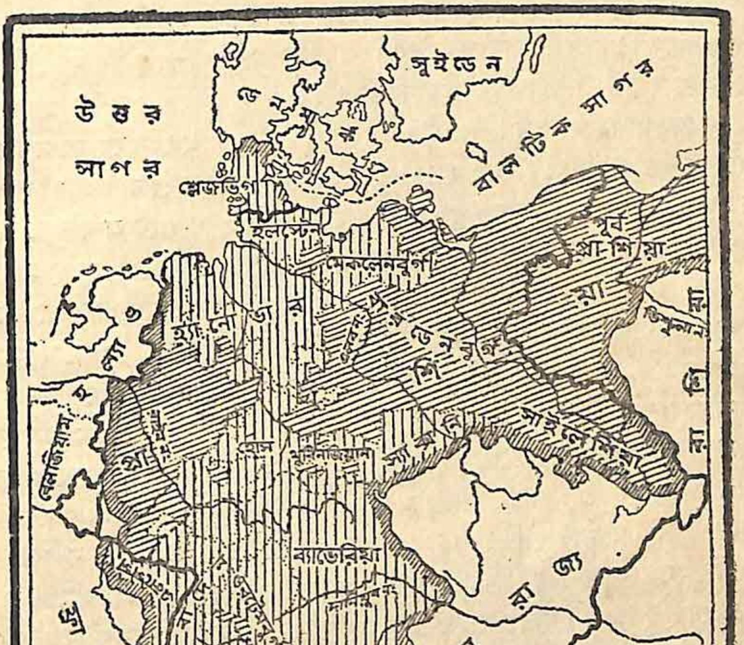
অষ্ট্রিয়ার মিত্রহীনতা

গ্যাষ্টিনের সন্ধির পর বিসমার্ক অষ্ট্রিয়ার সহিত যুদ্ধের প্রস্তুতি আরম্ভ করেন। তিনি অষ্ট্রিয়াকে আগেই মিত্রহীন করিয়া ফেলেন। ফ্রান্সের অধিপতি তৃতীয় নেপোলিয়নের সহিত তিনি বিয়ারিৎসের গোপন চুক্তি (১৮৫৬ খ্রীঃ) (Secret Pact of Biarritz) সম্পাদন করেন। এই চুক্তির দ্বারা অষ্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধের সময় ফ্রান্স নিরপেক্ষতা রক্ষায় রাজী হয়। বিনিময়ে ফরাসী সীমান্ত সংলগ্ন জার্মানীতে কিছু স্থান ফ্রান্সকে ছাড়িয়া দিতে বিসমার্ক রাজী হন (বিস্তারিত বিবরণ পরে ১৪১ পৃঃ দেখ)। বিসমার্ক অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ইতালীর সহিত মিত্রতা চুক্তি করেন। ইহার ফলে ইতালীকে অষ্ট্রিয়া অধিকৃত ভিনিসিয়া প্রদেশ ছাড়িয়া দিতে অঙ্গীকার দেওয়া হয়। রাশিয়ার জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারকে প্যারিসের সন্ধির সামুদ্রিক শর্ত ভঙ্গে সমর্থন দিতে বিসমার্ক আশ্বাস দেন। ইহার ফলে তিনি অষ্ট্রিয়ার সহিত যুদ্ধে রাশিয়ার নিরপেক্ষতাও লাভ করেন। এইভাবে বিসমার্ক অষ্ট্রিয়াকে মিত্রহীন করিয়া ফেলেন।

অষ্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধ ১৮৬৬ খ্রীঃ

অষ্ট্রিয়াকে মিত্রহীন করিবার পর গ্যাষ্টিনের সন্ধিভঙ্গের অজুহাতে তিনি অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। বিসমার্ক জানিতেন যে অষ্ট্রিয়ার সহিত প্রাশিয়ার যুদ্ধ আসলে একটি জার্মান রাষ্ট্রের সহিত অপর জার্মান রাষ্ট্রের যুদ্ধ। জার্মান জাতীয়তাবাদীরা ইহাতে বিভ্রান্ত হইবে। এজন্য তিনি জোর প্রচার কার্য দ্বারা জার্মান জনমতকে প্রাশিয়ার পক্ষে আনেন। অষ্ট্রিয়া জার্মান জনমত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। অষ্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধে স্যাডোয়া নামক স্থানে ১৮৬৬ খ্রীঃ অষ্ট্রিয়া প্রাশিয়ার নিকট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। প্রাশিয়ার সেনাদল অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনার নিকটে আসিয়া পড়ে। কিন্তু বিসমার্ক জানিতেন যে ভবিষ্যতে প্রাশিয়ার পক্ষে অষ্ট্রিয়ার মিত্রতার দরকার হইবে এবং জার্মান জনমত প্রাশিয়ার বাড়াবাড়ি পছন্দ করিবে না। তিনি অসাধারণ সংযম দেখাইয়া ভিয়েনা আক্রমণ হইতে প্রাশিয় সেনাদলকে নিরস্ত করেন। তিনি অষ্ট্রিয়ার সহিত প্রাগের সন্ধি ১৮৬৬ খ্রীঃ স্বাক্ষর করেন। এই সন্ধির ফলে অষ্ট্রিয়া জার্মানী হইতে সরিয়া যায়। দক্ষিণে মেইন নদী পর্যন্ত জার্মান ভূভাগ প্রাশিয়ার নেতৃত্বে সংযুক্ত হয়। মেইন নদীর দক্ষিণের জার্মান রাজ্যগুলি আলাদা থাকে। ইতালী ভিনিসিয়া প্রদেশ পায়। অষ্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধের ফলে জার্মানীর বৃহদংশ প্রাশিয়ার সহিত ঐক্যবদ্ধ হয়।

অস্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধের পর ফ্রান্সের সহিত প্রাশিয়ার সম্পর্কের দ্রুত অবনতি ঘটে ফরাসী জনমত বুঝিতে পারে যে জাতীয়তাবাদী ও ঐক্যবদ্ধ জার্মানী ফ্রান্সের জাতীয়



নিরপত্তার পক্ষে ঘোর বিপদ সৃষ্টি করিবে। ১৬৪৮ খ্রীঃ জার্মানীকে ৩০০টি রাজ্যে বিভক্ত করিয়া ফ্রান্স নিজেকে নিরাপদ করিয়াছিল। অস্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধের ফলে জার্মানীর সেই বিভাজন নষ্ট হয়। ফরাসী নেতা থিয়ার্স বলেন যে প্রাশিয়ার নিকট অষ্ট্রিয়া পরাজিত হইলেও কার্যতঃ ইহাকে ফ্রান্সের পরাজয় মনে করা যাইতে পারে (It was France that was defeated at

ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয় যুদ্ধ : ১৮৭০ খ্রীঃ

Sadowa, not Austria)। তৃতীয় নেপোলিয়ন এই যুদ্ধে নিরপেক্ষতা নীতি লইবার জন্য ফরাসী জাতির বিরাগভাজন হন। তৃতীয় নেপোলিয়ন বিক্ষুব্ধ ফরাসী জনমতকে শান্ত করিবার জন্য জার্মানীকে রাইনল্যাণ্ড অথবা বেলজিয়াম অথবা লাক্সেমবার্গ হইতে ফ্রান্সকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য চাপ দেন। বিয়ারিৎসের গোপন চুক্তির দ্বারা বিসমার্ক অবশ্য কিছু স্থান ছাড়িয়া দিতে স্বীকৃত ছিলেন। জার্মান জনমত জার্মানীর ব্যাপারে ফ্রান্সের হস্তক্ষেপে বিরক্ত হয়। জার্মান নেতারা বলিতে থাকেন যে ফ্রান্স চিরকাল জার্মানীকে বিভক্ত ও দুর্বল রাখিতে চাহে। ইহা আর সহ্য করা হইবে না। জার্মান জনমত আপাততঃ ক্ষতিপূরণ দানের বিপক্ষে দেখিয়া বিসমার্ক ক্ষতিপূরণ দানে অস্বীকার করেন। এদিকে তৃতীয় নেপোলিয়ন নিজে যুদ্ধ বিরোধী হইলেও ফ্রান্সের যুদ্ধং দেহি মনোভাব দেখিয়া ইহার সামিল হইয়া পড়েন। ফলে ফ্রান্সের সহিত প্রাশিয়ার সম্পর্কের দ্রুত অবনতি ঘটে। যুদ্ধ অনিবার্য দেখিয়া বিসমার্ক কূটনীতির সাহায্যে ফ্রান্সকে মিত্রহীন করিয়া ফেলেন। ইহার পর বিসমার্ক ফ্রান্সকে জব্দ করিবার জন্য স্পেনের সিংহাসনে প্রাশিয়ার রাজবংশকে স্থাপনের আয়োজন করেন। এজন্য তিনি স্পেনের সিংহাসনে প্রাশিয়ার রাজবংশের লিওপোল্ডকে বসাইবার ব্যবস্থা করেন। ইহাতে ফ্রান্সে দারুণ উত্তেজনা দেখা দেয়। প্রাশিয়ার রাজা প্রথম উইলিয়াম যাহাতে স্পেনের সিংহাসনের উপর দাবী ত্যাগ করেন, এজন্য তাঁহার নিকট হইতে এক প্রতিজ্ঞা পত্র আদায় করিবার জন্য ফরাসী রাষ্ট্রদূত বেনেদিতিকে ফরাসী মন্ত্রী গ্রামণ্ট আদেশ দেন। এই আদেশ পাইয়া বেনেদিতি এমস্ (Ems) নামক স্থানে প্রথম উইলিয়ামের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ফ্রান্সের দাবী পেশ করেন। প্রথম উইলিয়াম নম্রতা ও দৃঢ়তার সহিত এই দাবী প্রত্যাখ্যান করেন। তবে তিনি আশ্বাস দেন যে প্রাশিয়া স্পেনের সিংহাসনে আপাততঃ বসিবে না। প্রথম উইলিয়াম এই সাক্ষাৎকারের বিবরণ এমস হইতে টেলিগ্রাম যোগে বিসমার্ককে জানান। বিসমার্ক ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধের উপলক্ষ খুঁজিতেছিলেন। তিনি এমস্ টেলিগ্রামের কয়েকটি শব্দ বাদ দিয়া সংবাদপত্রে প্রকাশ করেন। ফলে ফ্রান্সের লোকের ধারণা হয় যে, প্রথম উইলিয়াম ফরাসী দূত বেনেদিতিকে অপদস্থ করিয়াছেন। অপরদিকে জার্মানগণের ধারণা হয় বেনেদিতি প্রাশিয়ারাজ প্রথম উইলিয়ামকে অপমান করিয়াছেন। ইহার ফলে রাইন নদীর দুই দিকে যুদ্ধের দামামা বাজিয়া উঠে। বিসমার্ক বলেন যে, "তিনি গলদেশের (ফ্রান্সের) ষাঁড়কে লাল কাপড় দেখাইয়া ক্ষেপাইয়া দিয়াছেন" (Bismarck showed the red rag to the Gallic bull)। এমতাবস্থায় তৃতীয় নেপোলিয়ন জনমতের চাপে প্রাশিয়ার উপর যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এদিকে রাশিয়া, ইতালী ও অষ্ট্রিয়া নিরপেক্ষ থাকায় ফ্রান্সকে একাকী প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হয়। সেডানের যুদ্ধে (১৮৭০ খ্রীঃ) তৃতীয় নেপোলিয়ন পরাজিত ও বন্দী হন। ইহার পর জার্মান বাহিনী ফরাসী রাজধানী প্যারিস অবরোধ করিয়া দখল করে। প্যারিসের পতনের পর ফ্রান্সের তৃতীয় প্রজাতন্ত্রের উপর বিসমার্ক ফ্রাংকফুর্টের সন্ধি ১৮৭১ খ্রীঃ (Treaty of Frankfurt) চাপাইয়া দেন। ফ্রান্স, জার্মানীকে আলসাস ও লোরেন ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়। ফ্রান্স পাঁচ বিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ জার্মানীকে

জার্মানীর ঐক্যলাভ

দিতে বাধ্য হয়। ফ্রান্সের রাজতন্ত্রী শহর ভার্সাইয়ের কাঁচের প্রাসাদে (Hall of Mirror) প্রাশিয়ার রাজা প্রথম উইলিয়ামের জার্মান সম্রাটরূপে অভিষেক সম্পন্ন হয়। তিনি সম্রাট প্রথম কাইজার উইলিয়াম খেতাব গ্রহণ করেন। জার্মানীর ঐক্য সম্পন্ন হয়।

ফ্রাঙ্কো-প্রাশীয় সম্পর্ক ও ফ্রাঙ্কো-প্রাশীয় যুদ্ধ (Franco-Prussian Relations and the Franco-Pussian War) ঃ ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন ইতালী ও জার্মান জাতীয়তাবাদের সমর্থক ছিলেন। জার্মানীর ঐক্য স্থাপিত হইলে ভিয়েনার সন্ধি ভাঙিয়া পড়িবে এবং অষ্ট্রিয়ার প্রতিপত্তি বিনষ্ট হইবে বলিয়া তিনি মনে করিতেন। সুতরাং তৃতীয় নেপোলিয়ন গোড়ার দিকে জার্মান ঐক্যের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। অষ্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধে ফ্রান্সকে নিরপেক্ষ রাখিবার জন্য বিসমার্ক, তৃতীয় নেপোলিয়নের প্রতিশ্রুতি চাহিলে বিয়ারিৎসের গোপন চুক্তি দ্বারা নেপোলিয়ন সেই প্রতিশ্রুতি দেন।

ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয় নিরপেক্ষতা নীতি

তৃতীয় নেপোলিয়ন সম্ভবতঃ ভাবিয়াছিলেন যে অষ্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধ দীর্ঘদিন চলিবে। তিনি সুবিধামত এই যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিয়া ফ্রান্সের অনুকূলে ঘটনা নিয়ন্ত্রিত করিবেন। কিন্তু প্রাশিয়ার বিদ্যুৎগতি আক্রমণ ও স্যাডোয়ার যুদ্ধে অষ্ট্রিয়ার শোচনীয় পরাজয় তাঁহার সকল হিসাব বানচাল করিয়া দেয়। তৃতীয় নেপোলিয়ন উপায় না দেখিয়া অষ্ট্রিয়ার সহিত প্রাশিয়ার সন্ধি আলোচনায় হস্তক্ষেপ করেন। তাঁহারই চাপে বিসমার্ক মেইন নদী পর্যন্ত জার্মানীর অংশ প্রাশিয়ার সহিত যুক্ত করেন। মেইন নদীর দক্ষিণে অবস্থিত জার্মান রাজ্যগুলি স্বাধীন রাজ্য হিসাবে স্বীকৃত হয়। ফ্রান্স জার্মানীর এই দক্ষিণ অংশের পৃষ্ঠপোষক হইয়া দাঁড়ায়।

সাডোয়ার যুদ্ধের পর তৃতীয় নেপোলিয়নের হস্তক্ষেপ

অষ্ট্রো-প্রাশিয় সন্ধিতে তৃতীয় নেপোলিয়নের হস্তক্ষেপ বিসমার্ক মোটেই সন্তুষ্টচিত্তে নিতে পারেন নাই। ইহার ফলে ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয় সম্পর্কে চিড় ধরে। কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন যে ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয় যুদ্ধের বীজ এই সময়েই রোপিত হয়। কিন্তু ঐতিহাসিক আইখ (Eyck) এই মতকে নস্যাৎ করিয়াছেন। যাহা হউক অষ্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধের পর ফ্রান্সের সহিত প্রাশিয়ার সম্পর্কের দ্রুত অবনতি ঘটে। এই যুদ্ধের পর ফ্রান্সের জাতীয়তাবাদীগণ প্রচার করে যে প্রাশিয়ার নেতৃত্বে উত্তর জার্মানীর ঐক্য ফ্রান্সের নিরাপত্তার ক্ষতি করিবে। তাহারা বলে যে, "স্যাডোয়ার যুদ্ধে প্রকৃতপক্ষে ফ্রান্সই পরাজিত হইয়াছে"। স্যাডোয়ার প্রতিহিংসার জন্য ফরাসী জাতীয়তাবাদীগণ সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে।

জার্মান ও ফরাসী জনমত

তৃতীয় নেপোলিয়ন এই সংকটে পড়িয়া প্রাশিয়ার নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ দাবী করেন। তাঁহার আশা ছিল যে ইহার দ্বারা তিনি ফ্রান্সের জনমতকে শান্ত করিতে পারিবেন। বিয়ারিৎসের চুক্তিতে বিসমার্ক ফ্রান্সের ক্ষতিপূরণ দানের নীতি স্বীকার করিয়াছিলেন। নেপোলিয়ন মেইনজ প্রস্তাব দ্বারা রাইনল্যান্ডের কিছু স্থান ক্ষতিপূরণ চান। এদিকে জার্মান জাতীয়তাবাদীগণ ফ্রান্সকে

ক্ষতিপূরণ সমস্যা

ক্ষতিপূরণ দানের ঘোর বিরোধী ছিল। বিসমার্ক সুবিধা বুঝিয়া জার্মান জনমতকে কাজে লাগান এবং মেইনজ প্রস্তাব নাকচ করেন। নেপোলিয়ন অতঃপর বেলজিয়াম দাবী করিলে, বিসমার্ক দাবী করেন যে, মেইন নদীর দক্ষিণে অবস্থিত জার্মানীকে প্রাশিয়ার সহিত সংযুক্ত হইবার অধিকার দিলে, বেলজিয়ামের উপর ফরাসী দাবী বিবেচিত হইবে। ইহাতে নেপোলিয়ন অসম্মত হন। তৃতীয় নেপোলিয়ন তখন আত্মসম্মান রক্ষার জন্য লাক্সেমবার্গ দাবী করেন। কিন্তু দক্ষিণ জার্মানীতে ইহার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করিয়া বিসমার্ক এই প্রস্তাব নাকচ করেন।

ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয় যুদ্ধের দায়িত্ব

লাক্সেমবার্গ প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইলে তৃতীয় নেপোলিয়ন বাধ্য হইয়া প্রাশিয়ার সহিত যুদ্ধের কথা ভাবেন।[১] বিসমার্কও ফ্রান্সের মতিগতি বুঝিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি আরম্ভ করেন। এইভাবে ১৮৬৭ খ্রীঃ ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয় যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন যে ১৮৬৭ খ্রীঃ আগে হইতে বিসমার্ক ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধের জন্য পরিকল্পনা করেন। কিন্তু ঐতিহাসিক এ. জে. পি. টেইলার এই মত খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহার মতে "ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয় যুদ্ধ, অষ্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধের ন্যায় সুপরিকল্পিত ছিল না।"[২]

ফ্রান্সের মিত্রহীনতা

১৮৬৭ খ্রীঃ পর যুদ্ধ অনিবার্য দেখিয়া বিসমার্ক তৃতীয় নেপোলিয়নকে মিত্রহীন করিবার কাজে হাত দেন। তৃতীয় নেপোলিয়নের বৈদেশিক নীতি ইওরোপের প্রধান শক্তিগুলির বিরক্তি সৃষ্টি করিয়াছিল। বিসমার্ক ইহার পূর্ণ সুযোগ নেন। ইওরোপের অধিকাংশ শক্তি এই যুদ্ধে নেপোলিয়নকে সাহায্য না করিয়া নিরপেক্ষ থাকে। বিসমার্ক রাশিয়াকে প্যারিসের সন্ধির সামুদ্রিক শর্ত ভাঙিতে সম্মতি দিয়া রাশিয়ার নিরপেক্ষতাও লাভ করেন।

বিসমার্ক ফ্রান্সকে জব্দ করিবার জন্য স্পেনের সিংহাসনে প্রাশিয়ার রাজবংশের লিওপোল্ডকে বসাইতে মনস্থ করেন। স্পেনে প্রাশিয়ার অধিকার বিস্তৃত হইলে ফ্রান্সের নিরাপত্তার বিষম ক্ষতি হইত। পূর্বে জার্মানী ও দক্ষিণ-পশ্চিমে স্পেনে জার্মান বংশ বসিলে ফ্রান্স দুই দিক দিয়া বেষ্টিত হইয়া পড়িত। স্পেনের সিংহাসনে লিওপোণ্ডকে বসাইবার চেষ্টা করা হইলে ফ্রান্স মহা প্রতিবাদ করে ও যুদ্ধের আয়োজন চালায়। ফরাসী মন্ত্রী গ্রামণ্টের নির্দেশে রাষ্ট্রদূত বেনেদিতিকে অশোভন ব্যস্ততার সহিত প্রাশিয়ার রাজা প্রথম উইলিয়ামের নিকট হইতে স্পেনের সিংহাসনে পাকাপাকি নাদাবী আদায় করার জন্য পাঠান হয়। প্রথম উইলিয়াম মৌখিক প্রতিশ্রুতি দিলেও ফ্রান্স তাহাতে সন্তুষ্ট হয় নাই। প্রথম উইলিয়াম এই সময় এমস্ শহরে ছিলেন। তিনি

স্পেনের সমস্যা ও এমস্ টেলিগ্রাম

বেনেদিতিকে এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিতে অসম্মতি জানান। প্রথম উইলিয়াম এমস্ হইতে এক টেলিগ্রাম যোগে বেনেদিতির সহিত তাঁহার আলোচনা বিসমার্ককে জানান। বিসমার্ক এই টেলিগ্রামটিকে সম্পাদনা করিয়া সংবাদপত্রে প্রকাশ করিলে ফ্রান্স ও জার্মানীতে ইহার পরস্পর বিরোধী

১. Vide New Cambridge History. Vol. X. P. 580.

২. "The war lacked the deliberation of the war with Austria". A. J. P. Taylor.

ব্যাখ্যা দেখা দেয়। ফরাসীগণ মনে করে যে তাহাদের রাষ্ট্রদূতকে জার্মান অধিপতি উইলিয়াম অপদস্থ করিয়াছেন। ইহাতে ফরাসী জনমত যুদ্ধের জন্য উগ্র হয়। অপরদিকে জার্মানগণ মনে করে যে ফরাসী রাষ্ট্রদূত জার্মান সম্রাটকে অপদস্থ করিয়াছেন। অবশেষে ফরাসী জনমতের চাপে তৃতীয় নেপোলিয়ন জার্মানীর উপর যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয় যুদ্ধ ১৮৭০ খ্রীঃ আরম্ভ হয়।

ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয় যুদ্ধের ফলাফল ঃ ১৮৭১ খ্রীঃ সংগঠনের গুরুত্ব (Results of Franco-Prussian War : Singnificance of the Settlement of 1871) ঃ "ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয় যুদ্ধের ফলে জার্মানী ইওরোপের কর্ত্রী ও বিসমার্ক জার্মানীর কর্তা হন।"[১]

ভিয়েনা সন্ধির দ্বারা ইওরোপে যে শক্তিসাম্য স্থাপিত হইয়াছিল, ১৮৭১ খ্রীঃ তাহা সম্পূর্ণ ভাঙিয়া পড়ে। ঐক্যবদ্ধ জার্মানী ইওরোপের অন্যতম প্রধান শক্তির ভূমিকা গ্রহণ করে। জার্মানীর অপ্রতিহত সামরিক শক্তি ও জার্মান রাষ্ট্রনায়ক বিসমার্কের কূটনৈতিক দক্ষতা জার্মানীকে এক বিরল মর্যাদার অধিকারী করে। ১৮৭১ খ্রীঃ বিসমার্কের "রক্ত ও লৌহ-নীতি" (Blood and iron policy) চূড়ান্ত সফলতা লাভ করে। মেটারনিক যেমন ১৮১৫—৪৮ খ্রীঃ পর্যন্ত ইওরোপকে নেতৃত্ব দেন, বিসমার্ক সেইরূপ ১৮৭১ খ্রীঃ পর ইওরোপে সর্বেসর্বা হইয়া দাঁড়ান।[২] তাছাড়া ১৮৭০—১৮৯০ এই কুড়ি বৎসর তিনি জার্মানীর উপর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব লাভ করেন। বিসমার্কের নেতৃত্বে জার্মানী দ্রুত ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। একটি সংবিধান দ্বারা বিসমার্ক জার্মানীর পরস্পর বিরোধী শক্তিকে সংহত করেন। তিনি মুদ্রা সংস্কার, শুল্ক নীতির সংস্কার করিয়া জার্মানী আর্থিক ও বাণিজ্যিক শক্তি বাড়ান। মোট কথা ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয় যুদ্ধের পর হইতে জার্মানী নিরবিচ্ছিন্নভাবে শক্তি বৃদ্ধি করে। দ্বিতীয়তঃ, ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয় যুদ্ধের ফলে ইতালীর ঐক্য সম্পূর্ণ হয়। ১৮৭০ খ্রীঃ রোম নগরী হইতে ফরাসী সেনা অপসারিত হইলে রোম নগরীতে ইতালীর রাজধানী স্থাপিত হয়। তৃতীয়তঃ, জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার প্যারিসের শান্তি চুক্তির সামুদ্রিক শর্ত ভাঙিয়া ফেলেন। ফ্রান্স ছিল এই চুক্তির অন্যতম রক্ষক। ফ্রান্সের পরাজয়ের ফলে এই শর্ত রক্ষা করা একা ইংলণ্ডের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে। ইহার ফলে পূর্বাঞ্চল সমস্যা পুনরায় দেখা দেয়। চতুর্থতঃ, ফ্রান্সের ইতিহাসে ১৮৭১ খ্রীঃ সুদূর-প্রসারী পরিবর্তনের সূচনা করে। সেডানের যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে তৃতীয় নেপোলিয়নের পতন ঘটে। ফ্রান্সে চিরতরে রাজতান্ত্রিক শাসন লোপ পায়। তৃতীয় প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়। এছাড়া ফ্রান্সে সর্বসাধারণের ভোটাধিকার দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। বোনাপার্টবাদ ও রাজতন্ত্রবাদের চিরতরে অবসান ঘটে। ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হইলে ইওরোপের রাজতন্ত্রগুলির মনে

রক্ত-লৌহ নীতির জয় ঃ বিসমার্কের প্রতিপত্তি ও ফ্রান্সের অবস্থা ঃ ইওরোপীয় শক্তিসাম্য

১. "The Franco-Prussian war made Germany the mistress of Europe and Bismarck the master of Germany."—Ketelby.

২. D. Tomson P. 299.

গভীর আশংকা দেখা দেয়। রাশিয়ার জার প্রভৃতি আশংকা করেন যে তাঁহাদের দেশে এই বৈপ্লবিক ভাবধারা ছড়াইয়া পড়িবে। ১৮৭১ খ্রীঃ ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয় যুদ্ধের সময় ফ্রান্সের সমাজতান্ত্রিক দল ফ্রান্সে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য প্যারিস কমিউন স্থাপন করে। কিন্তু প্যারিস কমিউনের চরমপন্থী নীতি বুর্জোয়া শ্রেণীর পছন্দ না হওয়ায়, বুর্জোয়াগণ বল প্রয়োগের দ্বারা এই 'কমিউন' আন্দোলনকে দমাইয়া দেয়। ফ্রান্সে রাজনৈতিক গণতন্ত্র বহাল থাকে। পঞ্চমতঃ, ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয় যুদ্ধে জার্মানীর নিকট ফ্রান্সের পরাজয় ও আলসাস, লোরেন প্রদেশ জার্মানীর হস্তগত হইলে ফরাসী জাতি গভীর বেদনা বোধ করে। আলসাস ও লোরেন পুনরুদ্ধার এবং ১৮৭০ খ্রীঃ পরাজয়ের প্রতিশোধ লইবার জন্য ফরাসী প্রজাতন্ত্র চেষ্টায় থাকে। অবশেষে প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানীর পরাজয়ের ফলে ফ্রান্সের প্রতিহিংসা চরিতার্থ হয়। ষষ্ঠতঃ, এই প্রতিহিংসা-নীতির সম্মুখীন হইয়া বিসমার্ক ফ্রান্সকে মিত্রহীন করার পরিকল্পনা নেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি তিন-কাইজারের চুক্তি ও ত্রিশক্তি মিত্রতা গঠন করেন। ইহার ফলে ফ্রান্স ইওরোপে মিত্রহীন হইয়া পড়ে। ফ্রান্সের সহিত জার্মানীর বিরোধ অব্যাহত থাকে। সপ্তমতঃ, ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয় যুদ্ধের ফলে ইওরোপের শক্তিসাম্যের চেহারা পাল্টাইয়া যায়। প্রাশিয়ার নিকট অষ্ট্রিয়া ও ফ্রান্সের পরাজয় এবং জার্মানীর উত্থান ইওরোপীয় রাজনীতিতে নূতন ছক সৃষ্টি করে। ১৮৭০ খ্রীঃ পর জার্মানী ও রাশিয়া ইওরোপ মহাদেশে প্রাধান্য পায়। ফ্রান্স কোনঠাসা হইয়া পড়ে। ইংলণ্ড ক্রমশঃ ইওরোপের বাহিরে ঔপনিবেশিক ব্যাপারে মন দেয়। সর্বশেষে বলা যায় যে বিসমার্কের "রক্ত-লৌহ নীতি" ইওরোপীয় রাজনীতিতে নূতন আদর্শ সৃষ্টি করে। ন্যায় নীতির স্থলে বাহুবল ও কূটনীতিই প্রাধান্য পায়।[১] ১৮৭১ খ্রীঃ ইওরোপের মানচিত্র জটিলতা মুক্ত হইয়া সরলীকৃত হয়। জার্মানীতে ৩৯টি রাজ্যের স্থলে একটি ও ইতালীতে একটি রাজ্য স্থাপিত হয়।

নবম অধ্যায়

ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির আভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক নীতি ১৮৭০-১৮৯০

(Internal and External Policies of the European Nations)

বিসমার্কের আভ্যন্তরীন সংগঠন নীতি, ১৮৭১-১৮৯০ (Internal reconstruction of Germany by Bismarck) : ১৮৭১ খ্রীঃ ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয় যুদ্ধের পর প্রাশিয়ার রাজা প্রথম উইলিয়াম, সমগ্র জার্মানীর সম্রাট হিসাবে কাইজার প্রথম উইলিয়াম উপাধি নেন। নবগঠিত জার্মান রাষ্ট্রকে সংগঠিত

১. D. Thomson. P. 299.

করিবার জন্য বিসমার্ক একটি শাসনতন্ত্র স্থাপন করেন। জার্মানীর ২৫টি রাজ্য লইয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়। এই যুক্তরাষ্ট্রের নাম হয় জার্মান সাম্রাজ্য বা Empire। কাইজার প্রথম উইলিয়াম ইহার সম্রাট হন। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের সকল ক্ষমতার অধিকারী হন। প্রধানমন্ত্রী বা চ্যান্সেলরকে নিয়োগের অধিকারও তিনি পান। সম্রাটের নামে চ্যান্সেলরই শাসনকার্য চালাইবার আসল ক্ষমতা পান। চ্যান্সেলরকে আইনসভার নিকট দায়বদ্ধ না করিয়া সম্রাটের নিকট দায়বদ্ধ করা হয়। বিসমার্ক ইম্পিরিয়েল চ্যান্সেলর বা সাম্রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত হন। কেন্দ্রীয় আইন সভায় বুণ্ডসর্যাট (Bundesrat) ও রাইখষ্ট্যাগ (Reichastag) নামে দুইটি কক্ষ স্থাপন করা হয়। জার্মানীর ২৫টি রাজ্যের মনোনীত প্রতিনিধি বুণ্ডসর্যাটের সভ্য হন। এই সভায় প্রাশিয়াকে সংখ্যাগুরু ভোটের অধিকার দেওয়া হয়। নিম্নকক্ষ বা রাইখষ্ট্যাগের সভ্যগণকে সর্বসাধারণের ভোটে নির্বাচিত করার নিয়ম করা হয়। সংবিধানে বুণ্ডসর্যাট বা উচ্চ কক্ষের হাতেই বেশী ক্ষমতা দেওয়া হয়। অর্থ বাজেট দুইটি কক্ষের সম্মতিক্রমে পাশ হইবার ব্যবস্থা হয়। জার্মানীকে শাসন করিবার জন্য কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক দুইভাগে ক্ষমতা ভাগ করা হয়। কতকগুলি বিষয় যথা দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র নীতি প্রভৃতি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকে। অঙ্গ রাজ্যগুলিকে কেন্দ্রীয় বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে স্বায়ত্ব শাসনের অধিকার দেওয়া হয়। এইভাবে বিসমার্ক কেন্দ্রীয়তার সহিত প্রাদেশিক স্বকীয়তার সমন্বয় সাধন করেন।

জার্মান শাসনতন্ত্র

জার্মানীর সকল স্থানে যাহাতে একই প্রকার আইন চলে এজন্য বিসমার্ক একটি আইন কমিশন বসান। এই কমিশন যে সকল সুপারিশ করে বিসমার্ক তাহা রূপায়িত করেন। তিনি ১৮৭৩ খ্রীঃ সমগ্র জার্মানীর জন্য কেন্দ্রীয় রেলবোর্ড গঠন করেন। কেন্দ্রীয় ডাক ও তার বিভাগও স্থাপিত হয়। ইহার ফলে জার্মানীর ঐক্য দৃঢ় হয়। তিনি ব্যাংক ব্যবস্থার সংগঠন করেন। ১৮৭৬ খ্রীঃ রাইখ্ ব্যাংক বা রাষ্ট্রীয় ব্যাংক স্থাপন করিয়া তিনি জার্মানীর মুদ্রা ব্যবস্থাকে কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণে আনেন। বিসমার্ক জার্মানীতে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা চালু করেন এবং জার্মান জাতীয় সেনাদল সংগঠন করেন। ১৮৭৯ খ্রীঃ বিসমার্ক তাঁহার নূতন অর্থনীতি ও বাণিজ্য-নীতি প্রবর্তন করেন। বিসমার্ক শিল্প সংরক্ষণ নীতি লইয়া আমদানীর উপর উচ্চ শুল্ক ধার্য করিলে জার্মানীতে শিল্পের দ্রুত প্রসার ঘটে।

অর্থনৈতিক সংস্কার

বিসমার্কের শাসনকালে জার্মানীর অন্যতম প্রধান ঘটনা ছিল ক্যাথলিক চার্চের সহিত জার্মান রাষ্ট্রের সংঘর্ষ বা কুলটুরক্যাম্প (Kultur kampf)। প্রাশিয়া হইল প্রটেস্টাণ্ট রাষ্ট্র। জার্মানীতে প্রটেস্টাণ্ট প্রাশিয়ার আধিপত্য জার্মান ক্যাথলিকগণ পছন্দ করিত না। ১৮৭০ খ্রীঃ পোপ নবম পায়াস পোপের অভ্রান্ততা (Papal Infallibility) নামে এক ঘোষণার দ্বারা জার্মান ক্যাথলিকগণকে নির্দেশ দেন যে যদি কোন রাষ্ট্রীয় আইন পোপের ধর্মীয় আইনের বিরোধী হয় তবে তাহারা রাষ্ট্রীয় আইনকে না মানিয়া পোপের আইনই মান্য করিবে।

কুলটুরক্যাম্প

ক্যাথলিকগণ রাষ্ট্রীয় আইন ক্যাথলিকগণের ধর্মবিরোধী হইলে তাহারা মানিবে না। কারণ ক্যাথলিক ধর্ম অনুসারে ধর্মের ব্যাপারে রাষ্ট্রের কোন অধিকার স্বীকার করা হয় না। ডাঃ ডলিঞ্জার নামে মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপক পোপের এই হুকুমের বিরোধিতা করেন। পোপের হুকুমে ডাঃ ডলিঞ্জার ও তাঁহার মতবাদীগণকে ক্যাথলিক চার্চ হইতে বহিস্কার করা হয়। বিসমার্ক ইহা উপলব্ধি করেন যে পোপের 'অভ্রান্ত আদেশনামা' কার্যকরী হইলে জার্মান ক্যাথলিকগণ রাষ্ট্রের আইনের বাহিরে চলিয়া যাইবে এবং জার্মানীতে পোপের ক্ষমতা বাড়িবে। ইহার ফলে জার্মান জাতীয়তাবাদ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। সুতরাং তিনি মে আইন (May Laws) দ্বারা উগ্র-ক্যাথলিক ও জেসুইটগণকে জার্মানী হইতে বহিস্কার করেন। ক্যাথলিক কর্মচারীগণকে জার্মান নাগরিকত্ব ও রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য লইতে আদেশ দেন। রেজেস্ট্রী বিবাহ বাধ্যতামূলক করেন। ক্যাথলিক বিদ্যালয়গুলিতে তদারকী করিবার জন্য সরকারী পরিদর্শক বসান। পোপ 'মে আইন'কে বেআইনী ঘোষণা করেন। তিনি জার্মান ক্যাথলিকগণকে তাহা অমান্য করিতে বলেন। ক্যাথলিকগণ নিস্ক্রিয় প্রতিরোধ নীতি লইয়া জেল, জরিমানা ও গ্রেপ্তার বরণ করে। বিসমার্ক অবশ্য সদর্পে বলেন যে, "জার্মানী কানোসার নামে অপমান পুনরায় ঘটিতে দিবে না" (Germany will not go back to Canossa in body and spirit)। পোপের সহিত জার্মান জাতীয়তাবাদের সংঘর্ষকে "সংস্কৃতির যুদ্ধ" বা কুলটুর ক্যাম্প নাম দেওয়া হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিসমার্ক পোপের সহিত মিটমাট করিতে বাধ্য হন। জার্মানীতে সমাজতন্ত্রবাদের ক্ষমতা বাড়িলে বিসমার্ক ক্যাথলিকগণের সহিত ঝগড়া মিটাইয়া ফেলেন। কারণ সমাজতন্ত্রবাদকে বিসমার্ক অধিকতর বিপজ্জনক মনে করিতেন। সমাজতন্ত্রীগণের বিরুদ্ধে ক্যাথলিক দলের সহায়তা পাইবার জন্য তিনি ক্যাথলিক বিরোধী নীতি ত্যাগ করেন।

বিসমার্কের শাসনকালের অন্যতম প্রধান ঘটনা ছিল সমাজতন্ত্রীগণের সহিত তাঁহার বিরোধ। বিসমার্ক ও কাইজার প্রথম উইলিয়াম উভয়েই সমাজতন্ত্রের আদর্শকে ঘৃণ্য করিতেন। তাঁহারা মনে করিতেন যে সমাজতন্ত্রের আদর্শ জয়লাভ করিলে জার্মান রাষ্ট্র ভাঙিয়া যাইবে। বিসমার্ক সমাজতন্ত্রবাদীগণের বিরুদ্ধে কঠোর দমন নীতি চালান। জার্মানীর সোস্যাল ডেমোক্র্যাট দলকে তিনি নানাভাবে নাজেহাল করেন। নির্বিচারে গ্রেপ্তার, কারাদণ্ড ও নির্বাসন দিয়া তিনি জার্মানীতে সমাজতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করেন। এত চেষ্টা করিয়াও তিনি সোস্যাল ডেমোক্র্যাটদের জনপ্রিয়তা নষ্ট করিতে বিফল হন। নির্বাচনে তাঁহারা অধিকসংখ্যক ভোট পাইতে থাকে। বিসমার্ক অবশ্য শ্রমিক সমাজের অসন্তোষ সম্পর্কে বিসমার্ক উদাসীন ছিলেন না। তিনি "রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র" বা State Socialism-এর আদর্শ লইয়া শ্রমিক কল্যাণমূলক আইন পাশ করেন। রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র বলিতে রাষ্ট্র কর্তৃক শ্রমিক কল্যাণমূলক কাজ বোঝায়। বার্ধক্য বীমা, দুর্ঘটনা বীমা, অসুস্থ বীমা প্রভৃতি আইন দ্বারা শিল্প মালিকগণকে শ্রমিকের জন্য অর্থ ব্যয় করিতে বাধ্য করেন। তবে বিসমার্কের 'রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র' ছিল একটি দুর্বল নীতি। ইহার দ্বারা

সমাজতন্ত্রের প্রভাব ঃ রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র।

শ্রমিক সমাজের মূল সমস্যার কোন সমাধান হয় নাই। কারণ মালিকগণ যাহাতে শ্রমিককে শোষণ না করিতে পারে এই ব্যবস্থা ইহাতে ছিল না।

তাছাড়া বিসমার্কের আভ্যন্তরীণ নীতি সাধারণ জার্মানদের স্বার্থরক্ষা অপেক্ষা বুর্জোয়া বা ধনী শিল্পপতিশ্রেণী ও জাংকার বা বড় বড় জমিদার শ্রেণীর স্বার্থেই পরিচালিত হয়। তিনি শিল্প সংরক্ষণ আইন (১৮৭৯) পাশ করিলে জার্মান শিল্পপতিদের বড় বড় শিল্প স্থাপনের সুবিধা হয়। বৈদেশিক সস্তা মালের উপর বেশী হারে আমদানী শুল্ক চাপাইলে বৈদেশিক মালের আমদানী কমিয়া যায়। দেশী শিল্পপতিদের মাল বিক্রয়ের সুবিধা হয়। বিদেশী সস্তা মাল সাধারণ লোকে কিনিয়া ব্যবহার করিত। দেশী মালের একচেটিয়া মালিকেরা ইচ্ছামত দাম লোকের কাছে আদায় করে। বিসমার্কের শিল্প সংরক্ষণ নীতির বিরুদ্ধে সোস্যাল ডেমোক্র্যাট দল তীব্র প্রতিবাদ জানায়।[১] তাছাড়া প্রাশিয়ার বড় বড় জমিদারীর মালিকেরা শিল্প ও সেনাবিভাগে কর্তৃত্ব স্থাপন করে। ঐতিহাসিক ব্যারাকল (Barracklough) এজন্য বিসমার্কের ধনীঘেঁষা নীতির ঘোর সমালোচনা করিয়াছেন।

শিল্প ও অর্থনীতি

বিসমার্ক প্রথমদিকে জার্নানীকে "পরিতৃপ্ত দেশ" বলিয়া ঘোষণা করিয়া উপনিবেশ বিস্তারের নীতি বর্জন করেন। কিছুকাল পরে জার্মানীর কলকারখানা ও লোকসংখ্যা বাড়িলে উপনিবেশের প্রয়োজন দেখা দেয়। তিনি টোগোল্যান্ড, ক্যামেরন, নিউগিনি, পূর্ব আফ্রিকায় উপনিবেশ স্থাপন করেন। বিসমার্ক আফ্রিকা ব্যবচ্ছেদেও অংশ নেন। তিনি জার্মানীর অন্তর্গত ডেন ও পোল প্রভৃতি জাতিগুলিকে জার্মান সংস্কৃতির অঙ্গীভূত হইতে বাধ্য করেন। এইভাবে বিসমার্ক নব-প্রতিষ্ঠিত জার্মান রাষ্ট্রকে সংগঠিত ও শক্তিশালী করেন। কাইজার প্রথম উইলিয়ামের মৃত্যুর পর কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম জার্মান সিংহাসনে বসেন। ক্ষমতা-প্রিয় যুবক কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের সহিত বৃদ্ধ বিসমার্কের গুরুতর মতভেদ দেখা দিলে, তিনি ১৮৯০ খ্রীঃ বিসমার্ককে পদচ্যুত করেন। ইহার ফলে বিসমার্কের যুগ শেষ হয়। যে কাপ্তেন জাহাজটিকে ঝড়-ঝাপ্টা কাটাইয়া বন্দরে আনেন, তাহাকে নাবিকেরা জলে ফেলিয়া দেয়। বিসমার্কের পদচ্যুতিকে এজন্য Dropping the pilot বলা হয়। ১৮৯৮ খ্রীঃ বিসমার্কের মৃত্যু হয়।

বিসমার্কের যুগ

বিসমার্কের পররাষ্ট্রনীতি: ত্রিশক্তি মৈত্রী, ১৮৭০-৯০ খ্রীঃ (Bismarck's Foreign Policy: Formation of the Triple Alliance):

ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয় যুদ্ধে ১৮৭০ খ্রী; প্রাশিয়া জয়লাভ করিলে প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মানী ঐক্যবদ্ধ হয়। কিন্তু বিজয়ী জার্মানী বৈদেশিক ক্ষেত্রে নূতন সমস্যার সম্মুখীন হয়। প্রাশিয়ার নবোদিত সামরিক শক্তির ভয়ে সমগ্র ইওরোপে আতঙ্ক দেখা দেয়। জার্মানীর বিরুদ্ধে জোট গঠনের সম্ভাবনা দেখা দেয়। জার্মানীর নিকট যুদ্ধে হারিয়া, ফ্রান্স আহত সর্পের ন্যায় ক্রুর ও প্রতিহিংসা-পরায়ণ

নবীন জার্মানীর সমস্যা

১. Barracklough—Origin of Modern Germany,

হইয়া উঠে। জার্মানীর নিকট হইতে আলসাস ও লোরেন পুনরুদ্ধারের জন্য ফ্রান্স চেষ্টা চালায়। এজন্য ফ্রান্স পুনরায় যুদ্ধের কথা ভাবিতে আরম্ভ করে। বিসমার্ক ইহা উপলব্ধি করেন যে জার্মানী আর কোন যুদ্ধের ঝুঁকি লইতে পারে না। জার্মানীকে সংগঠিত করিবার জন্য শান্তির প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করেন।

বিসমার্ক প্রথমেই জার্মানীকে "পরিতৃপ্ত দেশ" (Satiated country) বলিয়া ঘোষণা করেন। তিনি বলেন যে জ্যার্মানীর আর কোন যুদ্ধ বা বিস্তারের ইচ্ছা নাই।

ফ্রান্সের মিত্রহীনতা স্থাপন

বিসমার্ক এই নীতি ঘোষণা করায় ইওরোপে জার্মান আক্রমণের ভীতি দূর হয়। রাশিয়া প্রভৃতি রাজ্যগুলি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। জার্মানীর বিরুদ্ধে বিসমার্কের মূল উদ্দেশ্য ছিল ইওরোপের বৃহৎ শক্তিগুলিকে লইয়া জার্মানীর সহিত মিত্র জোট গঠন করা। এই মিত্র-জোট গঠন করিলে ফ্রান্স মিত্রহীন হইয়া পড়িত। প্রতিহিংসাপরায়ণ ফ্রান্স একাকী জার্মানীর কোন ক্ষতি করিতে না পারিয়া নিষ্ফল ক্রোধে ফুঁসিতে থাকিত।

বিসমার্ক এই নীতিকে কার্যকরী করিবার জন্য জার্মানী, অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে তিন কাইজারের সংঘ (League of Three Kaisers) ১৮৭২ খ্রীঃ স্থাপন করেন। ইওরোপে সাম্যবাদী ও নৈরাজ্যবাদী (Nihilist) বিপ্লব দেখা দিলে, রাশিয়া, অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশের রাজতন্ত্র বিপন্ন হইতে পারে। সুতরাং বিসমার্ক এই তিন সম্রাটকে বুঝান যে তাঁহাদের আত্মরক্ষার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া উচিত। বিপ্লবের ভয় দেখাইয়া

তিন কাইজারের চুক্তি

বিসমার্ক তিন সম্রাটের সংঘ স্থাপন করেন। কিন্তু আসলে ইহার দ্বারা তিনি ফ্রান্সকে মিত্রহীন করেন। কিন্তু তিন সম্রাটের সংঘ স্থায়ী হয় নাই। বিসমার্ক ১৮৭৫ খ্রীঃ পুনরায় ফ্রান্স আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে রাশিয়ার জার, বিসমার্ককে ইহার বিরুদ্ধে সতর্ক করিয়া দেন। ইহাতে রাশিয়ার সহিত জার্মানীর সম্পর্ক খারাপ হয়। রাশিয়ার মন্ত্রীগণ জার্মানীর সহিত মিত্রতার বিরুদ্ধতা করেন। অবশেষে বার্লিন চুক্তির (১৮৭৮ খ্রীঃ) পর জার্মানীর সহিত রাশিয়ার সম্পর্কের অবনতি ঘটে। রাশিয়া মনে করে যে জার্মানী রাশিয়া অপেক্ষা অষ্ট্রিয়ার স্বার্থকে বেশী সমর্থন করে। বার্লিন কংগ্রেসে বিসমার্ক নিজেকে "সৎ দালাল" (Honest broker) রূপে ঘোষণা করিলেও অষ্ট্রিয়ার স্বার্থকেই সমর্থন করিয়াছেন। ইহার ফলে রাশিয়া তিন সম্রাটের সংঘ ত্যাগ করে।

বিসমার্ক ইহাতে হতোদ্যম না হইয়া অষ্ট্রিয়া ও জার্মানীর মধ্যে দ্বিশক্তি মিত্রতা চুক্তি (Dual Alliance), ১৮৭৯ খ্রীঃ স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তির সর্তগুলি অত্যন্ত গোপনে

ত্রিশক্তি মৈত্রী

রাখা হয়। এই চুক্তির দ্বারা স্থির হয় যে (১) অষ্ট্রিয়াকে যদি রাশিয়া আক্রমণ করে তবে জার্মানী অষ্ট্রিয়ার পক্ষে যুদ্ধে যোগ দিবে। (২) জার্মানীকে যদি ফ্রান্স আক্রমণ করে তবে অষ্ট্রিয়া ফ্রান্সের পক্ষে না গিয়া নিরপেক্ষ থাকিবে। দ্বিশক্তির মিত্রতা চুক্তি বিসমার্কের বৈদেশিক নীতির প্রধান স্তম্ভ ছিল। অষ্ট্রিয়া পুরাপুরি জার্মানীর মিত্র রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ইহার ফলে ফ্রান্স অষ্ট্রিয়ার মিত্রতা লাভে বঞ্চিত হয়। দ্বিশক্তি চুক্তির পর বিসমার্ক কুটনীতির দ্বারা

ইতালীকে এই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত করেন। ইহার ফলে এই চুক্তির ত্রিশক্তি মিত্রতা চুক্তিতে পরিণত হয়। ইতালীর সহিত ফ্রান্সের টিউনিস লইয়া বিরোধ ছিল। ফ্রান্স টিউনিস অধিকার করায় ইতালী ক্রুদ্ধ হইয়া জার্মানীর সহিত যোগ দেয়। ইতালী, অষ্ট্রিয়া, জার্মানী মিত্রতাবদ্ধ হইলে ফ্রান্স মিত্রহীন হইয়া পড়ে।

বিসমার্ক রাশিয়াকে নিজ পক্ষে রাখিতে ত্রুটি করেন নাই। তিনি আশঙ্কা করেন যে যদি রাশিয়া ফ্রান্সের পক্ষে চলিয়া যায় তবে জার্মানীর বিপদ হইবে। এজন্য তিনি জারের উপর প্রভাব বিস্তার করেন। ১৮৮৪ খ্রীঃ তিনি রাশিয়ার সহিত রি-ইনস্যুর‍্যান্স চুক্তি (Re-insurance Treaty) সম্পাদন করেন। ইহাতে স্থির হয় যে যদি কোন তৃতীয় শক্তি, রাশিয়া বা জার্মানীর কাহাকেও আক্রমণ করে তবে অপর পক্ষ নিরপেক্ষ থাকিবে। এই তৃতীয় শক্তি বলিতে বিসমার্ক ফ্রান্সকে মনে করেন। বিসমার্ক সগর্বে বলেন যে, "যদিও রাশিয়ার সহিত সরকারী স্তরে যোগাযোগ ছিন্ন হইয়াছে আমি বেসরকারী সংযোগের লাইন খোলা রাখিয়াছি।"[১] এছাড়া বিসমার্ক রুমানিয়া, সার্বিয়া প্রভৃতি রাজ্যকে জার্মানীর মৈত্রীভুক্ত করেন। তিনি কেবলমাত্র ইংলণ্ডের সহিত কোন মিত্রতা চুক্তি করেন নাই। বিসমার্ক মনে করিতেন যে ইওরোপ মহাদেশের বিষয়ে ইংলণ্ডের আপাততঃ কোন আগ্রহ নাই। জার্মানী নৌশক্তি গঠন ও উপনিবেশ বিস্তারের চেষ্টা করিলে ইংলণ্ডের সহিত জার্মানীর বিরোধ দেখা দিতে পারে বলিয়া বিসমার্ক মনে করিতেন। তিনি এই চেষ্টা না করায় ইংলণ্ডের সহিত আপাততঃ মিত্রতা বজায় থাকে। "জার্মানী হইল স্থলভাগের ইঁদুর ও ইংলণ্ড হইল জলের ইঁদুর। ইহাদের ঝগড়ার কোন কারণ নাই।"

কৃশ-নিরপেক্ষতা চুক্তি

এইভাবে বিসমার্ক তাঁহার বৈদেশিক নীতির দুইটি থাম গড়েন, যথা, ত্রিশক্তি চুক্তি ও রাশিয়ার সহিত নিরপেক্ষতা চুক্তি। এই দুই চুক্তির দ্বারা তিনি ফ্রান্সকে পুরা মিত্রহীন করেন। জার্মানী ইওরোপে প্রধান শক্তি হইয়া দাঁড়ায়। বিসমার্ক পূর্ব ইওরোপে বা বলকানে অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং ইংলণ্ডের হস্তক্ষেপকে নিয়ন্ত্রণে রাখেন। তিনি অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়া এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিকে ভালভাবে বুঝাইয়া দেন যে জার্মানীর সম্মতি ছাড়া কোন শক্তিকে এককভাবে বলকানে ক্ষমতা বিস্তার করিতে দেওয়া হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, অষ্ট্রিয়াকে দুর্বল করিয়া জার্মানী রাশিয়াকে বলকানে আগাইতে দিবে না। তৃতীয়তঃ, বলকানে স্থিতাবস্থা বজায় রাখিতে জার্মানী সর্বদা চেষ্টা করিবে। বিসমার্কের এই দৃঢ়নীতির ফলে বলকানে আপাততঃ কিছুদিন শান্তি বজায় থাকে। ইংলন্ডও হস্তক্ষেপ করিতে ব্যর্থ হয়। বিসমার্ক বলিতেন যে, "আমি সর্বদা পাঁচটি বল লইয়া খেলা করি ও তিনটি বল সর্বদা শূন্যে রাখি"। এই পাঁচটি বল হইল অষ্ট্রিয়া, ইতালী, রাশিয়া, ইংলণ্ড ও ফ্রান্স। ত্রিশক্তি চুক্তি বিসমার্কের পতনের পর, জার্মান সম্রাট কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের প্রধান অবলম্বন হয়।

ত্রিশক্তি চুক্তি আপাততঃ ইওরোপে শান্তি রক্ষায় সমর্থ হয় ; জার্মানী ফ্রান্সের প্রতিশোধ

১. "Although the public telegraph line between Berlin and St. Petersburg is broken, I have kept open a private wire."

মূলক যুদ্ধের ভয় হইতে মুক্ত থাকে। কিন্তু এই চুক্তির ফল ভবিষ্যতে ভাল হয় নাই। ত্রিশক্তি চুক্তির প্রধান ত্রুটি ছিল এই যে এই চুক্তি দ্বারা অষ্ট্রিয়ার ভাগ্যের সহিত জার্মানী নিজ ভাগ্য জড়াইয়া ফেলে। অষ্ট্রিয়া ছিল সমস্যাসংকুল ও দুর্বল রাজ্য। ইহার সহিত নবগঠিত শক্তিশালী জার্মানীর যোগ দেওয়াকে অনেকে ভুল মনে করেন। ঐতিহাসিক টেইলারের মতে "পোকা খাওয়া অষ্ট্রিয়ার জাহাজের সহিত প্রাশিয়ার বাষ্প চালিত রণতরী জুড়িয়া দিয়া" বিসমার্ক মহা ভুল করেন। ইহার ফলে জার্মানীর স্বাধীনভাবে চলা মুস্কিল হয়। অষ্ট্রিয়ার সমস্যাকে জার্মানীর নিজ সমস্যা বলিয়া গণ্য করিতে বাধ্য হয়। তাছাড়া এই সন্ধি দ্বারা অষ্ট্রিয়ারই সুবিধা বেশী হয়। যদি অষ্ট্রিয়ার সহিত রাশিয়ার যুদ্ধ হইত তবে জার্মানীকে যুদ্ধে যোগ দিতে হইত। অপরদিকে যদি ফ্রান্সের সহিত জার্মানীর যুদ্ধ হইত তবে অষ্ট্রিয়া নিরপেক্ষ থাকিত। এই চুক্তিতে অষ্ট্রিয়ারই অধিক সুবিধা হয়। দ্বিতীয়তঃ, যদি বিসমার্ক ফ্রান্সের সহিত জার্মানীর গোলমাল মিটাইতে পারিতেন তবে এই চুক্তির দরকার হইত না। ফ্রান্স আহত সাপের ন্যায় জার্মানীকে সর্বদা ছোবল দেওয়ার চেষ্টা করিত না। তাছাড়া অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়ার স্বার্থ ছিল পরস্পর বিরোধী। জার্মানীর পক্ষে উভয়ের সহিত একসঙ্গে মিত্রতা রাখা সম্ভব ছিল না।

বৈদেশিক নীতির সমালোচনা

বিসমার্কের কৃতিত্ব (Estimate of Bismarck) : "রক্ত ও লৌহ" নীতি (Blood and iron Policy) অনুসরণ করিয়া ছয় বৎসরের মধ্যে তিনটি যুদ্ধের দ্বারা জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া বিসমার্ক অসাধারণ খ্যাতির অধিকারী হইয়াছেন। ঊনবিংশ শতকের ইওরোপীয় ইতিহাসে বিসমার্ক এক বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব। তাঁহার কূটনৈতিক জ্ঞান, অঙ্কের ন্যায় নির্ভুল কূটনৈতিক বিচারশক্তি, শত্রু পক্ষকে মিত্রহীন করিবার ক্ষমতা, তাঁহাকে বিরল মর্যাদা দিয়াছে। সমকালীন কাভুর, তৃতীয় নেপোলিয়ন এমন কি ডিসরেইলী অপেক্ষা বিসমার্ক অনেক বেশী খ্যাতির অধিকারী হইয়াছেন।

বিসমার্কের কৃতিত্ব

বিসমার্কের জ্ঞানস্পৃহাও কম ছিল না। তিনি পাঠাগারেই তাঁহার অবসর জীবন কাটাইতেন। তাঁহার স্মৃতিকথা (Recollections) নামক রচনা ইতিহাসের এক উপাদানরূপে গণিত হয়। বিসমার্কের বাগ্মীতা ছিল অসাধারণ। জার্মান জাতিকে তিনি তাঁহার বাগ্মীতার মদিরায় আচ্ছন্ন করেন। উপযুক্ত বাক্য ব্যবহার করিয়া ভাব প্রকাশে তাঁহার জুড়ি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

পাণ্ডিত্য ও বাগ্মীতা

প্রাশিয়ার জনগণ যখন জার্মানীর ঐক্যের কথা ভাবে নাই, বিসমার্ক তখন এই কথা ভাবেন। প্রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়া এই দুই জার্মান রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধের কথা যখন কোন জার্মান ভাবিতে পারে নাই, বিসমার্ক তখনই এই যুদ্ধের জন্য জাতিকে ডাক দেন। তিনি প্রাশিয়ার উদারপন্থীগণকে তিরস্কার করিয়া বলেন যে, "জার্মানী প্রাশিয়ার উদারপন্থার দিকে তাকায় নাই, প্রাশিয়ার শক্তির দিকে তাকাইয়া আছে। বিতর্ক অথবা ভোটের দ্বারা জার্মান ঐক্যের সমাধান হইবে না। একমাত্র রক্ত ও লৌহের (Blood and Iron)

দ্বারাই সমাধান হইবে"। প্রাশিয়ারাজ প্রথম উইলিয়াম, ভ্রাতৃ রাজ্য অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণায় কুণ্ঠাবোধ করিলে বিসমার্ক তাঁহাকে তিরস্কার করেন। তিনি বলেন যে. "জার্মানী এমনই ছোট জায়গা যে উহাতে অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার উভয়ের স্থান সংকুলান হইবে না। এজন্য প্রাশিয়ার স্বার্থে, অষ্ট্রিয়াকে বহিস্কৃত করিতে হইবে।" অষ্ট্রিয়ার সহিত যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে বিসমার্কের মনে কোন সংশয় ছিল না। যদিও প্রাশিয়া অপেক্ষা অষ্ট্রিয়া বৃহদাকার ছিল বিসমার্ক তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। বিসমার্কের সংযম ও সীমাজ্ঞান খুবই প্রখর ছিল। জার্মান-ভাষী রাজ্য অষ্ট্রিয়ার ওপর চূড়ান্ত পরাজয় চাপাইয়া দিলে বা কঠোর সন্ধি স্থাপন করিলে জার্মান জনমত অখুসী হইবে বিসমার্ক বুঝিতেন। তাছাড়া ভবিষ্যতে ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধের সময় অষ্ট্রিয়ার নিরপেক্ষতার দরকারও তিনি বুঝিতেন। তাই অসাধারণ দূরদর্শিতা ও সংযম সহ তিনি অষ্ট্রিয়ার সহিত উদার সর্তে সন্ধি করেন।

রক্ত-লৌহ নীতি ও কূটনৈতিক দক্ষতা

অষ্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধের পর, ফ্রান্স জার্মানীর শত্রুতাচরণ করিলে বিসমার্ক কূটনীতির দ্বারা ফ্রান্সকে মিত্রহীন করিয়া ফেলেন। স্পেনের সিংহাসনের দাবীকে কাজে লাগাইয়া তিনি ফ্রান্সকেই যুদ্ধ ঘোষণায় বাধ্য করেন। ফলে জার্মান জাতির নিকট ফ্রান্সই আক্রমণকারীরূপে চিহ্নিত হয়। ১৮৭০ খ্রীঃ ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয় যুদ্ধে ফ্রান্সের পরাজয় ঘটে। জার্মান ঐক্য সম্পূর্ণ হয়।

বিসমার্ক কেবলমাত্র জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করেন নাই। তিনি নানাবিধ সংস্কার দ্বারা জার্মানীকে শক্তিশালী করেন। বিসমার্ক সংগঠন নীতিতেও কম কৃতিত্ব দেখান নাই। জার্মানীর শাসনতন্ত্রে তিনি কেন্দ্রীয়তার সহিত প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসনের সমন্বয় করেন। জার্মান রাজন্যমণ্ডলীর স্বার্থের সহিত জার্মান জনসাধারণের স্বার্থকে যুক্ত করেন। তিনি জার্মান চার্চকে জাতীয়করণের চেষ্টা করেন। এজন্য তিনি ক্যাথলিক চার্চের সহিত দীর্ঘ সংগ্রাম (Kulturkampf) করেন। সমাজতন্ত্রবাদের প্রভাব এড়াইবার জন্য রাষ্ট্রিক সমাজতন্ত্রবাদ (State Socialism) প্রবর্তন করেন। রাষ্ট্রই শ্রমিক কল্যাণের আইন পাশ করে।

জার্মানীর সংগঠন

১৮৭০ খ্রীঃ পর, প্রতিহিংসা-পরায়ণ ফ্রান্সকে শক্তিহীন ও খর্ব করিবার জন্য বিসমার্ক তিন সম্রাটের চুক্তি ও ত্রিশক্তি চুক্তি করেন। ইহার ফলে ফ্রান্স মিত্রহীন হইয়া নিস্ফল ক্রোধে জ্বলিতে থাকে। এক কথায় বলা যায় যে বিসমার্ক যেমন জার্মান রাষ্ট্রের স্থাপন করেন, তেমন ইহার উন্নতি ও ক্ষমতা বৃদ্ধির পথও রচনা করেন। তাঁহার দূরদর্শিতা, স্থির-সংকল্প ও সংগঠন শক্তি ছিল সমসাময়িক যুগের বিস্ময়। তিনি জার্মানীকে ইওরোপীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত করেন।

বিসমার্কের জীবনীকারগণ তাঁহাকে প্রাপ্যের অতিরিক্ত প্রশংসা করিয়াছেন। বীর পূজার মোহে অনেক সময় বিসমার্কের যোগ্যতার অতিরঞ্জন করা হইয়াছে। বিসমার্কই একমাত্র জার্মানীর ঐক্যের কথা প্রথম ভাবেন ইহা বলা যায় না। জার্মানীর ঐক্য আন্দোলন বিসমার্কের আগে হইতেই ধীরে ধীরে আগাইতেছিল। জলভেরাইন, ফ্রাঙ্কফুর্ট

পার্লামেণ্টের মাধ্যমে জার্মান জাতীয়তাবাদ জাগিতেছিল। বিসমার্ক এই ভাবধারাকে পরিণতি দান করেন। দ্বিতীয়তঃ, কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে বিসমার্ক জার্মানীর ঐক্যের বদলে জার্মানীর উপর প্রাশিয়ার কর্তৃত্ব চাপাইয়া দেন।[১] জার্মানীতে অন্ততঃপক্ষে ৩৯টি আলাদা রাজ্য ছিল। তাহাদের সত্বাকে দাম না দিয়া বিসমার্ক তাহাদের উপর প্রাশিয়ার আধিপত্য স্থাপন করেন। বিসমার্ক বলেন যে "জার্মানীকে প্রাশিয়ার ভাবধারায় দীক্ষিত করা হইবে, কিন্তু প্রাশিয়ার জার্মানীকরণ করা হইবে না।"[২] তৃতীয়তঃ, জার্মানীতে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা না করিয়া বিসমার্ক প্রাশিয়ার রাজবংশের অধীনে এক স্বৈরতন্ত্রী শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। চতুর্থতঃ, তিনি ফ্রান্সের সহিত বিরোধ না মিটাইয়া এই বিরোধ উত্তরাধিকার সূত্রে জাতিকে দিয়া যান। এই বিরোধ বিসমার্ক যদি মিটাইতে পারিতেন তবে হয়ত ইওরোপের ইতিহাস অন্য রকম হইত। পঞ্চমতঃ, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত চুক্তিগুলি মোটেই দীর্ঘস্থায়ী ও মজবুত ছিল না। অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়ার পরস্পর বিরোধী স্বার্থের সমন্বয় করিয়া তাহাদের এই সন্ধির মধ্যে একত্র করার চেষ্টা শেষ পর্যন্ত সফল হয় নাই। জার্মানী বাধ্য হইয়া অপর জার্মান রাষ্ট্র অষ্ট্রিয়ার পক্ষে সমর্থন জানাইতে বাধ্য হয়। ফলে রাশিয়া ত্রিশক্তি চুক্তির মায়া কাটাইয়া ক্রমে ফ্রান্সের দিকে ঝুকিয়া পড়ে। ইওরোপে দুইটি শিবির গড়িয়া উঠে। কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য বিসমার্কের পরোক্ষ দায়িত্ব ছিল। তাছাড়া আভ্যন্তরীণ সংগঠনের ক্ষেত্রে তিনি পুরাতন জঙ্গীবাদী জমিদার শ্রেণী বা জাংকারদের এবং বড় বড় শিল্পপতিদের স্বার্থ রক্ষা করেন। ঐতিহাসিক ব্যারাকলর (Barracklough) মতে, বিসমার্ক জার্মান জনসাধারণের স্বার্থ অপেক্ষা শাসক শ্রেণী ও বুর্জোয়াদের স্বার্থ বেশী করিয়া দেখেন। তবুও একথা নিঃসন্দেহে সত্য যে বিসমার্ক ছিলেন সমসাময়িক যুগের শ্রেষ্ঠ নেতা। তিনি যে যুগ সৃষ্টি করেন তাহাকে বিসমার্কের যুগ (Age of Bismarck) বলা হয়।

বিসমার্কের ত্রুটি

কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম, ১৮৯০—১৯১৪ খ্রীঃ (Kaiser William II of Germany) ঃ জার্মান সম্রাট কাইজার প্রথম উইলিয়াম ১৮৮৮ খ্রীঃ ৯১ বৎসর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাহার তিন মাস পরে তাঁহার পুত্র ফ্রেডারিক প্রাণত্যাগ করেন। ফলে প্রথম উইলিয়ামের পৌত্র কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম জার্মান সিংহাসনে বসেন। প্রথম উইলিয়াম তাঁহার জীবিতকালে দ্বিতীয় উইলিয়ামকে হাতে কলমে রাজকার্য শিখিবার সুযোগ দেন। দ্বিতীয় উইলিয়াম লৌহ মানব বিসমার্কের নিকট শাসনকার্য ও কূটনীতি শিক্ষা করেন। দ্বিতীয় উইলিয়াম ছিলেন অত্যন্ত অহংকারী ও নিজ বুদ্ধির উপর আস্থাশীল। তিনি কঠোর পরিশ্রমী, উদ্যমশীল ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী ছিলেন। কিন্তু অহংকার ও অপরের বুদ্ধির প্রতি অনাস্থা তাঁহার ভাল গুণগুলিকে নষ্ট করিয়া দেয়। তিনি তাঁহার মন্ত্রীদের কেরাণীর মত তাঁহার আদেশ পালনে বাধ্য করেন। মন্ত্রীদের পরামর্শকে তিনি তেমন

চরিত্র

---

১. Seaman.

২. "Prussia will not be Germanised but Germany will be Prussianised."

মূল্য দিতেন না। দ্বিতীয় উইলিয়াম অত্যন্ত বাক্যবাগীশ লোক ছিলেন। যে ক্ষেত্রে তাঁহার কথা না বলিলে ভাল হইত সেক্ষেত্রে তিনি চুপ থাকিতে পারিতেন না। পরস্পর-বিরোধী উল্টোপাল্টা মন্তব্য করায় তিনি ওস্তাদ ছিলেন।[১] বিসমার্ক বাস্তববাদী ছিলেন। কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম ছিলেন নীতিবাগীশ। বাস্তব অবস্থা না বুঝিয়া তিনি অধিকাংশ সময় কাজ করিতেন।

কাইজার তাঁহার প্রধানমন্ত্রী বিসমার্কের ক্ষমতার প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিলেন। ঐতিহাসিক গুচের (Gooch) মতে বিসমার্কের সহিত কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের বিরোধ ছিল ব্যক্তিগত, নীতিগত নহে। ১৮৯০ খ্রীঃ কাইজার হঠাৎ বিসমার্ককে পদচ্যুত করিয়া ক্যাপ্রিভিকে (Caprivi) প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। বিসমার্ক তাঁহার পদচ্যুতির সময় কাইজারকে পরামর্শ দেন যে তিনি যেন রাশিয়ার সহিত কোন বিবাদ না করেন। তাহা হইলে রাশিয়া ফ্রান্সের পক্ষে চলিয়া যাইবে। কিন্তু কাইজার বিসমার্কের উপদেশে কান দেন নাই। তিনি তাঁহার দক্ষতা দেখাইবার জন্য বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কয়েকটি নীতি গ্রহণ করেন। এই নীতিগুলি ছিল খুবই কাঁচা ও দুর্বল। তিনি প্রথমেই রাশিয়ার সহিত রি-ইনসুর‍্যান্স চুক্তি বা নিরপেক্ষতা চুক্তি বাতিল করিয়া দেন। এই চুক্তি বিসমার্ক বহু কষ্টে ফ্রান্সকে মিত্রহীন করিবার জন্য গড়িয়াছিলেম। কাইজার এই চুক্তি বাতিল করায় রাশিয়া ক্রমে ফ্রান্সের দিকে ঢলিয়া পড়ে। শেষ পর্যন্ত ফ্রাঙ্কো-রুশ সামরিক চুক্তি ১৮৯৪ খ্রীঃ স্বাক্ষরিত হয়। ইহার ফলে ফ্রান্সের মিত্রহীনতা কাটিয়া যায়। রাশিয়া ফ্রান্সের মিত্রে পরিণতি হয়। কাইজার, বিসমার্কের নীতি ত্যাগ করিয়া মহাভুল করেন। বিসমার্কের ত্রিশক্তি চুক্তি ও রুশ নিরপেক্ষতা চুক্তির দ্বারা জার্মানী ইওরোপে যে প্রাধান্য পাইয়াছিল কাইজারের দোষে তাহা বিনষ্ট হয়।

রুশ নিরপেক্ষতা চুক্তি নাকচ

কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম ইহার পর ইংলণ্ডের মিত্রতা লাভের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালান। তাঁহার ধারণা ছিল যে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের মিত্রতা জার্মানীর সহায়ক হইবে। ইংলণ্ডের ঔপনিবেশিক মন্ত্রী চেম্বারলেন জার্মান মিত্রতার স্বপক্ষে ছিলেন। কাইজার ইংলণ্ডের রাজপরিবারের সহিত তাঁহার আত্মীয়তার সম্পর্ক জোরদার করেন। তিনি ইংলণ্ডের মিত্রতা লাভের আশায় জাঞ্জিবার দ্বীপ ও নীল নদের উপত্যকার উপর জার্মানীর দাবী ছাড়িয়া দেন। ইহার বিনিময়ে তিনি হেলিগোল্যাণ্ড দ্বীপ লাভ করেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যে ইংলণ্ডের সহিত জার্মানীর সম্পর্ক তিক্ত হইয়া উঠে। দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সভ্যাল ও অন্যান্য স্থানে জার্মানীর সহিত ইংলণ্ডের দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। বুয়ার যুদ্ধের সময় কাইজার ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ক্রুগার টেলিগ্রাম (Kruger Telegram) করায় ব্রিটিশ সরকার ক্ষুব্ধ হন। জার্মানী তুরস্ককে হাত করিয়া বার্লিন-বাগদাদ রেলপথ নির্মাণের পরিকল্পনা করিলে ব্রিটেনের ভারতীয় সাম্রাজ্য বিপন্ন হইবার উপক্রম হয়। কাইজার ১৯০০ খ্রীঃ জার্মান নৌ আইন পাশ করিলে ইংলণ্ড অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়। এই আইনের

ইংলণ্ডের মিত্রতা-লাভের ব্যর্থ চেষ্টা

১. Ibid.

বলে নৌশক্তি হিসাবে জার্মানীর পত্তন আরম্ভ হয়। ইংলণ্ডের সহিত জার্মানীর নৌ প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয়। ইংলণ্ড ক্রমে জার্মানীর বিরুদ্ধে ফ্রান্স ও রাশিয়ার সহিত ত্রিশক্তি আঁতাতে যোগ দেয়। ইংলণ্ড জার্মানীর পক্ষ ত্যাগ করিয়া ফ্রান্স ও রাশিয়ার সহিত যুক্ত হয়।

কাইজার ইহার পর ইঙ্গ-ফরাসী উপনিবেশগুলির দিকে লোভাতুর দৃষ্টি দিলে এই দুই শক্তির সহিত জার্মানীর বিরোধিতা তীব্র আকার ধারণ করে। ফ্রান্স মরক্কো দখলে উদ্যত হইলে কাইজার মরক্কোর সুলতানের পক্ষ নেন। ইহার ফলে ফ্রান্সের সহিত জার্মানীর বিরোধ দেখা দেয়। কাইজার প্যান্থার (Panther) নামক যুদ্ধ জাহাজ মরক্কোর আগাদির বন্দরে ১৯১১ খ্রীঃ পাঠাইলে ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধ জাহাজ জার্মান যুদ্ধ জাহাজের পথ আটকাইয়া দাঁড়ায়। কাইজার আপাততঃ প্যান্থারকে ফিরাইয়া নেন। কিন্তু কাইজারের ঔপনিবেশিক নীতি প্রথম মহাযুদ্ধের সূচনা করে। কাইজার বলেন যে "জার্মানী আর পরিতৃপ্ত দেশ নহে। ইহা বিস্তার নীতিতে আগ্রহী। সকল উপনিবেশ কেবলমাত্র ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের একচেটিয়া থাকিতে পারে না। জার্মানীরও ইহাতে অংশ থাকা উচিত।"[১] তিনি আরও বলেন যে, "জার্মানী হইল ইওরোপের শ্রেষ্ঠ শক্তি। জার্মানীকে বাদ দিয়া কোন আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধান করা যাইবে না।"[২] কাইজার জার্মানীর নৌশক্তি গঠনের নীতি লইলে ইংলণ্ডের আশঙ্কা বাড়ে। ইংলণ্ড মনে করে যে এই নৌ শক্তির সাহায্যে জার্মানী ইংলণ্ডের ঔপনিবেশগুলি দখল করিয়া লইবে। ইংলণ্ড জার্মানীকে জানায় যে, "নৌ শক্তি হইল ইংলন্ডের পক্ষে জীবন-মরণ সমস্যা, আর জার্মানীর পক্ষে বিলাসিতা"। কাইজার ইংলণ্ডের প্রতিবাদে কান না দিলে ইংলণ্ড জার্মানীর বিরুদ্ধে ত্রিশক্তি আতাঁতে (Triple Entente) যোগ দেয়।

ঔপনিবেশিক ও জোট নীতি

কাইজারের ঔপনিবেশিক নীতির ফলে জার্মানীর সহিত ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের ঘোর বিরোধ দেখা দেয়। কাইজার ত্রিশক্তি চুক্তিকে জোরদার করিয়া অষ্ট্রিয়াকে বলকান অঞ্চলে আগ্রাসী নীতিতে উৎসাহ দেন। ইহার ফলে রাশিয়ার সহিত অষ্ট্রিয়ার শত্রুতা বাড়ে। অবশেষে সেরাজেভো নামক স্থানে অষ্ট্রিয়ার যুবরাজ জনৈক আততায়ীর হস্তে নিহত হইলে অষ্ট্রিয়া এই হত্যার জন্য সার্বিয়াকে দায়ী করিয়া চরমপত্র দেয়। অষ্ট্রিয়া সার্বিয়া আক্রমণ করে। অষ্ট্রিয়ার সমর্থনে জার্মানী, রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। জার্মানী ও অষ্ট্রিয়া রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামিলে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের নিরপেক্ষ থাকা সম্ভব হয় নাই। ত্রিশক্তি আতাঁত অনুযায়ী ফ্রান্স ও ইংলণ্ড রাশিয়ার পক্ষ নেয়। ফলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়। লোয়েস ডিকিনসনের (Lowes Dickinson) মতে এই বিশ্বযুদ্ধের জন্য কাইজারই প্রধানতঃ দায়ী ছিলেন। কিন্তু ঐতিহাসিক ফে (Fay) এই মত খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহার মতে কাইজার নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া অষ্ট্রিয়াকে সামলাইবার চেষ্টা করেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের জন্য দ্বিতীয় উইলিয়ামের দায়িত্ব

১. Quoted by Ketleby—History of Modern Times.

২. Oxford—Genisis of the War P. 49-50.

কিন্তু অষ্ট্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করা তাঁহার সাধ্য ছিল না। ফলে অষ্ট্রিয়ার মিত্র হিসাবে জার্মানী যুদ্ধে জড়াইয়া পড়িতে বাধ্য হয়।[১] যাহা হউক একথা স্বীকার্য যে কাইজার উইলিয়াম বিসমার্কের নীতি ত্যাগ করিয়া ক্ষমতা বিস্তার নীতি গ্রহণ করায় প্রথম মহাযুদ্ধ আসন্ন হইয়া পড়ে। পরিণামে জার্মানীর শোচনীয় পরাজয় ঘটে।

জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার ও রাশিয়া, ১৮৫৫-৮১ খ্রীঃ (Czar Alexander II and Russia)ঃ জার প্রথম নিকোলাসের মৃত্যুর পর জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার রাশিয়ার সিংহাসনে বসেন। দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার ছিলেন মানবিক ও উদারভাবাপন্ন লোক। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয় তাঁহার মনে গভীরভাবে দাগ কাটে। তিনি বুঝিতে পারেন যে সমগ্র ইওরোপে যখন পরিবর্তনের জোয়ার আসিয়াছে তখন রাশিয়াতে তাহা আটকান যাইবে না। মধ্যযুগীয় সমাজ ও শাসন ব্যবস্থা লইয়া রাশিয়া আধুনিক যুগে পিছাইয়া পড়িবে। এজন্য তিনি সিংহাসনে বসিবার পর রাশিয়ার আধুনিকীকরণ ও সমাজ সংস্কারের কাজে হাত দেন।

তিনি প্রথমে ডেকাব্রিষ্ট বিদ্রোহীগণকে মুক্তি দেন। সেন্সার প্রথা বা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, থার্ড সেক্সন (Third section) নামে গুপ্ত পুলিশ ব্যবস্থা তিনি উঠাইয়া দেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় ও সংবাদপত্রের উপর নিয়ন্ত্রণ রদ করেন। তিনি রাশিয়ায় রেলপথ নির্মাণ ও শিল্প-বাণিজ্য বৃদ্ধির দিকে জোর দেন। জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার তাঁহার শাসন ব্যবস্থায় যে উদার নীতির হাওয়া ঢুকাইয়া দেন তাহার ফলে সাধারণ লোকের মনে গভীর উৎসাহ দেখা দেয়। তিনি স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন ব্যবস্থার সংস্কার করেন। স্থানীয় ভোটের ভিত্তিতে কাউন্সিল নির্বাচিত হয়। কাউন্সিলগুলির ভোটে জেলা পরিষদ নির্বাচিত হয়। জেলা পরিষদের ভোটে জেমেষ্টভো (Zemestvo) বা প্রাদেশিক সভা নির্বাচিত হয়। প্রাদেশিক সভাগুলির হাতে রাস্তাঘাট নির্মাণ প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দুর্ভিক্ষ, ত্রাণ প্রভৃতি কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়। জার আলেকজাণ্ডার বিচার ব্যবস্থারও সংস্কার করেন। বিচার বিভাগের উপর শাসন বিভাগের এক্তিয়ার সরাইয়া তিনি বিচার বিভাগের স্বাধীনতা দেন। জুরী প্রথা, আইনে পারদর্শী বিচারক নিয়োগ, আপীলের ব্যবস্থা করা হয়। বিচারকদের চাকুরীর নিরাপত্তা ও সম্মানজনক বেতন দেওয়ার ফলে সৎ ও যোগ্য লোকেরা বিচার বিভাগে যোগ দেয়। জাষ্টিস অফ পিস্ নামে অবৈতনিক বিচারক দ্বারা ছোটখাট মামলার বিচারের ব্যবস্থা করা হয়। জার আলেকজাণ্ডার প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতিবিধান করেন। বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার প্রথাও চালু করা হয়।

উদারনৈতিক সংস্কার

জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সংস্কার ছিল ভূমিদাস প্রথার উচ্ছেদ। এই সংস্কারের জন্য তিনি "মুক্তিদাতা জার" (Gzar Liberator) আখ্যা পান। রাশিয়ার জনসংখ্যার অর্ধাংশ ছিল ভূমিদাস। ইহাদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৫ কোটি। এই ভূমিদাসগণের অর্ধেক জারের খাস জমিতে ভূমিদাস ছিল। বাকি অর্ধাংশ

১. Fay—Origin of World War I.

অন্যান্য জমিদারগণের অধীনে ছিল। প্রায় দেড়লক্ষ জমিদার দেশের অধিকাংশ জমির ও ভূমিদাসদের মালিক ছিল। রাশিয়ার আইন অনুযায়ী ভূমিদাসগণ ছিল মালিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। মালিকেরা তাহাদের নীলামে বিক্রয় অথবা শারীরিক পীড়ন করিলে রাষ্ট্র তাহাতে বাধা দিত না।

ভূমিদাস উচ্ছেদ আইন

ভূমিদাসগণের আর্থিক অবস্থা ছিল খুবই খারাপ। নিরতিশয় দারিদ্র্যের মধ্যে, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারহীন অবস্থায় তাহারা জীবন কাটাইত। এই দুঃসহ জীবন হইতে মুক্তিলাভের জন্য ভূমিদাসগণ জার প্রথম নিকোলাসের আমলে কয়েকবার বিদ্রোহ করে। ইতিমধ্যে রাশিয়ায় শিল্প-বিপ্লব ও বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ প্রচলিত হইলে ভূমিদাস প্রথার উপযোগিতা কমিয়া যায়।[১] কলকারখানায় অদক্ষ ভূমিদাস মজুরকে খাটাইয়া লাভবান হওয়া সম্ভব ছিল না। ভূমিদাসরা বংশানুক্রমে জমিচাষ ও অর্দ্ধমৃত জীবন কাটাইয়া এমনই অকর্মণ্য হইয়া পড়ে যে তাহাদের দিয়া কলকারখানায় ভালভাবে কাজ করান সম্ভব ছিল না। সেনাদলে সার্ফসেনা বা ভূমিদাস সেনা তেমন যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারে নাই। ভূমিদাস সৈন্য লইয়া দীর্ঘ যুদ্ধ করাও সম্ভব ছিল না। জার সরকার বুঝিতে পারে যে রাশিয়ার পিছাইয়া পড়ার জন্য ভূমিদাস প্রথা দায়ী ছিল। দেশের স্বার্থের ব্যাপারে ইহারা নিস্পৃহ ছিল। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয়ের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল রুশ সেনাদল ভূমিদাসগণের দ্বারা গঠিত ছিল। এইসব কথা বিবেচনা করিয়া জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার ভূমিদাস প্রথা লোপের জন্য ১৮৬১ খ্রীঃ আইন পাশ করেন। এই আইনের বলে ভূমিদাসগণ মুক্ত ও স্বাধীন নাগরিকে পরিণত হয়। মুক্ত ভূমিদাসগণ নিজ ইচ্ছামত জীবিকা গ্রহণ করিবার অধিকার পায়। জার বুঝিতে পারেন যে শুধু ভূমিদাসদের মুক্তি দিলে কোন কাজ হইবে না। মুক্ত ভূমিদাসেরা জীবিকার অভাবে বেকার দরিদ্র লোকে পরিণত হইবে। এজন্য তিনি ভূমিদাসগণকে জমিদারদের জমির অর্ধাংশ দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। জমিদারগণ এজন্য সরকার হইতে ক্ষতিপূরণ পায়। ভূমিদাসগণ ক্ষতিপূরণের টাকা ৪৯ বৎসরের কিস্তিতে সরকারকে পরিশোধ করিতে আদিষ্ট



দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার

হয়। ভূমিদাসগণকে যে জমি দেওয়া হয় তাহাতে কেবলমাত্র তাহারা চাষ আবাদ ও উপস্বত্ব ভোগ করিবার অধিকার পায়। এই জমির মালিকানা তাহাদের হাতে না দিয়া গ্রাম্য মীর বা পঞ্চায়েৎ সভার হাতে দেওয়া হয়। জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার এইভাবে রাশিয়ায় উদারনৈতিক সংস্কার প্রবর্তন করেন। জার বুঝিয়াছিলেন যে, সময় যেরূপ দ্রুত পাল্টাইয়া যাইতেছে তাঁহার সহিত তাল রাখিয়া সংস্কার না করিলে সিংহাসন

১. Lionel Kochan—History of Russia.

অটুট রাখা যাইবে না। "সংস্কার দিতে বাধ্য হওয়া অপেক্ষা স্ব ইচ্ছায় সংস্কার করা তিনি সম্মানজনক মনে করিতেন।"[১]

জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের উদারনৈতিক সংস্কারগুলি শেষ পর্যন্ত বিফলতায় পর্যবসিত হয়। তাঁহার সংস্কার নীতিতে কোন মৌলিকতা ও গভীরতা ছিল না। এগুলি নিতান্তই কাজ চলা ধরণের ছিল। জারের সংস্কার চিন্তার পশ্চাতে রাশিয়ায় সদূরপ্রসারী পরিবর্তন আনিবার কোন চেষ্টা ছিল না। যাহা নিতান্ত না করিলে নয়, সেইটুকু কাজ তিনি করিবার চেষ্টা করেন। ইহাতে লোকে সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। জারের সরকারের কর্মচারীরাও এই নূতন ব্যবস্থাকে কার্যকরী করার জন্য চেষ্টা করে নাই। তাঁহার স্বায়ত্ব শাসন আইন কার্যকরী হয় নাই। এই আইনে তিনি প্রাদেশিক সভাগুলিকে দায়িত্ব দিলেও ক্ষমতা দেন নাই। প্রাদেশিক সভা তাহাদের জনহিতকর কাজের ব্যয় নির্বাহের জন্য কর আদায় করিতে পারিত না। সরকার যে অর্থ সাহায্য দিত একমাত্র তাহার উপর নির্ভর করিয়া তাহাদের চলিতে হইত। এই সামান্য অর্থের দ্বারা উন্নয়নমূলক কাজ করা সম্ভব ছিল না। সরকারী কর্মচারীগণ প্রাদেশিক সভার উপর কর্তৃত্ব চালাইবার ফলে এই সভাগুলির স্বাধীনতা খর্ব হয়। জারের বিচার বিভাগীয় সংস্কার আইনজ্ঞ বিচারকের অভাবে বিফল হয়। জারের ভূমিদাস মুক্তি আইন ছিল বিশেষ ত্রুটিপূর্ণ। ইহা কাগজ-কলমে খুব চমকপ্রদ মনে হইলেও বাস্তবে তেমন কার্যকরী ছিল না। এই আইনের দ্বারা জমিদারগণের প্রতিপত্তি ও অত্যাচার খর্ব করা যায় নাই। জমির অর্ধাংশ জমিদারগণের হাতে থাকায় তাহাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি অব্যাহত থাকে। জমিদারগণ সমাজের সকল সুবিধাগুলি নিরঙ্কুশ ভোগ করিতে থাকে। মুক্ত ভূমিদাসগণ ক্ষতিপূরণের অর্থ দিতে খুবই দুর্ভোগ পায়। জমির মালিকানা ভূমিদাসগণকে না দিয়া গ্রাম্য মীর বা সভার হাতে দিলে, মীর বা সভাগুলি এই ক্ষমতার অপব্যবহার করে। তাহারা জমিদারগণের ন্যায় ভূমিদাসগণের উপর জুলুম চালায়। মুক্ত ভূমিদাসেরা মনে করে যে পুরাতন জমিদারের স্থলে মীর বা গ্রাম সভাগুলি তাহাদের উপর নূতন জমিদার হইয়া বসিয়াছে। তাছাড়া নিস্ফলা পতিত জমিগুলি মুক্ত ভূমিদাসগণকে দেওয়া হয়। ভাল জমিগুলি জমিদারগণের দখলে থাকে। ইহার ফলে ভূমিদাসগণের অবস্থার প্রকৃত উন্নতি হয় নাই। মুক্তি আইন পাশ হইবার পরেও রাশিয়ায় অন্ততঃ ৪৬৯ বার কৃষক বিদ্রোহ ঘটে।[২] জারের সংস্কার নীতি ছিল অপ্রচুর ও প্রগতিহীন। প্রকৃত শাসনতান্ত্রিক সংস্কার করিতে জার ইচ্ছুক ছিলেন না। জার তাঁহার স্বৈর ক্ষমতা বহাল রাখেন। গণতান্ত্রিক বা উদারতান্ত্রিক সংস্কার জার সযত্নে এড়াইয়া যান। ফলে উদারপন্থীগণ হতাশাগ্রস্ত হইয়া তাঁহার সমালোচনা চালায়। পোল্যাণ্ডে ১৮৬৩ খ্রীঃ বিদ্রোহ দেখা দিলে এবং গণতান্ত্রিক শাসনের দাবী উঠিলে জার ক্রমে উদারনীতি ছাড়িয়া প্রতিক্রিয়াশীলতার পথ ধরেন। তাঁহার দমন নীতির ফলে অসন্তুষ্ট হইয়া নিহিলিষ্ট নামক

বিফলতার কারণ

১. "We live in an age, when reforms, if they do not come from above will come from below." Lipson.।

২. L. Kochan—History of Russia.

নৈরাজ্যবাদী দল তাঁহার প্রাণনাশের চেষ্টা করে। অবশেষে ১৮৮১ খ্রীঃ সেণ্ট পিটার্স-বার্গের রাস্তায় একটি বোমার আঘাতে তাঁহার মৃত্যু হয়।

জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের শাসনকালে পোল বিদ্রোহ (১৮৬৩ খ্রীঃ) ছিল এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। জার সরকার পোলগণের উপর রুশীকরণ নীতি চালায়। কিন্তু পোল জাতীয়তাবাদীগণ তাহাতে না দমিয়া পোল্যাণ্ডে স্বায়ত্ব শাসন দাবী করে। জার কিছু পরিমাণ স্বায়ত্ব শাসন দান করিলেও পোলগণ তাহাতে সন্তুষ্ট হয় নাই। স্বাধীন ও সার্বভৌম পোল্যাণ্ড গঠনের জন্য তাহারা বিদ্রোহ করে। জার দৃঢ় হাতে এই বিদ্রোহ দমন করেন। পোলগণ ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের সহায়তা পাইবার চেষ্টা করিলে, তৃতীয় নেপোলিয়ন হাত গুটাইয়া নেন। জারের শাসনকালে নিহিলিষ্ট নামক নৈরাজ্যবাদীগণ সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য সংঘবদ্ধ হয়। জারের মৃত্যুর পর নিহিলিষ্ট আন্দোলন দমাইয়া দেওয়া হয়।

পোল ও নিহিলিষ্ট বিদ্রোহ

জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের আমলে বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে অনেক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার ইওরোপ হইতে দৃষ্টি সরাইয়া দূরপ্রাচ্য ও মধ্য এশিয়ায় রাজ্য বিস্তারের দিকে নজর দেন। দূরপ্রাচ্যে রাশিয়া মঙ্গোলিয়া অধিকার করিয়া ভ্লাডিভোষ্টক বন্দর স্থাপন করে। জার সরকার চীনের উপর কয়েকটি সাম্রাজ্যবাদী ও বৈষম্যমূলক সন্ধি চাপাইয়া দেন। মধ্য এশিয়ায় সমরখন্দ, বোখারা, খিভা ও তাসখন্দ রুশ অধিকারে আসে। কাস্পিয়ান হ্রদের তীরেও রুশ সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়। ইওরোপে ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয় যুদ্ধের সুযোগে ১৮৭০ খ্রীঃ জার প্যারিসের সন্ধির সামুদ্রিক শর্ত নাকচ করেন। জার্মানীর সহিত রুশ মৈত্রীর ফলে জার মনে করেন যে ইওরোপে রাশিয়ার সাম্রাজ্য বিস্তারের সুযোগ আসিয়াছে। সুতরাং তিনি ১৮৭৭ খ্রীঃ তুরস্ককে আক্রমণ করিয়া স্যানষ্টিফেনোর সন্ধি স্থাপন করেন। কিন্তু পরে ইংলণ্ড ও অষ্ট্রিয়ার চাপে তিনি বার্লিন কংগ্রেসে এই সন্ধি পরিবর্তন করেন (পৃঃ ১১৬ দেখ)। জারের মন্ত্রী গোর্চাকফ প্রভৃত দক্ষতার সহিত জারের বৈদেশিক নীতি পরিচালনা করেন।

বৈদেশিক নীতি

নিহিলিষ্ট মতবাদ ও নিহিলিষ্ট বিদ্রোহ (Nihilism and Nihilist Movement)ঃ ঊনবিংশ শতকের শেষ দিকে রাশিয়ায় জার সরকারের স্বৈর শাসনের ফলে চিন্তাশীল লোকেদের মনে বিরাট হতাশা দেখা দেয়। তাহারা মনে করে যে শান্তিপূর্ণ উপায়ে রাশিয়ায় গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র প্রবর্তন করা সম্ভব হইবে না। রাশিয়ায় পুরাতন প্রথা ও স্বৈর শাসন ব্যবস্থা এমনই পোক্ত যে উহাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস না করিলে নূতন কিছু করা সম্ভব হইবে না। এই হতাশাময় মনোভাব হইতে নিহিলিষ্ট বা নৈরাজ্যবাদী আন্দোলন জন্ম নেয়।

বিখ্যাত দার্শনিক ও নৈরাজ্যবাদী বাকুনিনের (Bakunin) মতবাদও নিহিলিষ্টদের প্রভাবিত করে। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক টুর্গেনিভ সর্বপ্রথম 'নিহিলিষ্ট' কথাটি ব্যবহার করেন। রাশিয়ার শিক্ষক, ছাত্র, ডাক্তার, শিল্পী, শ্রমিক প্রভৃতি এই মতবাদে অনুরক্ত

হইয়া পড়ে। নিহিলিষ্ট মতবাদের দুইটি দিক ছিল যথা, ধ্বংসমূলক বা নেতিবাচক, গঠনমূলক বা ইতিবাচক। প্রথমটির দ্বারা নিহিলিষ্ট বা নৈরাজ্যবাদীরা, পুরাতন রীতি নীতি, বিশ্বাস, প্রথা, রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থাকে ধ্বংস করিবার কথা ভাবে। দ্বিতীয়টির দ্বারা পুরাতন ব্যবস্থা ধ্বংস করিলে ইহার উপর নূতন ব্যবস্থা স্থাপনের কথা বলা হয়। নিহিলিষ্টরা ধর্মের স্থলে বিজ্ঞান, স্বাধীন প্রেমের ভিত্তিতে পারিবারিক জীবন, সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত মালিকানার স্থলে জাতীয় মালিকানা প্রভৃতি মতবাদ বিশ্বাস করিত। যাহা হউক নিহিলিষ্টদের প্রভাবে স্থানে স্থানে গণবিদ্রোহ দেখা দিলে এবং নিহিলিষ্টরা জারের প্রাণনাশের চেষ্টা করিলে, এই আন্দোলন জার সরকার দমাইয়া ফেলে। ১৮৮১ খ্রীঃ স্বয়ং জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার নিহিলিষ্ট আততায়ীর হাতে নিহত হন। নিহিলিষ্ট আন্দোলনের পশ্চাতে গণ সমর্থন না থাকায় ইহা ব্যর্থ হয়।

জার তৃতীয় আলেকজাণ্ডার, ১৮৮১—১৮৯৪ খ্রীঃ (Czar Alexander III)ঃ জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র তৃতীয় আলেকজাণ্ডার জারের সিংহাসনে বসেন। তৃতীয় আলেকজাণ্ডার ছিলেন খুবই সংকীর্ণ মনের লোক। তিনি গণতন্ত্র ও পার্লামেণ্টকে সভ্যতা-বিরোধী বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার আদর্শ ছিল "এক জার, এক গীর্জা ও এক রাশিয়া" (one Czar, one Church and one Russia.)। জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার যে উদারতন্ত্র প্রবর্তন করেন, জার তৃতীয় আলেকজাণ্ডার তাহা নস্যাৎ করেন। তিনি কঠোর হস্তে নিহিলিষ্ট ও উদারনৈতিকদের দমন করেন। সংবাদপত্রের কণ্ঠ রোধ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তি নিয়ন্ত্রিত করা হয়। স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন সংকুচিত করা হয়। স্থানীয় ও প্রাদেশিক সভায় নির্বাচনের স্থলে মনোনয়ন চালু করা হয়। তিনি ভূমিদাস প্রথাকে পুনরায় ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করেন। এজন্য তিনি যে আইন চালু করেন তাহাকে বাষ্টার্ড ফিউডালিজম (Bastard Feudalism) বা কৃত্রিম সামন্ততন্ত্র বলা হয়। জারের দমন নীতির ফলে সর্বত্র আপাতঃ শান্তি স্থাপিত হয়। জার তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের আমলে রাশিয়ায় শিল্প-বিপ্লবের দ্রুত প্রসার ঘটে। ফ্রান্সের সহিত মিত্রতার ফলে ফরাসী মূলধনের সাহায্যে রাশিয়ায় রেলপথের বিস্তার হয়। লোহা ও কয়লার উৎপাদন বাড়ে। ব্যাংক ব্যবস্থার উন্নতি ঘটে। ঝড়ের আগে যেমন প্রকৃতি শান্ত স্তব্ধ হইয়া যায় জার তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের শাসনকাল সেইরূপ রুশ বিপ্লবের পূর্বে স্তব্ধতা ধারণ করে। জার তৃতীয় আলেকজাণ্ডার ফ্রান্সের সহিত ফ্রাংকো-রুশ সামরিক চুক্তি ১৮৯৪ খ্রীঃ সম্পাদন করেন।


তৃতীয় আলেকজাণ্ডার

জার দ্বিতীয় নিকোলাস ও রুশ বিপ্লব, ১৮৯৪—১৯১৭ খ্রীঃ (Czar Nicholas II and the Russian Revolution) ঃ জার তৃতীয় আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় নিকোলাস ১৮৯৪ খ্রীঃ রাশিয়ার সিংহাসনে বসেন। দ্বিতীয় নিকোলাস তাঁহার পিতার মতই স্বৈরতন্ত্রের অনুরাগী ছিলেন। তিনি দমন নীতিকে আরও শাণিত ও কঠোর করেন। তাঁহার আমলে রাশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রায় এক পঞ্চমাংশ ছাত্র এক বছরের মধ্যে সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হয়। উদার মতবাদের অধ্যাপকগণ তাঁহার নির্দেশে কারাদণ্ড ভোগ করেন। সংবাদপত্র ও রাজনৈতিক দলগুলির কণ্ঠরোধ করা হয়। সর্বত্র গুপ্ত পুলিশ বাহিনী নির্বিচারে গ্রেপ্তার ও নির্যাতন চালায়। পোল, ফিন, জার্মান প্রভৃতি সংখ্যালঘু অধিবাসীগণকে রুশীকরণ নীতির কঠোর আওতায় আনা হয়। অর্থাৎ তাহাদের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি ভুলিয়া রুশ ভাষা ও সংস্কৃতি গ্রহণে বাধ্য করা হয়। জার নিকোলাসের দমন নীতির কঠোরতায় রাশিয়া শিহরিত হয়।

দমন নীতি



দ্বিতীয় নিকোলাস

দ্বিতীয় নিকোলাসের আমলে রাশিয়ায় শিল্পবিপ্লব দ্রুত বিস্তার লাভ করে। পেট্রোগ্রাড প্রভৃতি শহরে বহু কলকারখানা ও শ্রমিক বস্তী গঠিত হয়। কিন্তু সরকারী স্বৈরনীতির সুযোগে পুঁজিপতিগণ শ্রমিক শ্রেণীকে নির্বিচারে শোষণ করে। রুশ কৃষকগণও তীব্রভাবে শোষিত হয়। এদিকে মার্কসবাদী কমিউনিষ্টগণ শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে সমাজ বিপ্লবের ভাবধারা প্রচার করে। তাহারা শ্রমিকগণকে এই কথা বুঝাইতে সক্ষম হয় যে যতদিন রাষ্ট্র বুর্জোয়া পুঁজিবাদীগণের হাতে থাকিবে ততদিন শ্রমিকের কল্যাণ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য মার্কসবাদীগণ জোর প্রচার চালায়।

জার দ্বিতীয় নিকোলাস নিজে তেমন কর্মদক্ষ ও দৃঢ় চরিত্রের লোক ছিলেন না। তাঁহার নাম লইয়া পুলিশ, সরকারী কর্মচারী ও অভিজাতগণই শাসন চালাইত। ইহার ফলে শাসন ব্যবস্থায় বহু দুর্নীতি দেখা দেয়। জার দ্বিতীয় নিকোলাসের রাণী আলেকজান্দ্রা, রাসপুটিন নামক এক ভণ্ড সন্ন্যাসীর প্রভাবে পড়েন। নিজ ব্যক্তিত্ব না থাকায় জার দ্বিতীয় নিকোলাস রাণী ও রাসপুটিনের কথায় চালিত হইতেন। ইহার ফলে তিনি কর্মচারী ও প্রজাগণের শ্রদ্ধা হারাইয়া ফেলেন।

জার দ্বিতীয় নিকোলাসের দমননীতি ও শাসন ব্যবস্থায় দুর্নীতির জন্য দেশে তীব্র অসন্তোষ ধূমায়িত হয়। রুশ দেশের কৃষকেরা জমির মালিক বা কুলাক (Kulaks) গণের শোষণে জর্জরিত হয়। ভূমিহীন কৃষকগণ ভূমি পাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়ে। জর্জ প্লেখানভ্ নামে এক বিপ্লবী "ভূমি ও স্বাধীনতা" (Land and Liberty) পাইবার জন্য রুশ জনসাধারণকে বিপ্লবের ডাক দেন। ভেরা (Vera) নামধারী জনৈক

নারী বিপ্লবী সেনাপতি ট্রোপভ (Tropov) কে হত্যা করে। শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যেও বেশী খাটুনী ও কম মজুরীর জন্য বিক্ষোভ দেখা দেয়। ইতিমধ্যে রুশ-জাপান যুদ্ধে ক্ষুদ্র জাপানের নিকট রাশিয়া পরাজিত হইলে জার সরকারের প্রতি জনগণের শ্রদ্ধা নষ্ট হয় এবং বিপ্লব দেখা দেয়। ১৯০৫ খ্রীঃ ২২শে ফেব্রুয়ারী রবিবার ফাদার গ্যাপন নামক এক ধর্মযাজকের নেতৃত্বে পেট্রোগ্রাড শহরের জনতা শোভাযাত্রাসহ শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের দাবী জানায়। এই শোভাযাত্রার উপর জারের সেনাদল গুলি চালাইলে বহু লোক নিহত হয়। ফলে দেশের সর্বত্র দাঙ্গা-হাঙ্গামা আরম্ভ হয়। জারের সেনা ও নৌবাহিনীর একাংশে বিদ্রোহ ছড়াইয়া পড়ে। রুশ যুদ্ধ জাহাজ পোটিয়োমকিনের (Potyomkin) নাবিকেরাও ইহাতে যোগ দেয়। জার দ্বিতীয় নিকোলাস উপায়ান্তর না দেখিয়া ডুমা (Duma) বা প্রতিনিধি সভা আহ্বান করেন। জার তাঁহার মন্ত্রী ষ্টোলিপিন (Stolypin) এর পরামর্শে সম্পন্ন কৃষকগণকে হাত করিবার জন্য এক সংস্কার ব্যবস্থা চালু করেন। ইহাকে ষ্টোলিপিন সংস্কার বলা হয়। ইহাতে কৃষকগণকে জমির মালিকানা দেওয়া হয়। ফলে এক শ্রেণীর লোক টাকার জোরে গরীব চাষীর নিকট হইতে ইচ্ছামত জমি কিনিয়া জোতদার বা ছোট ভূম্যাধিকারী বা কুলাক (Kulak) হইয়া বসে। ইহারা সরকারের পক্ষে যোগ দেয়। ইতিমধ্যে জারের পুলিশদল কঠোর হস্তে বিদ্রোহ দমন করে। জার ডুমার অধিকাংশ সভ্যগণকে হাত করিয়া তাঁহার স্বৈর ক্ষমতা অব্যাহত রাখেন। ১৯০৫—১৯১২ খ্রীঃ পর্যন্ত জার চারটি ডুমা বা প্রতিনিধি সভা আহ্বান করেন। কিন্তু ইহাতে শাসন সংস্কারের কাজ কিছুই হয় নাই। ফলে দেশে অসন্তোষের আগুন ধূমায়িত হইতে থাকে।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লব

এদিকে ১৯১৪ খ্রীঃ প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়। সার্বিয়া ছিল রাশিয়ার মিত্র। অষ্ট্রিয়ার হ্যাপসবার্গ সরকার জার্মানীর সহায়তায় সার্বিয়া আক্রমণ করিলে জার্মানী ও অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে রাশিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করে। এছাড়া রাশিয়া ছিল ত্রিশক্তি আঁতাত বা ইংলন্ড ও ফ্রান্সের মিত্র। সুতরাং ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সহযোগিতায় রাশিয়া যুদ্ধ চালাইতে থাকে। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধে রাশিয়ার শোচনীয় পরাজয় ঘটিতে থাকে। জার্মানগণ রাশিয়ার ভূমি অধিকার করে। প্রথম মহাযুদ্ধে যোগদানে রুশ জনগণ ইচ্ছুক ছিল না। দেশের ভিতর এতই সমস্যা ছিল যে আগু বাড়াইয়া যুদ্ধে যোগ দিতে লোকের উৎসাহ ছিল না। জার সরকার জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে রাশিয়াকে যুদ্ধে জড়ান। রুশ জনগণ ক্লান্ত হইয়া শান্তির জন্য দাবী জানায়। কিন্তু জার তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া যুদ্ধ চালাইতে থাকেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের ফলাফল

ইতিমধ্যে রাশিয়ায় ক্যাডেট, বলশেভিক, মেনসেভিক প্রভৃতি রাজনৈতিক দলগুলি নিজ নিজ শক্তি বৃদ্ধি করে। বলশেভিক দল লেনিন, ট্রটস্কি, স্ট্যালিন প্রভৃতি নেতার পরিচালনায় শ্রমিক ও সেনাদলে বহু অনুরাগী সভ্য গঠন করে। বলশেভিক দল মার্কসবাদ অনুয়ায়ী শ্রমিকরাজ ও সমাজতন্ত্র

বলশেভিক দল

প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী ছিল। লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিকগণ "শান্তি, জমি ও রুটি" দিতে জনসাধারণকে প্রতিশ্রুতি দেয়।

১৯১৭ খ্রীঃ ৮ই মার্চ পেট্রোগ্রাড শহরে বলশেভিক দলের ডাকে এক ব্যাপক ধর্মঘট হয়। ধর্মঘট উপলক্ষে জনসাধারণ রাস্তায় শোভাযাত্রা করিলে সেনাদলও জনসাধারণের সহিত যোগ দেয়। পেট্রোগ্রাড শহরে বিপ্লবের ফলে এই শহরে জারের শাসনের পতন ঘটে। পেট্রোগ্রাড শহরে শ্রমিক ও জনসাধারণের সোভিয়েত বা প্রতিনিধি সভার শাসন স্থাপিত হয়। পেট্রোগ্রাড শহরের অনুকরণে অন্যান্য স্থানেও অনুরূপ সোভিয়েত স্থাপিত হয়। অভিজাত ও প্রতিক্রিয়াশীলগণ আক্রান্ত ও বিতাড়িত হয়। ইহার ফলে জারতন্ত্র অচল হইয়া পড়ে। জার দ্বিতীয় নিকোলাস উপায় না দেখিয়া ডুমা বা জাতীয় প্রতিনিধি সভার হাতে ক্ষমতা ছাড়িয়া দেন। ডুমার নির্দেশে জার পদত্যাগ করেন। রাশিয়ায় প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হয়। ইতিমধ্যে জার দ্বিতীয় নিকোলাস ও তাঁহার পরিবারবর্গ বন্দী হইয়া নিহত হন। তিনশত বৎসর শাসন করিবার পর (১৬১৩—১৯১৭ খ্রীঃ) রাশিয়ার রোমানভ বংশের পতন ঘটে। জার দ্বিতীয় নিকোলাস ছিলেন শেষ রোমানভ রাজা। জার দ্বিতীয় নিকোলাস যে ডুমা বা প্রতিনিধি সভার হাতে ক্ষমতা ছাড়িয়া দেন, তাহাতে বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রাধান্য ছিল। সুতরাং ডুমার ঘোষিত প্রজাতন্ত্রী সরকারের নেতৃত্ব মানিতে বলশেভিকগণ অস্বীকার করে। শেষ পর্যন্ত বলশেভিকগণই রাশিয়ার শাসন ক্ষমতা দখল করে। ইহারা লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্থাপন করে। (বলশেভিক বিপ্লবের কারণ ত্রয়োদশ অধ্যায় ২০৮ পৃঃ দেখ)।

বলশেভিক বিপ্লব

ত্রিশক্তি আঁতাতঃ ইওরোপের পরস্পর-বিরোধী শক্তিজোট গঠন (The formation of the Triple Entente : System of rival Allinces in Europe) : বিসমার্কের পতনের পর জার্মান সম্রাট দ্বিতীয় কাইজার উইলিয়াম যে বৈদেশিক নীতি গ্রহণ করেন তাহা পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে (১৪৮ পৃঃ দেখ)। বিসমার্কের প্রধান নীতি ছিল ইওরোপের প্রধান শক্তিগুলিকে জার্মানীর মিত্রতাভুক্ত করিয়া ফ্রান্সকে মিত্রহীন রাখা। এই উদ্দেশ্যে বিসমার্ক ত্রিশক্তি চুক্তি গঠন করেন (পূর্বে পৃঃ ১৪৮ বিসমার্কের বৈদেশিক নীতি দেখ)। বিসমার্কের সম্পাদিত রুশ নিরপেক্ষতা চুক্তি বা রিইনসিওর‍্যান্স সন্ধি কাইজার নাকচ করিলে স্বভাবতঃই রাশিয়ার জার ও নেতাগণ অসন্তুষ্ট হন। ফলে রাশিয়া ফ্রান্সের সহিত মিত্রতা স্থাপনের নীতি গ্রহণ করে। ফরাসী নৌবহর রুশ বন্দর ক্রণষ্ট্যাডে (Cronstadt) শুভেচ্ছা সফরে আসিলে স্বৈরতন্ত্রী জার প্রজাতন্ত্রী ফ্রান্সের পতাকার নীচে দাঁড়াইয়া প্রজাতন্ত্রী ফ্রান্সের জাতীয় সঙ্গীত শুনিয়া ফরাসী নাবিকগণের অভিবাদন গ্রহণ করেন। ফরাসী মূলধন দূরপ্রাচ্যে রুশ রেলপথ নির্মাণের জন্য নিযুক্ত হয়। ইহার পর ফ্রাঙ্কো-রুশ মিত্রতা চুক্তি ১৮৯১ খ্রীঃ স্বাক্ষরিত হয়। ১৮৯৩ খ্রীঃ ফ্রাঙ্কো-রুশ সামরিক চুক্তি সম্পাদিত হয়। ফ্রাঙ্কো-রুশ মিত্রতা চুক্তির ফলে ফ্রান্সের মিত্রহীনতা দূর হয়। ফ্রাঙ্কো-রুশ মৈত্রী স্থাপিত হইলে ইহার বিরুদ্ধে

রুশ-ফরাসী চুক্তি, ১৮৯৩ খ্রীঃ

কাইজার জার্মানী, অষ্ট্রিয়া, ইতালীর ত্রিশক্তি চুক্তি (পৃঃ ১৪৮ দেখ) জোরদার করেন। ফলে ইওরোপে দুইটি শক্তিজোট গঠিত হয়।

বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যে একমাত্র ইংলণ্ড মিত্রহীন অবস্থায় পড়িয়া বিপদাপন্ন হয়।

ইংলণ্ডের মিত্রহীনতা; জার্মান মিত্রতার আগ্রহ

ইওরোপ দুই পরস্পর বিরোধী শক্তি জোটে বিভক্ত হওয়ার ফলে ইংলণ্ডের পক্ষে একাকী থাকা নিরাপদ ছিল না। তাছাড়া ফ্রান্সের সহিত মিশর, সুদান ও উত্তর আফ্রিকার উপনিবেশ লইয়া ইংলণ্ডের ঘোর বিরোধ দেখা দিয়াছিল। আফগানিস্থান লইয়া রাশিয়ার সহিতও ইংলণ্ডের বিরোধ দেখা দেয়। এমতাবস্থায় ইংলণ্ড প্রথমে জার্মানীর সহিত মিত্রতা স্থাপনের আগ্রহ দেখায়। ইংলণ্ডের ঔপনিবেশিক মন্ত্রী চেম্বারলেন ১৮৯০ খ্রীঃ জার্মানীর নিকট মিত্রতা প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কিন্তু জার্মানীর প্রধানমন্ত্রী বুলো (Bulow) ইহাতে কর্ণপাত করেন নাই। এদিকে দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সভাল অঞ্চলে জার্মানীর সহিত ইংলণ্ডের ঔপনিবেশিক বিবাদ দেখা দেয়। কাইজার একটি টেলিগ্রাম দ্বারা ট্রান্সভালের প্রেসিডেণ্ট ক্রুগারকে (Kruger Telegram) সমর্থন জানাইলে ইংলণ্ড জার্মান মিত্রতা নীতি ত্যাগ করে। তাছাড়া জার্মানীর নৌ বাহিনী গঠনের চেষ্টা ও ঔপনিবেশিক নীতি ইংলণ্ডের মনে ভীতির সঞ্চার করে।

ইঙ্গ-ফরাসী মিত্রতা স্থাপন

এদিকে মিশর, সুদান প্রভৃতি অঞ্চলে ফ্রান্সের সহিত ইংলণ্ডের ঔপনিবেশিক স্বার্থ লইয়া বিরোধের মীমাংসা সহজ হয়। ফরাসী প্রধানমন্ত্রী ডেলক্যাসী (Delcasse) বাস্তবতাপূর্ণ নীতি লইয়া ইংলণ্ডের সহিত এই সকল বিরোধের নিষ্পত্তি করিতে আগাইয়া আসেন। তিনি ফরাসী জনসাধারণকে এই কথা বুঝান যে ফ্রান্সের প্রধান শত্রু হইল জার্মানী। জার্মানীর বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের মিত্রতা ফ্রান্সের স্বার্থ রক্ষায় সহায়ক হইবে। ইংলণ্ডের রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড ও অন্যান্য মন্ত্রীগণও জার্মানী অপেক্ষা ফ্রান্সের মিত্রতা অধিকতর কাম্য মনে করেন। ইংলণ্ড রাজ সপ্তম এডওয়ার্ড ফ্রান্স পরিদর্শনে আসিলে ফ্রান্সে তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা জানান হয়। ইহার ফলে ইঙ্গ-ফরাসী আতাঁত কর্ডিয়াল বা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়িয়া উঠে। ইঙ্গ-ফরাসী কনভেনশন ১৯০৪ খ্রীঃ (Anglo-French Convention) দ্বারা ইংলণ্ডের সহিত ফ্রান্সের মিত্রতা দৃঢ়বদ্ধ হয়। এই সন্ধি দ্বারা মিশরে ইংরাজ অধিকার ও মরক্কোয় ফরাসী অধিকার স্বীকৃত হয়। ইঙ্গ-ফরাসী সামরিক চুক্তি ১৯০৫ খ্রীঃ (Anglo-Freneh Military Convention) স্বাক্ষরিত হইলে ইওরোপে জার্মান বিরোধী জোট দৃঢ় হয়।

ইঙ্গ-রুশ মৈত্রী

ইংলণ্ড ইহার পর রাশিয়ার সহিত মিত্রতা স্থাপনের চেষ্টা চালায়। ফ্রান্স ছিল রাশিয়ার মিত্র রাষ্ট্র। সুতরাং ফ্রান্স এই বিষয়ে মধ্যস্থতা করে। ইহার ফলে ইঙ্গ-রুশ চুক্তি (Anglo-Russian Convention) ১৯০৭ খ্রীঃ সম্পাদিত হয়। এই চুক্তি দ্বারা পারস্য, আফগানিস্থান ও তিব্বত লইয়া ইংলণ্ড ও রাশিয়ার বিরোধ মিটাইয়া ফেলা হয়। ইংলণ্ড জাপানের সহিত ১৯০২ খ্রীঃ একটি মিত্রতা চুক্তি স্থাপন করেন।

রুশ-ফরাসী, ইঙ্গ-ফরাসী ও ইঙ্গ-রুশ মিত্রতা চুক্তির ফলে ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও রাশিয়া পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিত্রতাবদ্ধ হয়। এই মিত্র জোটকে ট্রিপল আতাঁত বা ত্রিশক্তি মিত্রতা বলা হইয়া থাকে। ইহা ছিল কাইজারের ট্রিপল এ্যালায়েন্স বা ত্রিশক্তি চুক্তির পাল্টা ব্যবস্থা। কাইজারের ট্রিপল এ্যালায়েন্স বা ত্রিশক্তি চুক্তি, জার্মানী, অষ্ট্রিয়া ও ইতালী লইয়া গঠিত ছিল।

ত্রিশক্তি মৈত্রী

১৯০৪ খ্রীঃ পর হইতে ১০ বৎসর ইওরোপ দুইটি সশস্ত্র শিবিরে (Two Armed Camps) বিভক্ত হইয়া যায়। একদিকে জার্মানীর নেতৃত্বে অষ্ট্রিয়া, ইতালীর ত্রিশক্তি চুক্তি অবস্থিত থাকে। ইহার অপর দিকে ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও রাশিয়ার ত্রিশক্তি আতাঁত বা মিত্রতা অবস্থিত থাকে। দুই বিরোধী শক্তি জোট মারণাস্ত্র নির্মাণের প্রতিযোগিতায় নামে। এই দুই বিরোধী জোটের শক্তির আস্ফালন পৃথিবীর শান্তিকে বিনষ্ট করিতে উদ্যত হয়। ঐতিহাসিক ল্যাংসামের (Langsham) ভাষায় বলা যায় যে "যে কোন দুর্ঘটনাই ইওরোপের শান্তিকে ধ্বংস করিতে পারিত"।[১] মরক্কোর সমস্যা, ইতালীর ঔপনিবেশিক ক্ষুধা, বলকান জাতীয়তাবাদ, অষ্ট্রিয়ার আগ্রাসী নীতি ও রাশিয়ার বলকান নীতি যুদ্ধকে ত্বরান্বিত করে। ১৯০৪—১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দকে এজন্য "সশস্ত্র শান্তির যুগ" বা Age of Armed Peace বলা হয়।

ইওরোপে পরস্পর বিরোধী জোট

দশম অধ্যায়

সমাজতন্ত্রবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ

(Socialism and Imperialism)

সমাজতন্ত্রবাদ (Socialism)ঃ আধুনিক যুগে শিল্প বিপ্লবের ফলে সমাজতন্ত্রবাদের উদ্ভব লক্ষ্য করা যায়।[২] শিল্প বিপ্লবের ফলে বড় বড় কলকারখানা গড়িয়া উঠে। এই সকল কলকারখানায় মালিকেরা শ্রমিককে খাটাইয়া বহু মুনাফা পায়। কিন্তু মুনাফার লোভে মালিকেরা শ্রমিককে কোন সুবিধা না দিয়া বেশী খাটায় এবং কম মজুরী দেয়। ইহার ফলে শ্রমিকের দুরবস্থার একশেষ হয়। ইংলণ্ডে যেহেতু শিল্প বিপ্লব প্রথম দেখা দেয় সেহেতু ইংলণ্ডে শ্রমিকের অসন্তোষ প্রথম দেখা দেয়। ক্রমে জার্মানী, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশেও শিল্প বিপ্লবের ফলে শ্রমিক শোষণ চলিতে থাকে। শ্রমিকেরা তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য আদায়ের জন্য ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করে এবং ধর্মঘট করিয়া প্রতিবাদ জানায়। কিন্তু ঐ সকল দেশের সরকার পুঁজিবাদীগণের সমর্থন পুষ্ট থাকায়, সরকার শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষার জন্য আগাইয়া আসিতে অনিচ্ছা দেখায়।

১. "The peace of Europe rested on accident"—Langsham.

২. Hazen—Europe Since Napoleon. P. 257.

ইতিমধ্যে (ঊনবিংশ শতকে) কিছু সংখ্যক চিন্তাশীল ব্যক্তি ও বুদ্ধিজীবি লক্ষ্য করেন যে শিল্প বিপ্লবের ফলে সমাজে শিল্পপতি, ব্যাংক মালিক ও বড় ব্যবসায়ীগণ দেশের বেশী সম্পদ দখল করিতেছেন। অপরদিকে শ্রমিক, কৃষক প্রভৃতি মেহনতী মানুষেরা দারিদ্র্যের পাঁকে ডুবিতেছে। ধনতন্ত্রবাদ বা পুঁজিবাদের প্রভাবে ধনী আরও ধনী ও গরীব আরও গরীব হইতেছে। সমাজের এই বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা দূর করিবার জন্য তাঁহারা চিন্তা করেন। তাঁহাদের চিন্তার ফলেই সমাজতন্ত্রবাদ বা স্যোসালিজমের (Socialism) উদ্ভব হয়।

সমাজতন্ত্রবাদের ব্যাখ্যা বিভিন্ন চিন্তাবিদ বিভিন্নভাবে দিয়াছেন। যাহা হউক, রাষ্ট্র যদি সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা লোপ করিয়া সমাজের সকল শ্রেণীর স্বার্থে উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার দায়িত্ব নেয় তবে তাহাকে সমাজতন্ত্র বলা হয়। উৎপাদন ব্যবস্থা বলিতে কলকারখানায় পণ্য উৎপাদন, ক্ষেতে খামারে শস্য উৎপাদন বুঝায়। বণ্টন বলিতে উৎপাদিত মালকে বিক্রয় ও বিতরণ করা বুঝায়। যদি উৎপাদন ও বণ্টন ব্যক্তিগত মালিকানায় থাকে তবে মালিক ইচ্ছামত মুনাফা লুটে এবং শ্রমিককে তাহার ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করে। দ্বিতীয়তঃ, মালের সরবরাহ ও দাম ইচ্ছামত বাড়াইয়া সাধারণ লোককে বেশী দামে কিনিতে বাধ্য করে এবং বেশী মুনাফা পায়। যদি রাষ্ট্র উৎপাদন ও বণ্টনের দায়িত্ব নেয় তবে কোন বিশেষ শ্রেণী লাভবান হইতে পারে না। এইজন্য শ্রমিক, কৃষক ও মেহনতী মানুষের ভোটে রাষ্ট্র গঠিত হইলে এই রাষ্ট্র তাহাদের স্বার্থ দেখিবে। ইহাই হইল সমাজতন্ত্রের মূল কথা। ইংলণ্ডের চিন্তাবিদ রবার্ট আওয়েন (Robert Owen) সর্বপ্রথম সমাজতন্ত্র কথাটির ব্যবহার করেন বলিয়া জানা যায়।[১]

ইংলণ্ডের সমাজতন্ত্রবাদীগণ মনে করেন যে সমাজতন্ত্র ক্রমে ক্রমে বির্তনের পথে ইতিহাসের নিয়মে আসিবে। পার্লামেণ্টের সাহায্যে আইন করিয়া শ্রমিকের স্বার্থরক্ষা এবং মালিকের শোষণ বন্ধ করা সম্ভব। প্রয়োজন হইলে আইন দ্বারা শিল্পকে জাতীয়করণ বা সরকারের হাতে নেওয়া যাইবে। এজন্য বিপ্লব বা হিংসাত্মক আন্দোলনের প্রয়োজন নাই। ফ্রান্সের সমাজতন্ত্রবাদীগণ মনে করিতেন যে রাষ্ট্রের হাতে উৎপাদন বা বণ্টনের ক্ষমতা না দিয়া শ্রমিকের নিজস্ব সংগঠন বা সিণ্ডিকের (Syndic) হাতে ক্ষমতা ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। সিণ্ডিক্যালিষ্ট বা সিণ্ডিকবাদীরা মনে করিত যে—যে শিল্পে যে শ্রমিকেরা কাজ করে সেই শিল্পের মালিকানা সেই বিশেষ শ্রমিক সংগঠনের হাতে দেওয়া উচিত। ফ্রান্সে সেণ্ট সাইমন ও ফ্যুরিয়ের সমাজতান্ত্রিক মতবাদ প্রচার করেন। জার্মান সমাজতন্ত্র কার্ল মার্কসের মতবাদে রূপ পাইয়াছে। মার্কসের মতবাদ পরে বিস্তারিত আলোচিত হইয়াছে। যাহা হউক মার্কসের মতবাদের মূল কথা হইল যে শ্রমিকের শ্রমে যা মুনাফা হয় তাহা একমাত্র শ্রমিকেরই প্রাপ্য। দ্বিতীয়তঃ, সমাজে শোষক ও শোষিত থাকিবে না। সকল সম্পদ, উৎপাদন ও বণ্টন রাষ্ট্রের হাতে যাইবে। শ্রমিক শ্রেণী রাষ্ট্র গঠন করিলে রাষ্ট্রের সাহায্যে সম্পদ শ্রমিক শ্রেণীই ভোগ করিতে পারিবে। ফলে মালিক শ্রেণী লোপ পাইবে এবং শ্রমিকের শোষণ বন্ধ হইবে। শ্রেণীহীন সমাজ গঠিত

১. Glimpses of World History—J. Nehru.

হইবে। এই সমাজে সকলে সাধ্যমত কাজ করিবে, দরকার মত অর্থ, খাদ্য ও অন্যান্য দ্রব্য পাইবে। তৃতীয়তঃ, ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিতে কিছুই থাকিবে না।

যাহা হউক কার্ল মার্কসের পূর্ববর্তী সমাজতন্ত্রবাদীগণ অপেক্ষা মার্কসের মতবাদ পৃথক। এজন্য পূর্ববর্তী চিন্তাবিদগণকে ইওটোপিয়ন (utopian) বা ভাববাদী সমাজতান্ত্রিক বলা হয়। মার্কসীয় মতবাদ ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের উপর স্থাপিত। বর্তমান যুগে সমাজতন্ত্র বলিতে প্রধানতঃ মার্কসবাদ বুঝায়।

সমাজ ব্যবস্থায় দার্শনিক মতামতের প্রভাব

কার্ল মার্কস ও সমাজতন্ত্রবাদ (Karl Marx and Socialism)ঃ বিজ্ঞানের অগ্রগতি যদি মানুষের জীবনযাত্রাকে আরামপ্রদ করিয়া থাকে তবে দার্শনিকগণের মতবাদ রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থাকে আগাইয়া দেওয়ার কাজ করে। কার্ল মার্কসের দার্শনিক মতবাদ বিংশ শতকের সকল রাষ্ট্রকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করিয়াছে।

কার্ল মার্কস ঃ প্রথম জীবন

কার্ল মার্কস ছিলেন জাতিতে জার্মান ইহুদী। তাঁহার পিতার নাম ছিল হারশেবল মার্কস। মার্কসের মাতা ছিলেন গোঁড়া প্রটেস্টাণ্ট খ্রীষ্টান। জার্মানীর রাইনল্যান্ড অঞ্চলে ১৮১৮ খ্রীঃ মার্কসের জন্ম হয়। তিনি জার্মানীর বিশ্ব-বিদ্যালয়ে আইন ও দর্শন শাস্ত্র লইয়া পড়াশোনা করেন। তিনি জেনা (Jena) বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণামূলক থিসিস দাখিল করেন। অধ্যাপনার দিকে তাঁহার ঝোঁক থাকিলেও মেটারনিক্ তন্ত্রের প্রতাপে তিনি সেই ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া সাংবাদিকের জীবিকা নেন। রাইনিস্কে জেইৎসুং (Rhenische Zeitung) নামক পত্রিকায় তিনি সংবাদদাতার চাকুরী নেন।

কার্ল মার্কসের নির্বাসিত জীবন ঃ ফ্রেডারিক এঙ্গেলস

মার্কসের মতবাদ প্রাশিয়া সরকার খুবই বিপজ্জনক মনে করিয়া তাঁহাকে বহিস্কার করেন। মার্কস কিছুকাল প্যারিসে বাস করেন। এই স্থানে তিনি প্রুধোঁ (Prudhon) প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিকগণের সংস্পর্শে আসেন। শেষ পর্যন্ত তিনি ইংলণ্ডে আশ্রয় নেন। প্রায় ৩৫ বৎসকাল তিনি ইংলণ্ডে বাস করেন। এই সময় সমাজতন্ত্রবাদী ফ্রেডারিক এঙ্গেলস তাঁহার একান্ত অনুরাগী বন্ধুতে পরিণত হন। মার্কসের সাংসারিক অভাব অনেক পরিমাণে এঙ্গেলসের দাক্ষিণ্যে দূর হয়। মার্কস ও এঙ্গেলস যুক্তভাবে ১৮৪৮ খ্রীঃ কমিউনিষ্ট ম্যানিফেষ্টো (Communist Manifesto) নামক সাম্যবাদী মতবাদের গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থকে সাম্যবাদের বাইবেল বলা হয়। কমিউনিষ্ট ম্যানিফেষ্টো প্রকাশিত হইলে ইওরোপের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ইহা আগ্রহ সহকারে পড়েন। মার্কস পরে ডাস ক্যাপিটাল (Das Capital) ও আরও কয়েকটি গ্রন্থ এবং বহু প্রবন্ধ রচনা করেন। ১৮৮৩ খ্রীঃ মার্কসের মৃত্যু হয়। তাঁহার ভাবধারা আধুনিক সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে বহু পরিমাণে প্রভাবিত করিয়াছে।

দার্শনিক হেগেল সর্বপ্রথম দ্বন্দ্ববাদ বা ডায়ালেকটিকস প্রচার করেন। মার্কস হেগেলীয় দ্বন্দ্ববাদকে ইতিহাসের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। হেগেলের সহিত মার্কসের মতবাদের মৌলিক

প্রভেদ দেখা যায়।।[১] মার্কস ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে বিভিন্ন যুগে অর্থনীতির ভিত্তিতেই সমাজ ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে। সমাজে একশ্রেণীর লোক সকল সম্পদ দখল করিয়া ধন ও ক্ষমতা পায়। বাকী সকলে তাহাদের অধীনে থাকে। যাহারা ধন ও সম্পদ পায় তাহারা বাকী সকলকে শোষণ করে। শোষিত লোকেরা শেষ পর্যন্ত শোষকের হাত হইতে ক্ষমতা ছিনাইয়া নেয়। শোষক ও শোষিতের (Haves and Have nots) দ্বন্দ্বই হইল ইতিহাসের মুখ্য বস্তু। প্রাচীন যুগে যথা গ্রীস ও রোমে স্বাধীন নাগরিক ও ক্রীতদাসে শ্রেণীসংগ্রাম, প্রাচীন রোমে অভিজাত ও সাধারণ নাগরিকে শ্রেণীসংগ্রাম, মধ্যযুগে জমিদার ও ভূমিদাসে, আধুনিক যুগে মালিক ও শ্রমিকে শ্রেণীসংগ্রামই হইল ইতিহাসের মুখ্য বস্তু। এই পরস্পর-বিরোধী শক্তির সংঘাতে ইতিহাস আগাইয়া চলে। আদি যুগে ভূমি ছিল মানুষের একমাত্র সম্পদের উৎস। ক্রমে এক শ্রেণীর লোক রাষ্ট্রকে নিজের আয়ত্তে আনিয়া ইহার সাহায্যে ভূমি ও সম্পদ অধিকার করে। ইহার ফলে অভিজাততন্ত্র বা সামন্ততন্ত্র বা ফিউডালিজমের উদ্ভব হয়। ক্রমে ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার হইলে এবং শিল্প-বিপ্লব দেখা দিলে নূতন এক শ্রেণীর উদয় হয়। ইহাদের বুর্জোয়া বা ধনতন্ত্রবাদী বলা হয়। ইহারা ব্যবসায়, ব্যাংক, কলকারখানা চালাইয়া প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করে। অভিজাত ও বুর্জোয়ার পার্থক্য হইল এই যে, অভিজাতগণ বংশ কৌলীন্যে সমৃদ্ধ এবং তাহাদের সম্পদ ভূমি হইতে প্রাপ্ত; বুর্জোয়া বা ধনতন্ত্রবাদীগণের বংশকৌলিন্য না থাকিলেও কাঞ্চনকৌলিন্য ছিল। ইহাদের সম্পদ কল-কারখানা ও ব্যবসায় হইতে উৎপন্ন। অভিজাত ও বুর্জোয়াগণ উভয়েই শোষণের দ্বারা সমৃদ্ধি-শালী হইয়াছে। ফরাসী বিপ্লবের ফলে অভিজাতগণ ক্ষমতাচ্যুত হয় এবং বুর্জোয়াগণ ক্ষমতা পায়। সরকারী শাসনযন্ত্র হাতে রাখিয়া বুর্জোয়াগণ শ্রমিকগণকে শোষণ করে।

ইতিহাসের মার্কসবাদী ব্যাখ্যা



কার্ল মার্কস

মার্কসের মতে শ্রমিকের শ্রমেই সম্পদ উৎপন্ন হয়। সুতরাং উৎপাদনের ফলে যা মুনাফা হয় তাহা একমাত্র শ্রমিকের প্রাপ্য। এই মুনাফা শ্রমিককে না দিয়া বুর্জোয়াগণ অধিকার করিয়া থাকে। মার্কসের মতে ইতিহাসের নিয়মে শ্রমিকগণের হাতে বুর্জোয়া-গণের পতন ঘটিবে। তিনি শ্রমিকগণকে সংঘবদ্ধ হইয়া বুর্জোয়াগণের বিরুদ্ধে বিপ্লবের ডাক দেন। তিনি বলেন, "সকল দেশের মজদুর এক হও। ইহাতে তোমাদের শিকল ছাড়া আর কিছু হারাইবে না"।[২]

---

১. Fisher—History of Europe.

২. "Proletariates of all country unite. You will lose nothing but your chains."

মার্কসবাদ অনুযায়ী শ্রেণী সংগ্রামের দ্বারাই ইতিহাসের অগ্রগতি ঘটে। বুর্জোয়াগণ যেমন অভিজাতগণের হাত হইতে ক্ষমতা ছিনাইয়া লইয়াছে তেমনি শ্রমিককে সংগ্রাম বা বিপ্লবের দ্বারা ক্ষমতা ছিনাইয়া লইতে হইবে। শ্রমিক রাষ্ট্রযন্ত্র অধিকার করিয়া উৎপাদন ও বণ্টন নিয়ন্ত্রণ করিলে শ্রেণীহীন সমাজ বা classless society প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই সমাজে প্রত্যেকে প্রয়োজন অনুযায়ী পাইবে এবং সাধ্য অনুযায়ী কাজ করিবে। কেহ কাহাকেও শোষণ করিবে না। শ্রেণীহীন সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও মালিকানা অবলুপ্ত হইবে। রাষ্ট্রই সকল সম্পত্তির মালিক হইবে। আয় অনুযায়ী চড়া হারে আয়কর আদায় করা হইবে। মুদ্রা ব্যবস্থা, রেল, ব্যাংক সবই রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে আসিবে। শ্রমিককে তাহার শ্রমের নায্য মূল্য দেওয়া হইবে। মার্কসের মতে মানুষ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা, শোষক ও শোষিত। পৃথিবীর শোষিত শ্রেণীর মধ্যে সাদা ও কালো চামড়ার কোন তফাৎ নাই। মার্কসবাদ আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলন গঠনের কথা বলিয়াছে। এই উদ্দেশ্যে প্রথম ইনটারন্যাশন্যাল ১৮৬৪ খ্রীঃ স্থাপিত হয়।

মার্কসের মতে শ্রেণী সংগ্রাম ও বিপ্লবের আদর্শ

মার্কসের মতবাদকে সাম্যবাদ (Communism) বলা হয়। ইহাকে সমাজতন্ত্রবাদ না বলিয়া সাম্যবাদ কেন বলা হয় তাহা উল্লেখযোগ্য। ফরাসী চিন্তাবিদ সেণ্ট সাইমন, লুই ব্লাংক, ফ্যুরিয়ের প্রভৃতি সমাজতন্ত্রবাদের কথা বলেন। ইঁহাদের মতবাদ মার্কসের মতবাদ হইতে পৃথক। এজন্য মার্কসের মতবাদকে সাম্যবাদ বলা হয়।

সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের পার্থক্য

কোন কোন দার্শনিক মার্কসের মতবাদের সমালোচনা করিয়াছেন। প্রথমতঃ, তাঁহাদের মতে মার্কস ইতিহাসের অত্যন্ত সংকীর্ণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইতিহাস কেবলমাত্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। দ্বিতীয়তঃ, হিংসাত্মক বিপ্লব না করিয়া ভোটের দ্বারা সরকার অধিকার করিয়া সমাজতন্ত্রবাদী সংস্কার করা সম্ভব একথা অনেকে মনে করেন। রাষ্ট্রের আইন দ্বারা সমাজ ব্যবস্থা পাল্টাইয়া মূলধনী শ্রেণীকে দমাইয়া ফেলা সম্ভব একথা অনেকে মনে করেন। কিন্তু মার্কস কেবলমাত্র শ্রেণীসংগ্রামের দ্বারাই ইহা সম্ভব বলিয়াছেন। তৃতীয়তঃ, কোন কোন ধনতন্ত্রবাদী দেশের পার্লামেণ্ট আইনের সাহায্যে সংস্কার করিয়া দেশে শ্রমিকগণের মঙ্গল সাধন করিয়াছেন। সেই সকল ধনতন্ত্রবাদী দেশের শ্রমিকদিগকে নানাবিধ সুখ-সুবিধা দেওয়া হয়। চতুর্থতঃ, মার্কস জাতীয়তাবাদকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তিনি পৃথিবীর শোষিত শ্রমিকের কোন জাতিভেদ নাই বলিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এক দেশের শ্রমিক অন্য দেশের শ্রমিক হইতে নিজেদের পৃথক মনে করে। এই কারণে একটি সাম্যবাদী দেশের সহিত অন্য সাম্যবাদী দেশের বিবাদ দেখা যায়। বর্তমানে চীন ও রাশিয়ার বিবাদ এই কথা সত্য প্রতিপন্ন করে। পঞ্চমতঃ,মার্কস শ্রেণীহীন সমাজের কথা বলিলেও সাম্যবাদী দেশগুলিতে প্রকৃত শ্রেণীহীন সমাজ স্থাপিত হয় নাই বলিয়া অভিযোগ করা হয়। রাশিয়া প্রভৃতি দেশে শ্রমিকের অধিকার বিশেষভাবে স্বীকৃত হইয়াছে সত্য। কিন্তু শ্রমিক ছাড়া অপর শ্রেণীর অধিকার যথা যাহারা কায়িক পরিশ্রমের কাজ করে

মার্কসবাদের সমালোচনা

না তাহাদের অধিকার আইন দ্বারা প্রকৃত স্বীকৃত হয় নাই। "ডিক্টেটর অফ প্রলিটারিয়েট" অথবা শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কতন্ত্র স্থাপিত হওয়ার অর্থ হইল কেবল শ্রমিকের স্বার্থই দেখা হইবে অপর শ্রেণী বঞ্চিত হইবে। সুতরাং শ্রেণীহীন সমাজ কথার কথা মাত্র। অধুনা রুশ সংবিধানে এই কথাটি পাল্টাইয়া "ডিক্টেটরশিপ অফ পিপল" বা জনগণের একনায়কতন্ত্র বলা হয়। যাহাই হউক মার্কসবাদ বা সাম্যবাদকে বহু লোক বৈজ্ঞানিক সত্য বলিয়া মনে করেন। ইহার প্রভাবে আধুনিক সকল সভ্য দেশের রাষ্ট্র, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উৎপাদন ও বণ্টন নিয়ন্ত্রণ, মূলধন নিয়ন্ত্রণ ও শ্রমিক কল্যাণের জন্য আইন করিয়া থাকে। মার্কসবাদের ব্যাখ্যা লইয়া রাশিয়া, চীন, যুগোশ্লাভিয়া প্রভৃতি সাম্যবাদী দেশে মতভেদ থাকিলেও মার্কসের মূল নীতি এই সকল দেশের শাসননীতিকে প্রভাবিত করিয়াছে। মার্কসবাদের ঐতিহাসিক প্রভাব অনস্বীকার্য।

সাম্রাজ্যবাদের বিস্তারের কারণ (The Urge for Imperial expansion): ঊনবিংশ শতকের ইতিহাসের একটি বৈশিষ্ট্য হইল সাম্রাজ্যবাদের বিস্তার। ১৮৭০ খ্রীঃ পর উপনিবেশ স্থাপনের আন্দোলন তীব্রতর হয়। ১৮৭০ খ্রীঃ পর হইতে ইওরোপীয় জাতিগুলি এশিয়া, আফ্রিকা ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে উপনিবেশ স্থাপনের জন্য ব্যাপক চেষ্টা চালায়। উপনিবেশের অধিকার লইয়া ইওরোপীয় জাতিগুলির মধ্যে ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সংঘাত দেখা দেয়। ঊনবিংশ শতকের এই ঔপনিবেশিক আন্দোলনকে ঐতিহাসিকেরা সাম্রাজ্যবাদ বা Imperialism বলিয়া অভিহিত করেন। উপনিবেশ বিস্তারের জন্য ১৮৭০ খ্রীঃ পর ইওরোপীয় জাতিগুলি কেন এত ব্যস্ত হইয়া পড়ে এ সম্পর্কে ইংরাজ অর্থনীতিবিদ হবসন (Hobson) একটি ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তাঁহার মতে শিল্প-বিপ্লবের ফলে পশ্চিম ও মধ্য ইওরোপের দেশগুলিতে ধনতন্ত্রী বা বুর্জোয়াগণের হাতে প্রচুর মূলধন জমে। তাহারা এই উদ্বৃত্ত মূলধনকে উপনিবেশের নূতন কলকারখানায় লগ্নী করিয়া মুনাফা বাড়াইবার জন্য উপনিবেশ স্থাপন করে। এছাড়া উপনিবেশগুলির কাঁচামাল যথা তুলা, রেশম, রবার, উদ্ভিদতৈল, কয়লা, লোহা তাহারা নামমাত্র দামে কিনিবার সুযোগ পায়। নূতন উপনিবেশের বাজারগুলিতে কলকারখানায় উৎপন্ন সস্তা মাল বিক্রয় করিয়া সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি বহু মুনাফা লাভ করে। এই কারণে ১৮৭০ খ্রীঃ পর সাম্রাজ্যবাদের দ্রুত প্রসার ঘটে। ঐতিহাসিক ল্যাটিমোরের (Lattimore) মতে যে সকল দেশ জাহাজ ভর্তি মাল বিক্রয়ের জন্য পাঠাইতে পারিত এবং এই জাহাজের পিছু পিছু বল প্রয়োগের জন্য যুদ্ধ জাহাজ পাঠাইত তাহারাই সাম্রাজ্যবাদকে নীতি হিসাবে রূপায়িত করে।[১] অর্থনৈতিক শোষণই ছিল সাম্রাজ্যবাদের প্রধান শিকড় (The tap root of imperialism).

ঊনবিংশ শতকের সাম্রাজ্যবাদ

সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভবের কারণ: হবসনের মতবাদ

লেনিনের মতে ধনতন্ত্রী উৎপাদন ব্যবস্থাই সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্টি করিয়াছে। ইওরোপে

১. "The nations who had merchant ships to send and gunboats to accompany them turned imperialists." Owen Lattimore—Modern Chinese History.

শিল্প বিপ্লবের ফলে বড় বড় কলকারখানার মালিকেরা প্রচুর অর্থের মালিক হয়। তাহারা উপনিবেশে সস্তা কাঁচামাল পাইয়া, শ্রমিককে কম মজুরী দিয়া অধিক মুনাফা করার সুযোগ পায়। এজন্য তাহারা উপনিবেশ স্থাপনের কাজে সরকার ও সর্বসাধারণকে উৎসাহ দেয়। উপনিবেশের বাণিজ্য হইতে যে বাড়তি মুনাফা হয় তাহার কিছু অংশ শিল্পপতিরা নিজ নিজ দেশের সরকার ও শ্রমিকদের দেয়। ইহার ফলে সাম্রাজ্যবাদী দেশের শ্রমিকেরাও বুর্জোয়াগণের সাম্রাজ্যবাদ নীতিকে সমর্থন জানায়। সাম্রাজ্যবাদী দেশের শ্রমিকেরা বিপ্লবের কথা ভুলিয়া গিয়া উপনিবেশের শোষণের জন্য বুর্জোয়া শিল্পপতিগণের সহিত হাত মেলায়।

লেনিনের মতবাদ

সাম্রাজ্যবাদ অর্থনৈতিক কারণে গড়িয়া উঠে ইহা অনেক ঐতিহাসিক স্বীকার করেন না। সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার অনেক ত্রুটি দেখা যায়। প্রথমতঃ, ১৮৭০ খ্রীঃ বহু আগে শিল্প-বিপ্লব দেখা দিলেও ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ সেই সময় সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করে নাই। এই সময় ইংলণ্ডের জনমত উপনিবেশ বিস্তারের বিরোধী ছিল। গ্ল্যাডষ্টোন, কবডেন প্রভৃতি ইংরাজ চিন্তাবিদগণ ইংলণ্ডের সকল উপনিবেশকে স্বাধীনতা দানের পক্ষপাতী ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, শিল্পে অগ্রসর অনেক দেশ উপনিবেশ দখল না করিয়াও বাণিজ্য চালায়। মার্কিন দেশ শিল্পে খুবই উন্নত এবং ধনতন্ত্রী অর্থনীতির ভক্ত। কিন্তু মার্কিন দেশ উপনিবেশ অধিকার না করিয়াও শিল্প বাণিজ্যে উন্নতি লাভ করিয়াছে। সুতরাং ১৮৭০ খ্রীঃ পর হঠাৎ কি কারণে ইওরোপীয় জাতিগুলি উপনিবেশ দখলের আগ্রহ দেখায় তাহার যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা অর্থনৈতিক মতবাদে পাওয়া যায় না। অর্থনৈতিক কারণ নিঃসন্দেহে সাম্রাজ্যবাদকে তীব্রতর করে। তবে শুধু এই কারণেই সাম্রাজ্যবাদের বিস্তার হয় তাহা অনেকে মনে করেন না।

অর্থ নৈতিক ব্যাখ্যার আলোচনা

উপনিবেশ স্থাপন করিয়া ক্ষমতা বৃদ্ধি, নিজ দেশের মর্যাদা বৃদ্ধি উপনিবেশ বিস্তারের অন্যতম কারণ হিসাবে মনে করা যায়। জার্মানী ও ইতালী প্রধানতঃ এই মনোভাব লইয়া সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসরণ করে। এইভাবে মরক্কোর অধিকার লইয়া জার্মানী-ফ্রান্সের বিরোধ বাধে। ট্রান্সভালের অধিকার লইয়া ইংলণ্ড ও জার্মানীর বিরোধ বাধে।

রাজনৈতিক কারণ

এছাড়া ১৮৭০ খ্রীঃ পর্যন্ত ইওরোপের জার্মানী, ফ্রান্স, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশ ইংলণ্ডের উৎপন্ন কাপড়, যন্ত্রপাতি ও লোহার জিনিষের বড় খরিদ্দার ছিল। ১৮৭০ খ্রীঃ নাগাদ এই দেশগুলি নিজ নিজ কলকারখানা বানাইয়া নিজ দেশের প্রয়োজনীয় মাল উৎপাদন করে। ফলে, ইওরোপে ইংলণ্ডের মাল বিক্রয় করা হয়। ইংলণ্ডের কলকারখানাগুলি যদি বন্ধ হইয়া যাইত তবে বহু শ্রমিক বেকার হইয়া পড়িত। সুতরাং ইংলণ্ডকে বাধ্য হইয়া এশিয়া, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে নূতন বাজারের আশায় উপনিবেশ স্থাপন করিতে হয়। এই কারণে ১৮৭০ খ্রীঃ পর সাম্রাজ্যবাদের প্রবলতা দেখা দেয়। এশিয়া, আফ্রিকার বাজারে বিলাতী মালের চাহিদাও বিস্তর ছিল। ইহার ফলে উপনিবেশ দখলের প্রতিযোগিতা তীব্রতর হয়।

শিল্প-বিপ্লব ও বাজার দখলের চেষ্টা

পশ্চিম ইওরোপীয় দেশগুলিতে এক শ্রেণীর শিল্পপতিগণ সাম্রাজ্য দখলের জন্য জনমত গঠন করে। এই সকল শিল্পপতিগণ রাজনৈতিক দলগুলিকে প্রভাবিত করিয়া সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে। ইংলণ্ডের টোরীদল ইহার ফলে উপনিবেশ বিস্তার নীতি গ্রহণ করে। ফ্রান্সের প্রজাতন্ত্রীদলের নেতা গ্যাম্বেটা ও জুলিয়াস ফেরী পর্যন্ত উপনিবেশ বিস্তার নীতিকে সমর্থন করেন। রাশিয়ার অভিজাত ও সামরিক নেতাগণ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও মর্যাদা বাড়াইবার জন্য রাজ্য বিস্তারনীতি গ্রহণ করেন। লিভিংষ্টোন, ষ্টানলী, কার্ল পিটারস প্রভৃতি ভৌগোলিক অভিযাত্রীরা আফ্রিকার দুর্গম অঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়া এই সকল স্থান সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করেন। খ্রীষ্টান মিশনারী বা ধর্মযাজকগণ খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারের জন্য এই সকল দেশে ঢুকিয়া পড়েন। মিশনারীদের পিছু পিছু বণিকেরা অনুগমন করে। তাহারা সেই দেশে নিজ দেশের কলকারখানার মাল বিক্রয় আরম্ভ করে। বণিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য সেই দেশের সরকার আগাইয়া আসে। এই ভাবে আফ্রিকা, চীন প্রভৃতি দেশে উপনিবেশ স্থাপিত হয়। ক্রমে সেসিল রোডস, লর্ড ক্রোমার, লর্ড মিলনার, কার্ল পিটারস প্রভৃতি নেতা তাঁহাদের সংগঠনী শক্তি সাম্রাজ্য বিস্তারের কাজে নিয়োজিত করেন। এই সকল মিশ্রিত কারণে ঊনবিংশ শতকের শেষ ভাগে সাম্রাজ্যবাদ বা নব উপনিবেশবাদ জাগ্রত হয়। ইওরোপের এই সাম্রাজ্যবাদ "তরুণ গরুড়ের বিরাট ক্ষুধা" লইয়া এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশকে উদরস্থ করে। ফলে কয়েক শতাব্দীর জন্য এশিয়া, আফ্রিকাকে শোষণ করিয়া ইওরোপ নিজ শক্তি বৃদ্ধি করে। সাম্রাজ্যের অধিকার লইয়া ইওরোপীয় জাতিগুলি পরস্পর যুদ্ধে মত্ত হয়। এই কারণে এই যুগের ইতিহাসকে সাম্রাজ্যবাদের যুগ (Age of Imperialism) বলা হয়।

শিল্পনীতি ও সংগঠকগণের উদ্যম



লিভিংষ্টোন

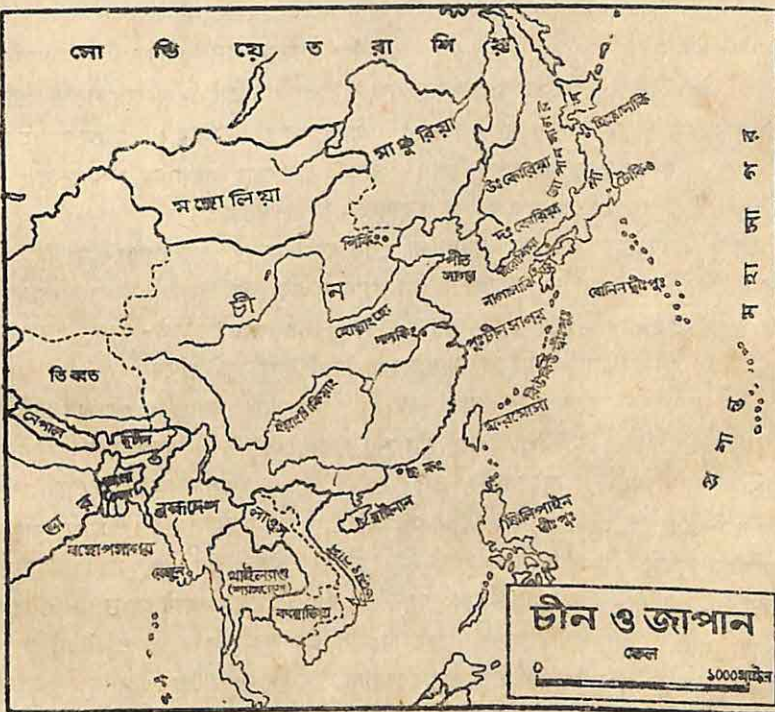
চীনে বৈদেশিক জাতির উপনিবেশ স্থাপন (Imperialist Aggressions on China)ঃ ভারতের ন্যায় চীনেও একটি বিশাল দেশ। ভারতের ন্যায় চীনও এক প্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকারী। মাঞ্চু রাজবংশের শাসনকালে মাঞ্চু সরকার চীনে বিদেশী জাতির অনুপ্রবেশ নিষিদ্ধ করেন। ইহার ফলে ইংরাজ প্রভৃতি বণিক জাতিগুলি চীনে অবাধ বাণিজ্য করিতে বাধা পায়। চীনের ভিতর ঢুকিতে না পারায় ইংরাজ প্রভৃতি জাতির বাণিজ্যের ক্ষতি হয়। মাঞ্চু সরকার চীনের বন্দরগুলির মধ্যে কেবলমাত্র ক্যাণ্টন (Canton) বন্দরটিতে পশ্চিমী বণিকগণকে মাল বিক্রয়ের অধিকার দেন। ক্যাণ্টনে নানা বাধা নিষেধের মধ্যে ইওরোপীয় বণিকদের কাজ করিতে

হয়। চীনের সর্বত্র ঢুকিয়া মাল বিক্রয় না করিতে পারায় পশ্চিমী বণিকেরা খুবই চটিয়া যায়। তাহারা চীনের মাঞ্চু সরকারকে শায়েস্তা করিবার ফন্দি খুঁজিতে থাকে। এবিষয়ে ইংরাজেরাই অগ্রণী ভূমিকা নেয়। ইতিমধ্যে মাঞ্চু সরকার ইংরাজ বণিকগণকে চীনে আফিম বিক্রী করিতে নিষেধাজ্ঞা দেন। ফলে ইংরাজের আফিম ব্যবসায়ে ভাঁটা পড়ে। ইংরাজ বণিকেরা ভারত হইতে আফিম লইয়া চীনে বিক্রয় করিত। ইহার বিনিময়ে চীন হইতে মূল্যবান সবুজ চা (Green Tea), রেশম প্রভৃতি কিনিত। এদিকে চীনের লোকেরা আফিম খাইবার অভ্যাস করিবার ফলে অকর্মণ্য হইয়া পড়ে। তাঁহারা মাথায় লম্বা বেণী রাখিয়া ও দিনরাত আফিম খাইয়া অধঃপাতের পথে চলিতে থাকে। এইজন্য মাঞ্চু সরকার আফিম বিক্রয় নিষিদ্ধ করেন। কিন্তু ইংরাজ বণিকেরা এই নিষেধ মানিতে রাজী ছিল না। তাহারা চোরাই পথে ক্যাণ্টন বন্দর হইতে চীনে আফিম চালান দিতে থাকে। ইহাতে মাঞ্চু সম্রাট বিরক্ত হইয়া ক্যাণ্টন বন্দরে ইংরাজ বাণিজ্য কেন্দ্রগুলি অবরোধ করিয়া আফিম বাজেয়াপ্ত করেন। আফিম অবরোধ ও ইংরাজের পতাকার প্রতি অসম্মানের অজুহাতে ইংলণ্ড চীনের বিরুদ্ধে ১৮৩৯ খ্রীঃ যুদ্ধ ঘোষণা করে। ইহাকে প্রথম ইঙ্গ-চীন যুদ্ধ বা অহিফেন যুদ্ধ (First Anglo-Chinese War or First Opium War) বলা হয়। ১৮৪২ খ্রীঃ নানকিং-এর সন্ধি দ্বারা এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। চীন তাহার উপকূলের ৫টি বন্দর ইংরাজ ও অন্য ইওরোপীয় জাতির বাণিজ্যের জন্য খুলিয়া দিতে বাধ্য হয়। এছাড়া আরও নানা প্রকার বাণিজ্যিক সুবিধা ও আমদানী মালের উপর ৫% শুল্ক ধার্য করিতে চীন বাধ্য হয়।

দক্ষিণ দিক হইতে ইংরাজ প্রভৃতি জাতি চীনে ঢুকিয়া পড়িলে উত্তর দিক হইতে রাশিয়ার জার সরকার চীনের ভূখণ্ড গ্রাস করিবার চেষ্টা করে। ১৮৫৩ খ্রীঃ আইগুনের সন্ধি (Treaty of Aigun) দ্বারা রাশিয়া মোঙ্গোলিয়ার একাংশ গ্রাস করে। ইতিমধ্যে চীনের সহিত ইংরাজ ও ফরাসীর বাণিজ্যিক বিরোধ পুনরায় দেখা দিলে দ্বিতীয় ইঙ্গ-চীন যুদ্ধ বাধে। মাঞ্চু সরকার পরাস্ত হইয়া ১৮৫৮ খ্রীঃ টিয়েণ্টসিনের সন্ধি (Treaty of Tientsin) স্বাক্ষর করে এবং ১৮৬১ খ্রীঃ পিকিং-এর সন্ধি (Treaty of Peking) স্বাক্ষর করে। ইংলণ্ড চীনের নিকট হইতে হংকং দ্বীপ, চীনের ১১টি বন্দরে বাণিজ্যের অধিকার এবং অতিরাষ্ট্রিক অধিকার (Exterritorial Right) পায়। ইংলণ্ডের পথ ধরিয়া ইওরোপের অন্য জাতিগুলি চীনের ভূখণ্ড গ্রাস করিতে আগাইয়া আসে। চীনের প্রতিবেশী জাপানও চীনের দিকে সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টি দেয়। জাপান একদা দুর্বল ও অনুন্নত দেশ ছিল। কিন্তু ১৮৬৮ খ্রীঃ পর বিভিন্ন সংস্কার ও পাশ্চাত্য প্রথায় শিল্প বিস্তার করিয়া জাপান প্রভূত শক্তিশালী হয়। চীনের সহিত জাপানের কোরিয়ার উপর অধিকার লইয়া বিরোধ বাধে। ১৮৯৪ খ্রীঃ চীন-জাপান যুদ্ধে চীন পরাস্ত হইলে ১৮৯৫ খ্রীঃ সিমনোসেকীর সন্ধি দ্বারা চীন জাপানকে মাঞ্চুরিয়ার একাংশ ও বাণিজ্যের জন্য নানা সুবিধা দিতে বাধ্য হয়। তরমুজকে কাটিয়া যেমন লোকে ভাগ করিয়া খায় সেইরূপ সাম্রাজ্যবাদীরা চীনা তরমুজকে কাটা (Chinese melon) আরম্ভ করে। এই পটভূমিকায় চীনে অন্তর্বিপ্লব দেখা দেয়।

চীনে অন্তর্বিপ্লব ও সংস্কার (Reform and Revolution in China) : তাইপিং বিপ্লব (Taiping Movement) : উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে চীনে, তাইপিং বিপ্লব নামে এক অন্তর্বিপ্লব ঘটে। তাইপিং (Taiping) কথাটির অর্থ হইল পবিত্র রাজ্য। চীনে লোকসংখ্যার বৃদ্ধি, ইয়াংসি নদীর বন্যার ফলে শস্যহানি, জনসাধারণের মধ্যে গভীর দারিদ্র এবং মাঞ্চু সরকারের দুর্নীতিপূর্ণ শাসন এই বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। এদিকে প্রথম ইঙ্গ-চীন যুদ্ধে শ্বেতকায় ইওরোপীয়গণের হাতে মাঞ্চু সরকারের পরাজয় ঘটিলে চীনাগণের জাতীয়তাবোধ উদ্দীপিত হয়। চীনা চিন্তাবিদগণ বুঝিতে পারেন যে মাঞ্চু

তাইপিং বিপ্লব



সরকারের দুর্বলতার জন্যই "শ্বেতকায় শয়তানগণ" (White Devils) চীনে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিয়াছে। সুতরাং মাঞ্চু সরকারকে সরাইয়া নূতন ধরণের রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন তাইপিং নেতাগণের মনে উদিত হয়।[১]

হুং-সিও চুয়ান (Hung Hsiu Chuan) নামক জনৈক ভাববাদী, সমাজতত্ত্বে পণ্ডিত ব্যক্তি তাই-পিং নামে একটি সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। হুং-এর চিন্তাধারায় প্রটেস্টান্ট ধর্মের প্রভাব ছিল বলিয়া অনেকে মনে করেন। হুং নিজেকে যীশুখ্রীষ্টের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া দাবী করিতেন। তিনি

তাই-পিং আদর্শ ও সংগঠন

১. Fairbank—A History of East Asian Civilisation. Vol II.

ঈশ্বরের সাক্ষাৎ ও তাঁহার প্রত্যাদেশ পাইয়াছেন বলিয়া দাবী করেন। হুং তাঁহার সম্প্রদায়ের সভ্যগণকে কমিউন প্রথায় সংঘবদ্ধ করেন। তিনি জলদস্যু, কয়েদী, অবসর-প্রাপ্ত সৈনিক, কৃষক প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর লোক লইয়া কঠোর শৃঙ্খলার দ্বারা তাই-পিং সেনাদল গঠন করেন। তাই-পিংগণের লক্ষ্য ছিল মাঞ্চু সরকারের পতন ঘটাইয়া তাই-পিং বা নূতন ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা। ১৮৫০ খ্রীঃ হুংয়ের সেনাদল মাঞ্চু সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। হুং নিজেকে "ঈশ্বরের আশীর্বাদপুত রাজা" বলিয়া ঘোষণা করেন। চীনের প্রায় ১৬টি প্রদেশে তাই-পিং বিদ্রোহ ছড়াইয়া পড়ে। আগ্নেয়াস্ত্রের অভাবে তাই-পিং সেনাদল পূর্ণ সাফল্য লাভ না করিলেও তাহারা চীনের দ্বিতীয় রাজধানী নানকিং শহর ১৮৫৩ খ্রীঃ অধিকার করে। চীনের অধিকৃত স্থানগুলিতে তাই-পিং শাসন ব্যবস্থা স্থাপিত হয়। তাই-পিং শাসনে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিলুপ্ত করা হয়। নারী ও পুরুষকে সমান অধিকার দেওয়া হয়। তাই-পিং সম্প্রদায়ের সভ্যদের কঠোর ব্রহ্মচর্য ও নিয়ম-শৃংখলা পালনের উপর জোর দেওয়া হয়। চীনে বৌদ্ধ মঠ ও মন্দির ধ্বংস করার আদেশ দেওয়া হয়। সকল মানুষের সমান অধিকারের কথা বলা হয়। তাই-পিং সম্প্রদায়কে তাই-পিং ভ্রাতৃসংঘ নাম দেওয়া হয়।

মাঞ্চু সরকারের নবগঠিত সেনাদল শেষ পর্যন্ত তাই-পিং বিদ্রোহকে দমাইয়া দেয়। তাই-পিংদের হাতে যথেষ্ট আগ্নেয়াস্ত্র না থাকায় এবং তাহারা আধুনিক যুদ্ধবিদ্যা না জানায় পরাস্ত হয়। ইওরোপীয় ব্যবসায়ীগণ বুঝিতে পারে যে তাই-পিংগণ সফল হইলে চীন হইতে সাম্রাজ্যবাদীরা বিতাড়িত হইবে। এজন্য মার্কিন সেনাপতি ওয়ার্ড (Ward) ও ইংরাজ সেনাপতি গর্ডন (Gordon) তাই-পিং বিদ্রোহীগণের বিরুদ্ধে চীন সরকারের সেনাদলকে পরিচালিত করেন।[১] যাহা হউক তাই-পিং বিদ্রোহের ফলে চীনের জাতীয় সম্পত্তির প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতি হয়। মাঞ্চু সরকারের কর আদায় খুবই কমিয়া যায়। মাঞ্চু সরকারের সামরিক দুর্বলতা সকলের নিকট স্পষ্ট হইয়া যায়। ইহার পর মাঞ্চু সরকারের বিরুদ্ধে চীনের বিভিন্ন প্রদেশে স্থানীয় বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। চীনে দলবদ্ধ গুণ্ডামি ও লুঠপাট বাড়িয়া যায়। সর্বোপরি মাঞ্চু সরকারের প্রতি দেশবাসীর ঘৃণা প্রকট হইয়া পড়ে। মোট কথা, তাই-পিং বিদ্রোহ একদিকে স্বৈরাচারী মাঞ্চু সরকারের পতনের সূচনা করে। অপরদিকে তাই-পিংগণের সাম্যবাদী আদর্শ চীনের জনগণের মনে নূতন আদর্শবাদ স্থাপন করে।

তাই-পিং বিদ্রোহ দমন

চীনে সামরিক সংস্কার ও পাশ্চাত্য ভাবধারার অনুপ্রবেশ (Reactions of Taiping Movement : Military Reforms and penetration of Western Ideas) : তাই-পিং বিদ্রোহীগণের বিরুদ্ধে ইংরাজ সেনাপতি গর্ডনের ইওরোপীয় কায়দায় শিক্ষিত সেনাদলের সাফল্য চীনের মাঞ্চু সরকারের নজরে পড়ে। ইহার ফলে মাঞ্চু সরকার আধুনিক সেনাদল ও নৌবাহিনী গঠনের জন্য সিদ্ধান্ত নেয়। মাঞ্চু সরকার বুঝিতে পারে যে সেনাদলকে আধুনিক যুদ্ধের

১. Vinacke—History of Far East in Modern Times.

কৌশল না শিখাইলে বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে চীন আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না। চীনের নবনেতা লি হাং চাং (Li Hung Chang) চীনের নব সেনাদল (New Army) গঠনের জন্য প্রচেষ্টা চালান। কিন্তু মাঞ্চু সরকারের অর্থাভাব ও চীনা সেনাপতিগণের বৈদেশিক ভাবধারার প্রতি বিদ্বেষ এই প্রচেষ্টাকে বিফল করিয়া দেয়। মাঞ্চু সরকার যোগাযোগের উন্নতির জন্য চীনে রেলপথ নির্মাণ আরম্ভ করেন। কিন্তু প্রাচীনপন্থী সরকারী কর্মচারীগণের বিরোধিতায় রেলপথ নির্মাণ বন্ধ হয়। ক্ষিপ্ত জনসাধারণ রেলপথগুলিকে উপড়াইয়া ফেলে।[১] জনসাধারণ মনে করে যে এই রেলপথ ধরিয়া বিদেশীরা চীনের ভিতর ঢুকিয়া পড়িবে। মাঞ্চু সরকারও প্রদেশগুলির স্বায়ত্ব শাসন নষ্ট করিয়া কেন্দ্রের অধিকার বাড়াইবে। কিন্তু আধুনিক ভাবধারার গতিবেগকে ঠেকাইয়া রাখা চীনা পুরাতনপন্থীগণের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। লি হাং চাং-এর চেষ্টায় দক্ষিণ চীনে টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা চালু হয়। চীনে ১৮৭৩ খ্রীঃ বাষ্পীয়পোতে যাত্রী ও মাল বহন আরম্ভ হয়। হান-ইয়াং লৌহ কারখানা ১৮৯০ খ্রীঃ স্থাপিত হয়। চীনা ছাত্রগণ ইওরোপের বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠন-পাঠনের জন্য যাত্রা করে। চীনের আধুনিকীকরণের প্রধান পুরোহিত ছিলেন লি-হাং-চাং। তবে আধুনিক ভাবধারা চীনের মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোকের মধ্যে সীমিত থাকে। সমগ্র জাতির জীবনে তখনও প্রাচীন অন্ধবিশ্বাস, অহমিকা ও কুসংস্কার শিকড় গাড়িয়া থাকে। তবুও আধুনিক চীনের স্রষ্টা হিসাবে লি হাং চাং-এর নাম স্মরণযোগ্য। তবে চীনের যথোপযুক্ত সংস্কার ও অগ্রগতি করা সম্ভব হয় নাই। এই কারণে চীন-জাপান যুদ্ধে ক্ষুদ্র জাপানের নিকট চীন পরাস্ত হয়।

চীনে আধুনিক সংস্কার আন্দোলন লি হাং চাং

একশত দিনের সংস্কার : কাং ইউ ওয়ে (Hundred Days of Reform : Kang yu-wei) : চীন-জাপান যুদ্ধে, ১৮৯৪ খ্রীঃ দৈত্যের ন্যায় আকৃতি বিশাল চীন, বামনের ন্যায় ক্ষুদ্রকায় জাপানের নিকট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। চীনের প্রাচীনপন্থী নেতাগণ এতকাল চীনে যাহা কিছু চলিতেছে সবই ভাল মনে করিতেন। পাশ্চাত্য বা আধুনিক ভাবধারাকে ঘৃণা করিতেন। এই কারণে তাঁহারা চীনে আধুনিক সংস্কারের ঘোর বিরোধিতা করেন। কিন্তু জাপানের হাতে পরাজয়ের পর চীনের রক্ষণশীলগণের আত্মবিশ্বাস টলিয়া যায়। মাঞ্চু সম্রাটের দরবারে তাহাদের প্রভাবও কমিয়া যায়। এই সময় কাং-ইউ-ওয়ে (Kang yu-wei) নামক এক চিন্তাবিদ ও দেশপ্রেমিক ব্যক্তি চীনে আধুনিক সংস্কার প্রবর্তনের জন্য সম্রাটের নিকট একটি স্মারকপত্র পাঠান। কাং তাঁহার স্মারকপত্রে স্মরণ করাইয়া দেন যে চীনের শাসন ব্যবস্থা ও আইন ব্যবস্থা একান্তই অচল ও যুগের অনুপযোগী হইয়া পড়িয়াছে। ইহাকে মেরামত না করিলে চীনের স্বাধীনতা বিপন্ন হইবে।[২] কাং-ইউ-ওয়ে তাঁহার প্রস্তাবিত সংস্কারের সমর্থনে কনফুসিয়াসের দর্শনের যে নব ব্যাখ্যা করেন তাহা বিশেষ মনোগ্রাহী হয়। কং বলেন যে চীনে যে

কাং-ইউ-ওয়ের মতামত

১. Vinacke.

২. Quoted by Fairbank.

সংস্কারই করা হউক না কেন, তাহা সরকারের মাধ্যমে করিতে হইবে। সরকারকে বাদ দিয়া কোন সংস্কার প্রবর্তন করা সম্ভব হইবে না। চীন সম্রাট কোয়াং সু (Kwang Tsu) কাং-এর আদর্শে প্রভাবিত হন।

কোয়াং সুর সংস্কার-সমূহ

একশত দিন ধরিয়া (Hundred Days) বিভিন্ন আদেশনামার দ্বারা চীন সম্রাট কোয়াং সু একের পর এক কাং-এর প্রস্তাবিত সংস্কারগুলিকে কার্যকরী করার আদেশ দেন। (১) পুরাতন ছয়টি পরিষদ (Six Boards) ভাঙিয়া দেওয়া হয়। (২) ক্যাবিনেট প্রথা অনুযায়ী এক একটি দপ্তরের জন্য এক এক জন মন্ত্রী দায়িত্ব পায়। সকল মন্ত্রীকে যৌথভাবে নীতি স্থির করিতে বলা হয়। (৩) সরকারী কাজ চালাইবার জন্য দক্ষ প্রশাসক নিয়োগের আদেশ দেওয়া হয়। (৪) সম্রাট ও জনগণের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য জাতীয় সভা (Parliament) আহ্বানের কথা বলা হয়। (৫) স্থানীয় সমস্যার সমাধানের জন্য স্থানীয় সমিতি নিয়োগের আদেশ দেওয়া হয়। (৬) শিক্ষার উন্নতির জন্য আধুনিক ধরণের বিদ্যালয় স্থাপনের ব্যবস্থা হয়। (৭) পুরাতন পরীক্ষা ব্যবস্থা লোপ করা হয়। (৮) আইনগুলিকে ঢালিয়া সাজাইবার জন্য কমিশন নিয়োগ করা হয়। (৯) সেনাদলকে আধুনিক যুদ্ধবিদ্যা ও অস্ত্রে সজ্জিত করার আদেশ দেওয়া হয়।

রক্ষণশীল আঘাত : সংস্কার আন্দোলনের বিফলতা

একশত দিবসের প্রগতিশীল সংস্কারের ফলে চীনে পুরাতনতন্ত্র ধ্বসিয়া পড়ার উপক্রম হয়। ইহার ফলে পুরাতনপন্থীগণের মধ্যে বিক্ষোভের ঝড় উঠে। সম্রাট কোয়াং সু ছিলেন পরলোকগত মাঞ্চু সম্রাটের বিধবা পত্নী জু-সির (Tzu hsi) দত্তক পুত্র। জু-সি বার্ধক্য হেতু অবসর গ্রহণ করিয়া কোয়াং সুকে সকল ভার দেন। জু-সি ছিলেন গোঁড়া রক্ষণশীল। তিনি নবীন সম্রাট কোয়াং সুর আধুনিক সংস্কার ঘোর অপছন্দ করেন। পুরাতনপন্থীরা সম্রাজ্ঞী জু-সির সমর্থন পাইয়া সেনাপতি জুংলুর সহায়তায় সম্রাট কোয়াংসুকে বন্দী করে। জু-সির আদেশে কোয়াং সুর সকল সংস্কার নাকচ করা হয়। চীনে পুরাতনতন্ত্র পুনরায় ফিরিয়া আসে। কোয়াং সু তাহার সংস্কারগুলি একশত দিন ধরিয়া (১১ই জুন—২১শে সেপ্টেম্বর ১৮৯৮ খ্রীঃ) চালান বলিয়া ইহাকে "একশত দিবসের সংস্কার" (Hundred days of Reform) বলা হয়। জনমতকে গঠন না করিয়া হঠাৎ সংস্কারের চেষ্টা করিয়া কোয়াং সু বিফল হন। কিন্তু একশত দিবসের সংস্কার বিফল হইলেও ইহা স্পষ্ট হইয়া যায় যে চীনে পুরাতনতন্ত্র আর বেশীদিন চলিবে না।

বক্সার বিদ্রোহ, ১৮৯৯ খ্রীঃ (Boxer Movement) : চীন-জাপান যুদ্ধে (১৮৯৪—৯৫ খ্রীঃ) চীনের শোচনীয় পরাজয়ের পর সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিমী শক্তিগুলি চীনকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাগ করিয়া লইতে উদ্যত হয়। ইহার ফলে চীনের স্বাধীনতা বিপন্ন হইয়া পড়ে। এদিকে চীনের বেশ কিছু লোক খ্রীষ্টান মিশনারীদের প্রভাবে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে। খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত চীনাগণের বিলাতী চালচলনের ফলে চীনের

চিরাচরিত ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থা বিপন্ন হইয়া পড়ে। খ্রীষ্টান মিশনারীগণের প্রভাবে দলে দলে চীনা নাগরিকগণ খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিতে আরম্ভ করে। ইহাতে চীনা খ্রীষ্টান-গণের বিরুদ্ধে সাধারণ চীনাদের আক্রোশ বাড়ে। ইতিমধ্যে ইয়াংসি নদীর বন্যায় লক্ষ লক্ষ লোক বাস্তুহারা হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। এই সকল বাস্তুহারা লোকেরা সবকিছু লণ্ডভণ্ড করিয়া দিতে ব্যগ্র হয়। ইহারা ক্রমে বক্সার বিপ্লবে যোগ দেয়। চীনের বন্দরগুলি বিদেশী বাণিজ্যের জন্য খুলিয়া দিলে চীনের বাজার সস্তা দরের বিলাতী কাপড় ও বিলাতী জিনিষ ছাইয়া ফেলে। ফলে চীনের তাঁতি ও কারিগর শ্রেণীর হাতে তৈয়ারী জিনিষ লোকে না কিনিয়া সস্তা বিলাতী মাল কিনিতে থাকে। ইহার ফলে চীনের তাঁতি ও কারিগরেরা বেকার হইয়া পড়ে। জীবিকা অর্জনের রাস্তা না থাকায় এই শ্রেণীর লোকেরাও বিদ্রোহী হইয়া পড়ে। চীনের এই দুঃখ-দুর্দশার জন্য বহু চৈনিক দেশপ্রেমিক বৈদেশিক আক্রমণ-কারীগণকেই দায়ী করে। এইভাবে চীনে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীগণের বিরুদ্ধে চেতনা জাগিয়া উঠে। বক্সার আন্দোলনের একটি প্রধান কারণ ছিল বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া (anti foreign feeling)।

বক্সার বিদ্রোহের কারণ

১৮৯৮ খ্রীঃ চীনে একটি গুপ্ত সমিতি জনপ্রিয় হইয়া উঠে। ইহার নাম ছিল আই-হো-চুয়ান (I-ho-chuan)। চীনা ভাষায় "চুয়ান" শব্দটির অর্থ "মুষ্টি যুদ্ধ"। আই-হো-চুয়ান সমিতির যাহারা সভ্য হইত তাহাদের প্রাচীন নিয়ম অনুযায়ী শৃংখলার সহিত মুষ্টিযুদ্ধ শিক্ষা করিতে হইত। ইওরোপীয় লেখকগণ এইজন্য এই সমিতির সভ্যগণকে "মুষ্টিযোদ্ধার সমিতি" বলিত। মুষ্টিযোদ্ধার ইংরাজী প্রতিশব্দ হইল "বক্সার" (Boxer)। ১৮৯৯ খ্রীঃ বিদ্রোহে যেহেতু আই-হো-চুয়ান সমিতি বা বক্সার সমিতি প্রধান ভূমিকা নেয় সেজন্য এই বিদ্রোহকে বক্সার বিদ্রোহ বলা হয়। আই-হো-চুয়ান সমিতির গোড়ার দিকে প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দুর্নীতিগ্রস্ত মাঞ্চু সরকারকে তাড়াইয়া দেওয়া এবং দেশকে বৈদেশিক কবল হইতে মুক্ত করা। তাহাদের ধ্বনি ছিল "চিং বা মাঞ্চুদের উচ্ছেদ কর ঃ মিং বা বিদেশীদের ধ্বংস কর।"[১]

বক্সার সমিতি গঠন

বক্সারগণ গোড়ার দিকে তিনটি আদর্শ অনুসরণ করে ; যথা, চীনে খ্রীষ্টান ধর্মের প্রসারে বিরোধিতা করা, চীনে বিদেশী জাতির উচ্ছেদ করা ও মাঞ্চু রাজবংশের উচ্ছেদ করা।[২] কিন্তু মাঞ্চু সাম্রাজ্ঞী জু-সি বক্সারগণকে সমর্থন করায় বক্সার আন্দোলন মাঞ্চু সরকারের বিরোধিতায় নিরস্ত থাকে। জু-সি কূটনৈতিক দক্ষতার সহিত বক্সারগণকে চীন সরকারের মিলিশিয়া বা নাগরিক সেনাদলের মর্যাদা দেন। তিনি বক্সার আন্দালনকে কৌশলে বৈদেশিক আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে লেলাইয়া দেন। ইহার ফলে বক্সার আন্দোলন প্রধানতঃ খ্রীষ্টান ও বৈদেশিকগণের বিরুদ্ধেই পরিচালিত হয়। বক্সার আন্দোলনের সময় মাঞ্চু সরকার দুমুখো নীতি নেন। উত্তর চীনে তাঁহারা বক্সারগণের সহিত হাত মিলাইয়া বিদেশীয়গণের বিরোধিতা করেন।

বক্সার বিদ্রোহের বিস্তার

১. "Overthrown the Ching, destroy the Ming or foreigner."
২. "Anti-foreign, anti-Christian and anti-Manchu." Littomore—Modern China.

দক্ষিণ চীনে মাঞ্চু সরকার খোলাখুলিভাবে ইওরোপীয়গণের বিরোধিতা না করার নীতি নেন। দক্ষিণ চীনে মাঞ্চু সরকার এইরূপ ধারণার সৃষ্টি করেন যে তাঁহারা বক্সারগণকে সংযত রাখিবার চেষ্টা করিয়াও বিফল হইয়াছেন। এই দুমুখো নীতির ফলে মাঞ্চু সরকারের প্রতি ইওরোপীয়গণের আক্রোশ কম হয়।

বক্সার বিদ্রোহীগণ বহু খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী চীনাকে হত্যা করে। তাহারা চীনা রাজধানী পিকিং-এ বৈদেশিক দূতাবাসগুলি অবরোধ করে। বহু বিদেশী খ্রীষ্টান মিশনারীও তাহাদের হাতে নিহত হন। মাঞ্চু সরকার বক্সারদের দমনের আন্তরিক চেষ্টা না করায় ইওরোপীয় শক্তিগুলি শেষ পর্যন্ত নিজ নিজ সেনার দ্বারা বক্সার আন্দোলন দমনে সিদ্ধান্ত নেয়। আটটি ইওরোপীয় জাতির সম্মিলিত সেনাদল জার্মান সেনাপতি ফন ওভালডারজির (Von Waldersee) নেতৃত্বে পিকিং-এ প্রবেশ করে। ইওরোপীয় সেনাদল বক্সার বিদ্রোহীগণকে সহজে দমন করে। ইহার পর বিজয়ী ইওরোপীয় শক্তিগুলি মাঞ্চু সরকারের উপর বক্সার শর্তাবলী, ১৯০১ খ্রীঃ (Boxer Protocol) চাপাইয়া দেয়। (১) দশজন উচ্চপদস্থ চীনা কর্মচারীর প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। (২) চীন সরকারকে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে এবং ৩৩৩ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। (৩) চীনের বন্দরগুলিতে আমদানী, রপ্তানী শুল্ক ৫% করিতে হয়। (৪) চীনের অভ্যন্তরে বৈদেশিকগণের নিরাপদে ও স্বাধীনভাবে যাতায়াতের অধিকার স্বীকার করা হয়।

বক্সার বিদ্রোহ দমন ও বক্সার সন্ধি স্থাপন

ডাঃ সান ইয়াৎ সেন : প্রজাতান্ত্রিক বিপ্লব (১৯১১ খ্রীঃ) : মাঞ্চু সরকারের পতন (Dr. Sun yat Sen : Republican Revolution of 1911 and the fall of the Manchus) :

প্রথম চীন-জাপান যুদ্ধের পর মাঞ্চু সরকারের শক্তি দ্রুত ক্ষয় পাইতে থাকে। চীনের প্রগতিবাদী সম্রাট কাং সুর একশত দিনের সংস্কার প্রচেষ্টা (Hundred Days of Reform) বিফল হইলে এই সরকারের দুর্বলতা আরও বাড়ে। ফলে মাঞ্চু সরকারের বিরুদ্ধে সংস্কারপন্থী বিক্ষোভ দানা বাঁধিতে থাকে। সংস্কারপন্থীগণের আশা ছিল যে বৃদ্ধা সম্রাজ্ঞী জু-সির মৃত্যুর পর উদারপন্থী সম্রাট কোয়াং সু পুনরায় সিংহাসনে বসিলে চীনে আধুনিক শাসন সংস্কার প্রচলন করা সম্ভব হইবে। কিন্তু ১৯০৮ খ্রীঃ রহস্যজনকভাবে কোয়াং সুর মৃত্যু ঘটিলে সংস্কারপন্থীগণের আশা নির্মূল হয়। ইহার অল্প দিন পরে বৃদ্ধা সম্রাজ্ঞী জু-সিরও মৃত্যু ঘটে। জু-সি ছিলেন মাঞ্চু রাজবংশের শেষ শক্তিশালী শাসিকা। সাধারণ লোক তাঁহাকে ভয় ও ভক্তি করিত। লোকে তাঁহাকে "প্রাচীনা বুদ্ধ" (Old Buddha) নাম দিয়াছিল। জু-সির মৃত্যুর পর এক নাবালক মাঞ্চু সিংহাসনে বসিলে উপযুক্ত শাসকের অভাবে এই রাজবংশের পতন ঘনাইয়া আসে। মাঞ্চু দরবারে অভিজ্ঞ ও উপযুক্ত মন্ত্রী ও নেতারও অভাব দেখা দেয়।

কোয়াং সু ও জু-সির মৃত্যু

চীনের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে দেশে খাদ্যাভাব, দারিদ্র্য ও চুরি-ডাকাতির সংখ্যা বাড়িয়া যায়। তাছাড়া ১৯১০-১১ খ্রীঃ এক ভয়াবহ বন্যায় বহু লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

জনসাধারণের দুঃখকষ্ট বৃদ্ধির ফলে লোকের ধারণা হয় যে "ঈশ্বরের, যে প্রত্যাদেশ (Mandate of heaven) অনুযায়ী মাঞ্চু বংশ শাসন করে, ঈশ্বর মাঞ্চু বংশের উপর হইতে সেই প্রত্যাদেশ তুলিয়া লইয়াছেন।" বিপ্লবীগণ জনসাধারণের এই অন্ধ বিশ্বাসকে মাঞ্চু সরকারের বিরুদ্ধে কাজে লাগায়।[১] ফলে জনসাধারণ এই সরকারের প্রতি আস্থা হারাইয়া ফেলে। চীন-জাপান যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের অর্থ, বক্সার বিদ্রোহের ক্ষতিপূরণের অর্থ মিটাইতে মাঞ্চু সরকারের রাজকোষ শূন্য হইয়া যায়। সুতরাং অর্থাভাব মিটাইবার জন্য মাঞ্চু সরকার জনসাধারণের উপর করের বোঝা বাড়াইলে লোকে ক্ষেপিয়া যায়। এই সুযোগে 'বিপ্লবী' সংবাদপত্রগুলি মাঞ্চু সরকারের বিরুদ্ধে জনসাধারণের নিকট প্রচার চালায়। বিপ্লবী সংবাদপত্রগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ছিল সান-ইয়াৎ-সেনের পত্রিকা মিন-পাও (Min-Pao) প্রভৃতি।

লোকসংখ্যা বৃদ্ধি ও চিং সরকারের জনপ্রিয়তা হ্রাস

চীনের নিকট প্রতিবেশী জাপানের অসাধারণ অগ্রগতি চীনা জাতীয়তাবাদীগণকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। আধুনিক জাপানের সামরিক শক্তি ও সম্পদ তাহাদের চোখ ধাঁধাইয়া দেয়। ফলে চীনা জাতীয়তাবাদীগণ মনে করে যে জাপানের ন্যায় চীনে আধুনিক সংস্কার প্রবর্তন করিলে চীন শক্তিশালী হইবে। যেহেতু মাঞ্চু সরকার ছিল আধুনিক সংস্কারের বিরোধী, সেহেতু এই সরকারের পতন ঘটাইতে তাহারা কৃত-সংকল্প হয়। মাঞ্চু সরকার দ্বারা চীন হইতে বিতাড়িত চীনা জাতীয়তাবাদীগণ জাপানে আসিয়া সমবেত হয়। চীনের যে সকল ছাত্র জাপানে পড়িবার জন্য আসে তাহারাও ইহাদের সহিত যোগ দেয়। এইভাবে জাপান চীনা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ঘাঁটিতে পরিণত হয়। ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেন জাপানে সমবেত নির্বাসিত চীনা জাতীয়তাবাদীগণকে সংগঠিত করিয়া প্রজাতান্ত্রিক আদর্শে দীক্ষিত করেন। ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেনকেই এজন্য আধুনিক চীনের জনক বলা হয়।

বিদেশী চীনা ছাত্রগণের আদর্শবাদ

চীনের শিয়াং-শান (Hsiang-shan) প্রদেশে সান-ইয়াৎ-সেনের (১৮৬৬ খ্রীঃ) জন্ম হয়। ডাঃ সানের পিতা ছিলেন সম্পন্ন কৃষক এবং তাঁহার কাকা ছিলেন তাই-পিং বিদ্রোহের অন্যতম নেতা। সান-ইয়াৎ-সেন হনলুলুতে ইংরেজী বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। হনলুলুতে থাকিবার সময় পাশ্চাত্য সভ্যতার উৎকর্ষ তিনি নিজ চক্ষে দেখেন। যৌবনে তিনি খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি হংকং-এর মেডিক্যাল কলেজে রসায়ন ও চিকিৎসা শাস্ত্র পড়েন। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িবার সময়ে স্বদেশের অধঃপতনের জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। চীনকে নব গৌরবে জাগাইবার জন্য তিনি প্রতিজ্ঞা নেন। ডাঃ সানের মনে স্বদেশের প্রতি ভালবাসার যে অংকুর জাগিয়াছিল তাহা তাঁহাকে বিপ্লবী জীবনের পথেই ঠেলিয়া দেয়। তিনি উপলব্ধি করেন যে প্রাচীনপন্থী মাঞ্চু সরকারের উচ্ছেদ না করিলে চীনের জনগণের মুক্তির সম্ভাবনা নাই। তিনি ট্রিয়াড সমিতি (Triad Society) নামে এক গুপ্ত

সান-ইয়াৎ-সেনের নেতৃত্ব

১. Vinacke—History of the Far East.

বিপ্লবী সমিতির সংস্পর্শে আসেন। তিনি মাঞ্চু সরকারের উচ্ছেদের জন্য ১৮৯৫ খ্রীঃ পর বারংবার বিদ্রোহ ঘটান। কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টাই বিফল হয়। মাঞ্চু সরকারের ভয়ে ডাঃ সান শেষ পর্যন্ত চীন হইতে পলাইয়া জাপানে আশ্রয় নেন।

ডাঃ সান আমেরিকা এবং ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ ঘুরিয়া প্রভূত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। তিনি বিদেশে বসবাসকারী চীনাগণকে জাতীয়তাবাদী মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া বিপ্লবী দলের শক্তি বাড়ান। জাতীয়তাবাদী চীনাগণ যাহাতে মতবিরোধের দরুণ দুর্বল না হইয়া পড়ে এজন্য তিনি সর্বসাধারণের গ্রহণযোগ্য এক অনুপ্রেরণামূলক মতবাদ প্রচার করেন। ইহার নাম ছিল "জনসাধারণের তিন নীতি" বা সান-মিন-চু-আই (San-min-chu-i)। এই তিনটি নীতি ছিল, (১) "জনসাধারণের জীবিকার ব্যবস্থা, (২) গণ জাতীয়তাবাদ ও (৩) জনগণতন্ত্র" (Peoples' livelihood, Peoples' nationalism, Peoples' democracy)। ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেনের তিনটি নীতি চীনের দেশপ্রেমিকগণের মনে গভীর সাড়া জাগায়। চীনা ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলি ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেনের ভাবধারা চীনে প্রচার করে। ডাঃ সানের সম্পাদিত পত্রিকা মিন পাও (Min Pao) এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা নেয়। এইভাবে ডাঃ সান চীনের জাতীয়তাবাদের প্রাণপুরুষে পরিণত হন। ইতালীর মুক্তি আন্দোলনে ম্যাৎসিনী যেরূপ প্রেরণা দেন ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেন চীনে সেই রূপ প্রেরণা সঞ্চার করেন।

সান-মিন-চু-আই মতবাদ



সান-ইয়াৎ-সেন

টুং-মেং-হুই দল গঠন

জাপানে বসবাসকারী চীনা জাতীয়তাবাদীগণকে লইয়া ডাঃ সান, টুং-মেং-হুই (Tung-meng-hui) বা সম্মিলিত সংঘ নামে এক দল (১৯০৫ খ্রীঃ) গঠন করেন। ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেন এই দলের প্রধান কর্মকর্তার পদ নেন। টুং-মেং-হুই চীনের জনসাধারণের মধ্যে জাতীয়তাবাদ, প্রজাতন্ত্র ও আধুনিক সংস্কারের বাণী ছড়াইয়া দেয়।

রেলপথ নির্মাণ সমস্যা ও প্রাদেশিক সরকারের বিরোধিতা উচাং বিদ্রোহ; প্রজাতন্ত্র স্থাপন

এদিকে মাঞ্চু সরকার চীনের রেলপথগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে আনিতে চাহিলে প্রাদেশিক শাসন পরিষদগুলির সহিত মাঞ্চু সরকারের গভীর মতভেদ হয়। প্রাদেশিক পরিষদগুলি মনে করিত যে রেলপথ কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে গেলে কেন্দ্রীয় সরকার ইওরোপীয় কোম্পানী-গুলিকে রেলপথের ইজারা দিয়া দিবেন। ফলে চীনে বিদেশী শোষণ বাড়িবে। তাছাড়া কেন্দ্রের হাতে রেলপথ গেলে প্রদেশের উপর কেন্দ্রের চাপ বাড়িবে। এজন্য প্রাদেশিক সভাগুলি প্রাদেশিক সরকারের হাতে স্থানীয় রেলপথের দায়িত্ব দেওয়ার দাবী জানায়। প্রাদেশিক সভাগুলি কেন্দ্রের উপর চাপ সৃষ্টির

জন্য কেন্দ্রীয় সভা বা পার্লামেণ্ট আহ্বানের দাবী জানায়। কেন্দ্রীয় সরকার প্রদেশগুলির বিরোধিতা দমনের জন্য পুলিশী নির্যাতন আরম্ভ করে। ইহার প্রতিবাদে চীনের সে-চুয়ান প্রদেশে ব্যাপক ধর্মঘট ও বিদ্রোহ দেখা দেয়। ইতিমধ্যে টুং-মেং-হুই দল ডাঃ সানের নির্দেশে সরকারী সেনাদলের একাংশকে মাঞ্চু সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষেপাইয়া তুলে। উচাং শহরের সেনাদল ১৯১১ খ্রীঃ মাঞ্চু সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে এই বিদ্রোহ দেশের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। এই সুযোগে ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেনপন্থী বিপ্লবীগণ নানকিং শহরে বিকল্প প্রজাতান্ত্রিক সরকার স্থাপন করেন। ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেন ইহার অস্থায়ী সভাপতি হন। এই বিদ্রোহী প্রজাতন্ত্রকে দমনের জন্য মাঞ্চু সরকার অবসরপ্রাপ্ত সেনাপতি যুয়ান-সি-কাইকে পাঠান। কিন্তু সেনাপতি যুয়ান-সি-কাই বিপ্লবী সরকারের সহিত হাত মিলান। যুয়ান-সি-কাইকে বিপ্লবী প্রজাতন্ত্রী সরকারের রাষ্ট্রপতির পদ দেওয়া হইলে তাঁহার অধীনস্থ সেনাদল তাঁহার নির্দেশে মাঞ্চু সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। এই বিপ্লবের আঘাতে শেষ পর্যন্ত মাঞ্চু রাজবংশের পতন ঘটে। চীনে (১৯১১ খ্রীঃ) প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়। ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেন স্বেচ্ছায় রাষ্ট্রপতির পদ ত্যাগ করিয়া যুয়ান-সি-কাইকে সেই পদে বসান। ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেনের আত্মত্যাগ ও জীবন সাধনার ফলেই প্রজাতন্ত্রী চীনের জন্মলাভ সম্ভব হয়।

চীনের নূতন প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি যুয়ান-সি-কাই গণতন্ত্রের বদলে সামরিক ডিক্টেটরশিপ স্থাপন করিলে বিপ্লবীগণ হতাশাগ্রস্ত হইয়া পড়েন। কারণ ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেনের জনগণতন্ত্রের আদর্শ ইহার ফলে অপূর্ণ থাকে। চীনে প্রকৃত গণতন্ত্র স্থাপনের জন্য যুয়ান-সি-কাইয়ের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় একটি বিপ্লবের দরকার হয়। দ্বিতীয় বিপ্লব সফল করিবার জন্য ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেন কুয়োমিন তাং বা চীনা জনসাধারণের দল নামে একটি নূতন রাজনৈতিক দল গঠন করেন। এই দলের সাহায্যে দক্ষিণ চীনে একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র গঠন করা হয়। ডাঃ সান চীনে রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপন করিয়া বৈদেশিক শক্তিগুলি চীনের উপর যে শোষণমূলক সন্ধি স্থাপন করিয়াছিল তাহা নাকচ করার চেষ্টা করেন। এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য তিনি সোভিয়েত রাশিয়ার সাহায্য গ্রহণে দ্বিধা করেন নাই। রাশিয়ার সহায়তা লইবার ফলে চীনা কমিউনিষ্টগণও ডাঃ সানের সহযোগিতা করেন। রুশ বিপ্লবী বোরোডীন ও গ্যালেনস ডাঃ সানের পরামর্শদাতার কাজ করেন। কিন্তু ১৯২৫ খ্রীঃ ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেনের মৃত্যু হইলে তাঁহার আরব্ধ কার্য অসমাপ্ত থাকে। ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেন তাহার মৃত্যুকালীন উইলে বলেন যে "এখনও সান-মিন-চু-আই লাভ হয় নাই। এজন্য জনসাধারণকে কাজ করিতে হইবে।" যাহা হউক তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কুয়োমিন-তাং প্রজাতন্ত্রের অধীনে নবীন চীনের জন্মলাভ হয়।

দ্বিতীয় বিপ্লব : ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেনের কৃতিত্ব

কুয়োমিন-তাং রাজত্ব ও চীনে কম্যুনিষ্ট বিপ্লব (Kuomin-tang Regime and the Communist Revolution in China) : ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেনের মৃত্যুর পর তাঁহারই অনুচর মার্শাল চিয়াং-কাই-শেক (Chiang-Kai-Shek) কুয়োমিন তাং সরকারের রাষ্ট্রপতির পদলাভ করেন। মার্শাল চিয়াং ধীরে ধীরে

চীনের ক্ষমতা-লোভী সেনাপতিগণকে দমন করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের শক্তি বৃদ্ধি করেন। চীনের দুই রাজধানী নানকিং ও পিকিং তিনি অধিকার করেন। ইহার ফলে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির পতন ঘটে। কিন্তু চীনের কমিউনিষ্টগণের সহিত মার্শাল চিয়াং-এর মতবিরোধ ঘটে। চীনা কমিউনিষ্টগণ মাও-সে-তুং, চু-তে প্রভৃতির নেতৃত্বে চীনের কৃষক শ্রেণীকে সংঘবদ্ধ করিয়া চীনে জমিদার শ্রেণীর একাধিপত্য নষ্ট করিবার কথা বলেন। তাঁহারা দরিদ্র ভূমিহীন কৃষকগণকে জমিদারগণের উদ্বৃত্ত জমি দখলে উৎসাহ দেন। মার্শাল চিয়াং, ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেনের আদর্শ ভুলিয়া অভিজাত ও বুর্জোয়াগণের পক্ষ নেন। তিনি চীনা কমিউনিষ্টগণের ভূমি নীতির ঘোর বিরোধিতা করেন। ইহার ফলে কুয়োমিন তাং-এর সহিত কমিউনিষ্টগণের সংঘর্ষ বাধে। চীনের এই অন্তর্বিরোধের সুযোগে সাম্রাজ্যবাদী জাপান মাঞ্চুরিয়া অধিকার (১৯৩১ খ্রীঃ) করিয়া ক্রমে উত্তর চীনে ঢুকিয়া পড়ে।

চীনে গৃহযুদ্ধ



চিয়াং-কাই-শেক

কুয়োমিন তাং সরকারের রাষ্ট্রপতি মার্শাল চিয়াং আক্রমণকারী জাপানকে বাধাদান না করিয়া সর্বাগ্রে চীনা কমিউনিষ্টগণকে দমন করার সংকল্প নেন। তিনি তাঁহার এই নীতির নাম দেন "জাতীয় ঐক্য স্থাপন নীতি"।[১] কিন্তু কুয়োমিন তাং ও কমিউনিষ্টগণ যাহাতে একযোগে বহিঃশত্রুকে বাধা দেয় এজন্য জনমতের দাবী প্রবল হইয়া উঠে। চীনের জনমতের চাপে মার্শাল চিয়াং তাঁহার নীতি পাল্টাইতে বাধ্য হন। শেষ পর্যন্ত মার্শাল চিয়াং-এর সহিত চীনা কমিউনিষ্টগণের সিয়ান চুক্তি ১৯৩৬ খ্রীঃ সম্পাদিত হয়। ইহার দ্বারা কুয়োমিন তাং ও কমিউনিষ্ট মিলিয়া যৌথভাবে জাপানকে বাধাদানের নীতি নেওয়া হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন চীনকে জাপানের বিরুদ্ধে প্রভূত অস্ত্রশস্ত্র সাহায্য দেয়। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়। জাপান ছিল আমেরিকা ও চীন উভয়ের শত্রু। সুতরাং চীনে জাপানী আক্রমণ ঠেকাইবার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কুয়োমিন তাং সরকারকে প্রভূত অস্ত্র সাহায্য দেয়।

কুয়োমিন তাং ও কমিউনিষ্ট মৈত্রী

এদিকে কুয়োমিন তাং-কমিউনিষ্ট মিত্রতা বা আতাঁতে ভাঙন ধরে। কমিউনিষ্টগণ চীনের কৃষকদের মধ্যে প্রভাব বৃদ্ধি করে। কুয়োমিন তাং ইহাতে রুষ্ট হইয়া আমেরিকার পাওয়া অস্ত্রের সাহায্যে তাহাদের দমনের চেষ্টা করে। ১৯৩৪ খ্রীঃ কুয়োমিন তাং সেনাদলের চাপ এড়াইবার জন্য মাও-সে-তুং-এর নেতৃত্বে প্রায় এক লক্ষ চীনা কমিউনিষ্ট চীনের উত্তর-পশ্চিমের সেন্‌সি প্রদেশে চলিয়া যায়। এই যাত্রাকে লং মার্চ (Long March) বলা হয়। চীনা

কমিউনিষ্ট বিপ্লব মাও-সে-তুং

১. Unification before resistance policy.

কমিউনিষ্ট ফৌজ কুয়োমিন তাং আক্রমণ প্রতিহত করিয়া ২৬৮ দিন ধরিয়া হাঁটে। পথে প্রায় ৮০ হাজার লোক মারা পড়ে। তবুও ইহাতে ভীত না হইয়া মাও-সে-তুং-এর নেতৃত্বে চীনা কমিউনিষ্টগণ নিজ লক্ষ্য স্থানে উপনীত হয়। কুয়োমিন তাং সরকারের দুর্নীতিপূর্ণ শাসনব্যবস্থা ও ধনিক ঘেঁষা নীতি জনসাধারণের নিকট ইহার জনপ্রিয়তা নষ্ট করিয়া দেয়। এই সুযোগে মাও-সে-তুং-এর নেতৃত্বে কমিউনিষ্টরা চীনের বিশাল অঞ্চল অধিকার করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর দীর্ঘকাল কুয়োমিন তাং ও কমিউনিষ্ট গৃহযুদ্ধ চলিতে থাকে। অবশেষে ১৯৪৯ খ্রীঃ চিয়াং সরকার মাও-সে-তুং পরিচালিত চীনা কমিউনিষ্টগণের নিকট যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া চীনের মূল ভূখণ্ড ছাড়িয়া ফরমোজা বা তাইওয়ান দ্বীপে আশ্রয় নেয়। চীনের মূল ভূখণ্ডে মাও-সে-তুং-এর নেতৃত্বে কমিউনিষ্ট সরকার স্থাপিত হয়। ভারতবর্ষ ও অন্যান্য দেশ এই নবগঠিত সরকারকে স্বীকৃতি দেয়। কমিউনিষ্ট চীন ১৯৭১ খ্রীঃ জাতি সংঘের সভ্যপদ পায়। এইভাবে চীনে মাঞ্চু সরকারের পতনের পর হইতে ৩৮ বৎসর উত্থান পতনের পর মাও-সে-তুং-এর নেতৃত্বে একটি স্থায়ী ও প্রগতিশীল সমাজতান্ত্রিক সরকার স্থাপিত হয়।

চীনে কমিউনিষ্ট বিপ্লবের কারণ (Causes of the Communist Revolution in China*)ঃ চীনে কুয়োমিন তাং সরকারের পতন এবং ১৯৪৯ খ্রীঃ চীনা কমিউনিষ্টগণের ক্ষমতা লাভ এশিয়ার ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ১৯১৭ খ্রীঃ রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লবের পর চীনের ন্যায় এইরূপ গভীর মূল সমাজ বিপ্লব খুব কম দেখা যায়। চীনে কমিউনিষ্ট বিপ্লবীগণের সফলতার কারণ চীনের ইতিহাসের মধ্যেই নিহিত ছিল।

প্রথমতঃ, ১৯১৭ খ্রীঃ বলশেভিক বিপ্লবের প্রভাব চীনের বহু বুদ্ধিজীবিগণকে প্রভাবিত করে। রাশিয়ার ন্যায় তাঁহারাও চীনের দরিদ্র কৃষক ও শ্রমিকের স্বার্থে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন দেখেন। মাও-সে-তুং, চু-তে, লিও-শাও-চি, চৌ-এন-লাই প্রভৃতি নেতাগণ মার্কসবাদী ভাবধারায় প্রভাবিত হইয়া চীনে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংকল্প নেন। তাঁহারা মনে করেন যে দরিদ্র ও শোষিত চীনা জনগণের মুক্তির একমাত্র পথ হইল চীনে সমাজতান্ত্রিক সরকার স্থাপন। ১৯২১ খ্রীঃ চীনা কমিউনিষ্ট পার্টি স্থাপিত হইলে, এই পার্টির নেতৃত্বে কমিউনিষ্ট কর্মীগণ সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা চীনা কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র ও সেনাদলের মধ্যে ছড়াইয়া দেন। কুয়োমিন-তাং সরকারের ধনীঘেঁষা বুর্জোয়া নীতি দরিদ্র জনসাধারণের বিরাগ সৃষ্টি করে। ফলে দরিদ্র ও সর্বহারা শ্রেণী কমিউনিষ্টগণের প্রধান সমর্থকে পরিণত হয়।

দ্বিতীয়তঃ, ১৯১১ খ্রীঃ প্রজাতান্ত্রিক বিপ্লবের পর চীনের কেন্দ্রীয় সরকার দুর্বল হইয়া পড়ে। স্বার্থান্বেষী সমরনেতাগণ (War lords) নিজ নিজ এলকায় স্বাধীনভাবে শাসন করিতে আরম্ভ করে। এই সমরনেতাগণ তাহাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য চীনা কৃষক-

* উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ নির্ধারিত সিলেবাসে ১৯৪৫ খ্রীঃ হইল সময়-সীমা; চীনের কমিউনিষ্ট বিপ্লব ১৯৪৯ খ্রীঃ সাফল্যমণ্ডিত হয়। তবুও ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য চীনে কমিউনিষ্ট বিপ্লবের কারণ সংক্ষেপে আলোচিত হইল।

গণকে নিষ্ঠুরভাবে শোষন করে। কৃষকগণের জমির খাজনা বাড়ান হয় এবং নগদ অর্থে তাহা সরকারে আদায় দিতে বলা হয়। ইহার ফলে চীনা কৃষকের দুর্দশার একশেষ হয়। প্রজাতন্ত্রী কুয়োমিন তাং সরকার এই সকল অত্যাচারী সমরনেতাগণ ও জমিদারদের বিতাড়ণ করিয়া কৃষকগণকে রক্ষায় ব্যর্থ হয়। কিন্তু চীনা কমিউনিষ্টগণ সকল বিপদ তুচ্ছ করিয়া কৃষকগণের স্বার্থে অত্যাচারী সমরনেতাগণের সহিত লড়িতে থাকে। ইহার ফলে কমিউনিষ্টগণ চীনা কৃষকগণের পরিত্রাতা রূপে পরিগণিত হয়।

তৃতীয়তঃ, চীনের জনসংখ্যার শতকরা ৮০ ভাগ হইল কৃষিজীবি। কিন্তু ভূমিবণ্টনের ক্ষেত্রে চীনে কোন সাম্য নীতি ছিল না। উর্বরা ইয়াংসি উপত্যকায় ৩০০০ একর জমির মালিকানা জমিদারদের হাতেই ছিল। জমিদারেরা ঐশ্বর্যশালী হইলেও ভূমিহীন দরিদ্র কৃষককুল ঋণ, রোগ ও অন্নাভাবে ধুঁকিত। ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেন যদিও তাঁহার সান-মিন-চু-আই নীতিতে "জনসাধারণের জীবিকার" (People's Livelihood) কথা বলেন, কুয়োমিন তাং শাসক মার্শাল চিয়াং এই আদর্শ ভুলিয়া জমিদার ও বুর্জোয়াগণের স্বার্থ-রক্ষার চেষ্টা করেন। তিনি মাঝে মাঝে ভূমি সংস্কারের কথা বলিলেও কার্যক্ষেত্রে ভূমি-হীনকে ভূমি বন্টনের কোন চেষ্টা করেন নাই। চীনা কমিউনিষ্টগণ চীনা কৃষকের হাতে জমি দেওয়ার পরিকল্পনা নেয়। তাহারা কৃষকগণকে সঙ্ঘবন্ধ করিয়া জমিদারগণের হাত হইতে জমি কাড়িয়া কৃষকগণের হাতে দেয়। ইহার ফলে চীনের বৃহত্তর জনসাধারণ, অর্থাৎ কৃষক শ্রেণী কমিউনিষ্টগণকে সমর্থন জানায়। কুয়োমিন তাং সরকার কৃষকগণের আস্থা হারাইয়া ফেলে। চীনা কমিউনিষ্টগণ তাহাদের বিখ্যাত লং মার্চ (Long March) এর পর চীনের সেন্সি (Sensi) প্রদেশে নূতন ভূমি বণ্টন ব্যবস্থা চালু করিলে চীনা কৃষকগণের মধ্যে সাড়া পড়িয়া যায়। ফলে কুয়োমিন তাং-এর বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধে কমিউনিষ্টগণ কৃষক সমাজের সমর্থন ও আনুগত্য পায়।

চতুর্থতঃ, কুয়োমিন তাং সরকার চীনে কৃষি ও শিল্পের উন্নতির কোন চেষ্টা করে নাই। মার্শাল চিয়াং শিল্প গঠন অপেক্ষা সেনাদল গঠন অধিক পছন্দ করিতেন। ইহার ফলে চীনের অর্থনৈতিক অবস্থা দারুন খারাপ হইয়া পড়ে। চীনের কলকারখানার বেশীর ভাগ ছিল বিদেশীদের হাতে। ১৯৩০ খ্রীঃ চীনে মোট কাপড়ের কলের সংখ্যা ছিল ৮১টি। ইহার মধ্যে বিদেশী ইওরোপীয় মালিকের কল ছিল ৪৬টি। ১৯৩৭ খ্রীঃ শিল্পে চীনের যে মূলধন খাটিত তাহার $\frac{২}{৫}$ অংশ ছিল চীনা মালিকের, $\frac{৩}{৫}$ অংশ আমেরিকান ও ইংরাজের হাতে। এই সকল শিল্পে যাহা লাভ হইত তাহার বেশীর ভাগ বিদেশে চলিয়া যাইত। ফলে চীন প্রকৃতপক্ষে আমেরিকা ও ইংলণ্ডের উপনিবেশে পরিণত হয়। কুয়োমিন তাং সরকার শিল্পের জাতীয়করণ না করিয়া সাম্রাজ্যবাদীগণের স্বার্থ রক্ষা করে। কমিউনিষ্ট-গণ চীনের শিল্পের জাতীয়করণ, বেকার সমস্যা দূর করার জন্য দাবী জানায়। ইহার ফলে তাহারা শহরবাসী মধ্যবিত্ত ও শ্রমিক শ্রেণীর আনুগত্য পায়।[১]

পঞ্চমতঃ, ১৯২৭ খ্রীঃ চিয়াং সরকার চীনা কমিউনিষ্ট দলকে ধ্বংস করিবার জন্য প্রচণ্ড সামরিক চাপ দেয়। এই সময়ে মাও-সে-তুং দলকে রক্ষা করিবার জন্য বিপ্লবী কৃষক

১ Falconer—New China, P. 37.

ফৌজ গড়েন। তিনি হুনান প্রদেশে যে বিপ্লবী কৃষক বাহিনী গড়েন কালক্রমে এই আদর্শে সমগ্র কমিউনিষ্ট বাহিনী গড়া হয়। এই বাহিনীকে রাজনৈতিক মতাদর্শে দীক্ষিত করিয়া একটি শক্তিশালী সেনাদলে পরিণত করা হয়। গেরিলা কায়দায় যুদ্ধ-কৌশল করিয়া চিয়াং সরকারের নৈতিক শক্তিহীন বাহিনীর সহিত যুদ্ধে কমিউনিষ্ট সেনাদল অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করে।

ষষ্ঠতঃ, জাপানী আক্রমণের সময় চিয়াং সরকার ও কমিউনিষ্টগণ সম্মিলিতভাবে জাপানকে বাধা দেয়। ১৯৪৫ খ্রীঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের পরাজয় ঘটিলে এবং জাপানী সেনা চীন হইতে দেশে ফিরিয়া যায়। এই সুযোগে কমিউনিষ্টগণ উত্তর-পূর্ব চীনের বৃহদংশ অধিকার করে। সোভিয়েত অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া চীনা কৃষকগণের সমর্থন পুষ্ট কমিউনিষ্টগণ মেরুদণ্ডহীন, আমেরিকার সাহায্য পুষ্ট চিয়াং সরকারকে সহজে বিতাড়িত করে।

সপ্তমতঃ, কুয়োমিন তাং সরকার ছিল প্রতিক্রিয়াশীল, দুর্নীতিপূর্ণ এবং আমেরিকার স্বার্থে পরিচালিত। কুয়োমিন তাং সরকারের নেতারা ছিল ক্ষমতালোভী ও স্বার্থপর। চীনা জনসাধারণ ও দেশপ্রেমিক চীনাগণ এই সরকারকে ঘৃণা করিত। তাহারা আদর্শ-বাদী, সমাজতান্ত্রিক কমিউনিষ্টগণকে অধিকতর কাম্য মনে করে।

পরিশেষে, চীনে কমিউনিষ্ট বিপ্লবের সাফল্যের জন্য মাও-সে-তুং এর দূরদর্শিতা, বলিষ্ঠ নেতৃত্ব বিশেষভাবে দায়ী ছিল। হুনান প্রদেশের একটি সম্পন্ন কৃষক পরিবারে ১৮৯৩ খ্রীঃ মাওয়ের জন্ম হয়। মাও ছিলেন মেধাবী ছাত্র, কবি ও দার্শনিক প্রকৃতির মানুষ। ১৯১১ খ্রীঃ সান-ইয়াৎ-সেনের নেতৃত্বে প্রজাতান্ত্রিক বিপ্লব তাঁহাকে চীনের সমস্যা সম্পর্কে সজাগ করে। তিনি ১৯১৭ খ্রীঃ সিন-মিন-সুয়ে-হুই নামে একটি গণ পাঠচক্র স্থাপন করেন। ১৯২০ খ্রীঃ হইতে তিনি কার্ল মার্কসের কমিউনিষ্ট ম্যানিফেষ্টোর চীনা অনুবাদ পড়িয়া মার্কসবাদের প্রতি অনুরক্ত হন। মাও গভীর চিন্তা করিয়া মার্কসবাদকে চীনের বাস্তব অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইয়া তাঁহার মতবাদ গঠন করেন। ইহাকে কেহ কেহ মাওবাদ (Maoism) বলেন। মাও বুঝিতে পারেন যে চীনের দরিদ্র কৃষককে লইয়া সমাজ বিপ্লব সার্থক করিতে হইবে। এজন্য তিনি বিপ্লবী কৃষক ফৌজ গঠন করেন। ১৯২১ খ্রীঃ চীনা কমিউনিষ্ট দল স্থাপিত হইলে তিনি ইহার অন্যতম শীর্ষ স্থানীয় নেতা হন। বিপ্লবকে সঠিক পথে পরিচালনার দূরদর্শিতা মাও-সে-তুং এর ছিল। তাঁহার যোগ্য সহযোগী ছিলেন যুদ্ধ বিশারদ চু-তে, কূটনীতিবিদ চৌ-এন-লাই প্রভৃতি। উপযুক্ত নেতৃত্ব চীনা বিপ্লবকে সাফল্যমণ্ডিত করে। বিপ্লবের পর চীনে কৃষি সংস্কার ও অন্যান্য সংস্কার করিয়া দেশকে শক্তিশালী করা হইয়াছে।



মাও-সে-তুং

একাদশ অধ্যায়

অটোমান তুর্কী সাম্রাজ্যের ভাঙন : বলকান জাতীয়তাবাদের অগ্রগতি

(Dismemberment of the Ottoman Empire : Progress of Balkan Nationalism)

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ : তুরস্কের সাম্রাজ্যের ভাঙন (The Crimean War : Dismemberment of Turkish Empire) : ষোড়শ শতকে তুরস্ক নববলে বলীয়ান হইয়া পূর্ব ইওরোপের বলকান উপদ্বীপ অঞ্চল নিজ সাম্রাজ্য-ভুক্ত করে। তুরস্ক ছিল ইসলামীয় সভ্যতার প্রতিনিধি। তুরস্কের ইওরোপীয় প্রজাগণ ছিল খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী। তুরস্কের সুলতান তাঁহার খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী প্রজাদের মুসলমান প্রজাদের সহিত সমান অধিকার দিতে মোটেই রাজী ছিলেন না। ইহার ফলে শাসক ও শাসিতের মধ্যে ব্যবধান রহিয়া যায়। অষ্টাদশ শতক হইতে তুরস্কের সুলতানী শাসন ব্যবস্থা দুর্বল হইয়া পড়ে। তুরস্ক তাহার মধ্য যুগীয় শাসন ও দুর্বল সামরিক ব্যবস্থা লইয়া আধুনিক ভাবধারার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে অপারগ হয়।

ইতিমধ্যে রাশিয়ার জার সরকার পূর্ব ইওরোপে প্রভাব ও আধিপত্য বিস্তারের নীতি নেয়। তুরস্কের আভ্যন্তরীন দুর্বলতা রাশিয়াকে এই অঞ্চলে ক্ষমতা বিস্তারের এক বিরল সুযোগ করিয়া দেয়। রাশিয়ার জার প্রথম নিকোলাস পূর্ব ইওরোপে তুরস্কের খ্রীষ্টান প্রজাদের পক্ষ লইয়া দ্রুত প্রভাব বাড়াইয়া ফেলেন। রাশিয়া ও পূর্ব ইওরোপের খ্রীষ্টানরা ছিল গ্রীক খ্রীষ্টান ধর্ম নামক একই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। ইহার ফলে রাশিয়ার প্রভাব বিস্তারে সুবিধা হয়। ১৮২১ খ্রীঃ গ্রীস তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে জার নিকোলাস গ্রীসের পক্ষ লইয়া তুরস্ককে আক্রমণ করিয়া এড্রিয়ানোপলের সন্ধি স্বাক্ষরে বাধ্য করেন। ইহার ফলে গ্রীস স্বাধীনতা লাভ করে। বলকান অঞ্চলে রুশ প্রভাব প্রতিপত্তি দ্রুত বাড়িয়া যায়। ইহার পর জার নিকোলাস তুরস্ক সাম্রাজ্যকে ব্যবচ্ছেদ করিবার পরিকল্পনা নেন। তিনি জানিতেন যে ইংলণ্ডের সম্মতি ছাড়া বিনা যুদ্ধে তুরস্কের সাম্রাজ্য ব্যবচ্ছেদ করা সম্ভব নয়। এজন্য তিনি বারে বারে ইংলণ্ডের নিকট এই ব্যবচ্ছেদের প্রস্তাব দেন। তিনি বলেন যে "ইওরোপের রুগ্ন মানুষ" (Sick man of Europe) শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পড়িবে। ইহার আগেই ইহার সম্পত্তির ব্যবচ্ছেদ দরকার। 'ইওরোপের রুগ্ন মানুষ' বলিতে তুরস্ককে বুঝাইত। কিন্তু ইংলণ্ড রুশ প্রস্তাবকে সরাসরি নাকচ না করিয়া ধোঁয়াটে ও ভাসা ভাসা উত্তর দিয়া অসম্মতি জানায়। ফলে জারের ধারণা হয় যে ইংলণ্ড তাঁহার প্রস্তাবে ঠিক রাজী হইয়াছে। কোন রকমে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া ব্যবচ্ছেদের ব্যবস্থা করিলেই ইংলণ্ড তাহাতে যোগ দিবে। এই ধারণাবশতঃ জার গ্রোটোর চাবি উপলক্ষে ক্রিমিয়া যুদ্ধে নামিয়া পড়েন।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ

এদিকে ব্রিটিশ মন্ত্রীসভা রাশিয়ার এই প্রস্তাবকে ইংলণ্ডের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকারক

মনে করিত। তাঁহারা মনে করে যে তুরস্ক ব্যবচ্ছেদ করিলে পূর্ব ইওরোপে রাশিয়ার ক্ষমতা অসম্ভব বাড়িয়া যাইবে। কিন্তু এই কথা তাহারা স্পষ্ট ভাষায় জারকে না জানাইবার ফলে গোলমাল দেখা দেয়। ঐতিহাসিক টেমপারলি এজন্য বলেন যে, "ক্রিমিয়ার যুদ্ধ ছিল জারের ভুল বুঝা ও ব্রিটিশ সরকারের ইতস্ততঃ নীতির ফল" (The Crimean war was the rcsult of misunderstanding on the part of the Zar and vacillation on the part of the British Government)। ইংলণ্ডের মন্ত্রী লর্ড পামারষ্টোন, তুরস্কে ইংলণ্ডের দূত র‍্যাডক্লিফ এই যুদ্ধ এড়াইবার বহু সুযোগ ইচ্ছা করিয়া নষ্ট করেন। এমন কি যাহাতে যুদ্ধ বাধে তাঁহারা সেই দিকে ঘটনাকে চালিত করেন। কারণ তাঁহারা মনে করিতেন যে রাশিয়াকে পরাস্ত করিলে তাহার তুরস্ক আগ্রাসনের ঝোঁক কমিয়া যাইবে। সুতরাং এই যুদ্ধের প্রধান কারণ ছিল রাশিয়ার আগ্রাসন নীতি ও ইংলণ্ডের যুদ্ধ নীতি। অষ্ট্রিয়া, ফ্রান্স, ইতালী নিজ নিজ কারণে এই যুদ্ধে রাশিয়ার বিরুদ্ধে নামিয়া পড়ে।

একটি সামান্য ব্যাপারকে উপলক্ষ্য করিয়া ক্রিমিয়ার যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ১৮৫৪ খ্রীঃ তুরস্কের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত জেরুজালেমের বিখ্যাত গ্রোটোর গীর্জার (Church of Grotto) চাবি লইয়া জার নিকোলাসের সহিত তুর্কী সুলতানের বিবাদ বাদে। এই সুযোগে তুরস্ককে ব্যবচ্ছেদ করিবার মানসে জার তুরস্কের মোলদাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া প্রদেশ অধিকার করেন। ইহাতে তুরস্ক, রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও সার্ডিনিয়া তুরস্কের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ফলে ১৮৫৫ খ্রীঃ বিখ্যাত ক্রিমিয়ার যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধ প্যারিসের সন্ধি (১৮৫৬ খ্রীঃ) দ্বারা সমাপ্ত হয়। প্যারিসের সন্ধি দ্বারা (১) রাশিয়া, বেসারাবিয়া, মোলদাভিয়া, ওয়ালাচিয়া তুরস্ককে ফিরাইয়া দেয়। (২) কৃষ্ণ সমুদ্র ও দার্দানালিস প্রণালীতে যুদ্ধ জাহাজ চলাচল নিষিদ্ধ হয়। (৩) কৃষ্ণ সমুদ্রের তীরে নৌঘাঁটি নির্মাণ নিষিদ্ধ হয়। (৪) তুরস্কের সুলতান আধুনিক সংস্কার প্রবর্তন করিয়া তুরস্কের শক্তি বাড়াইবার প্রতিশ্রুতি দেন। (৫) খ্রীষ্টান প্রজাগণের প্রতি তুরস্ক ন্যায্য ব্যবহার করার প্রতিশ্রুতি দেয়। (৬) ইওরোপীয় শক্তিগুলি তুরস্কের স্বাধীনতা রক্ষা এবং সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেয়।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ফল ছিল খুবই অস্থায়ী। প্যারিসের সন্ধির দ্বারা রাশিয়ার আগ্রাসী নীতিকে ঠেকান এবং তুরস্কের সাম্রাজ্যকে অখণ্ড রাখা এবং তুরস্ককে শক্তিশালী করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই এই দুইটি ব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়ে। প্যারিসের সন্ধির ১৪ বৎসর পরে রাশিয়া পুনরায় কৃষ্ণ সাগরে ঢুকিয়া পড়ে এবং তুরস্কের রাজ্য আক্রমণ করে। এদিকে তুরস্কের দুর্বলতা বাড়িতে থাকে। ইঙ্গ-ফরাসী শক্তি তুরস্কের অখণ্ডতা নীতি ত্যাগ করিয়া বার্লিনের সন্ধি দ্বারা তুরস্ক ব্যবচ্ছেদের দিকে আগাইয়া যায়। এজন্য অনেকে ক্রিমিয়ার যুদ্ধকে নিষ্ফলা ও অপ্রয়োজনীয় যুদ্ধ (useless war) বলেন। তবে ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পরোক্ষ ফল ছিল সুদূরপ্রসারী। এই যুদ্ধের ফলে ভিয়েনা সন্ধির দ্বারা ইওরোপে যে শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল তাহা ভাঙিয়া পড়ে।

ফ্রান্স তৃতীয় নেপোলিয়নের নেতৃত্বে ইওরোপে এক প্রধান শক্তিরাষ্ট্রে আত্মপ্রকাশ করে। তৃতীয় নেপোলিয়ন কিছুদিনের মত ইওরোপের ভাগ্য বিধাতায় (arbiter of Europe) পরিণত হন। রাশিয়া পরাজিত ও হতমান হইয়া আভ্যন্তরীন সংগঠন ও ভূমিদাস প্রথার উচ্ছেদে মন দেয়। বৈদেশিক ক্ষেত্রে রাশিয়া ইওরোপ হইতে মুখ ফিরাইয়া এশিয়ায় রাজ্য বিস্তারের দিকে নজর দেয়। ফলে চীনের সহিত ও ব্রিটিশ ভারতের সহিত রাশিয়ার বিবাদ বাধে। ইতালীর ঐক্য এই যুদ্ধে ত্বরান্বিত হয়। জার্মানীর ঐক্য আন্দোলনেরও সুবিধা হয়। কারণ অষ্ট্রিয়া এই যুদ্ধে রাশিয়ার বিরোধিতা করিলে, অষ্ট্রো-প্রাশীয় যুদ্ধে রাশিয়া অষ্ট্রিয়াকে সাহায্য করিতে বিরত থাকে। এইভাবে ক্রিমিয়ার যুদ্ধের অপ্রত্যাশিত ফল (unintended consequences) ইওরোপে গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এজন্য অনেকে ক্রিমিয়ার যুদ্ধকে ইওরোপের "জল বিভাজিকা" (watershed of European history) বলিয়াছেন।

বলকান জাতীয়তাবাদের উদ্ভব: রুশ-তুরস্ক যুদ্ধ, ১৮৭৭: (Development of Balkan nationalism : Russo-Turkish war of 1877):

সুলতান আবদুল হামিদের দমন নীতি

ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পর প্যারিসের সন্ধি (১৮৫৫ খ্রীঃ) দ্বারা পূর্বাঞ্চল সমস্যার কোন স্থায়ী সমাধান হয় নাই। তুরস্কের সুলতান প্যারিসের সন্ধি দ্বারা উদার ও আধুনিক ভাবধারায় শাসন সংগঠনের প্রতিশ্রুতি এবং খ্রীষ্টীয় প্রজাগণের প্রতি সৎ ব্যবহারের প্রতিশ্রুতি দিলেও কার্য-ক্ষেত্রে তাহা প্রযুক্ত হয় নাই। তুরস্কের সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদ ছিলেন ঘোর স্বৈরতন্ত্রী শাসক। তাঁহার নির্দেশে বলকান অঞ্চলে তুরস্কের খ্রীষ্টীয় প্রজাগণের উপর তুর্কী শাসনকর্তাগণ ঘোর দমন নীতি চালান। ইহার ফলে বলকান জাতিগুলি বিদ্রোহী হইয়া উঠে। প্যারিসের সন্ধি দ্বারা বলকান অধিবাসীগণের জাতীয়তাবাদের পরিতৃপ্তির কোন ব্যবস্থা হয় নাই। ঊনবিংশ শতক ছিল ইওরোপের ইতিহাসে জাতীয়তাবাদের যুগ। সুতরাং বলকান জাতিগুলি তুরস্কের আধিপত্য হইতে মুক্তিলাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে।

বলকানের অধিকাংশ অধিবাসী ছিল স্লাভ জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্গত। রাশিয়াও ছিল স্লাভ জাতির অংশ। রাশিয়া স্বভাবতঃই বলকান অঞ্চলের স্লাভ জাতীয়তাবাদের সমর্থন জানায়। রাশিয়ার আসল উদ্দেশ্য ছিল তুরস্কের সাম্রাজ্য গ্রাস করা। বলকানে তুরস্কের প্রভাব নষ্ট করিবার জন্য রাশিয়া 'স্লাভ জাতির ঐক্যের আদর্শ' (Pan Slavism) প্রচার করে। রুশ এজেণ্ট-গণ গোপনে বলকান জনগণের নিকট প্যান স্লাভবাদ বা স্লাভ ঐক্যবাদের আদর্শ প্রচার করিতে থাকে।[১] মস্কোতে ১৮৬৭ খ্রীঃ একটি সর্বস্লাভ কংগ্রেসের অধিবেশন বসে। প্যান স্লাভ আন্দোলনের ফলে বলকান অঞ্চলে জাতীয়তাবাদ প্রবল হইয়া উঠে এবং তুরস্কের সাম্রাজ্যবাদের-বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দানা বাঁধে।

সর্ব-স্লাভ আন্দোলন বলকান জাতীয়তাবাদ

এদিকে গ্রীস তুরস্কের শাসনমুক্ত হইলেও গ্রীসের কিছু অংশ তুরস্কের অধীনে রহিয়া

১. Marriot—Eastern Question.

যায়। এই স্থানগুলি তুরস্কের নিকট হইতে উদ্ধারের জন্য গ্রীস চেষ্টা চালায়। ফলে গ্রীসের সহিত তুরস্কের বিরোধ বাধে। মোলদাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া প্রদেশ তৃতীয় নেপোলিয়নের সহযোগিতায় স্বাধীন রুমানিয়া হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। ইহার ফলে বলকানের অন্য জাতিগুলির মনে অনুরূপভাবে স্বাধীনতা লাভের ইচ্ছা উদগ্র হয়। ঊনবিংশ শতকে জাতীয়তাবাদ ইওরোপের সর্বত্র আলোড়ন সৃষ্টি করে। ইতালী ও জার্মানীর ঐক্য বলকান জাতিগুলিকে অধিকতর অনুপ্রাণিত করে। ইহার ফলে ঊনবিংশ শতকের শেষদিকে বলকানে জাতীয়তাবাদ একটি বিস্ফোরক অবস্থায় পেঁছে।

বলকান জাতীয়তাবাদের জাগরণ

এই পরিস্থিতিতে হার্জেগোভিনার অধিবাসীগণ স্বাধীনতা লাভের জন্য তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ক্রমে বসনিয়া ও বুলগেরিয়া এই বিদ্রোহে যোগ দেয়। বুলগেরিয়া হইতে তুর্কী কর্মচারীগণকে বিতাড়িত করা হয়। বুলগেরিয়ার বিদ্রোহে ক্রুদ্ধ হইয়া সুলতান তাঁহার নিয়মিত ও স্বেচ্ছাসেবী সেনাদলকে এই বিদ্রোহ দমনের জন্য পাঠান। তুর্কী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী নিরস্ত্র বুলগারগণের উপর প্রচণ্ড অত্যাচার চালায়। বহু নিরস্ত্র ও নিরপরাধ লোককে হত্যা করে। অনেক গ্রাম ছারখার করিয়া দেওয়া হয়। প্রায় ১২ হাজার নিরপরাধ বুলগেরিয় এই অত্যাচারের ফলে নিহত হয়।

বুলগেরিয়ায় বিদ্রোহ

বুলগেরিয়ায় তুরস্কের বর্বর অত্যাচারের কাহিনী ইওরোপের সংবাদপত্রগুলিতে সর্বত্র ফলাও করিয়া ছাপা হইলে ইওরোপের খ্রীষ্টান জনমত বুলগেরিয়ার খ্রীষ্টানগণের উপর মুসলিম তুর্কীর আক্রমণে শিহরিয়া উঠে। ইংলণ্ডের অবসরপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী গ্যাল্ডষ্টোন অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে মন্তব্য করেন "তুরস্ক ইওরোপ ছাড়িয়া মালপত্র শুদ্ধ সরিয়া পড়ুক।" (Let the Turks leave Europe with bag and baggage)।

ইওরোপীয় প্রতিক্রিয়া

তুরস্কের বিরুদ্ধে ইওরোপীয় জনমতের সুযোগে রাশিয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্কল্প নেয়। রাইখষ্ট্যাডের সন্ধি (Treaty of Reichstadt) দ্বারা রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়া তুরস্কের সাম্রাজ্য ভাগ করিবার পরিকল্পনা করে। সার্বিয়া ও রুমানিয়া রাজ্য তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলে রাশিয়াও এই যুদ্ধে যোগ দেয়। রুশ সেনাদল কনষ্টাণ্টিনোপল আক্রমণের উদ্যোগ করিলে সুলতান বাধ্য হইয়া স্যানস্টিফেনোর সন্ধি (Treaty of Sanstefano) স্বাক্ষর করেন। এই সন্ধি দ্বারা তুরস্ক (১) রুমানিয়া, সার্বিয়া ও মণ্টিনেগ্রোর স্বাধীনতা স্বীকার করে। (২) স্বয়ংশাসিত বুলগেরিয়া রাজ্য গঠিত হয়। নূতন বুলগেরিয়ার সীমান্ত পশ্চিমে দানিউব হইতে পূর্ব ঈজিয়ান সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। (৩) রাশিয়া তুরস্কের নিকট হইতে কারস, বাটুম ও রুমানিয়ার সীমান্তে বেসারাবিয়া ও দোব্রুজা পায়। (৪) তুরস্ক রাশিয়াকে ক্ষতিপূরণ দিতে স্বীকৃতি দেয়। এইভাবে স্যানস্টিফেনোর সন্ধি দ্বারা রাশিয়া তুরস্ককে হতবল করে এবং বলকানে কয়েকটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার পৃষ্ঠপোষক হইয়া দাঁড়ায়।

রুশ-তুর্কী যুদ্ধ
স্যানষ্টিফেনোর সন্ধি

বার্লিনের সন্ধি, ১৮৭৮ খ্রীঃ (The Treaty of Berlin) ঃ রুশ-তুরস্ক যুদ্ধের পর স্যানস্টিফেনোর সন্ধি (১৮৭৮ খ্রীঃ) স্বাক্ষরিত হইলে পূর্বাঞ্চল সমস্যা পুনরায় প্রকট হইয়া উঠে। ইংলণ্ড বরাবর তুরস্কের সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষার নীতি অনুসরণ করিত। স্যানস্টিফেনোর সন্ধি দ্বারা বলকানে রুশ প্রভাব বাড়িলে ইংলণ্ড এই সন্ধি স্থাপনে বাধা দিতে মনস্থ করে। ইংলণ্ডের নীতি ছিল রুশ আগ্রাসন হইতে তুরস্ককে রক্ষা করা। কারণ বলকানে রাশিয়া ক্ষমতা লাভ করিলে শক্তিসাম্য নষ্ট হইত। রাশিয়া ভূমধ্যসাগরে ঢুকিয়া পড়িলে ইংলণ্ডের নৌ আধিপত্য এবং ভারতে আসিবার জলপথ সুয়েজের রাস্তা বিপন্ন হইত। সুতরাং ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী ডিসরেইলী স্যানস্টিফেনোর সন্ধি পরিবর্তনের জন্য রাশিয়ার উপর জোর চাপ দেন। এমন কি তিনি রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধের হুমকী দেখাইবার জন্য ভারতীয় সেনাদলকে মাল্টায় সমবেত করেন। ব্রিটিশ নৌবহর পূর্ব ভূমধ্যসাগরে হাজির হয়।

স্যানষ্টিফেনোর সন্ধির বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের প্রতিক্রিয়া

এদিকে অষ্ট্রিয়া স্যানস্টিফেনোর সন্ধিতে বিষম অসন্তুষ্ট হয়। রাইখষ্ট্যাডের গোপন চুক্তি দ্বারা অষ্ট্রিয়াকে যে সকল সুবিধা দিতে রাশিয়া প্রতিশ্রুতি দেয় এই সন্ধিতে তাহা ভঙ্গ করা হয়। রাশিয়া অষ্ট্রিয়াকে কোন ভাগ না দিয়া কেবলমাত্র নিজ রাজ্য বাড়ায়। এছাড়া বুলগেরিয়ার সীমানা ডানিয়ুব নদীর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়ায়, অষ্ট্রিয়া তাহার সীমান্তে এক প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির উত্থানের ভয়ে ভীত হয়। ফলে অষ্ট্রিয়া ইংলণ্ডের সহিত যোগ দিয়া এই সন্ধি পাল্টাইবার জন্য দাবী জানায়। বেসারাবিয়া হারাইয়া রুমানিয়া এই সন্ধির প্রতিবাদ করে। জার্মানীর প্রধানমন্ত্রী বিসমার্ক ইওরোপে এইরূপ সঙ্কট দেখা দিলে ব্যাপক যুদ্ধের আশঙ্কায় চিন্তিত হন। বিসমার্ক এই সময়ে ইওরোপে কোন যুদ্ধ বাধা পছন্দ করিতেন না। কারণ যুদ্ধ বাধিলে অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়া পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়াইয়া পড়িত। বিসমার্কের স্থাপিত তিন কাইজারের চুক্তিতে অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়া অন্তর্ভুক্ত ছিল। উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ বাধিলে এই চুক্তি ভাঙিয়া যাইত। এজন্য বিসমার্ক সকল শক্তিকে আলাপ-আলোচনার দ্বারা বলকান ঘটিত বিবাদ আপোষে মিটাইতে রাজী করান। এই কারণে তিনি বার্লিনে এক ইওরোপীয় কংগ্রেসের অধিবেশন ডাকেন এবং ইহাতে তিনি নিজে সভাপতিত্ব করেন। তিনি নিজেকে "নিরপেক্ষ দালাল" (Honest broker) বলিয়া অভিহিত করেন। ইওরোপের সকল শক্তিগুলি যথা ইংলণ্ড, অষ্ট্রিয়া, জার্মানী প্রভৃতি বার্লিন বৈঠকে একযোগে সন্ধি পরিবর্তনের দাবী জানাইলে রাশিয়ার একারপক্ষে তাহাতে বাধাদান অসম্ভব হয়। সুতরাং বার্লিন কংগ্রেসে স্যানষ্টিফেনোর সন্ধি পাল্টাইয়া যে নূতন সন্ধি হয় তাহার নাম ছিল বার্লিনের সন্ধি (১৮৭৮ খ্রীঃ)।

অষ্ট্রিয়ার প্রতিক্রিয়া ও বার্লিন কংগ্রেস আহ্বান

বার্লিনের চুক্তি (১৮৭৮ খ্রীঃ) দ্বারা (১) সার্বিয়া, মণ্টিনেগ্রো ও রুমানিয়ার স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়। (২) রুমানিয়া দোব্রুজা ফেরৎ পায়। (৩) বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা প্রদেশের উপর অষ্ট্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়। (৪) কারস, বাটুম, আর্মেনিয়ার

একাংশ ও বেসারাবিয়া রাশিয়াকে দেওয়া হয়। (৫) ইংল্যান্ড সাইপ্রাস দ্বীপ পায়। (৬) ফ্রান্সকে ভবিষ্যতে উত্তর আফ্রিকার তুরস্কের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত টিউনিস দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। (৭) বৃহৎ বুলগেরিয়াকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়, যথা—(ক) ম্যাসিডোনিয়া অঞ্চল তুরস্ককে ফিরাইয়া দেওয়া হয়। (খ) পূর্ব রুমেলিয়া অঞ্চল তুরস্কের অধীনে স্বায়ত্ব শাসিত প্রদেশ হিসাবে গঠিত হয়। (গ) অবশিষ্ট স্থান লইয়া বুলগেরিয়া গঠিত হয়। বুলগেরিয়াকে স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা না দিয়া তুরস্কের সুলতানের অধীনে স্বায়ত্ব শাসনের অধিকার দেওয়া হয়। এইভাবে বার্লিন চুক্তি ছিল পূর্বাঞ্চল সমস্যার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অধ্যায়।

বার্লিন চুক্তি

বার্লিন চুক্তির অদূরদর্শিতা ও অকার্যকারিতা অতি অল্পকালের মধ্যেই প্রকট হইয়া পড়ে। ফলে পূর্বাঞ্চল সমস্যা আরও জটিল আকার ধারণ করে। বার্লিন চুক্তির ফলে রাশিয়া সর্বাপেক্ষা অসন্তুষ্ট হয়। যদিও সাম্রাজ্যের দিক হইতে রাশিয়ার কোন ক্ষতি হয় নাই। স্যানস্টিফেনোর সন্ধির দ্বারা প্রাপ্ত স্থানগুলিই এই সন্ধিতে রাশিয়াকে দেওয়া হয়। কিন্তু বার্লিনের সন্ধি দ্বারা রাশিয়ার রাজনৈতিক মর্যাদা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়। বলকানে রাশিয়ার প্রভাব লোপ পায়। বার্লিন চুক্তির ৬৫ নং ধারায় দার্দানালিস প্রণালী দিয়া রুশ যুদ্ধ জাহাজের যাতায়াত নিষিদ্ধ হইলে রাশিয়া ক্রুদ্ধ হয়। ইহার ফলে বার্লিন চুক্তি ধ্বংস করিবার জন্য রাশিয়া সচেষ্ট হয়। দ্বিতীয়তঃ, ডিসরেইলি কূটনীতির দ্বারা অষ্ট্রিয়াকে বলকানে রাশিয়ার প্রতিপক্ষ হিসাবে খাড়া করেন। ঐতিহাসিক এ. জে. পি. টেইলারের মতে ক্রিমিয়ার যুদ্ধের সময় ইংল্যান্ড যেরূপ ইঙ্গ-ফরাসী জোট, রাশিয়ার বিরুদ্ধে গড়িয়াছিল, বার্লিন বৈঠকেও অষ্ট্রিয়ার সাহায্যে তাহা করে। অষ্ট্রিয়াকে বসনিয়া, হার্জেগোভিনা দিলে অষ্ট্রিয়া বলকানে রাশিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়ায়। বার্লিন কংগ্রেস হইতে যে অষ্ট্রো-রাশিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হয় শেষ পর্যন্ত তাহা প্রথম মহাযুদ্ধের সূচনা করে। বার্লিন কংগ্রেসে ইহার বীজ রোপিত হয়। তৃতীয়তঃ, বার্লিন চুক্তির ফলে তুরস্ক ইংলণ্ডের প্রতি তাহার আস্থা হারাইয়া ফেলে। ইংলন্ড তুরস্কের অখণ্ডতা রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল। কিন্তু বার্লিন চুক্তি দ্বারা ইংল্যান্ড তুরস্কের সামাজ্য বিভিন্ন শক্তিকে ভাগ করিয়া দিলে এবং ইংল্যান্ড নিজে সাইপ্রাস গ্রাস করিয়া এই প্রতিশ্রুতি ভাঙিলে তুরস্ক খুবই অসন্তুষ্ট হয়। বার্লিন চুক্তির পর তুরস্ক ক্রমে ইংলণ্ডের সহিত মিত্রতা ত্যাগ করিয়া জার্মানীর সহিত মিত্রতাবদ্ধ হয়। চতুর্থতঃ, বার্লিন চুক্তির দ্বারা তুরস্কের ক্ষমতা খর্ব করা হইলেও এই চুক্তির দ্বারা বলকান জাতীয়তাবাদের কোন সমাধান করা হয় নাই। বৃহৎ শক্তিগুলি কেবল নিজ নিজ অভীষ্ট সিদ্ধির দিকেই নজর দেয়। রুমানিয়া রাশিয়ার নিকট বেসারাবিয়া প্রদেশ হারায়, সার্বিয়া অষ্ট্রিয়ার নিকট বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা প্রদেশ হারায়, বুলগেরিয়ার ব্যবচ্ছেদ বুলগারগণের গভীর ক্ষোভের কারণ হয়। গ্রীসের সীমান্ত সমস্যাকে এই চুক্তিতে অগ্রাহ্য করা হয়। ইহার ফলে বলকান জাতিগুলি ক্ষিপ্ত হইয়া যায়। শেষ পর্যন্ত বৃহৎ শক্তির উপর আস্থা হারাইয়া বলকান লীগ গঠন করিয়া তাহারা তুরস্ককে আক্রমণ করে। বলকানের অতৃপ্ত জাতীয়তাবাদ, সার্বিয়ার বসনিয়া ও

বার্লিন চুক্তির ত্রুটি

হার্জেগোভিনা প্রদেশ লাভের আগ্রহ পূর্বাঞ্চল সমস্যাকে জটিল করিয়া দেয়। ইহার ফলে ১৯১২, ১৯১৩ খ্রীঃ দুইটি বলকান যুদ্ধ বাধে। পঞ্চমতঃ, বার্লিন চুক্তির দ্বারা জার্মানীর সহিত রাশিয়ার সম্পর্কের অবনতি ঘটে। যদিও বিসমার্ক নিজেকে "নিরপেক্ষ দালাল" (Honest broker) বলিয়া ঘোষণা করেন। ঐতিহাসিক Langer-এর মতে রাশিয়া উপলব্ধি করে যে বার্লিন সন্ধি রচনার সময় বিসমার্ক রাশিয়া অপেক্ষা অষ্ট্রিয়ার স্বার্থ রক্ষার দিকে বেশী নজর দিয়াছিল। ইহার ফলে তিন কাইজারের সন্ধি হইতে রাশিয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। বিসমার্ক বাধ্য হইয়া অষ্ট্রিয়ার সহিত দ্বিশক্তি চুক্তি (Duar Alliance) স্থাপন করেন।

বার্লিন চুক্তি দ্বারা প্রকৃতপক্ষে প্রথম মহাযুদ্ধের পথ রচনা করা হয়। ঐতিহাসিক এ. জে. পি. টেইলারের মতে কমপক্ষে ইওরোপে চারটি নূতন প্রতিদ্বন্দ্বিতা এই চুক্তির ফলে দেখা দেয়, যথা অষ্ট্রো-রুশ, অষ্ট্রো-সার্বিয়, অষ্ট্রো-বুলগেরিয়, সার্বো-বুলগেরিয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা। কামানের নলে যেমন বারুদ ভরা থাকিলে সামান্য অগ্নি স্পর্শে তাহা বিস্ফোরিত হয়, তেমনই বার্লিন চুক্তি ইওরোপের রাজনীতিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতার বারুদ ঠাসিয়া দেয়।

প্রথম মহাযুদ্ধের উৎপত্তি

ইহার ফলে প্রথম মহাযুদ্ধ আসন্ন হইয়া পড়ে। শান্তির পরিবর্তে এই চুক্তি গভীর অশান্তি সৃষ্টি করে। অবশেষে বসনিয়া লইয়া অষ্ট্রো-সার্বিয় বিরোধ উপলক্ষে প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়। ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী এই সন্ধির পর বলেন যে "আমি ইংলণ্ডের জন্য শান্তি ও সম্মান লইয়া আসিয়াছি"।[১] কিন্তু তাঁহার আশা ফলবতী হয় নাই। ইংলণ্ড এই সন্ধির দ্বারা প্রকৃতপক্ষে ইওরোপে স্থায়ী শান্তি স্থাপনে সমর্থ হয় নাই।

পূর্বাঞ্চল সমস্যা ও বলকান যুদ্ধ (The Eastern Question and the Balkan wars) : বার্লিন চুক্তির কিছুকাল পরে, তুরস্কের সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদ স্বদেশে "তরুণ তুর্কী" (Young Turk) আন্দোলনের ফলে পদচ্যুত হন। তরুণ তুর্কীদলের নেতাগণ তুরস্কের পুরাতন মধ্যযুগীয় ব্যবস্থা বদলাইয়া তুরস্কের আধুনিকীকরণে এবং তুর্কী সাম্রাজ্যের উপর তুরস্কের ক্ষমতাকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালান। তুরস্কের ইওরোপীয় খ্রীষ্টান প্রজাগণকে তুরস্কীকরণ (Turkification) করা আরম্ভ হয়। তুরস্কের খ্রীষ্টান প্রজাগণ এতকাল তুরস্ক সরকারের নিকট যে সকল সুযোগ-সুবিধা পাইত তাহা নাকচ করা হয়। গ্রীক প্রজাগণ তুরস্কের সাম্রাজ্যে বাণিজ্যের যে সকল সুযোগ-সুবিধা পাইত তাহাও বাতিল করা হয়। ম্যাসিডোনিয়ায় তুরস্কের প্রভাব বাড়াইবার জন্য এই অঞ্চলে তুর্কীগণের বসবাসের ব্যবস্থা করা হয়। ইসলাম ধর্মাবলম্বী তুর্কীগণ ম্যাসিডোনিয়ায় বসবাস আরম্ভ করিলে এই অঞ্চলের খ্রীষ্টান অধিবাসীরা বিপন্ন বোধ করে। তুর্কীগণের ভয়ে বহুলোক ঘরবাড়ী ছাড়িয়া প্রতিবেশী বুলগেরিয়া, সার্বিয়া প্রভৃতি দেশে শরণার্থী হয়। তুরস্ক সরকার খ্রীষ্টান প্রজাদের সকল প্রতিবাদকে দৃঢ়হাতে দমাইয়া দেয়।

তরুণ তুর্কী আন্দোলন

---

১. "I have bought peace with honour,"

তুরস্ক সরকারের এই দমন নীতির ফলে বলকান জাতীয়তাবাদ বুলগেরিয়া, সার্বিয়া প্রভৃতি দেশকে আশ্রয় করিয়া মারমুখী হইয়া উঠে। তরুণ তুর্কীদের তুর্কীকরণ নীতিই ছিল ইহার প্রধান কারণ। যাহা হউক সার্বিয়া, বুলগেরিয়া প্রভৃতি জাতিগুলি স্থির করে যে বলকান বা পূর্ব ইওরোপ হইতে তুরস্কের সাম্রাজ্য লোপ করিয়া বলকান জাতিগুলিকে মুক্ত করিতে হইবে। নতুবা বলকানের

বলকান জাতীয়তাবাদ



বলকান অঞ্চল

খ্রীষ্টানরা তুরস্কের চাপে শেষ হইয়া যাইবে। এই কারণে বলকান অঞ্চলে তুরস্কের বিরুদ্ধে জোট বাঁধা আরম্ভ হয়।

এদিকে তুরস্ক সরকার দেশের ভিতর তরুণ তুর্কী আন্দোলনে দুর্বল হইয়া পড়ে। তুরস্কের এই দুর্বলতায় ইতালী তুরস্কের সাম্রাজ্যভুক্ত ত্রিপলী অধিকার করে এবং অষ্ট্রিয়া, বসনিয়া, হার্জেগোভিনা নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করে। ইহার ফলে পুনরায় তুর্কী সাম্রাজ্যের ব্যবচ্ছেদ আরম্ভ হয়। ইতালী ও অষ্ট্রিয়ার দৃষ্টান্তে বলকান জাতিগুলি উৎসাহ বোধ করে। তাহারা এই সুযোগে বলকান হইতে তুরস্ককে বিতাড়িত করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা নেয়। ইওরোপের বৃহৎ শক্তিগুলির মুখাপেক্ষী না হইয়া তাহার নিজ বলে এই কার্য সমাধা করিবার সংকল্প নেয়। এই উদ্দেশ্যে সার্বিয়া, গ্রীস ও বুলগেরিয়া একযোগে বলকান লীগ (১৯১২ খ্রীঃ) গঠন করে। বলকান লীগ দাবী করে যে তুরস্ক সরকারকে ম্যাসিডোনিয়ায় তুর্কীকরণ নীতি ত্যাগ করিতে হইবে এবং বলকানে উদারনৈতিক সংস্কার চালু করিতে হইবে। এই দাবী পূরণে তুরস্ক অস্বীকৃতি জানাইলে, বলকান লীগ তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ফলে প্রথম বলকান যুদ্ধ (১৯১২ খ্রীঃ) আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধে বলকান লীগ বিশেষতঃ বুলগেরিয়ার সেনাদল তুরস্ককে চতুর্দিক হইতে আক্রমণ করিয়া বলকান হইতে বিতাড়িত করে।

বলকান লীগ ; প্রথম বলকান যুদ্ধ

এদিকে ইওরোপের বৃহৎ শক্তিগুলি বলকান লীগের সাফল্যকে ভাল চোখে দেখে নাই। তাহারা মনে করে যে বলকান অঞ্চলে বলকান লীগ সফল হইলে তাহাদের কর্তৃত্ব নষ্ট হইবে। এদিকে বলকান জাতিগুলির স্বাধীনতা লাভের জন্য ন্যায় সংগত দাবী অগ্রাহ্য করাও সম্ভব ছিল না। সুতরাং বৃহৎ শক্তিগুলি তুরস্ক ও বলকান লীগের মধ্যে মধ্যস্থতা করে। অবশেষে ১৯১৩ খ্রীঃ লণ্ডন কংগ্রেসে তুরস্কের সহিত একটি শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তির ফলে তুরস্কের ইওরোপীয় সাম্রাজ্য যৌথভাবে বলকান লীগের অধিকারে আসে। ইওরোপের একটি ক্ষুদ্র অংশ তুরস্কের অধিকারে থাকে। আলবানিয়া একটি স্বয়ং-শাসিত রাজ্যে পরিণত হয়। ক্রীট দ্বীপ গ্রীসের সহিত যুক্ত হয়। তিনশত বৎসর পর ইওরোপ হইতে তুরস্কের সাম্রাজ্য লুপ্ত হয়। বলকান জাতীয়তাবাদ জয়যুক্ত হয়।

লণ্ডন চুক্তি : তুরস্কের ব্যবচ্ছেদ

লণ্ডন চুক্তির (১৯১৩ খ্রীঃ) মধ্যে দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধের বীজ লুক্কায়িত ছিল। ইহার ফলে দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধ অচিরেই আরম্ভ হয়। লণ্ডন চুক্তির দ্বারা তুরস্ক তাহার সাম্রাজ্য যৌথভাবে বলকান লীগের নিকট ছাড়িয়া দেয়। কিন্তু এই স্থানের অংশ লইয়া বলকান লীগের দুই সভ্য সার্বিয়া ও বুলগেরিয়ার মধ্যে তীব্র বিরোধ দেখা দেয়। সার্বিয়া, ম্যাসিডোনিয়ার বৃহদংশ দাবী করিলে বুলগেরিয়া আপত্তি জানায়। সার্বিয়ার সহিত বুলগেরিয়ার বিরোধে অষ্ট্রিয়া বুলগেরিয়ার পক্ষ নেয়। এদিকে অষ্ট্রিয়াকে জব্দ করিবার জন্য, সার্বিয়া রাশিয়ার সহিত মিত্রতা স্থাপন করে। অষ্ট্রিয়ার সহযোগীতা পাইয়া বুলগেরিয়া ১৯১৩ খ্রীঃ সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এই যুদ্ধে রুমানিয়া ও মণ্টেনেগ্রো সার্বিয়ার পক্ষে যোগ দেয়। ইহার ফলে দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধ বাধে। শেষ পর্যন্ত বুখারেষ্টের (১৯১৩ খ্রীঃ) সন্ধি দ্বারা দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধের অবসান ঘটে। বুলগেরিয়া তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী সার্বিয়া,

দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধ

মণ্টেনেগ্রো ও গ্রীসকে ম্যাসিডোনিয়ার বৃহদংশ ছাড়িয়া দেয়। রুমানিয়াকে দোব্রুজা ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

মোট কথা দুইটি বলকান যুদ্ধ দ্বারা তুরস্কের সাম্রাজ্য ব্যবচ্ছেদ সম্পন্ন করা হয়। দুইটি বলকান যুদ্ধে সার্বিয়ার ক্ষমতা বাড়াইয়া ফেলে। এদিকে বসনিয়া প্রদেশ যাহা অষ্ট্রিয়া অধিকার করিয়াছিল, তাহাতে সার্বিয়া দাবী জানায়। সার্বিয়ার এই দাবী সঙ্গত ছিল। কারণ বসনিয়ায় সার্বিয়ার লোকেরাই বাস করিত। কিন্তু অষ্ট্রিয়া বসনিয়া ছাড়িতে রাজী ছিল না। এই কারণে অষ্ট্রিয়ার সহিত সার্বিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্রতর হয়। এদিকে সার্বিয়া অষ্ট্রিয়ার সহিত একা আঁটিয়া উঠিতে পারিবে না একথা ভাবিয়া রাশিয়ার সহিত মিত্রতা স্থাপন করে। রাশিয়া বার্লিন চুক্তির পর হইতে অষ্ট্রিয়ার উপর ক্ষিপ্ত ছিল। সুতরাং রাশিয়া সহজে সার্বিয়ার পক্ষ নেয়। ইহার ফলে বলকান দ্বন্দ্বে রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়া জড়াইয়া পড়ে। প্রথম মহাযুদ্ধ পরিণামে এই দ্বন্দ্ব প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হয়।

দ্বাদশ অধ্যায়

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ঃ ভার্সাই ও অন্যান্য শান্তিচুক্তি ঃ লীগ অফ নেশনস ঃ তুরস্কের জাগরণ

(First World War : Versailles and other Peace Settlements : The League of Nations : The Modernisation of Turkey)

প্রথম মহাযুদ্ধের কারণ ও পটভূমিকা (The causes of the First World War and its background) ঃ বার্লিন কংগ্রেসের (১৮৭৮ খ্রীঃ) পর ইওরোপে রাজনৈতিক অশান্তির আগুন ধুমায়িত হইতে আরম্ভ করে। বৃহৎ শক্তিগুলির স্বার্থপর নীতি, ঔপনিবেশিক দ্বন্দ্ব, মারণাস্ত্র নির্মাণের প্রতিযোগিতা, উগ্র জাতীয়তাবাদ, বলকানের অতৃপ্ত জাতীয়তাবাদ ইওরোপকে একটি আগ্নেয়গিরিতে পরিণত করে। জার্মানীকে কেন্দ্র করিয়া ত্রিশক্তি চুক্তি ও ফ্রান্সকে কেন্দ্র করিয়া ত্রিশক্তি আতাঁত বা মৈত্রী ইওরোপকে দুই যুদ্ধমান শিবিরে বিভক্ত করে। ঐতিহাসিক ল্যাংসামের মতে ইহার পর "ইওরোপের শান্তি যে কোন দুর্ঘটনার দ্বারা ধ্বংস হইবার রাস্তা তৈয়ারী হয়।"[১]

১৯১৪ খ্রীঃ জুন মাসে (২৮শে জুন) অষ্ট্রিয়ার যুবরাজ ফার্দিনান্দ ও তাঁহার পত্নী সোফিয়া বসনিয়ার রাজধানী সেরাজেভো পরিদর্শনে গেলে জনৈক উগ্র জাতীয়তাবাদী

১. "Peace of Europe rested on accident."

বসনিয় ছাত্র উভয়কে হত্যা করে। অষ্ট্রিয়া সরকার এই হত্যাকাণ্ডের পশ্চাতে সার্বিয়ার সমর্থন আছে মনে করেন এবং সার্বিয়ার উপর একটি চরমপত্র (ultimatum) দেন। এই চরমপত্রে সার্বিয়াকে কয়েকটি শর্ত অবিলম্বে মানিয়া লইতে বলা হয়। সার্বিয়া এই চরমপত্রের কয়েকটি শর্ত মানিতে অস্বীকার করিলে অষ্ট্রিয়া সার্বিয়ার রাজধানী বেলগ্রেড আক্রমণ করে। ইহার ফলে অষ্ট্রো-সার্বিয় যুদ্ধ আরম্ভ হয়। কিন্তু অষ্ট্রো-সার্বিয় যুদ্ধ স্থানীয় যুদ্ধ না হইয়া অবিলম্বে বিশ্ব-যুদ্ধে পরিণত হয়। কারণ ইওরোপের অগ্নিগর্ভ অবস্থার জন্য অন্যান্য শক্তিগুলিও জোট গঠন করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। অষ্ট্রো-সার্বিয় যুদ্ধে তাহারা শীঘ্রই জড়াইয়া পড়ে। রাশিয়া, সার্বিয়ার পক্ষ লইয়া অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামিয়া পড়ে। এদিকে অষ্ট্রিয়ার পক্ষ লইয়া জার্মানী, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, তুরস্ক প্রভৃতি দেশগুলি যুদ্ধে নামে। জার্মানী বেলজিয়াম আক্রমণ করিলে ফ্রান্স ও ইংলণ্ড, জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামিয়া পড়ে। এইভাবে সেরাজেভো হত্যাকাণ্ডকে উপলক্ষ্য করিয়া প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধ বাধে।

সেরাজেভো হত্যাকাণ্ড

সেরাজেভোর হত্যাকাণ্ড প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাথমিক কারণ হইলেও এই যুদ্ধ কয়েকটি বিশিষ্ট কারণে ঘটিয়াছিল।

ঊনবিংশ শতকে ইউরোপে এক উগ্র ও অপরিতৃপ্ত জাতীয়তাবাদের উদ্ভব হয়। ফরাসী বিপ্লবের গর্ভে এই জাতীয়তাবাদের জন্ম হয়। ঐতিহাসিক ম্যারিয়টের ভাষায় বলা যায় যে, "এই জাতীয়তাবাদ বলকান উপদ্বীপের মৃত অস্থিতে প্রাণ সঞ্চার করে।"[১] বার্লিন চুক্তির দ্বারা বৃহৎ শক্তিগুলি নিজ নিজ স্বার্থ রক্ষা করিলেও বলকান জাতীয়তাবাদ পূরণের কোন চেষ্টা করে নাই। বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা ছিল সার্বিয়ার প্রাপ্য। এই স্থান অষ্ট্রিয়া অধিকার করায় সার্ব জাতীয়তা-বাদ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়া প্রভৃতি বৃহৎ শক্তিগুলি নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য বলকান জাতীয়তাবাদকে ব্যবহার করে। বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা লইয়া অষ্ট্রো-সার্বিয়া বিরোধে, রাশিয়া সার্বিয়ার পক্ষ নেয়। "সর্ব স্লাভ" (Pan Slav) আন্দোলনের ফলে সার্বিয়াকে কেন্দ্র করিয়া স্লাভ জাতীয়তাবাদ অত্যন্ত উগ্ররূপ ধারণ করে। সার্বিয়া অষ্ট্রিয়ার কবল হইতে বসনিয়াকে মুক্ত করিতে পণ করে। রাশিয়া সার্বিয়ার পক্ষ লইলে সার্বিয়া যুদ্ধের জন্য মাতিয়া উঠে। এদিকে অষ্ট্রিয়া সার্বিয়ার নায্য দাবীকে মোটেই মূল্য দিতে প্রস্তুত ছিল না। সার্বিয়াকে জব্দ করিবার জন্য অষ্ট্রিয়া, সার্বিয়ার শত্রু বুলগেরিয়ার পক্ষ নেয়। দ্বিশক্তি চুক্তি অনুযায়ী জার্মানী, অষ্ট্রিয়ার পক্ষে থাকায় অষ্ট্রিয়া সার্বিয়াকে ধ্বংস করিবার সুযোগ খুঁজিতে থাকে। সুতরাং বলকান জাতীয়তাবাদ ইওরোপে বিস্ফোরক অবস্থার সৃষ্টি করে। শেষ পর্যন্ত অস্ত্রের দ্বারা এই জাতীয়তাবাদকে জয়যুক্ত করাই বলকান জাতিগুলি একমাত্র উপযুক্ত পথ বলিয়া মনে করে।

বলকান জাতীয়তাবাদ

১. "The idea of nationalism of the French Revolution moved the dry bones of the Balkan valley."—Marriot.

পশ্চিম ইওরোপে ফরাসী, ইংরাজ ও জার্মান জাতীয়তাবাদও কম উগ্র ছিল না। ফরাসী জাতি যুদ্ধ দ্বারা আলসাস-লোরেন পুনঃরুদ্ধার ও সেডানের পরাজয়ের জন্য জার্মানীর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ লইতে পণ করে। ফ্রান্স নিজেকে ল্যাটিন সভ্যতার প্রতিনিধি মনে করিয়া ল্যাটিন সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করিতে থাকে। ফরাসী নেতা ক্লেমাঁসু (Clemenceau), পয়েনকারি (Poincare) প্রভৃতি ল্যাটিন সভ্যতার সহিত জার্মানীর টিউটনিক সভ্যতার অনিবার্য দ্বন্দ্বের কথা বলেন। এদিকে জার্মান লেখক বার্নহার্ডি, ট্রটস্কি প্রভৃতি জার্মান তথা টিউটনিক সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলেন। জার্মানীর কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম পৃথিবীতে টিউটনিক কর্তৃত্বের স্বপ্ন দেখিতে আরম্ভ করেন। ইংলণ্ডও জাতীয় অহমিকা-বোধে পিছাইয়া থাকে নাই। ইংরাজ লেখক হোমার লী[১] এ্যাংলো-স্যাক্সন জাতির শ্রেষ্ঠত্বের কথা প্রচার করেন। এইভাবে জার্মানী, ফরাসী ও ইংরাজ জাতি নিজ নিজ জাতির অহমিকা ও অন্য জাতির প্রতি ঘৃণা দেখাইলে জাতিগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয়। জাতিগত উগ্রতার সহিত সাম্রাজ্য ও সামরিক শক্তির দম্ভ মিশিয়া বড় বড় জাতিগুলিকে মারমুখী করিয়া তুলে। এক শক্তি অপর শক্তির সহিত মীমাংসার কথা না ভাবিয়া গায়ের জোরে নিজ স্বার্থ সিদ্ধ করাই উচিত কাজ মনে করে। আন্তর্জাতিক আইন ও ভ্রাতৃত্ববোধ লোপ পায়। ঐতিহাসিক ডেভিড টমসন এজন্য ১৯০৪—১৪ খ্রীষ্টাব্দকে ইওরোপে "আন্তর্জাতিক অরাজকতার" যুগ[২] বলিয়াছেন। পরিণামে ইহা প্রথম মহাযুদ্ধ ডাকিয়া আনে।

পশ্চিম ইওরোপে উগ্র জাতীয়তাবাদ

ঊনবিংশ শতকের শেষদিকে ইওরোপে কয়েকটি জটিল রাজনৈতিক সমস্যা যুদ্ধের সম্ভাবনাকে তীব্রতর করে। আলসাস-লোরেন লইয়া ফরাসী-জার্মান বিরোধ, ইতালীর ঔপনিবেশিক ক্ষুধা এবং টিউনিস লইয়া ফরাসী-ইতালী বিরোধ, বার্লিন সন্ধির ৬৫ ধারা অনুযায়ী দার্দানালিস প্রণালীতে রুশ যুদ্ধ জাহাজ যাতায়াতের উপর নিষেধাজ্ঞা এবং বসনিয়া লইয়া অষ্ট্রিয়া-সার্বিয়া বিরোধ ইওরোপের রাজনীতিকে জটিল করিয়া তুলে। বার্লিন সন্ধির ৬৫নং ধারায় দার্দানালিস প্রণালী দিয়া রুশ জাহাজ চলাচল নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা হয়। রাশিয়া ইহাতে খুবই অসন্তুষ্ট হইয়া, বৃহৎ শক্তিগুলিকে এই শর্ত পরিবর্তনের অনুরোধ জানায়। কিন্তু বৃহৎ শক্তিগুলি এই শর্ত পরিবর্তনের অনিচ্ছা দেখায়। রুশমন্ত্রী আইভোলস্কি (Izvolski) স্থির নিশ্চয় হন যে বড় রকমের যুদ্ধ ছাড়া বার্লিন সন্ধির ৬৫ ধারা পরিবর্তন করা যাইবে না।[৩] সুতরাং রাশিয়া যুদ্ধ না এড়াইয়া যুদ্ধ বাধাইবার কথা ভাবিতে থাকে। ফরাসী নেতাগণও মনে করেন যে বৃহৎ যুদ্ধ ছাড়া জার্মানীর নিকট হইতে আলসাস-লোরেন উদ্ধার করা যাইবে না। ১৮৭৫ খ্রীঃ হইতে ফ্রান্স যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি চালায়। ১৯০৪ খ্রীঃ হইতে ফরাসী-রুশ চুক্তির পর ফ্রান্স জার্মানীর বিরুদ্ধে

আন্তর্জাতিক সমস্যাবলী

---

১. Homer Lea.

২. "Phase of international anarchy". David Thomson—Europe Since Napoleon.

৩. Fay—Origin of World War I.

যুদ্ধের জন্য মরিয়া হইয়া পড়ে। ইংলণ্ড গোড়ার দিকে যুদ্ধের কথা না ভাবিয়া নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা করে। ক্রমে কাইজারের নৌশক্তি গঠনের ফলে ইংলণ্ড ভীতিগ্রস্থ হয়। কাইজার ইংরাজ উপনিবেশগুলিতে গোলমালের চেষ্টা করিলে ইংলণ্ডও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়। এইভাবে ফ্রান্স, ইংলণ্ড, রাশিয়া প্রভৃতি বৃহৎ শক্তিগুলি রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য যুদ্ধকেই একমাত্র পথ বলিয়া মনে করে। উনবিংশ শতকের শেষদিক হইতে ইওরোপীয় কূটনীতির মান অত্যন্ত নামিয়া যায়। ঘৃণ্য সুবিধাবাদ, চক্রান্ত ও গোপন ষড়যন্ত্র ন্যায়নীতির স্থান গ্রহণ করে। আন্তর্জাতিক বৈঠক ডাকিয়া পরস্পরের স্বার্থের সামঞ্জস্য করিয়া শান্তি স্থাপন করার মত মানসিকতা বৃহৎ শক্তিগুলি হারাইয়া ফেলে। যুদ্ধনীতি ও কূটনীতির নিম্নমান প্রথম মহাযুদ্ধকে ত্বরান্বিত করে।

কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের দায়িত্ব

অনেক ইংরাজ লেখক প্রথম মহাযুদ্ধের জন্য দ্বিতীয় কাইজার উইলিয়ামের আগ্রাসী নীতিকে দায়ী করেন। ঐতিহাসিক লোয়েস ডিকিনসন (Lowes Dickinson), লর্ড অক্সফোর্ড (Lord Oxford) প্রভৃতি দ্বিতীয় কাইজার উইলিয়ামের নীতিকেই প্রথমে বিশ্বযুদ্ধের জন্য প্রধানতঃ দায়ী বলিয়া মনে করেন। দ্বিতীয় কাইজার এই যুদ্ধের জন্য বহু অংশে দায়ী ছিলেন ইহা সত্য। কাইজারের ওয়েল্ট পলিটিক (Welt Politik) বা বিশ্ব শক্তি হিসাবে জার্মানীকে স্থাপন করার প্রচেষ্টা ইওরোপে বহু জটিলতা সৃষ্টি করে। মরক্কোর ঘটনা ও বুয়ার যুদ্ধে কাইজারের ভূমিকা জার্মানীর সহিত ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের দ্বন্দ্বকে তীব্রতর করে। কাইজারের বার্লিন—বাগদাদ রেলপথের পরিকল্পনা ভারতে ইংলণ্ডের সাম্রাজ্যকে বিপন্ন করে। (বিশদ বিবরণ পৃঃ ১৯৯ দেখ)। জার্মান নৌবাহিনীর বিস্তারের ফলে ইংলণ্ডের নৌ-আধিপত্যে আঘাত পড়ে। ইংলণ্ড আশঙ্কা করে যে জার্মানী যুদ্ধ জাহাজ বানাইয়া ইংলণ্ডের সাম্রাজ্য দখলের চেষ্টা করিবে। অষ্ট্রিয়ার বলকানে রাজ্যবিস্তার নীতিকে কাইজার সমর্থন করায় অষ্ট্রিয়া বলকানে উগ্র হইয়া পড়ে। অষ্ট্রো-সার্বিয় যুদ্ধে যদি কাইজার অষ্ট্রিয়ার পক্ষে যোগ না দিতেন তবে প্রথম মহাযুদ্ধ ১৯১৪ খ্রীঃ বাধিত না।

ঔপনিবেশিক প্রতিযোগিতা

সর্বশেষে ঔপনিবেশিক প্রতিযোগিতা প্রথম মহাযুদ্ধকে অনিবার্য করিয়া তুলে। শিল্প-বিপ্লবের ফলে ইওরোপের বিভিন্ন দেশে শিল্পদ্রব্যের প্রভূত উৎপাদন হইলে এই দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য বাজারের প্রয়োজন দেখা দেয়। বুর্জোয়া শ্রেণী উপনিবেশের বাজারগুলিকে নিজ নিজ দেশের কুক্ষিগত রাখার চেষ্টা করে। ইহার ফলে আফ্রিকা ও এশিয়ার অধিকাংশ দেশে ইঙ্গ-ফরাসী উপনিবেশ স্থাপিত হয়। এই সকল উপনিবেশ ইঙ্গ-ফরাসী শিল্পদ্রব্যের বাজারে পরিণত হয়। জার্মানীতে শিল্প-বিপ্লব দেরীতে ঘটে। সুতরাং জার্মানী শিল্পদ্রব্য উৎপাদনে প্রথম দিকে পিছাইয়া থাকে। দ্বিতীয় কাইজারের আমলে জার্মানীর উৎপাদন শক্তি খুবই বাড়িয়া যায়। বাড়তি মাল বিক্রয়ের জন্য জার্মান শিল্পপতিরা নূতন বাজার খুঁজিতে থাকে। কিন্তু এশিয়া ও আফ্রিকার সকল স্থানেই ভাল উপনিবেশগুলি ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের দখলে থাকায় জার্মানী কোন স্থানে পা রাখিবার সুযোগে বঞ্চিত হয়। এদিকে জার্মান মূলধনী শ্রেণী ও শিল্পপতিরা সরকারকে উপনিবেশ দখলের জন্য চাপ দিতে থাকে। দ্বিতীয়

কাইজার এজন্য বলেন যে, "পৃথিবীর যে দিকে তাকাই, সেইদিকেই হয় ইংলণ্ড, নয় ফরাসীর উপনিবেশ। জার্মানীও সূর্যের নীচে বাস করে"। অর্থাৎ কাইজার উপনিবেশ দখলের ইঙ্গিত দেন। জার্মানী এই উদ্দেশ্যে নৌশক্তি বাড়াইবার চেষ্টা করিলে ইংলণ্ড প্রমাদ গুণে। ফলে জার্মানীর সহিত ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত বুর্জোয়া ও মূলধনী সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার জন্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের দায়িত্ব (The Role of Kaiser William II in the outbreak of the First World War)ঃ যুদ্ধের সময় যে সকল দেশ যুদ্ধে নামে তাহারা নিজের সমর্থনে কথা বলে ও শত্রু পক্ষের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালায়। ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি মিত্র শক্তি প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ও যুদ্ধের পর প্যারিস শান্তি বৈঠকে এই প্রচার চালায় যে জার্মানীই একমাত্র বিশ্বযুদ্ধের জন্য দায়ী। আতাঁত ঐতিহাসিকগণ যথা লর্ড অক্সফোর্ড ও লোয়েস ডিকিনসন প্রভৃতি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য জার্মানীকে দায়ী করিয়া পুস্তক রচনা করেন।[১] অপর দিকে জার্মান জাতীয়তাবাদী লেখকেরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য ইঙ্গ-ফরাসী মিত্র-শক্তিকেই দায়ী করেন।

আতাঁত ঐতিহাসিকগণের মত

ইঙ্গ-ফরাসী ঐতিহাসিকেরা নিম্নলিখিত কারণে জার্মানীকে তথা কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য দায়ী করেন।

(১) কাইজার অত্যন্ত উগ্র ও জাতীয়তাবাদে আচ্ছন্ন হইয়া পৃথিবীর অন্যান্য শক্তিকে হেয় জ্ঞান করেন। হাউস্টন চেম্বারলেইন প্রভৃতি লেখকেরা জার্মান কুলটুর বা সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠতার বড়াই করেন। ইহার ফলে জার্মান জাতির শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে অহেতুক ধারণার সৃষ্টি হয়। কাইজার জার্মানীর স্বার্থরক্ষাকে তাঁহার একমাত্র নীতি বলিয়া মনে করেন। অন্য জাতির স্বার্থকে তিনি তুচ্ছ জ্ঞান করেন।

(২) কাইজার ওয়েল্ট পলিটিক (Welt Politik) বা বিশ্ব রাজনীতিতে জার্মানীকে শ্রেষ্ঠ আসনে স্থাপন করিবার সংকল্প নেন। তিনি একটি "পাশবিক কুটনীতি" (Brutal diplomacy) অনুসরণ করিয়া সর্বত্র জার্মানীর আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা চালান। জার্মানী-অষ্ট্রিয়া ও ইতালীর ত্রিশক্তি চুক্তিকে জার্মানীর আধিপত্য স্থাপনের জন্য তিনি ব্যবহার করেন। কাইজারের সহিত বিরোধের মীমাংসার চেষ্টা চালাইয়া ইংলণ্ড বিফল মনোরথ হয়। হলডেন, সলিসবেরী প্রভৃতি ইংরাজ রাজনীতিকগণ বারবার আপোষ প্রস্তাব দিলেও কাইজার মুখ ফিরাইয়া থাকেন। অধিকন্তু তিনি আফ্রিকায় ইংরাজ ঔপনিবেশিক স্বার্থ ধ্বংসের জন্য বুয়ারগণের সহিত হাত মেলান ও ক্রুগার টেলিগ্রাম পাঠান। তিনি মরক্কোয় ফরাসী স্বার্থ নষ্ট করার জন্য আগাদির বন্দরে জার্মান যুদ্ধ জাহাজ প্যান্থার পাঠান। কাইজারের আগ্রাসী নীতিই বিশ্বযুদ্ধকে ডাকিয়া আনে।

---

১. Oxford—Gensis of World War I.
Lowes Dickinson—International Anarchy.

(৩) কাইজার যুদ্ধের দ্বারা তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য উঠিয়া পড়েন। তিনি ১৮৯২ খ্রীঃ সৈন্য আইন দ্বারা জার্মান সৈন্যসংখ্যা বাড়ান। ১৯০৬ খ্রীঃ নৌ আইন দ্বারা জার্মান নৌ বাহিনীর সম্প্রসারণ আরম্ভ করেন। জার্মানীর এইরূপ সামরিক সম্প্রসারণ ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে আতঙ্ক জাগায়। ফলে এই শক্তিগুলিও জার্মানীর সহিত সামরিক প্রতিযোগিতায় নামিতে বাধ্য হয়।

(৪) কাইজারের বলকান নীতি ও অষ্ট্রিয়া নীতি প্রথম মহাযুদ্ধকে অনিবার্য করে। তিনি সার্বিয়ার বিরুদ্ধে অষ্ট্রিয়াকে মারমুখী করিয়া তুলেন। কাইজার এক গোপন নোটে (১৮ই জুলাই, ১৯১৪ খ্রীঃ) অষ্ট্রিয়াকে সার্বিয়া ও রাশিয়ার বিরুদ্ধে সাহায্যের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে আদেশ দেন।[১] সেরাজেভোর হত্যাকাণ্ডের পর ইংলণ্ডের প্রধান-মন্ত্রী লর্ড গ্রে জার্মানী, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, ইতালী লইয়া একটি মীমাংসা প্রস্তাব রচনার কথা কাইজারকে জানাইলে তিনি তাহা এড়াইয়া যান। তিনি বলেন যে, "সেরাজেভোর ব্যাপার, অষ্টিয়ার ব্যাপার, ইহাতে আমার কিছু করিবার নাই।"[২] ইহার ফলে যুদ্ধ স্থানীয় না হইয়া ব্যাপক হইয়া পড়ে। উপরোক্ত যুক্তি ও প্রমাণের সাহায্যে আতাঁত লেখকগণ জার্মানীকে যুদ্ধের জন্য দায়ী করেন।

অন্যান্য শক্তির দায়িত্ব

প্রথম মহাযুদ্ধের পর এই যুদ্ধের কারণ সম্পর্কে আরও তথ্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। এই তথ্য হইতে দেখা যায় যে জার্মানী যুদ্ধের জন্য অংশতঃ দায়ী হইলেও প্রথম মহাযুদ্ধে অন্যান্য শক্তির দায়িত্ব কম ছিল না। সুতরাং প্রথম মহাযুদ্ধের জন্য জার্মানী একমাত্র দায়ী ইহা গ্রহণযোগ্য নহে। এই মতের সমর্থনে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি উল্লেখ করা হয়, যথা:—

(১) কাইজার যেমন উগ্রপন্থী জাতীয়তাবাদে আচ্ছন্ন হন তেমন ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশও জঙ্গী জাজীয়তাবাদে প্রভাবিত হইয়াছিল। কাইজার উইলিয়াম তাঁহার মাতাকে ফ্রান্সে শুভেচ্ছা সফরে পাঠাইলে ফরাসী জনসাধারণ তাঁহার প্রতি এমনই অপমানজনক ব্যবহার করে যে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে স্বদেশে ফিরিয়া আসিতে হয়।

(২) ত্রিশক্তি আতাঁত দ্বারা রাশিয়া, ফ্রান্স ও ইংলণ্ড, জার্মানীকে বেষ্টন করিবার চেষ্টা করে। পৃথিবীর অধিকাংশ উপনিবেশগুলি ইংরাজ ও ফরাসী শক্তি অধিকার করিয়া জার্মানীকে কোনঠাসা করিয়া রাখে। পর্তুগীজ উপনিবেশে জার্মানীকে অংশ দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়া ইংলণ্ড কথার খেলাপ করে।

(৩) ফ্রান্স ও রাশিয়া জার্মানীর বিরুদ্ধে এক জঙ্গী জোট গঠন করে। ফ্রাঙ্কো-রুশ চুক্তিতে (১৮৯৪ খ্রীঃ) স্পষ্ট ভাষায় বলা ছিল যে যদি জার্মানী সেনা সমাবেশ করে তবে ফ্রান্স ও রাশিয়া সৈন্য সমাবেশ করিবে। ১৮৯৪ খ্রীঃ জার্মানী উভয় দেশের সহিত মিত্রতায় আবদ্ধ ছিল। এই সময় ফ্রান্স ও রাশিয়া আগু বাড়াইয়া সৈন্য সমাবেশের কথা ভাবিয়া আক্রমণমূলক মনোভাব প্রকাশ করে।

(৪) সর্বশেষে দ্বিশক্তি চুক্তি অনুযায়ী জার্মানী ও অষ্ট্রিয়া পারস্পরিক সাহায্যের

১. Quoted by Lowes Dickinson—International Anarchy. P. 413-214.
২. Fay—Origin of World War I.

প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু এই চুক্তির আশ্রয় লইয়া অষ্ট্রিয়া একক ইচ্ছায় বলকানে যে আগ্রাসী নীতি নেয় তাহাকে সংযত করা জার্মানীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। অষ্ট্রিয়া, জার্মানীর তোয়াক্কা না করিয়া নিজ মতে চলিতে থাকে।[১] এই সময়ে কাইজার অষ্ট্রিয়াকে সংযত করিবার চেষ্টা করিয়া বিফল হন। তিনি ইংলণ্ডকে অষ্ট্রিয়ার মতিগতি সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দেন।[২] যুদ্ধের প্রথম দিকে অষ্ট্রিয়ার উপর জার্মানীর নিয়ন্ত্রণ ছিল না। যুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে অষ্ট্রিয়ার সামরিক দুর্বলতা প্রকট হইলে তখন অষ্ট্রিয়ার উপর জার্মানীর প্রভাব বাড়ে। সুতরাং জার্মানী বলকানে অষ্ট্রিয়াকে লেলাইয়া দেয় একথা মনে করা ভুল।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে বুঝা যায় যে প্রথম মহাযুদ্ধের জন্য একা জার্মানীই দায়ী ছিল না। পারস্পরিক সন্দেহ, ঔপনিবেশিক দ্বন্দ্ব, পরস্পর-বিরোধী জোট গঠন, কূটনৈতিক বিফলতা ও উগ্র জাতীয়তাবাদ যুদ্ধকে অনিবার্য করিয়া তুলে। রাজনীতি-বিদগণ মীমাংসার দ্বারা সমস্যা সমাধানের দিকে নজর না দিয়া, নিজ দেশের স্বার্থরক্ষার জন্যই ব্যস্ত হইয়া পড়েন। যুদ্ধ বন্ধের চেষ্টা অপেক্ষা যুদ্ধ জয়ের চেষ্টাই তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়ায়। ইহার ফলে প্রথম মহাযুদ্ধ বাধে।

প্রথম মহাযুদ্ধে যোগদানকারী দেশসমূহ (Major Participants in the First World War)ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে দুই প্রধান প্রতিপক্ষ ছিল যথা—জার্মানী, অষ্ট্রিয়া ও ইতালীকে লইয়া ত্রিশক্তি চুক্তি। যুদ্ধের সময় ইহাদের নাম হয় কেন্দ্রীয় শক্তি (Central powers)। পরে তুরস্ক, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, হাঙ্গেরী কেন্দ্রীয় শক্তিবর্গের সহিত যোগ দেয়।

মিত্র শক্তি ও কেন্দ্রীয় শক্তি

ইহার বিরুদ্ধে ছিল ত্রিশক্তি আতাঁত বা ত্রিশক্তি মৈত্রী। ত্রিশক্তি আতাঁতে ছিল রাশিয়া, ফ্রান্স ও ইংলণ্ড। যুদ্ধের সময় ইহাদের নাম হয় মিত্রশক্তি (Allies)। পরে মিত্র শক্তির সহিত বেলজিয়াম, সার্বিয়া ও ইংলণ্ডের ঔপনিবেশিক দেশ যথা ভারত, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি যোগ দেয়। যুদ্ধ চলাকালে ইতালী, জার্মানীর পক্ষ ত্যাগ করিয়া লণ্ডনের গোপন চুক্তির দ্বারা মিত্রশক্তির পক্ষে যোগ দেয়। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লব ঘটে। ইহার ফলে রাশিয়া যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া জার্মানীর সহিত ব্রেষ্টলিটভস্কের সন্ধি (Treaty of Brest Litovsk) স্থাপন করে। এই সংকট সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মিত্রশক্তির পক্ষ লইয়া জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দেয়। দূর প্রাচ্যে জাপানও ছিল ইংলণ্ডের মিত্রশক্তি। জাপানও জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। চীনও নিরপেক্ষতা ত্যাগ করিয়া জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ইহার ফলে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশই কম বেশী প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জড়াইয়া যায়।

প্রথম মহাযুদ্ধের গতি (Main Course of the First World War)ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে সর্বক্ষেত্রেই চলে। যুদ্ধের প্রথম

১. Origin of First World War.

২. Ibid.

দিকে জার্মানী দুই রণাঙ্গনে যথা, পূর্ব সীমান্তে রুশ সেনার বিরুদ্ধে ও পশ্চিম সীমান্তে ইঙ্গ-ফরাসী শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালায়। পশ্চিম রণাঙ্গনে জার্মান সেনাদল বেলজিয়াম অধিকার করিয়া ফ্রান্সে ঢুকিয়া পড়ে এবং প্যারিসের ১৫ মাইলের মধ্যে উপস্থিত হয়। কিন্তু ফরাসী সেনাপতি জোফ্রে পাল্টা আক্রমণ চালাইয়া মার্ণের (Marne) যুদ্ধে জার্মানদের বিতাড়িত করেন। ইংরাজ সেনা ভার্দুনের যুদ্ধে (Verdun ফরাসী-বেলজিয়াম সীমান্ত শত্রুমুক্ত করে। ইংরাজগণ ট্যাংক ব্যবহার করিয়া জার্মান সেনাদলকে পর্যুদস্ত করিয়া দেয়। ১৯১৬ খ্রীঃ সোমের (Somme) যুদ্ধে মিত্রশক্তি জার্মানগণকে হঠাইয়া দেয়। কিন্তু অল্পকালের মধ্যে জার্মান সেনাপতি ফিল্ড মার্শাল হিণ্ডেনবুর্গ ও তাঁহার সহকারী কার্ল লুডেনডর্ফ নূতন যুদ্ধকৌশল দেখাইয়া মিত্র শক্তিকে কোণঠাসা করিয়া ফেলেন। তিনি এন্তোয়ার্পের যুদ্ধে (Ante-warp) মিত্রশক্তিকে হঠাইয়া পুনরায় বেলজিয়ামে ঢুকিয়া পড়েন।

ফ্রান্সের যুদ্ধ

পূর্ব রণাঙ্গনে যুদ্ধের প্রথম দিকে রুশ সেনাদল গ্যালিসিয়া অধিকার করে এবং জার্মানীর ভিতর ঢুকিয়া পড়ে। কিন্তু ফিল্ড মার্শাল হিণ্ডেনবুর্গের রণ-কৌশলে রুশ সেনাদল বিপর্যস্ত হইয়া পড়ে। টেনেনবার্গের যুদ্ধে হারিয়া রুশ সেনাদল বিচ্ছিন্ন হয়। ক্রমে জার্মানগণ রাশিয়ার ইউক্রেন, ক্রিমিয়া প্রভৃতি স্থান দখল করিলে রুশ সেনাদলের মনোবল ভাঙিয়া পড়ে। ইতিমধ্যে ১৯১৭ খ্রীঃ রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লব ঘটে। জার সরকারের পতন হইলে নবগঠিত কমিউনিষ্ট সরকার জার্মানীর সহিত ব্রেষ্টলিটভস্কের সন্ধি (১৯১৭ খ্রীঃ) স্থাপন করে। পূর্ব রণাঙ্গনের যুদ্ধ শেষ হয়।

রুশ সীমান্তে যুদ্ধ

১৯১৭ খ্রীঃ প্রথম মহাযুদ্ধের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বৎসর ছিল। পূর্ব রণাঙ্গনে ব্রেষ্ট লিটভস্কের সন্ধি দ্বারা রাশিয়ার সহিত যুদ্ধ শেষ হইলে সম্মিলিত জার্মান বাহিনী প্রবল পরাক্রমে জলপ্রপাতের ন্যায় পশ্চিম রণাংগনে ঝাঁপাইয়া পড়ে। এদিকে অষ্ট্রিয়াও সুযোগ বুঝিয়া ইতালী আক্রমণ করে। এই যৌথ চাপে ইংগ-ফরাসী মিত্রশক্তি ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম করে।

পশ্চিম রণাঙ্গনে পুনরায় যুদ্ধ

যুদ্ধের এই সংকটকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাহার নিরপেক্ষতা ত্যাগ করিয়া মিত্রশক্তির সমর্থনে যুদ্ধে যোগ দেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যোগ দিলে যুদ্ধের গতি দ্রুত মিত্র শক্তির অনুকূলে চলিয়া যায়। জার্মানী ক্রমশঃ শক্তিহীন হইয়া পড়ে। জার্মানীর অভ্যন্তরে কাইজারের বিরুদ্ধে এক অভ্যুত্থান হইলে কাইজারের পতন হয়। ১৯১৮ খ্রীঃ নভেম্বর মাসে জার্মানী মিত্রশক্তির নিকট আত্মসমর্পণ করে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যোগদান

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সমুদ্রপথেও ঘোরতর রূপে আরম্ভ হয়। ভারী যুদ্ধ জাহাজের শক্তিতে জার্মানী মিত্রশক্তির সমকক্ষ ছিল না। জার্মানীর পক্ষে ভারী যুদ্ধ জাহাজ বানাইয়া মিত্র পক্ষের সমকক্ষ হওয়া সম্ভব ছিল না। এজন্য জার্মান নৌ-সেনাপতি এ্যাডমিরাল টারপিৎস (Admiral Turpiz) ইংলণ্ড ও অন্যান্য শত্রুদেশের যুদ্ধ জাহাজ সাবমেরিণ দ্বারা ডুবাইয়া তাহাদের নৌশক্তিকে জার্মানীর

নৌযুদ্ধ

নীচে নামাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করেন। টারপিৎসের এই রণ-কৌশলকে "নেতিবাচক যুদ্ধ" (Negative war) বলা হয়। জার্মান সাবমেরিণ বা ইউ বোটের আক্রমণে বহু ইংরাজ ও মার্কিন যুদ্ধ জাহাজ ধ্বংস হয়। শেষ পর্যন্ত ইংরাজ নৌ-সেনাপতিগণের রণকৌশলে জার্মান নৌ-বহর ধ্বংস হয়। মিত্রশক্তির নৌ-বাহিনী জার্মানীকে অবরোধ করে। এই সময় জাটল্যাণ্ডের নৌযুদ্ধ বিশেষ খ্যাতিলাভ করে। এই যুদ্ধে ইংরাজ নৌবহর বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেয়।

মধ্য প্রাচ্য ও দূর প্রাচ্য

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ মধ্য প্রাচ্য ও দূর প্রাচ্যেও বিস্তার লাভ করে। মধ্য প্রাচ্যে তুরস্কের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ ভারতীয় বাহিনী মেসোপোটেমিয়ার কুত-এল-আমেরায় এবং তুরস্কের নিকট গ্যালিপোলিতে বিশেষ সাফল্য লাভ করে। দূর প্রাচ্যে জাপান, জার্মান উপনিবেশ শাং-টুং অধিকার করে। চীনও কিছু কিছু জার্মান উপনিবেশ অধিকার করে। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ দিকে জার্মানী জেপলিন নামে এক আকাশ যান হইতে আক্রমণ চালাইবার ব্যবস্থা করে। কিন্তু ইহা বিশেষ কার্যকরী হয় নাই। তবুও আকাশপথে যুদ্ধের সূচনা প্রথম মহাযুদ্ধে দেখা যায়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ছিল এক সর্বাত্মক যুদ্ধ। এই যুদ্ধে সামরিক ও অসামরিক সকল শ্রেণীর লোকই সমান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই যুদ্ধের ব্যাপকতা ও ধ্বংসলীলা আগেকার সকল যুদ্ধকে ছাড়াইয়া যায়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকার ভূমিকা (U. S. A. in the First World War) ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 'মনরো নীতি' অনুযায়ী ইওরোপীয় যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকে। মার্কিন প্রেসিডেণ্ট উইলসন ঘোষণা করেন যে "আমেরিকা নামে ও কাজে উভয় দিক হইতেই নিরপেক্ষ থাকিবে।"[১] আমেরিকা এই যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকিলেও যুদ্ধের সময় মিত্র শক্তিকে বহু পণ্য ও যুদ্ধাস্ত্র বিক্রয় করে। আমেরিকার অস্ত্র পাইয়া মিত্রশক্তি প্রবল হইয়া পড়ে। জার্মানী ইহাতে মরিয়া হইয়া ঘোষণা করে যে ইংলণ্ডের দরিয়ায় কোন জাহাজ দেখিলেই তাহাকে ডুবাইয়া দেওয়া হইবে। এই ঘোষণা বলে জার্মানী আমেরিকার নিরপেক্ষতাকে গ্রাহ্য না করিয়া আমেরিকার পণ্য বোঝাই জাহাজ ডুবাইতে আরম্ভ করিলে জার্মান-মার্কিন সম্পর্ক তিক্ত হইয়া উঠে। অবশেষে আমেরিকার সরকারী জাহাজ গালফ্লাইট (Gullflight) ও আমেরিকার বিলাসবহুল যাত্রীবাহী জাহাজ লুসিটানিয়াকে (Lusitania) জার্মানী টর্পেডো দ্বারা ডুবাইয়া দিলে আমেরিকায় জনমত তীব্র জার্মান বিরেধী হইয়া পড়ে। লুসিটানিয়া জাহাজে ১৬০০ আমেরিকান যাত্রী ডুবিয়া মারা যায়। প্রেসিডেণ্ট উইলসন মহাসমুদ্রে নিরপেক্ষ জাতির অবাধ নৌচলাচলের অবাধ অধিকার মানিয়া চলার জন্য জার্মানীকে সতর্ক করিয়া চিঠি দিলে জার্মানী সন্তোষজনক উত্তর দেয় নাই। ইহার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জার্মানী ও তাহার মিত্রশক্তির উপর যুদ্ধ ঘোষণা করে।

মার্কিন-জার্মান বিরোধ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উপরোক্ত কারণ দেখাইয়া যুদ্ধে নামিলেও আরও অনেক কারণে

১, "America will be neutral in fact and in name".

মার্কিন সরকার যুদ্ধে যোগ দেয়। আমেরিকার জনসংখ্যার বৃহৎ অংশ হইল ইংলণ্ড হইতে আগত। ইংলণ্ডের প্রতি এই সকল লোকের ঘোর সহানুভূতি ছিল। মাতৃভূমির দুর্দিনে তাহার পাশে দাঁড়াইবার জন্য আমেরিকার জনমত তাহাদের সরকারকে চাপ দেয়। এছাড়া আমেরিকায় সংবাদপত্রের মাধ্যমে ইংলণ্ড জোর জার্মান-বিরোধী প্রচার চালাইয়া আমেরিকার জনমতকে প্রভাবিত করে। আমেরিকা মনে করিত যে জার্মানীর হাতে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের পতন হইলে আমেরিকার নিরাপত্তা বিপন্ন হইবে। আমেরিকার সেনাপতিগণ মনে করিতেন যে ইংলণ্ডকে পরাজিত করিয়া জার্মানী ইহার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেই তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করিয়া আক্রমণ করিবে। ইঙ্গ-ফরাসী উপনিবেশে আমেরিকা বাণিজ্যের যে সকল সুযোগ-সুবিধা পাইত, জার্মানীর নিকট তাহা পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। মার্কিন শিল্পপতি ও ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীগণ যুদ্ধের সময় ইংলণ্ড ও ফ্রান্সকে যে ঋণ দেন ইংলণ্ড ও ফ্রান্স পরাজিত হইলে তাহা উদ্ধার করা শক্ত ছিল। এই সকল কথা ভাবিয়া ১৯১৭ খ্রীঃ উইলসন মার্কিন কংগ্রেসের নিকট জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সুপারিশ করেন। মার্কিন কংগ্রেস ১৯১৭ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে জার্মানী ও তাহার মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। উইলসন ইহার পর দেশবাসীকে উৎসাহিত করার জন্য বলেন যে, "পৃথিবীতে গণতন্ত্রকে নিরাপদ করিবার জন্যই আমেরিকা যুদ্ধে যোগ দিয়াছে।"[১]

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ্য

প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানীর পরাজয়ের কারণ (Reasons for Germany's defeat in the First World War)ঃ প্রথম মহাযুদ্ধের গোড়ার দিকে কাইজারের জার্মানী বিস্ময়কর সাফল্যলাভ করিলেও এই যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত শোচনীয় পরাজয় বরণ করে। জার্মান সেনা বীরত্ব ও দেশপ্রেম দেখাইলেও এবং জার্মান সেনাপতিমণ্ডলী যুদ্ধে বহু কৃতিত্ব দেখাইলেও জার্মানীর পতন ঘটে। জার্মানীর পতন অনেকটা পূর্ব নির্ধারিত ছিল একথা বলা যায়।

জার্মানীর রাজনৈতিক দলের মধ্যে সোস্যাল ডেমোক্র্যাটগণ আগাগোড়া কাইজারের যুদ্ধ নীতির বিরুদ্ধে ছিল। এই দল ছিল খুবই জনপ্রিয়। কাইজার স্বৈরশাসন চালাইয়া তাহাদের দমাইয়া রাখেন মাত্র। ১৯১৮ খ্রীঃ জার্মানীর পরাজয় আসন্ন হইলে এই দলের নেতৃত্বে জনসাধারণ কাইজারের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য বিদ্রোহ করে। ফলে কাইজারের পতন হয়। জার্মানীতে প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়। নূতন প্রজাতন্ত্রী সরকার আর যুদ্ধ চালাইতে আগ্রহী ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, জার্মান সমর নীতির অনেক ত্রুটি ছিল। জার্মানী সাময়িক ও স্বল্পস্থায়ী যুদ্ধে অপ্রতিরোধ্য ছিল, কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে জয়লাভ জার্মানীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। মিত্রশক্তির ন্যায় সাম্রাজ্য না থাকায় দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের রসদপত্র, লোকবল যোগাড় করা জার্মানীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাছাড়া ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া ও আমেরিকার ন্যায় বৃহৎ শক্তিগুলির বিরুদ্ধে একক যুদ্ধ চালান জার্মানীর

কাইজারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

জার্মান সামরিক ত্রুটি

১. "America has joined the war to make the World safe for democracy."

পক্ষে অসম্ভব ছিল। জার্মানী যদি কূটনীতির দ্বারা মিত্রশক্তিকে দুর্বল ও বিভক্ত করিতে পারিত তবে হয়ত জার্মানীর সাফল্যের সম্ভাবনা থাকিত। কিন্তু জার্মান কূটনীতি মিত্রশক্তিকে দুর্বল করিতে ব্যর্থ হয়। তৃতীয়তঃ, জার্মানী আক্রমণমূলক যুদ্ধে পটু ছিল কিন্তু আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে পটু ছিল না। রাশিয়ার ন্যায় বিশাল ভূভাগ না থাকায় জার্মানী একটি যুদ্ধে হারিয়া গেলে তাহার পিছু হটিয়া দাঁড়াইবার স্থান ছিল না। এই কারণে যুদ্ধের প্রথমে গোড়ার দিকে জার্মান সেনাপতিগণ আক্রমণমূলক যুদ্ধের পরিকল্পনা করেন। কিন্তু জার্মানীকে যখন আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ করিতে হয় তখন পিছাইয়া দাঁড়াইবার স্থানাভাবে, রসদপত্র ও লোকবলের অভাবে তাহার পতন ঘটে।

আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে অপটুত্ব

জার্মানীর পরাজয়ের জন্য নৌশক্তির অভাব একটি প্রধান কারণ। আধুনিক যুদ্ধে নৌশক্তি ছাড়া যুদ্ধ জয় সম্ভব নহে। জার্মানী ইউ বোটের দ্বারা মিত্রশক্তির জাহাজ ব্যাপকভাবে ডুবাইলেও, মিত্রশক্তি ইউ বোট প্রতিরোধের ব্যবস্থা আবিষ্কার করিতে ইউ বোট আক্রমণ অকার্যকরী হয়। শেষ পর্যন্ত ইঙ্গ-ফরাসী-মার্কিন নৌশক্তি জার্মানীকে অবরোধ করিয়া ফেলে। এই অবরোধের চাপে জার্মানীতে খাদ্য ও রসদপত্র আমদানী বন্ধ হইয়া যায়। ফলে জার্মানী আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়।

নৌশক্তির অভাব

সর্বশেষে বলা যায় যে আমেরিকা মিত্রশক্তির সহিত যোগ দিলে যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়া যায়। মিত্রশক্তির পাশে আমেরিকা তাহার বিরাট শক্তি লইয়া দাঁড়াইলে জার্মানী একা তাহার প্রতিরোধে বিফল হয়। এছাড়া ফ্রান্সের জনসাধারণ জার্মানীর বিরুদ্ধে মরণপণ লড়াই করে। ফ্রান্সে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ জনযুদ্ধে পরিণত হয়।

আমেরিকার ভূমিকা

প্যারিসের শান্তি সম্মেলন ও শান্তি চুক্তিসমূহ, ১৯১৯—২৩ খ্রীঃ (The Peace Congress of Paris and the Peace Settlements of 1919-23):

চতুর্দশ দফা

জার্মানীর আত্মসমর্পণের পর, ১৯১৯ খ্রীঃ ইওরোপীয় ও অন্যান্য শক্তিসমূহ ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে শান্তি চুক্তি রচনার জন্য সমবেত হয়। প্যারিসের শান্তি সম্মেলনে আহূত হইবার আগেই মার্কিন প্রেসিডেণ্ট উইলসন তাঁহার "চতুর্দশ দফা" (Fourteen points) ৮ই জানুয়ারী, ১৯১৮ খ্রীঃ ঘোষণা করিয়া কি কি শর্তে জার্মানী ও তাহার মিত্রশক্তির সহিত শান্তি স্থাপিত হইবে তাহা ঘোষণা করেন। "চতুর্দশ দফায়" নিরপেক্ষ দেশের অবাধ নৌচলাচলের অধিকার, গোপন চুক্তি নাকচ, অবাধ বাণিজ্য, জাতি সংঘ প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়। এছাড়া জার্মানীকে তাহার আইনগত সীমান্তে ফিরিয়া যাইতে এবং বলপূর্বক অধিকৃত স্থান ছাড়িয়া দিতে বলা হয়। "এক জাতি, এক রাষ্ট্র" (one nation, one state) নীতি লইয়া ইওরোপের পুনর্গঠন এবং স্বাধীন পোল্যাণ্ড প্রতিষ্ঠার কথাও বলা হয়।

প্যারিসের শান্তি সম্মেলনে প্রেসিডেণ্ট উইলসন তাঁহার "চতুর্দশ দফা" পুনরায় ঘোষণা করেন। ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ ও ফরাসী প্রধানমন্ত্রী ক্লেমাঁসু (Clea-

menceau) শান্তি সম্মেলনের প্রধান স্তম্ভ ছিলেন। শান্তি চুক্তি রচনার সময় তাঁহারা "ন্যায় বিচার", "পৃথিবীর জনগণের ইচ্ছাকে রূপ দান" প্রভৃতি আদর্শবাদের কথা বলেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে বৃহৎ শক্তিগুলির স্বার্থ শক্তিসাম্য, জাতীয়তাবাদ, ফ্রান্সের নিরাপত্তা প্রভৃতি বাস্তব সমস্যার সহিত খাপ খাওয়াইয়া শান্তি চুক্তি গঠন করিতে হয়। প্যারিসের শান্তি সম্মেলনে তিন প্রধান যথা উইলসন, লয়েড জর্জ ও ক্লেমাঁসু সকল বিষয়ে কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। ইতালীর প্রধানমন্ত্রী আরল্যাণ্ডো অন্যতম প্রধান শক্তি হিসাবে যোগ দিলেও, ইতালীর স্বার্থ

ইওরোপ ও ফ্রান্সের লক্ষ্য



ক্লেমাঁসু



লয়েড জর্জ

উপেক্ষিত হওয়ায় তিনি ভগ্ন হৃদয়ে সম্মেলন ত্যাগ করেন। এজন্য প্যারিসের শান্তি-চুক্তিকে "উইলসনের আদর্শবাদ, ক্লেমাঁসুর বাস্তববাদ ও লয়েড জর্জের সুবিধাবাদের" ফসল বলা যায়।

প্যারিসের শান্তি চুক্তি রচনার সময় নিম্নলিখিত নীতিগুলিকে প্রধানতঃ অনুসরণ করা হয়—(১) জার্মানীকে যুদ্ধের জন্য দায়ী করা ; (২) ভবিষ্যতে যাহাতে জার্মানী পুনরায় ইওরোপের শান্তি ভঙ্গ না করে তাহার ব্যবস্থা করা ; (৩) জার্মানীকে যুদ্ধাপরাধের জন্য শাস্তি দেওয়া ; (৪) ইওরোপে শক্তিসাম্য বজায় রাখা ; (৫) উইলসনের ভাবধারা অনুযায়ী জাতীয়তাবাদকে রূপায়িত করা ; (৬) ফ্রান্সের নিরাপত্তা বজায় রাখা ; (৭) ইওরোপে ভবিষ্যতে শান্তি রক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন ; (৮) ইওরোপে রাজনৈতিক ন্যায় বিচার স্থাপন ; (৯) গণতন্ত্রকে রক্ষা করা প্রভৃতি।

ভার্সাই শান্তিচুক্তির নীতিসমূহ

জার্মান ও তাহার মিত্ররাষ্ট্রগুলির সহিত শান্তি বৈঠকে নিম্নলিখিত সন্ধিগুলি স্থাপন করা হয়। যথা—(১) জার্মানীর সহিত ভার্সাইয়ের চুক্তি (Treaty of Versailles) ; (১) অস্ট্রিয়ার সহিত সেণ্ট জার্মেন এন লাইয়ের চুক্তি (Treaty of St. Germain en Lye) ; (৩) বুলগেরিয়ার সহিত নিউলির চুক্তি (Treaty of Neuilly) ; (৪) হাঙ্গেরীর সহিত ট্রিয়ানন-এর চুক্তি (Treaty of Trianon) ; তুরস্কের সহিত

সেভরের চুক্তি (Treaty of Sevres) এবং পরে সেভরের চুক্তির বদলে লসেনের চুক্তি, ১৯২৩ খ্রীঃ (Treaty of Lausanne) ।

ভার্সাইয়ের চুক্তি, ১৯১৯ খ্রীঃ (Treaty of Versailles) ঃ বিজয়ী মিত্রশক্তিবর্গ ও পরাজিত জার্মানীর মধ্যে ভার্সাই সন্ধি ১৯১৯ খ্রীঃ স্বাক্ষরিত হয়। যুদ্ধের শেষ দিকে কাইজারের পতন হইলে জার্মানীতে প্রজাতন্ত্রী সরকার স্থাপিত হয়। এই সরকারের প্রতিনিধিদল শান্তি চুক্তি সম্পর্কে আলাপ-আলোচনার জন্য প্যারিসে উপস্থিত হইলে গর্বিত মিত্রশক্তিবর্গ এই প্রতিনিধিদলকে চুক্তি রচনার আলোচনায় অংশগ্রহণ করিতে দেয় নাই। জার্মানীকে যুদ্ধ অপরাধী বলিয়া ঘোষণা করিয়া, ভার্সাই সন্ধির খসড়া মিত্রশক্তিগণই রচনা করে। জার্মানীর প্রতিনিধিগণের সহিত চুক্তির সম্পর্কে কোন আলাপ আলোচনা করা হয় নাই। ফ্রান্সের ভার্সাই শহরের কাঁচের প্রাসাদে যেখানে ১৮৭০ খ্রীঃ বিসমার্ক পরাজিত ফ্রান্সকে সন্ধি স্বাক্ষর করাইয়াছিলেন সেইখানে পরাজিত জার্মানীকে বিজয়ী ফ্রান্স ভার্সাই সন্ধি স্বাক্ষর করায়। জার্মান প্রতিনিধিদলকে একবার মাত্র চুক্তির খসড়া দেখিতে দেওয়া হয়। তাহার পর তাহাদের আপত্তিতে কর্ণপাত না করিরা তাহাদের সন্ধি স্বাক্ষরে বাধ্য করা হয়। জার্মান প্রতিনিধিদলকে যুদ্ধাপরাধী গণ্য করিয়া তাহাদের প্রতি অসম্মানজনক ব্যবহার করা হয়। সন্ধি স্বাক্ষরের পর জার্মান প্রতিনিধি দলের নেতা এজন্য সতর্ক করিয়া দিয়া বলেন যে "জার্মানীর ন্যায় শক্তিশালী দেশ এই ব্যবহার সহ্য করিবে না।"

জার্মান প্রতিনিধি দলের প্রতি অবমাননা

(১) ভার্সাই সন্ধির দ্বারা জার্মানী ফ্রান্সকে আলসাস ও লোরেন ফিরাইয়া দেয়। বেলজিয়ামকে ইউপেন, ম্যালমেডি ও মরিসনেট জেলা গণভোট সাপেক্ষে ছাড়িয়া দেয়। জার্মানী তাহার উত্তর সীমান্তে শ্লেজউইগ প্রদেশ ডেনমার্ককে ফিরাইয়া দেয়। মেমেল বন্দর লিথুয়ানিয়াকে ছাড়িয়া দেয়। জার্মানীর পূর্ব সীমান্তে পোল্যাণ্ড স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র হিসাবে গঠিত হয়। গণভোটের দ্বারা পোজেন ও পশ্চিম প্রাশিয়া পোল্যাণ্ডের সহিত সংযুক্ত হয়। জার্মানীর ভিতর দিয়া পোল্যাণ্ডকে সমুদ্রের সহিত সংযোগ রক্ষার জন্য রাস্তা দেওয়া হয়। এছাড়া জার্মানীর ডানজিগ বন্দরকে উন্মুক্ত বন্দর ঘোষণা করিয়া কার্যতঃ পোল্যান্ডকেই এই বন্দরের অধিকার দেওয়া হয়। জার্মানীর সাইলেসিয়া প্রদেশের একাংশ চেকোশ্লাভাকিয়াকে এবং অপর অংশ পোল্যাণ্ডকে দেওয়া হয়।

ভৌগোলিক শর্তাবলী

এছাড়া জার্মানীর উপনিবেশগুলি যাহা চীন, আফ্রিকা প্রভৃতি স্থানে অবস্থিত ছিল তাহা লীগের হাতে দেওয়া হয়। লীগ অফ নেশসন তাহা ম্যাণ্ডেট হিসাবে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সকে ছাড়িয়া দেয়। কার্যতঃ জার্মান উপনিবেশগুলি ইংলণ্ড, ফ্রান্সের হস্তগত হয়। জার্মানী তাহার পশ্চিম সীমান্তের সার প্রদেশ (Saar) ১৫ বৎসরের জন্য ফ্রান্সকে ছাড়িয়া দেয়।

ঔপনিবেশিক শর্তাবলী

জার্মানীর সামরিক সংগঠন ভাঙিয়া দেওয়া হয়। জার্মানীর যুদ্ধ জাহাজগুলি ইংলণ্ডকে ও বাণিজ্য জাহাজগুলি ফ্রান্সকে দিতে বলা হয়। জার্মানীর স্থল, জল

ও বিমান বাহিনী ভাঙিয়া দেওয়া হয়। ভবিষ্যতে এই সকল বাহিনী গঠন করা নিষিদ্ধ করা হয়। জার্মানীর সেনাপতিমণ্ডলীকে পদচ্যুত করা হয়; জার্মানীতে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা নিষিদ্ধ করা হয়; অস্ত্র-নির্মাণ নিষিদ্ধ হয়। জার্মান সরকারের অধীনে এক লক্ষের অধিক সৈন্য রক্ষা করা নিষিদ্ধ হয়। রাইন নদীর পূর্বতীর হইতে জার্মান সেনা সরাইয়া লইতে হয়। এই অঞ্চলকে অসামরিক এলাকা ঘোষণা করা হয়।

সামরিক শর্তাবলী

প্রথম মহাযুদ্ধের জন্য জার্মানীকে দায়ী করিয়া জার্মানীকে এক বিরাট অঙ্কের ক্ষতিপূরণ দিতে বলা হয়। শেষ পর্যন্ত এই ক্ষতিপূরণের পরিমাণ হয় ৬৬০০০০০০০০ পাউণ্ড। ক্ষতিপূরণের বাবদ ফ্রান্স ও ইতালীকে কয়লা সরবরাহের দায়িত্বও জার্মানীকে নিতে হয়। জার্মানীর নদী বিশেষতঃ রাইন নদীকে আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। ভার্সাই সন্ধির ২৩১ নং ধারা অনুযায়ী কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম ও তাঁহার উচ্চ কর্মচারীবর্গকে যুদ্ধ অপরাধী ঘোষণা করিয়া তাঁহাদের মিত্র শক্তির হাতে ছাড়িয়া দিতে বলা হয়। ভার্সাই সন্ধির প্রথম অধ্যায়ে বলা হয় যে আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষার জন্য একটি লীগ অফ নেশনস বা জাতিসংঘ স্থাপন করা হইবে।

অর্থ নৈতিক শর্তাবলী

জার্মান জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকগণ ভার্সাই সন্ধির তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। অপর দিকে গ্যাথন হার্ডি প্রমুখ ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ জার্মান সমালোচনার প্রত্যুত্তর দিয়া ভার্সাই সন্ধিকে সমর্থন করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ভার্সাই সন্ধির ন্যায় বিতর্কিত সন্ধি ইতিহাসে কমই দেখা যায়। যাহাই হউক ভার্সাই সন্ধির অনেকগুলি ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। এই কারণে এই সন্ধি স্থায়ী হইতে পারে নাই। কেহ কেহ ভার্সাই সন্ধির অকার্যকারিতা এবং ইহার ত্রুটিগুলি লক্ষ্য করিয়া মন্তব্য করেন যে "দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ হইল আসলে প্রথম মহাযুদ্ধের অনুসৃতি মাত্র।"[১] তাঁহাদের মতে ভার্সাই চুক্তিকে সন্ধি না বলিয়া 'যুদ্ধ বিরতি' বলা সঙ্গত। কারণ ইহার মধ্যেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীজ নিহিত ছিল।

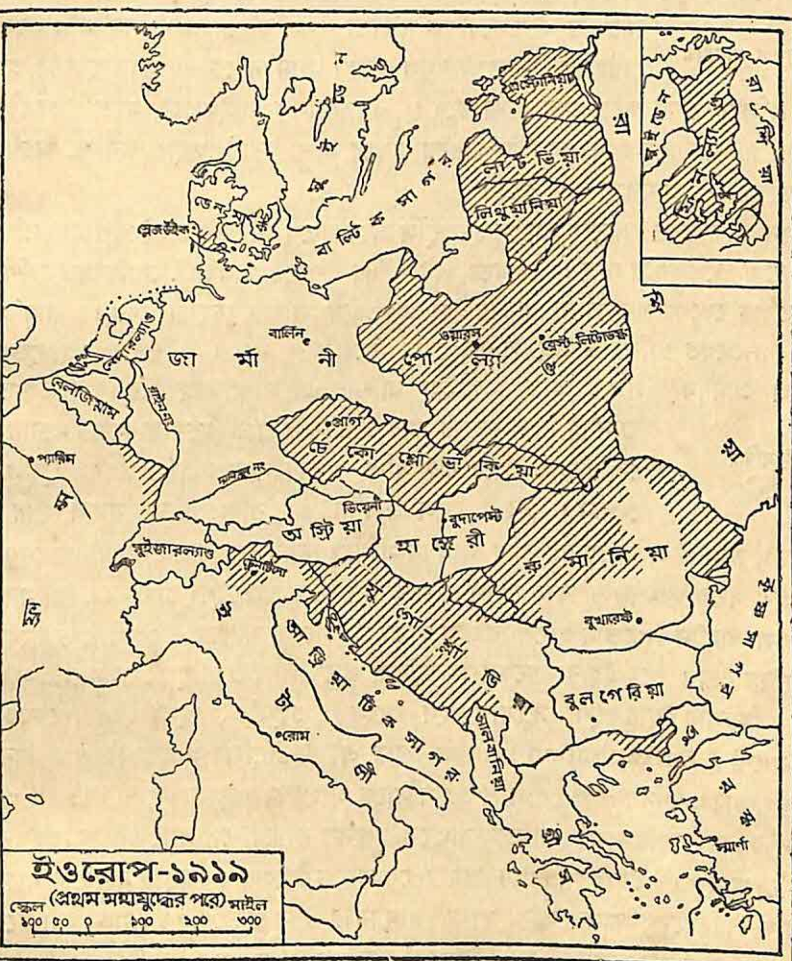
ভার্সাই সন্ধির জার্মান সমালোচনা

জার্মানীর মতে ভার্সাই সন্ধি ছিল একটি "জবরদস্তি সন্ধি" (Dictated Peace)। এই সন্ধি সম্পর্কে জার্মানীর কোন আপত্তি গ্রহণ করা হয় নাই। বিজয়ী মিত্রশক্তি এই সন্ধি পরাজিত জার্মানীর উপর চাপাইয়া দেন। ইহার পশ্চাতে মিত্রশক্তির প্রতিহিংসামূলক মনোভাব কাজ করিয়াছিল। এই সন্ধির নৈতিক ভিত্তি না থাকায় ইহাকে মান্য করার জন্য জার্মানীর কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। ভার্সাই সন্ধি সম্পর্কে জার্মানীর উপরোক্ত সমালোচনা অধিকাংশ ঐতিহাসিক সমর্থন করেন। সন্ধি স্থাপনের সময় যদি মিত্রশক্তি প্রতিশোধাত্মক মনোভাব না দেখাইতেন, তবে ভার্সাই সন্ধি অনেক উদার হইতে পারিত। ভার্সাই সন্ধির অপর দুর্বলতা এই ছিল যে ইহাতে একুইটি (Equity) বা ন্যায় বিচার নীতি প্রয়োগ করা হয় নাই। জার্মানীকে নিরস্ত্রীকৃত করা হইলেও ফ্রান্স ও অন্যান্য দেশের অস্ত্র হ্রাস

জবরদস্তি ও ন্যায় নীতির অভাব

১. "The Second World War is a continuation of the First World War."

করা হয় নাই। জার্মানীর ন্যায় একটি বৃহৎ দেশকে বেলজিয়ামের ন্যায় সামান্য সামরিক শক্তি রাখিতে অনুমতি দিয়া, জার্মান জাতির প্রতি ঘোর অবিচার করা হয়। সকল দেশের অস্ত্র হ্রাস না করিয়া কেবলমাত্র জার্মানীর অস্ত্র হ্রাস করা ছিল ঘোর অবিচার। ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি নিজ নিজ উপনিবেশ অক্ষুণ্ণ রাখে। তদুপরি জার্মান উপনিবেশগুলিকে লীগের দ্বারা অধিগ্রহণ করিয়া ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে ইহা ম্যাণ্ডেট হিসাবে বণ্টন করা



হয়। মোট কথা ইংলণ্ড, ফ্রান্স জার্মান উপনিবেশ প্রকারান্তরে হস্তগত করে। ভার্সাই সন্ধি দ্বারা জার্মান জাতীয়তাবাদকে অগ্রাহ্য করা হয়। জার্মান অধ্যুষিত জার্মানীর রাজ্যাংশ প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মধ্যে বণ্টন করা হয়। ফ্রান্সকে জার্মানীর সার অঞ্চল, পোল্যাণ্ডকে পোজেন ও পশ্চিম প্রাশিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়াকে সাইলেসিয়ার সুদেতেন অঞ্চল দিয়া জার্মান জাতিকে ব্যবচ্ছেদ করা হয়। ইহার ফলে জার্মানরা পিতৃভূমি হইতে

বিচ্ছিন্ন হইয়া বৈদেশিক জাতির অধীনে পড়ে। প্রেসিডেণ্ট উইলসন সকল জাতিকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দিলেও জার্মানীর ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম করা হয়।

ভার্সাই সন্ধির অর্থনৈতিক শর্তগুলি ছিল ন্যায়নীতি বিরোধী। চতুর্দশ দফায় ক্ষতিপূরণের কথা বলা না হইলেও জার্মানীকে যুদ্ধাপরাধী সাব্যস্ত করিয়া তাহার উপর ক্ষতিপূরণের বোঝা চাপাইয়া দেওয়া হয়। যুদ্ধে পরাজিত ও দুর্দশাগ্রস্ত জার্মানীর এই অর্থ প্রদানের ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু মিত্রশক্তি জার্মানীর এই দুরবস্থা গ্রাহ্য করে নাই। মিত্রশক্তি ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য দখল করিয়া এবং জার্মানীর কয়লা, লৌহ প্রভৃতি সম্পদ দখল করিয়া জার্মানীকে এই ক্ষতিপূরণের অর্থ দিতে বলিয়া ঘোর অবিচারের কাজ করে। ঐতিহাসিক রাইকারের মতে, "হংসীকে উপবাসী রাখিয়া সেই হংসী স্বর্ণডিম্ব প্রসব করিবে আশা করা" যেরূপ অন্যায়, মিত্রশক্তি জার্মানীর ক্ষেত্রে অনুরূপ কাজ করে।[১]

বৈষম্যমূলক ব্যবহার

ভার্সাই সন্ধির বিরুদ্ধে সমালোচনাগুলি অনেকাংশে অতিরঞ্জিত হইলেও এই সন্ধির বাস্তব ত্রুটি উপেক্ষণীয় নহে। প্রথমতঃ, এই সন্ধির পশ্চাতে জার্মানী, সোভিয়েত রাশিয়া ও নিরপেক্ষ দেশের সমর্থন না থাকায় ইহা একতরফা সন্ধির চেহারা নেয়। জার্মানী ছাড়া সোভিয়েত রাশিয়াও এই সন্ধির ঘোর বিরোধিতা করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে জার্মানীর সহিত হাত মিলাইয়া রাশিয়া এই সন্ধি ভঙ্গ করে। দ্বিতীয়তঃ, ভার্সাই সন্ধি রচনার সময় জার্মানীর প্রতি মিত্রশক্তি কঠোর মনোভাব দেখাইলেও পরে এই সন্ধি রক্ষার সময় তাঁহারা ঘোর দুর্বলতা দেখান। ইহার ফলে জার্মানী এই সন্ধি ভাঙিতে সাহস পায়।[২] তৃতীয়তঃ, ভার্সাই সন্ধি রচনার সময় জার্মান সীমান্ত নির্ধারণের কাজে যথেষ্ট যত্ন নেওয়া হয় নাই। ফলে জার্মানীর কোন কোন অংশ অন্যায়ভাবে প্রতিবেশী রাষ্ট্রভুক্ত হইয়া যায়। এই সকল জার্মান পিতৃভূমি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া চেকোশ্লোভাকিয়া ও পোল্যাণ্ডে সংখ্যালঘু হইয়া যায়। পরে ইহারা চেকোশ্লোভাকিয়া ও পোল্যাণ্ডে দারুণ গোলমালের সৃষ্টি করে। হিটলার ইহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন। চতুর্থতঃ, পূর্ব ইওরোপকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে (Balkanisation) বিভক্ত করায় এই রাষ্ট্রগুলির আত্মরক্ষার শক্তি বিনষ্ট হয়। পঞ্চমতঃ, জার্মানী ও পোল্যাণ্ডের সীমান্তে অহেতুক জটিলতা সৃষ্টি করা হয় এবং জার্মানীর ন্যায় শক্তিশালী জাতির স্বার্থকে অগ্রাহ্য করিয়া পোল্যাণ্ডের স্বার্থই বড় করিয়া দেখা হয়। ইহার পরিণামে জার্মান-পোল্যাণ্ড বিরোধ ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধে। সর্বশেষে, ক্ষতিপূরণ সমস্যা লইয়া ফ্রান্স, জার্মানীর উপর প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা করে। ইহার ফলে জার্মানীরা ভার্সাই সন্ধি সম্পর্কে সকল আস্থা হারায়।

ভার্সাই সন্ধির আসল ত্রুটি

অন্যান্য শান্তি চুক্তিসমূহ (Other Peace treaties) : (১) অষ্ট্রিয়ার সহিত সেণ্ট জার্মেন এন লাইয়ের চুক্তি সম্পাদন করা হয়। এই সন্ধির দ্বারা (ক) হ্যাপসবার্গ সাম্রাজ্য ব্যবচ্ছেদ করিয়া হাঙ্গেরী, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড, যুগোশ্লাভিয়া

১. "It was a policy of starving the goose and expect it to lay golden eggs".
২. "It was harsh in wrong places and built in wrong ways."

গঠিত হয়। (খ) অষ্ট্রিয়া একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম জার্মান রাষ্ট্রে পরিণত হয়। (গ) জার্মানীর সহিত অষ্ট্রিয়ার সংযুক্তি নিষিদ্ধ করা হয়। (ঘ) টাইরল, ডালমাশিয়া, ট্রিয়েষ্ট প্রভৃতি স্থান অষ্ট্রিয়া, ইতালীকে ছাড়িয়া দেয়। (ঙ) বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা যুগোশ্লাভিয়াকে, বুকোভিনা রুমানিয়াকে, গ্যালিসিয়া পোল্যাণ্ডকে অষ্ট্রিয়া ছাড়িয়া দেয়।

সেণ্ট জার্মেনের সন্ধি

(২) বুলগেরিয়ার সহিত নিউলির সন্ধি দ্বারা স্থির হয় যে, বুলগেরিয়া যুগোশ্লাভিয়াকে ম্যাসিডোনিয়া, গ্রীসকে পশ্চিম থ্রেস, রুমানিয়াকে দোব্রুজা ছাড়িয়া দিবে।

নিউলির সন্ধি

(৩) হাঙ্গেরীর সহিত ট্রিয়াননের সন্ধি দ্বারা স্থির হয় যে হাঙ্গেরী, (ক) চেকোশ্লোভাকিয়াকে স্লোভাকিয়া ছাড়িয়া দিবে। (খ) রুমানিয়াকে ট্রানসিলভ্যানিয়া, যুগোশ্লাভিয়াকে ক্রোশিয়া ছাড়িয়া দিতেও হাঙ্গেরী অঙ্গীকার করে। ইহার ফলে হাঙ্গেরীর আয়তন বহু পরিমাণে কমিয়া যায়।

ট্রিয়াননের সন্ধি

(৪) তুরস্কের সহিত সেভরের চুক্তি ১৯১৯ খ্রীঃ স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু নবীন তুর্কী নেতা কামাল আতাতুর্ক এই সন্ধি মানিতে অস্বীকার করেন। ফলে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হয়। শেষ পর্যন্ত ১৯২৩ খ্রীঃ ল্যসেনের (Lausanne (সন্ধি দ্বারা তুরস্কের সহিত চূড়ান্ত মীমাংসা স্থাপিত হয়। ল্যসেনের সন্ধির (১৯২৩ খ্রীঃ) ফলে (ক) তুরস্কের নিজ সাম্রাজ্যের ভিতর তাহার সার্বভৌম অধিকার স্বীকৃত হয়। (খ) কনষ্টান্টিনোপল, স্মার্ণা, পূর্বথ্রেস তুরস্ক ফিরিয়া পায়। (গ) তুরস্কের আরব সাম্রাজ্য যথা জোর্ডান, প্যালেষ্টাইন, মেসোপোটামিয়া, সিরিয়া ও হেজ্জাজ ইঙ্গ-ফরাসী ম্যাণ্ডেটের অধীনে স্থাপিত হয়। (ঘ) দার্দানালিস প্রণালী ও বসফোরাস উপসাগরকে আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়।

সেভরের ও ল্যসনের সন্ধি

এইভাবে প্রথম মহাযুদ্ধের পর শান্তি চুক্তিগুলি স্বাক্ষরিত হয়।

জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা (Foundation of the League of Nations) ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অপরিমেয় সম্পত্তির ক্ষয়-ক্ষতি, অসংখ্য মানুষের জীবন নাশ এবং নৈতিক অবক্ষয় চিন্তাশীল মানুষগণকে যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে সজাগ করিয়া দেয়। যুদ্ধে জয়লাভ করিলেই শান্তি আসিবে না একথা সকলেই বুঝিতে পারে। আন্তর্জাতিক বিবাদ-বিসম্বাদকে যদি ন্যায় ও সততার ভিত্তিতে শান্তিপূর্ণ উপায়ে না মিটান যায় তবে বার বার মানব জাতিকে সর্বনাশা যুদ্ধের গ্রাসে পড়িতে হইবে এই সত্য অনেকের মনে জাগে। আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট উইলসন আশা প্রকাশ করেন যে "এই যুদ্ধই মানব জাতির শেষ যুদ্ধ হইবে।[১] ১৯১৮ খ্রীঃ জানুয়ারী মাসে 'চতুর্দশ দফা' ঘোষণা করিয়া প্রেসিডেণ্ট উইলসন বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্য লীগ অফ নেশনস বা জাতি সংঘ স্থাপনের কথা বলেন। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের নেতাগণও যুদ্ধের ভয়াবহতা লক্ষ্য করিয়া ভবিষ্যতে যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য চেষ্টা চালান। ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী লর্ড গ্রে এজন্য একটি লীগ বা জাতি সংঘ প্রতিষ্ঠার

উইলসনের আদর্শবাদ

১. "This war and no further war. This is the war to end wars."

আশা প্রকাশ করেন। প্যারিসের শান্তি বৈঠকে ইংরাজ-মার্কিন মতের সমন্বয় সাধন করিয়া লীগ স্থাপনের জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত হয়। এই কমিটির সভাপতি পদে স্বয়ং প্রেসিডেণ্ট উইলসন কাজ করেন। বিভিন্ন দেশের সহিত আলাপ-আলোচনার পর এই কমিটি লীগের চুক্তিপত্র বা লীগ কভেন্যাণ্ট (League Covenant) রচনা করে। লীগ চুক্তিপত্রে প্রধানতঃ ইঙ্গ-আমেরিকান মতবাদই প্রাধান্য পায়। আমেরিকা হইতে নীতিগুলি এবং ইংলণ্ড হইতে লীগের চুক্তিপত্রের আইন-গুলি গ্রহণ করা হয়।[১] ভার্সাই সন্ধির ভিতর লীগ অফ নেশনসের চুক্তিপত্র সংকলিত করা হয়।


উইলসন

লীগ চুক্তিপত্রে লীগ অফ নেশনসের আদর্শ ও উদ্দেশ্য বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়। আন্তর্জাতিক সমবায় ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করা, বিশ্ব শান্তি ও নিরপত্তা স্থাপন করা, বিভিন্ন জাতির মধ্যে ন্যায় ও সম্মানের ভিত্তিতে সম্পর্ক স্থাপন, আন্তর্জাতিক আইনকে মানিয়া চলা লীগের আদর্শ বলিয়া গৃহীত হয়। দ্বিতীয়তঃ, লীগের সভ্যগণ যাহাতে আন্তর্জাতিক বিরোধ শান্তিপূর্ণ উপায়ে মিটাইয়া নেয় ও পৃথিবীর যুদ্ধ বন্ধ হয় ইহাও লীগের উদ্দেশ্যে ছিল। এছাড়া আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণের মাধ্যমে যুদ্ধের সম্ভাবনাকে নিরোধ করা এবং আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তির জন্য বিভিন্ন সংস্থা স্থাপন ছিল লীগের লক্ষ্য। তৃতীয়তঃ, নারী, বালক ও সমাজের অবহেলিত শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা, শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি নায্য ব্যবহার করা, বিশ্ব রেডক্রস গঠন প্রভৃতি লক্ষ্যও লীগ অফ নেশনস গ্রহণ করে।

লীগের আদর্শ

লীগ চুক্তিপত্রের ১০—১৬ নং ধারায় আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়। লীগের সভ্যগণকে যুদ্ধ বর্জন করিয়া লীগের ১০—১৬ নং ধারা অনুসারে তাহাদের বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। লীগের কোন সভ্য রাষ্ট্র যদি অন্য রাষ্ট্র কর্তৃক আক্রান্ত হয়, তবে সেই আক্রান্ত সভ্যকে লীগ যৌথ নিরাপত্তা (collective security) দানের প্রতিশ্রুতি দেয়। ইহার অর্থ ছিল যে লীগের একজন সভ্য আক্রান্ত হইলে লীগের সকল সভ্য আক্রমণকারীকে যৌথভাবে বাধা দিবে। আন্তর্জাতিক আদালত বা P. C. I. J. স্থাপন করিয়া আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তি এবং লীগ কাউন্সিলের দ্বারা বিরোধের মীমাংসার কথাও ইহাতে বলা হয়। লীগ চুক্তিপত্রের ১৬ নং ধারায় আক্রমণকারীকে শায়েস্তা করিবার জন্য আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে লীগ সভ্যগণের বাধ্যতামূলক অর্থনৈতিক অবরোধ এবং সম্ভব হইলে সামরিক ব্যবস্থা

আন্তর্জাতিক বিরোধের মীমাংসা

১. "America supplied the principle, the British the legal frame work."—Watters.

গ্রহণের কথাও বলা হয়। এইভাবে লীগ অফ নেশনস পৃথিবীতে শান্তিরক্ষার দায়িত্ব নেয়।

লীগ অফ নেশনস বা জাতিসংঘের কার্য পরিচালনার জন্য লীগকে কয়েকটি সংস্থায় ভাগ করা হয়। যথা ঃ—

(১) **সাধারণ সভা** (League Assembly) ঃ লীগের সকল সভ্যগণই সাধারণ সভার সভ্য হিসাবে গণ্য হইত। প্রতি সভ্যের একটি করিয়া ভোট দেওয়ার অধিকার ছিল। প্রতি বৎসর অন্ততঃ একবার সাধারণ সভার অধিবেশন আহ্বান করার ব্যবস্থা করা হয়। এই সভার কার্য পরিচালনার জন্য সভ্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে একটি রাষ্ট্রকে সভাপতি নির্বাচন করিত। লীগের সাধারণ সম্পাদকের রচিত বিষয়সূচী অনুযায়ী সাধারণ সভায় আলোচনা চলিত। লীগের এক্তিয়ারভুক্ত সকল বিষয়ে সাধারণ সভা আলাপ-আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার অধিকার ছিল। তবে লীগের পঞ্চম ধারা অনুযায়ী লীগের কার্য প্রণালী (procedure) ছাড়া অন্য বিষয়ে এই সভাকে সিদ্ধান্ত লইতে হইলে সকল সভ্যের একমত হইয়া সিদ্ধান্ত লইতে হইত। কোন নূতন রাষ্ট্রকে সভ্য হিসাবে গ্রহণ করিতে হইলে সাধারণ সভার $\frac{2}{3}$ ভোটে তাহা করা যাইত। সাধারণ সভা বিশ্ব শান্তি, আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা, সংখ্যালঘু সমস্যা, ম্যাণ্ডেট, রাজনৈতিক বিরোধ প্রভৃতি বিষয়ে সিদ্ধান্ত লইতে পারিত।

লীগ পরিষদ (League Council) ঃ লীগের কার্যাবলী পরিচালনা এবং লীগের আদর্শকে রূপায়িত করিবার জন্য লীগের একটি স্থায়ী পরিষদ (Council) ছিল। লীগের পরিচালনার (Executive) দায়-দায়িত্ব প্রধানতঃ এই পরিষদের (League Council) হাতে ছিল। ইহার নাম ছিল লীগ পরিষদ বা জাতিসংঘ পরিষদ। লীগের আইন অনুযায়ী লীগ পরিষদে ৫ জন স্থায়ী ও ৪ জন অস্থায়ী মোট ৯ জন সভ্য ছিল। লীগ পরিষদে স্থায়ী সভ্য ছিল ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইতালী, জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লীগে যোগ না দেওয়ার ফলে স্থায়ী সদস্য মাত্র ৪ জন হয়, যথা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইতালী ও জাপান। জাপান ১৯৩১ খ্রীঃ ও ইতালী ১৯৩৫ খ্রীঃ লীগের সদস্য পদ ত্যাগ করে। ফলে স্থায়ী সদস্য হিসাবে কেবলমাত্র ইংলণ্ড ও ফ্রান্স থাকিয়া যায়। পরে জার্মানী ও রাশিয়া নূতন সভ্য হিসাবে যোগ দেয়। লীগের পরিষদে স্থায়ী সভ্য সংখ্যা কমিয়া যাওয়ায় অস্থায়ী সভ্যের সংখ্যা বাড়ান হয়। কিন্তু বৃহৎ শক্তিগুলি ইহাতে না থাকিবার ফলে লীগের কার্যকারিতা নষ্ট হয়। যাহা হউক লীগ চুক্তি অনুযায়ী লীগ পরিষদকে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক বিরোধের মীমাংসা, আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আহ্বান, লীগের সাধারণ সভার নিকট রিপোর্ট প্রদান প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু লীগ পরিষদকে কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইলে সকল সভ্যের সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত লইতে হইত। কোন সভ্য অন্যমত হইলে লীগ পরিষদ কোন সিদ্ধান্ত লইতে পারিত না। ইহার ফলে লীগের কার্যকারিতা নষ্ট হয়।

লীগের সচিবালয় (Lcague Secretariat) ঃ লীগের কার্য পরিচালনার জন্য

লীগের মহাসচিবের (Secretary General) অধীনে জেনিভা শহরে একটি দপ্তর কাজ করিত। ইহাকে লীগের সচিবালয় বলা হয়।

লীগ অফ নেশনসের এই তিনটি বিভাগ ছাড়া লীগ চুক্তিপত্রের ১৪ নং শর্ত অনুযায়ী আন্তর্জাতিক বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য একটি স্থায়ী আদালত (P. C. I. J.) কাজ করিত। আন্তর্জাতিক আইনগত বিরোধ ও অন্যান্য বিরোধ এই আদালতে নিষ্পত্তি করা যাইত। লীগ পরিষদ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে এই আদালতের বিচারক নির্বাচন করিত এবং সাধারণ পরিষদ তাহা অনুমোদন করিত। এছাড়া লীগের অধীনে কয়েকটি **সহায়ক সংস্থা** যথা আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ প্রভৃতি স্থাপিত হয়।

এইভাবে লীগ অফ নেশনসের মাধ্যমে বিশ্বশান্তি রক্ষার চেষ্টা করা হয়।

তুরস্কের জাগরণ (Emergence of Turkey as a Modern Power)ঃ তুরস্কের মধ্যযুগীয় সমাজ ও শাসনব্যবস্থা তুরস্ককে একটি দুর্বল দেশে পরিণত করে। তুরস্কের কোন কোন সুলতান তুরস্কের দুর্বলতা দূর করিবার চেষ্টা করিয়া বিফল হন। সুলতান দ্বিতীয় মহম্মদ তুরস্কে তাঞ্জিমৎ (Janzimat) বা আলোক প্রাপ্ত সংস্কার প্রবর্তনে ব্যর্থ হন। মোল্লা ও রক্ষণশীল লোকেরা পুরাতন মধ্যযুগীয় ব্যবস্থাকে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা চালায়। ইহার ফলে তুরস্কের নাম হয় "ইওরোপের রুগ্ন মানুষ" (Sickman of Europe)। তুরস্কের খলিফাগণের স্বৈরনীতি, মোল্লাতন্ত্র এবং সংস্কারবিমুখিতার ফলে তুরস্ক ধীরে ধীরে ধ্বংসের পথে চলিতে থাকে। সুযোগ বুঝিয়া বিভিন্ন শক্তি তুরস্কের রাজ্য গ্রাস করিতে আরম্ভ করে। তুরস্কের দেশপ্রেমিক ব্যক্তিরা তুরস্কের এই পতন রোধ করিবার কথা ভাবিতে আরম্ভ করেন। এই উদ্দেশ্যে তুরস্কের নবীন জাতীয়তাবাদী সম্প্রদায়ের এক অংশ পাশ্চাত্য শিক্ষা পাইয়া তুরস্কের আধুনিকীকরণের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করে। এই সম্প্রদায়ের নাম হয় "তরুণ তুর্কী দল" (Young Turk Party)।

তরুণ তুর্কী আন্দোলন

এনভার পাশা, তালাত বেগ, কামাল পাশা ছিলেন তরুণ তুর্কী দলের সভ্য। ১৯০৮ খ্রীঃ, তরুণ তুর্কীগণ কামাল পাশার নেতৃত্বে তুর্কী সেনাদলকে নিজপক্ষে আনিয়া সুলতান ষষ্ঠ মহম্মদকে কতকগুলি আধুনিক সংস্কার চালু করিতে বাধ্য করে। তরুণ তুর্কী সমিতির প্রকৃত নাম ছিল "ঐক্য ও অগ্রগতি সমিতি" (Committee of Union and Progress)। খলিফার স্বৈরতন্ত্রের পরিবর্তে গণতান্ত্রিক শাসন, পার্লামেণ্ট স্থাপন, সামরিক বাহিনীর আধুনিকীকরণ, আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তন প্রভৃতি তরুণ তুর্কীদলের লক্ষ্য ছিল। তরুণ তুর্কী দল তুরস্কের ধ্বংসোন্মুখ সাম্রাজ্যকে দৃঢ়ভাবে রক্ষা করিবার সংকল্প নেয়। তাহারা তুরস্কের খ্রীষ্টান প্রজাগণের উপর তুর্কীকরণ নীতি প্রয়োগ করে। ফলে সাম্রাজ্যে বিদ্রোহ দেখা দেয়। ইতিমধ্যে বলকান যুদ্ধে এবং ইতালীর সহিত যুদ্ধে তুরস্ক শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইলে তরুণ তুর্কী দলের উচ্চাশা ব্যাহত হয়। এদিকে এই দলের নেতাগণের মধ্যে স্বার্থগত দ্বন্দ্ব দেখা দিলে তুরস্কের অগ্রগতির আশা ক্ষীণ হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় কামাল পাশা তরুণ তুর্কী দলের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করেন।

প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইলে তুরস্ক জার্মানীর মিত্রশক্তি হিসাবে পশ্চিমী শক্তির

বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করে। কিন্তু জার্মানীর ন্যায় তুরস্ক যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইলে বিজয়ী মিত্রশক্তি তুরস্কের উপর সেভরের সন্ধি (Treaty of Sevres) (বিশদ বিবরণ পূর্বে পৃঃ ২১১ দেখ) চাপাইয়া দেয়। তুরস্কের সুলতান ষষ্ঠ সহম্মদ স্বার্থপর নীতি লইয়া নিজ সিংহাসন বাঁচাইবার জন্য এই সন্ধি গ্রহণ করেন। কিন্তু মুস্তাফা কামাল পাশার নেতৃত্বে তুর্কী জাতীয়তাবাদীগণ এই সন্ধির তীব্র বিরোধিতা করেন।

সেভরের সন্ধি



কামাল আতাতুর্ক

মুস্তাফা কামাল পাশা বা কামাল আতাতুর্কের ১৮৮০ খ্রীঃ তুরস্কের এক সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম হয়। তিনি ছাত্রাবস্থায় নিজ প্রতিভার পরিচয় দিলে শিক্ষকগণ তাঁহাকে "কামাল" উপাধি দেন। কামাল পাশা তুরস্কের সামরিক বিভাগে চাকুরি নেন এবং সামরিক শিক্ষার জন্য ফ্রান্সে যান। ফ্রান্সে আসিয়া ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস পড়িয়া তিনি গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হন। ফ্রান্স ও ইওরোপীয় জাতিগুলির আধুনিক সমাজ ও শাসন ব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতি তাঁহাকে বিস্মিত করে। তুরস্কে ফিরিয়া আসিয়া তিনি স্বদেশকে মধ্যযুগীয় তন্দ্রা ও কুসংস্কার হইতে মুক্ত করিয়া নবীন জীবনদীপ্তিতে গড়িবার ব্রত নেন। এজন্য তিনি কয়েকটি গুপ্ত সমিতি গঠন করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তিনি গ্যালিপোলির যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব দেখাইয়া খ্যাতিলাভ করেন। প্রথম মহাযুদ্ধে তুরস্ক পরাস্ত হইয়া বিজয়ী মিত্রশক্তির চাপে সেভরের সন্ধি স্বাক্ষর করিলে তিনি এই সন্ধির বিরোধীতা করেন।

কামাল পাশার উত্থান

সুলতান ষষ্ঠ মহম্মদ এবং বিজয়ী ইংরাজ শক্তি কেহই কামাল পাশাকে পছন্দ করিতেন না। ইংরাজ প্রতিনিধির পরামর্শে তুরস্কের সুলতান, কামাল পাশাকে রাজধানী হইতে সরাইয়া আনাতোলিয়ার সৈন্যবাহিনীর পরিদর্শক হিসাবে নির্বাসিত করেন। বলা বাহুল্য আনাতোলিয়ায় কোন সেনাদলের অবস্থিতি ছিল না। ফলে কামাল পাশা কর্মহীন ও নির্বাসিত হইয়া পড়েন। কিন্তু কামাল তাহাতে না দমিয়া আনাতোলিয়ায় "তুর্কী জাতীয়তাবাদী" দল গঠন করেন এবং তুর্কীগণকে সেভরের সন্ধির বিরোধিতা করার আহবান জানান। ইতিমধ্যে কয়েকটি ঘটনা ঘটায় কামাল পাশার উদার মতবাদ জনসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। এই সময় ইংলণ্ডের পরোক্ষ সমর্থন লইয়া গ্রীস তুরস্ক আক্রমণ করিয়া স্মার্ণা (Smyrna) দখল করে। গ্রীক সেনাদল তুরস্কের নিরীহ নাগরিকগণকে হত্যা, লুণ্ঠন ও সম্পত্তি ধ্বংস করিলে তুর্কীগণের মনে সেভরের সন্ধি সম্পর্কে ক্ষোভ জাগে। দ্বিতীয়তঃ, গ্রীসের

জাতীয়তাবাদী দল গঠন

ভেনিজেলোস (Venizelos) ও ব্যাসিল জাহারফ (Basil Zaharoff) নামে দুই চক্রান্তকারী নেতা ইংলণ্ডের এজেণ্ট হিসাবে তুরস্ককে দমনের চেষ্টা চালান। ইংলণ্ডের এই গোপন চক্রান্তের কথা তুর্কীগণ জানিতে পারে। তৃতীয়তঃ, তুরস্কের এই বিপদের সময় তুরস্কের সমর্থনে ভারতে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে খিলাফৎ আন্দোলন ও অহিংস আন্দোলন চলায় ইংরাজ সরকার তুরস্ককে দমনে অপারগ হয়। কামাল পাশার আহবানে তুর্কী সেনাপতিগণ সেভরের সন্ধির বিরুদ্ধে "জাতীয় চুক্তি" (National Pact) সম্পাদন করে। কারণ সেভরের সন্ধি দ্বারা তুরস্কের ব্যবচ্ছেদ করার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এই সন্ধি ছিল তুরস্কের জাতীয় স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর। কামাল পাশার নেতৃত্বে তুর্কী নেতারা প্রতিজ্ঞা করে যে দরকার হইলে যুদ্ধ চালাইয়া সেভরের সন্ধি নাকচ করা হইবে। এমতাবস্থায় তুরস্কের সুলতান ষষ্ঠ মহম্মদ বাধ্য হইয়া তুরস্কের পার্লামেণ্ট আহবান করেন। পার্লামেণ্টের নির্বাচনে কামালপন্থীগণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। জাতীয় পার্লামেণ্টে কামালপন্থীগণ 'জাতীয় চুক্তি' অনুযায়ী প্রস্তাব নেয় যে ঃ—(১) সেভরের সন্ধি পরিবর্তন, (২) প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসন প্রবর্তন, (৩) তুরস্কের আভ্যন্তরীন বিষয়ে বৈদেশিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করা, (৪) তুরস্কের নিরাপত্তা স্থাপন প্রভৃতি নীতিকে কার্যকরী করা হইবে। তুরস্কের পার্লামেণ্টে জাতীয়তাবাদ প্রকাশিত হইলে ইংরাজ শক্তি আশঙ্কা বোধ করে। কারণ তুরস্ককে ব্যবচ্ছেদ করিয়া ইংরাজ শক্তি সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টায় ছিল। ইংরাজেরা তুরস্কের রাজধানী কনষ্টাণ্টিনোপল অধিকার করিয়া তুরস্কের পার্লামেণ্টের অধিকাংশ সভ্যকে গ্রেপ্তার করে। ইংরাজ সরকারের উদ্দেশ্য ছিল তুরস্কের জাতীয়তাবাদীদের দমন করিয়া সুলতানকে সেভরের সন্ধি স্বীকারে বাধ্য করা।

দেশের এই সংকট সময়ে, পার্লামেণ্টের কিছু সংখ্যক পলাতক সভ্য ও অন্যান্য প্রতিনিধি লইয়া কামাল পাশা আঙ্কারা শহরে তুরস্কের "জাতীয় পরিষদ" গঠন করেন। এই জাতীয় পরিষদ তুরস্ককে একটি প্রজাতন্ত্র বলিয়া ঘোষণা করে। সুলতানের সরকারকে বেআইনী ঘোষণা করা হয়। তুরস্কের সুলতান ষষ্ঠ মহম্মদ ইংরাজ সেনার সহায়তা লইয়া আঙ্কারা প্রজাতন্ত্রকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেন। তিনি কামাল পাশাকে হত্যার জন্য ধর্মবিশ্বাসী মুসলমানকে আদেশ দেন।[১] এইভাবে তুরস্কে ইংরাজ আশ্রিত সুলতানি সরকারের সহিত কামাল পাশার জাতীয়তাবাদী সরকারের গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয়। সুযোগ বুঝিয়া সেভরের সন্ধি কার্যকরী করার অজুহাতে গ্রীস, ফ্রান্স ও ইতালীয় সৈন্য তুরস্কে ঢুকিয়া পড়ে।

আঙ্কারা প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা

কামাল পাশা এই সংকটে বিচলিত না হইয়া সোভিয়েত রাশিয়ার মিত্রতা গ্রহণ করেন। সোভিয়েত অস্ত্র সাহায্য লইয়া তিনি ইতালী ও ফ্রান্সকে পরাজিত করেন। ইতিমধ্যে ফরাসী সরকারের মনোভাব পাল্টাইয়া যায়। ফরাসী সরকার উপলব্ধি করে যে সেভরের সন্ধির দ্বারা কেবলমাত্র ইংলণ্ড ও গ্রীসই লাভবান হইবে। এজন্য তাঁহারা কামাল পাশার আঙ্কারা সরকারকে

বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধ ও লণ্ডনের সন্ধি

১. Nehru—Glimpses of World History.

সমর্থন করেন। ফরাসী সরকার আঙ্কারা সরকারকে স্বীকৃতি দেন।[১] ফ্রান্সের সহিত আঙ্কারা প্রজাতন্ত্রের সন্ধির ফলে তুরস্কের সিরিয়া সীমান্তে যুদ্ধ বন্ধ হয়। কামাল পাশা সিরিয়া সীমান্ত হইতে সেনাদল সরাইয়া সমগ্র শক্তি লইয়া গ্রীক আক্রমণকারীগণকে বাধা দেন। কামালের বাহিনী স্মার্ণা ও সাকারিয়ার যুদ্ধে গ্রীক বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করিয়া তুরস্ক হইতে বিতাড়িত করে। ইংরাজ সরকার উপায় না দেখিয়া সেভরের সন্ধি পরিবর্তন করিয়া ল্যসেনের (Lausanne) সন্ধি (১৯২৩ খ্রীঃ) স্থাপন করেন। (শর্তগুলি পূর্বে পৃঃ ২১১ দেখ)। কামাল পাশা এই সন্ধির শর্ত নির্ধারণের সময় তাঁহার রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির পরিচয় দেন। তিনি বুঝিতে পারেন যে অতুর্কী জাতি লইয়া গঠিত তুরস্কের সাম্রাজ্যের মোহ ত্যাগ না করিলে তুরস্কের উন্নতি হইবে না। তুরস্কের জাতীয়তাবাদকে দৃঢ় করিতে হইলে কেবলমাত্র তুর্কীদের লইয়া রাজ্য গড়িতে হইবে। এজন্য তিনি কেবলমাত্র তুর্কী ভাষাভাষী জনগণকে লইয়া তুরস্কের রাজ্য সীমা নির্ধারণ করেন। তুরস্কে যে সকল গ্রীক বাস করিত তাহাদের গ্রীসে পাঠাইয়া, যে সকল তুর্কী গ্রীসে বাস করিত তাহাদের ফিরাইয়া নেওয়া হয়। ইহার ফলে তুরস্কের জাতীয়তাবাদ দূর হয়। কামাল পাশা তুরস্ক হইতে বৈদেশিক প্রভাব দূর করেন।

কামাল পাশার সংস্কার নীতি ঃ তুরস্কের আভ্যন্তরীন সংগঠন

স্বাধীন ও সার্বভৌম তুরস্ক গঠনের পর কামাল পাশা তুরস্কের আভ্যন্তরীন সংগঠনের কাজে হাত দেন। এই উদ্দেশ্যে জাতীয় সভা তুরস্কের জন্য একটি নূতন সংবিধান রচনা করে। (১) জাতীয় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯২৩ খ্রীঃ সুলতানের পদ লোপ করা হয়। তুরস্ক একটি প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়। মুস্তাফা কামাল পাশা ইহার প্রেসিডেণ্ট বা রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। সুলতান ষষ্ঠ মহম্মদকে দেশদ্রোহিতার জন্য বিচার করার আদেশ দেওয়া হয়। তিনি একটি ইংরাজ যুদ্ধ জাহাজে চড়িয়া ইংলণ্ডে পলায়ন করেন। (২) খলিফার বা ধর্মগুরুর পদ ১৯২৪ খ্রীঃ লোপ করা হয়। (৩) তুরস্ককে ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে গঠন করার উদ্দেশ্যে সংবিধানে "ধর্ম" কথাটি বাদ দেওয়া হয়। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ধর্মীয় প্রচার নিষিদ্ধ করা হয়। (৪) "স্বাধীনতার বিচারালয়" (Tribunal of Independence) নামক বিশেষ আদালত দ্বারা রাষ্ট্রবিরোধী সকল কাজ ও ব্যক্তিকে দমন করা হয়। এমন কি কামাল পাশার অন্তরঙ্গ ব্যক্তিগণও এই বিচারালয় দ্বারা দণ্ডিত হন। (৫) তুরস্কে ধর্মীয় গোঁড়ামী ও পুরাতনতন্ত্রকে ধ্বংস করিয়া আধুনিকতা চালু করিবার জন্য ইসলামের প্রতীক ফেজটুপী পরা নিষিদ্ধ করা হয়। গোঁড়া পুরাতন-পন্থীরা এজন্য দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধাইলে তাহা কঠোর হস্তে দমন করা হয়। (৬) ইসলামীয় ওয়াকফ, মঠ ও দরগাগুলি উঠাইয়া ইহার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। দরগার দরবেশ-গণকে গঠনমূলক কাজকর্ম করিয়া জীবিকা অর্জনের নির্দেশ দেওয়া হয়। (৭) ধর্মীয় বিদ্যালয় বন্ধ করিয়া, ধর্ম-নিরপেক্ষ সরকারী বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। (৮) পুরুষের বহু বিবাহ নিষিদ্ধ করা হয়। (৯) ইসলামী শরিয়তের আইন উঠাইয়া দেওয়া হয়।

১. J. Nehru—Glimpses of World History.

সুইজারল্যাণ্ডে প্রচলিত দেওয়ানী ও ইতালীর ফৌজদারী ও জার্মানীর বাণিজ্যিক আইন তুরস্কে চালু করা হয়। (১০) নারীগণকে পুরুষের সমান অধিকার দেওয়া হয়। পর্দাপ্রথা নিষিদ্ধ করা হয়। নারীগণকে চাকুরী, শিক্ষা ও সর্বক্ষেত্রে পুরুষের সমান অধিকার দেওয়া হয়। (১১) বিবাহের জন্য নারী ও পুরুষের নিম্নতম বয়স ধার্য করা হয়। বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ হয়। (১২) আরবী ও ফার্সী হরফ বন্ধ করিয়া লাটিন হরফে তুর্কী ভাষা শিক্ষার নিয়ম করা হয়। এছাড়া দশমিক মুদ্রা ও ওজন, কৃষি ও বিদ্যুৎ সরবরাহের উন্নতি প্রভৃতি বিভিন্ন উন্নতিমূলক সংস্কার প্রচলনও করা হয়। কামাল পাশা এইভাবে তুরস্ককে এক শক্তিশালী আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করেন। তবে এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে তিনি কোন মৌলিক অর্থনৈতিক সংস্কার ও সমাজতান্ত্রিক কাজে হাত দেন নাই। অর্থাৎ সমাজে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য কমাইবার জন্য তিনি ধন বণ্টনের কোন চেষ্টা করেন নাই। জমিদারী লোপ করিয়া কৃষককে জমি দেওয়ার ব্যবস্থাও করেন নাই।

কৃতিত্ব

কামাল পাশা রাশিয়ার মিত্রতা গ্রহণ করিলেও রাশিয়ার সাম্যবাদের অনুরাগী ছিলেন ইহা মনে করা যায় না। তিনি আসলে ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারার অনুরাগী ছিলেন। ১৯৩২ খ্রীঃ তাঁহার নেতৃত্বে তুরস্ক লীগ অফ নেশনসের সদস্য পদ লাভ করে। ১৯৩৮ খ্রীঃ তাঁহার মৃত্যু হয়। নবীন তুরস্কের স্রষ্টা হিসাবে তিনি অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

রুশ বিপ্লব ও তাহার প্রতিক্রিয়া

(The Russian Revolution and its Results)

১৯১৭ খ্রীঃ রুশ বিপ্লবের কারণ (Causes of the Russian Revolution of 1917)ঃ ১৯১৭ খ্রীঃ রুশ বিপ্লব হইল আধুনিক বিশ্ব ইতিহাসের অন্যতম প্রধান ঘটনা। ফরাসী বিপ্লবের পর মানবসমাজকে অন্য কোন ঘটনা রুশ বিপ্লবের ন্যায় প্রভাবিত করে নাই। রুশ বিপ্লব প্রকৃতপক্ষে একটি নূতন ধরণের সভ্যতা সৃষ্টি করিয়াছে।

স্বৈরতন্ত্রের দুর্বলতা

রুশ বিপ্লবের কারণ রুশ দেশের ইতিহাসের মধ্যেই নিহিত ছিল। রাশিয়ার জারের স্বৈরতন্ত্রী শাসন যুগের অনুপযোগী হইয়া পড়িয়াছিল। সমগ্র ইওরোপে যখন গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের জয় সূচিত হয় তখন রাশিয়ায় জারের স্বৈরতন্ত্র একটি বিরাট অসঙ্গতির ন্যায় বজায় থাকে। জুলাই বিপ্লব, ফেব্রুয়ারী বিপ্লব ও ফ্রান্সে তৃতীয় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হইতে রাশিয়ার জারেরা কোন শিক্ষা নেন নাই। তাঁহারা মনে করিতেন যে ইওরোপে রাজতন্ত্রের পতন ঘটিলেও রাশিয়ায় ইহা যেমন আছে তেমনই থাকিবে। জার প্রথম আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর ডেকাব্রিষ্ট

বিদ্রোহ ছিল জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ। জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের শাসন-কালে নিহিলিষ্ট আন্দোলন ছিল জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় প্রতিবাদ। (বিশদ বিবরণ আগে ১৫৮ পৃঃ দেখ)। ১৯০৫ খ্রীঃ বিদ্রোহ ছিল ১৯১৭ খ্রীঃ বিপ্লবের মহড়া (Dress rehearsal)। ১৯০৫ খ্রীঃ বিপ্লবে কৃষকশ্রেণী ও মধ্যবিত্তরা জার সরকারের বিরুদ্ধে ঘোর প্রতিবাদ জানায়। কিন্তু জারগণ ইতিহাসের শিক্ষা নেন নাই। উটপাখী যেমন মরুভূমির বালিতে মাথা ঢুকাইয়া বালির ঝড়কে অস্বীকার করিতে চেষ্টা করে সেইরূপে দমননীতি ও স্বৈরতন্ত্রের আড়ালে জার দ্বিতীয় নিকোলাস গণতান্ত্রিক দাবীকে অস্বীকার করেন। জারগণ ভুলিয়া যান যে সমগ্র ইওরোপীয় মহাদেশে যখন রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটিতেছে, তখন রাশিয়াকে এই পরিবর্তনের স্রোত হইতে বিচ্ছিন্ন রাখা সম্ভব হইবে না। রাশিয়ার নবজাগ্রত শ্রমিক ও মধ্যবিত্তরা রাশিয়ায় পরিবর্তন আনিবার জন্য চরম মূল্য দিতে প্রস্তুত ছিল। ১৯০৫ খ্রীঃ বিপ্লবী প্লেখানভ তাঁহার "ভূমি ও স্বাধীনতা" বক্তৃতায় যে প্রেরণা সঞ্চার করেন, ক্রমে লেনিন ও অন্যান্য মার্কসবাদী নেতাগণ তাহাকে মুক্তির আদর্শে পরিণত করেন। জার দ্বিতীয় নিকোলাস ফ্রান্সের রাজা ষোড়শ লুইয়ের ন্যায় তাঁহার রাণী আলেকজান্দ্রার আজ্ঞানুবর্তী ছিলেন। এদিকে রাণী আলেকজান্দ্রা, রাসপুটিন নামে এক ভণ্ড সন্ন্যাসীর প্রভাবে শাসনকার্যে হস্তক্ষেপ করেন। রাসপুটিন, রাণীর সাহায্যে সরকারের মন্ত্রী ও সেনাপতিদের উপর জবরদস্তি চালাইতে থাকে। সংকীর্ণচিত্ত, অর্ধশিক্ষিত দ্বিতীয় নিকোলাস ছিলেন রোমানভ বংশের সর্বাপেক্ষা অপদার্থ সন্তান। তাঁহার নিশ্ছিদ্র দমন নীতি, স্বৈরশাসন জাতিকে হতাশাগ্রস্ত করে। সকলেই একথা অনুভব করে যে জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ছাড়া আর কোন উপায়ে রাশিয়ায় সংস্কার সাধন করা সম্ভব নয়।

সমাজ ব্যবস্থার ত্রুটি

রাশিয়ার সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেই রুশ বিপ্লবের বীজ লুক্কায়িত ছিল। জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার ছাড়া আর কোন জার রাশিয়ার সমাজ সংস্কারের কাজে হাত দেন নাই। রাশিয়ার কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর লোকেরা গভীর দুরবস্থার মধ্যে দিন কাটাইত। জার সরকার নূতন আইন করিয়া কৃষকগণকে জমির অধিকার দিলেও দারিদ্র্যের জন্য তাহারা এই জমি বিক্রয় করিয়া ফেলে। স্টোলিপিন নামে জারের এক মন্ত্রী যে ভূমি-মালিকানার আইন করেন, সেই আইনের সাহায্যে জোতদার বা কুলাক শ্রেণী (Kulak) চাষীর জমি খরিদ করিয়া ইহার মালিক হয়। ভূমিহীন কৃষকশ্রেণী দারিদ্র্যের পাঁকে ডুবিতে থাকে। নারোদনিক (Narodnik) প্রভৃতি বিপ্লবী দল কৃষকগণকে তাহাদের দুরবস্থার প্রতিকারের জন্য সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে উৎসাহ দেয়। রাশিয়ার শ্রমিকদের অবস্থাও ছিল খুবই খারাপ। জার সরকার শ্রমিক কল্যাণমূলক কোন আইন প্রচলন না করার ফলে শ্রমিক-গণকে কম বেতনে বেশী সময় কারখানায় খাটিতে হইত। জার সরকার শ্রমিকদের দাবীতে কান দিতেন না। ইহার ফলে শ্রমিকগণ জার সরকারের প্রতি আস্থা হারাইয়া ফেলে। এই সুযোগে বলশেভিকগণ শ্রমিকগণের মধ্যে মার্কসবাদী প্রচার চালায়। তাহারা শ্রমিক-গণকে ইহা বুঝায় যে রাশিয়ায় শ্রমিক সরকার স্থাপন না করিলে খাটিয়া খাওয়া মানুষের

উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই। বলশেভিকগণের চেষ্টায় রাশিয়ার শ্রমিকেরা বিপ্লবের জন্য সংঘবদ্ধ হয়। পেট্রোগ্রাড শহরের শ্রমিকগণ এই বিষয়ে প্রধান ভূমিকা নেয়।

রাশিয়ার বৈপ্লবিক ভাবধারার প্রসারে রুশ সাহিত্যিক ও দার্শনিকগণের প্রভাবও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মানসিক প্রস্তুতি ছাড়া কোন বিপ্লব ঘটিতে পারে না। ফরাসী দার্শনিকগণ যেমন ফরাসী বিপ্লবের ক্ষেত্র পরোক্ষভাবে রচনা করেন, রুশ সাহিত্যিক ও সমসাময়িক দার্শনিকগণ সেইরূপ রুশ বিপ্লবের ক্ষেত্র রচনা করেন। হার্জেন (Harzen) তাঁহার রচনাবলীতে কমিউন প্রথার গুণগান করেন। ডষ্টয়েভস্কি তাঁহার উপন্যাসগুলিতে ধন-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ, যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থা, কৃষি সংস্কারের কথা বলেন। বিখ্যাত সাহিত্যিক টলস্টয়ের রচনাবলী রুশ জাতিকে নূতন আশাবাদে দীক্ষিত করে। বস্তুবাদী ইউটিলিটারিয়ানগণ (Utilitarians) এই মত প্রচার করেন যে কেবলমাত্র সাহিত্যিক রসাস্বাদনের জন্য সাহিত্য সৃষ্টির কোন দরকার নাই। সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতিকে সমাজের উপকারের জন্য লাগান দরকার। "শেক্সপিয়র অপেক্ষা একজন পাদুকা প্রস্তুতকারকের উপযোগিতা অনেক বেশী"।[১] বস্তুবাদীগণের প্রভাবে সমাজের নিপীড়িত মানুষের মনে নূতন আত্মবিশ্বাস ও চেতনা জাগে। বাকুনিনের নৈরাজ্যবাদ, কার্ল মার্কসের সমাজতন্ত্রবাদ রুশ চিন্তাবিদগণের মনে সমাজ বিপ্লবের প্রেরণা দেয়। শেষ পর্যন্ত লেনিন ও বলশেভিকগণ মার্কসবাদের আদর্শে রুশ বিপ্লবকে পরিচালিত করেন। মার্কস-বাদী নেতারা এই সত্য উপলব্ধি করেন যে শুধুমাত্র জারতন্ত্রের পতন ঘটিলে রুশ জনসাধারণের মুক্তি আসিবে না। রাষ্ট্রকে দরিদ্র শ্রমিকের স্বার্থে পরিচালনা না করিলে শ্রমিক ও কৃষকের শোষণ অব্যাহত থাকিবে। এজন্য তাঁহারা শ্রমিক, সৈনিক ও খাটিয়া খাওয়া মানুষদের মধ্যে জোর প্রচার ও সংগঠন চালান। এইভাবে রাশিয়ার জনগণের মনে রাজনৈতিক চেতনা জাগে।

দার্শনিকের প্রভাব



টলস্টয়

জার সরকারের বৈদেশিক নীতি জারতন্ত্রের পতন ত্বরান্বিত করে। প্রথম মহাযুদ্ধে রাশিয়া যোগদান করিলে রুশ জনমত তাহাতে সায় দেয় নাই। কিন্তু জার সরকার জনমতকে অগ্রাহ্য করিয়া প্রথম মহাযুদ্ধে রাশিয়াকে জড়াইয়া দেন। জার্মানীর হাতে রুশ সেনাদল যুদ্ধে হারিয়া তাহাদের মনোবল হারাইয়া ফেলে। যুদ্ধের দরুণ দেশে খাদ্য সমস্যা তীব্রতর হয়। জিনিষের দাম বাড়িয়া গেলে গরীব লোকেদের কষ্টের একশেষ হয়। কিন্তু জার সরকার তবুও শান্তি স্থাপন করিতে অনিচ্ছা দেখায়। এই সময় বলশেভিকগণ প্রচার করে যে তাহারা সরকার দখল করিলে যুদ্ধ বন্ধ করিয়া শান্তি স্থাপন

১. Quoted by Kochan.

করিবে। শ্রমিককে রুটি পাইবার নিশ্চিত ব্যবস্থা করিয়া দিবে এবং কৃষককে জমিদানের ব্যবস্থা করিবে। ইহার ফলে জার সৈন্যদলের অধিকাংশ বলশেভিকগণের প্রতি সমর্থন জানায়।[১] বলশেভিকগণের আহ্বানে ১৯১৭ খ্রীঃ ২৩শে ফেব্রুয়ারী পেট্রোগ্রাড শহরের শ্রমিকেরা একটি ধর্মঘট পালন করে। শ্রমিকেরা এই শহরের শাসন ব্যবস্থা নিজ হাতে নেয়। জারের সেনাদল তাহাদের উপর গুলি চালনা করিতে অস্বীকার করে। শ্রমিক ও বিপ্লবী সেনাদল সম্মিলিতভাবে পেট্রোগ্রাড শহরে একটি কমিউন বা সোভিয়েত স্থাপন করে। পেট্রোগ্রাড শহরের বিপ্লবী সরকার স্থাপনের কথা রাশিয়ার অন্য স্থানে ছড়াইয়া পড়িলে সর্বত্র এই অনুকরণে বিপ্লবী সোভিয়েত স্থাপিত হয়।

এইভাবে পরিস্থিতি জার সরকারের হাতের বাহিরে চলিয়া যায়। এমতাবস্থায় অন্য কোন উপায় না থাকায়, জার দ্বিতীয় নিকোলাস ডুমা বা প্রতিনিধি সভার অধিবেশন ডাকেন। এই ডুমা বা প্রতিনিধি সভার অধিকাংশ সদস্য ছিল মধ্যবিত্ত বা বুর্জোয়া শ্রেণীর। ইহারা জারের হাত হইতে ক্ষমতা নিজ শ্রেণীর হাতে লইতে ইচ্ছুক ছিল। এই প্রতিনিধি সভার চাপে জার দ্বিতীয় নিকোলাস সিংহাসন হইতে পদত্যাগ করেন। ডুমার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাশিয়ায় একটি প্রজাতন্ত্রী সরকার ঘোষিত হয়। লুভভ ও কেরেনেস্কি এই সরকারের প্রধান হন। কিন্তু প্রজাতন্ত্রী সরকার শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর সহযোগীতা লাভের কোন চেষ্টা না করায় ইহার ভিত্তি দুর্বল হইয়া পড়ে।

বুর্জোয়া বিপ্লব

কেরেনেস্কি সরকার তাহার বন্ধ্যা আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতির ফলে জনপ্রিয়তা হারায়। এই সরকার ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে ভূমি বণ্টনের কোন চেষ্টা না করিবার ফলে দরিদ্র শ্রেনীর মধ্যে ইহার ভাবমূর্তি নষ্ট নয়। দেশের জনমত শান্তির পক্ষপাতী হইলেও এই সরকার জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইতে সংকল্প নেয়। এদিকে জার্মানী, রাশিয়ার ইউক্রেন প্রভৃতি অঞ্চল অধিকার করিয়া ফেলে। রুশ প্রজাতন্ত্রী সরকারের সেনাদলের অধিকাংশ লোক ছিল গ্রামের চাষী। স্বদেশে জার সরকারের পতন এবং প্রজাতন্ত্রী সরকারের সহিত বলশেভিক দলের বিরোধের কথা শুনিয়া তাহারা মনোবল হারাইয়া ফেলে। এমন কি বহু সেনা, সেনাপতির নির্দেশ না মানিয়া ঘরে ফিরিতে আরম্ভ করে।[২] ফলে রণাঙ্গণে রাশিয়া প্রচণ্ড মার খায়। এমতাবস্থায় জার্মানীর সহিত শান্তি স্থাপন করিয়া স্বদেশে শৃংখলা স্থাপন করাই ছিল কেরেনেস্কি সরকারের কর্তব্য। কিন্তু এই সরকার জার্মানীর সহিত যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে জেদ করে। এদিকে রুশ বলশেভিকগণ এই সরকারকে স্বীকৃতি দিতে রাজী ছিল না। যদিও রুশ কমিউনিষ্ট পার্টির কিছু উপদল যথা নারোদনিক ও সোস্যাল ডেমোক্র্যাটগণ প্রজাতন্ত্রী সরকারকে সমর্থন জানায়, বলশেভিকগণ এই সরকারের পতন ঘটাইতে সংকল্প নেয়। এজন্য রাশিয়ার কলকারখানার শ্রমিকদের উপর কেরেনেস্কি সরকারের কোন প্রভাব ছিল না। বুর্জোয়া শ্রেণী কেরেনেস্কির সমর্থক হইবার ফলে তিনি শ্রমিকদের স্বার্থ সম্পর্কে

১. Langsham—World since 1914.

২. Mikhail Solokov—And Quite Flows the Don.

উদাসীন থাকেন। বলশেভিক দল প্রচার ও সংগঠনের দ্বারা শ্রমিকদের হাত করিয়া নেয়। তাহারা পেট্রোগ্রাড শহরের শ্রমিকদের পাল্টা বিপ্লবী সরকার গঠনের জন্য ডাক দেয়। বলশেভিকরা শ্রমিক সাধারণকে ইহা বুঝায় যে কেরেনেস্কি সরকার দ্বারা জারতন্ত্রের পতন ঘটিলেও শ্রমিক ও সাধারণ লোকের স্বার্থ এই সরকার রক্ষা করিবে না। এজন্য দ্বিতীয় বিপ্লবের দরকার হইবে। প্রথম বিপ্লবে জারতন্ত্রের পতন ঘটিয়াছে, দ্বিতীয় বিপ্লবে কেরেনেস্কি শাসিত বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রকে হঠাইয়া শ্রমিকের রাজ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। সাধারণ শ্রমিকেরা বলশেভিক দলের প্রতি সমর্থন জানায়। বলশেভিক দল প্রজাতন্ত্রকে উচ্ছেদ করিয়া সমাজতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য বিপ্লবের ডাক দেয়।

রাশিয়ার এই সংকট সময়ে লেনিনের নেতৃত্ব রুশ বিপ্লবকে এক ঐতিহাসিক পথে পরিচালিত করে। লেনিন এই সময়ে সুইজারল্যাণ্ডে তাঁহার নির্বাসন হইতে ফিরিয়া আসেন। তিনি বলশেভিকদের নেতৃত্ব লাভ করেন। রাশিয়ার অন্যান্য সমাজতন্ত্রী দলগুলি বলে যে রাশিয়াতে শ্রমিকরাজ প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত সময় এখনও হয় নাই। সুতরাং অপেক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু লেনিন এইমত নাকচ করেন। তিনি তাঁহার বিখ্যাত "এপ্রিল থিসিস" ব্যাখ্যা করিয়্য বলেন যে রাশিয়ায় একই সঙ্গে জমিদার ও বুর্জোয়াগণের হাত হইতে শ্রমিকের স্বার্থে ক্ষমতা ছিনাইয়া লইবার বিরল সুযোগ আসিয়াছে। রাশিয়ার শ্রমিকেরাও বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত। সেনাদলের বৃহদংশ শ্রমিকের প্রতি সহানুভূতিশীল। সুতরাং বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রকে নস্যাৎ করিয়া বলশেভিকগণের ক্ষমতা দখল করা দরকার। আর অপেক্ষা করার দরকার নাই। লেনিন বলেন যে "বলশেভিকগণ ক্ষমতা পাইলে শ্রমিককে রুটি, কৃষককে জমি ও সেনাদলকে শান্তি দিবে।" ইহার ফলে বলশেভিকগণ বিরাট জনপ্রিয়তা লাভ করে। তিনি সকলকে সতর্ক করিয়া বলেন যে "ইতিহাস বলশেভিকগণের নিকট এক অভূতপূর্ব সুযোগ আনিয়াছে। যদি এই সুযোগ ব্যবহারে অবহেলা দেখান হয় তবে ইতিহাস তাহাদের ক্ষমা করিবে না।" লেনিনের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও কর্মপন্থা বলশেভিক বিপ্লবকে জয়যুক্ত করে। ইতিমধ্যে পেট্রোগ্রাড শহরের ন্যায় দেশের অধিকাংশ স্থানে বলশেভিকরা শ্রমিক-কৃষকের সোভিয়েত বা পঞ্চায়েত স্থাপন করে। বিভিন্ন শহর ও গ্রামে বলশেভিক সংগঠন জোরদার হইয়া উঠে।

বলশেভিকগণ ধ্বনি তুলে যে "সকল ক্ষমতা সোভিয়েতগুলির হাতে দিতে হইবে" (All power to the Soviets)। এদিকে প্রজাতন্ত্রী কেরেনেস্কি সরকারের ক্ষমতা রাজধানীর বাহিরে বিশেষ ছিল না। গ্রামাঞ্চলে কৃষক ও শহরে কলকারখানার শ্রমিকেরা সোভিয়েত গড়িয়া কেরেনেস্কি সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। ফলে প্রজাতন্ত্রী কেরেনেস্কি সরকারের হুকুম দেশের সর্বত্র কার্যকরী করা সম্ভব ছিল না। লেনিন কেরেনেস্কি সরকারের এই দুর্বলতাকে কাজে লাগান। শেষ পর্যন্ত বলশেভিকগণ কেরেনেস্কি সরকারকে উচ্ছেদ করিয়া (৭ই নভেম্বর, ১৯১৭ খ্রীঃ) চূড়ান্ত ক্ষমতা অধিকার করে। রুশ বিপ্লব সার্থকতা লাভ করে।

১৯১৭ খ্রীঃ রাশিয়ায় এক বা একাধিক বিপ্লব হয় ইহা লইয়া মতভেদ আছে। কেহ কেহ মনে করেন যে ১৯০৫ হইতে ১৯১৭ খ্রীঃ নভেম্বর পর্যন্ত নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য

দিয়া শেষ পর্যন্ত বলশেভিকরা জয়লাভ করে। ইহা ছিল একটি বিপ্লব এবং ইহার আদর্শ ছিল বলশেভিকবাদ। ঐতিহাসিক রদেনষ্টিনের মতে, রুশ বিপ্লবের তিনটি পর্যায় লক্ষ্য করা যায়; যথা, ১৯০৫ খ্রীঃ বিপ্লব জারতন্ত্রের পতনের সূচনা করে এবং বুর্জোয়া বা ধনিকশ্রেণী ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করে। ১৯১৭ খ্রীঃ মার্চ মাসে জার দ্বিতীয় নিকোলাস পদত্যাগ করিলে অভিজাতগণের পতন ঘটে এবং বুর্জোয়াগণ কেরেনেস্কির নেতৃত্বে ক্ষমতা দখল করে। ১৯১৭ খ্রীঃ নভেম্বর মাসের বিপ্লবে বুর্জোয়াগণকে হঠাইয়া বলশেভিকরা শ্রমিকের সরকার স্থাপন করে। রাশিয়ার পুরাতন দিনপঞ্জী অনুসারে বিপ্লবের তারিখটি ছিল ২৫শে অক্টোবর ১৯১৭ খ্রীঃ। এজন্য কেহ কেহ এই বিপ্লবকে অক্টোবর বিপ্লব বলেন। আবার অনেকে ইহাকে নভেম্বর বিপ্লব বলেন।

বলশেভিক শাসনব্যবস্থা (Bolshevik Government): বলশেভিকগণ লেনিনের নেতৃত্বে ৭ই নভেম্বর ১৯১৭ খ্রীঃ কেরেনেস্কি সরকারের উচ্ছেদ করিয়া রাশিয়ার শাসন ক্ষমতা অধিকার করে। বলশেভিকগণ ক্ষমতা অধিকার করিলে লেনিনের নেতৃত্বে সর্বরুশীয় কংগ্রেস এই সরকারকে বৈধ বলিয়া ঘোষণা করে। নব প্রতিষ্ঠিত বলশেভিক সরকারের সম্মুখে অত্যন্ত জটিল ও দুরূহ সমস্যা দেখা দেয়। প্রথমতঃ, বৈদেশিক ক্ষেত্রে জার্মানীর সহিত তখনও রাশিয়ার মহাযুদ্ধ চলিতেছিল। জার্মান সেনাদল রাশিয়ার ক্রিমিয়া প্রদেশ অধিকার করিয়া এই স্থানে প্রতি-বিপ্লবীগণের সাহায্যে একটি পাল্টা সরকার গড়ে। এইভাবে জার্মানী বলশেভিক সরকারকে ধ্বংস করার চেষ্টা করে। জার্মান সেনাদলের আক্রমণে রুশ রাজধানী পেট্রোগ্রাড শহর বিপন্ন হইয়া পড়ে। দ্বিতীয়তঃ, রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লবের ফলে শ্রমিকশ্রেণীর শাসন ক্ষমতা দখলকে ইওরোপের ধনতান্ত্রিক দেশগুলি অত্যন্ত সন্দেহের চক্ষে দেখে। এই বিরোধী শক্তিগুলি নানাভাবে বলশেভিক সরকারকে পিষিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে। তৃতীয়তঃ, দেশের অভ্যন্তরে প্রতি-বিপ্লবীগণ বলশেভিক সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বৈদেশিক শক্তিগুলি রুশ প্রতি-বিপ্লবীগণের সহায়তা করে। চতুর্থতঃ, রাশিয়ায় সাম্যবাদকে বাস্তবে রূপায়িত করিতে হইলে পুরাতনতন্ত্রের বিলোপ ও নূতন সমাজ ব্যবস্থার পত্তন করা অবশ্যই করণীয় ছিল। এজন্য আমূল সংস্কার করার আবশ্যক হয়।

বলশেভিক সরকারের সমস্যা

বলশেভিক নেতা লেনিন এই সকল সমস্যার মোকাবিলা করিয়া তাঁহার প্রতিভার ও নেতৃত্বের পরিচয় দেন। জার্মানীর সহিত শান্তি স্থাপন এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানের জন্য তিনি আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ করেন। জার সরকার যুদ্ধের সময় মিত্র শক্তির সহিত যে সকল গোপন চুক্তি করিয়াছিল তাহা তিনি বাতিল করিয়া দেন। তিনি ঘোষণা করেন যে বলশেভিক সরকার কোন প্রতিবেশী দেশের রাজ্য গ্রাস করিবে না। তিনি জার্মানীর সহিত ব্রেষ্ট লিটভস্কের (Treaty of Brest Litovsk) সন্ধি স্থাপন করিয়া শান্তি স্থাপন করেন। এই সন্ধির ফলে রণক্লান্ত ও মনোবলহীন রুশ সেনাদল ঘরে ফিরিয়া বিপ্লবের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়। জার্মানীর সহিত শান্তি স্থাপনের ফলে লেনিন

জার্মানীর সহিত শান্তি স্থাপন: ব্রেষ্ট লিটভস্কের সন্ধি

রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ সমস্যার দিকে নজর দেওয়ার সুযোগ পান। অবশ্য ব্রেষ্ট লিটভস্কের সন্ধির দ্বারা রাশিয়াকে অনেক ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়। রাশিয়ার বহু স্থান জার্মানীকে ছাড়িয়া দিতে হয়। লেনিন এই সন্ধিকে সাময়িক মনে করিতেন। নয় মাস পরে জার্মানী মিত্র শক্তির নিকট আত্মসমর্পণ করিলে তিনি এই সন্ধিকে নাকচ করেন।

জার্মানীর সহিত সন্ধি স্থাপনের পর বলশেভিক সরকার আভ্যন্তরীণ প্রতিবিপ্লব ও বিদ্রোহ দমনের কাজে হাত দেন। এই সময় বলশেভিক সরকার উগ্রপন্থী সাম্যবাদ (Militant Communism or War Communism) গ্রহণ করেন। উগ্র মার্কস-বাদীরা মনে করিত যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকিলে লোকে পুঁজিবাদের অনুরাগী হইবে। রাষ্ট্রের হাতেই সকল সম্পত্তি থাকা দরকার। এজন্য ব্যক্তিগত সম্পত্তি, জমি, কলকারখানা, মূলধন, ব্যাংক প্রভৃতি সকল সম্পদ রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়। গ্রামাঞ্চলে কৃষকগণ জমিদারদের জমিগুলি অধিকার করে। সরকারী কর্মচারী-গণকে নিষ্ঠা সহকারে কাজ করিবার আদেশ দেওয়া হয়। লেনিন আইন জারী করেন যে "বিনা কাজে কেহ খাদ্য ও জীবনধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্য পাইবে না।[১]" ব্যাংকের মালিকগণ সরকারের সহিত অসহযোগিতা করায় ডিনামাইট দ্বারা ব্যাংকের লকারগুলি খোলা হয়। ব্যাংকের অর্থ রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়। একটি নির্দিষ্ট সংখ্যার উপর সকল ব্যক্তিগত অর্থ ও অলংকার রাষ্ট্রের সম্পত্তি বলিয়া ঘোষণা করা হয়। চার্চ বা খ্রীষ্টীয় গীর্জার সম্পত্তিগুলি বাজেয়াপ্ত করা হয়। কৃষকগণের খাইবার মত খাদ্য রাখিয়া উদ্বৃত্ত খাদ্য রাষ্ট্রের প্রয়োজনে অর্থাৎ শহরাঞ্চলের লোকের খাদ্যাভাব মিটাইবার জন্য অধিগ্রহণ করা হয়।[২] ইহার ফলে কৃষকেরা বেশী দামে খাদ্য বিক্রয় করার অধিকার হারায়। কৃষকদের সুবিধার জন্য কলকারখানার উৎপন্ন দ্রব্য কৃষকগণের চাহিদা মিটাইবার কাজে ব্যবহার করা হয়। রাশিয়ার উৎপাদন ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রের হাতে নেওয়া হয় এবং বণ্টনও রাষ্ট্রের হাতে আনা হয়। ইহার অর্থ হইল যে জমি, কলকারখানা যাহাতে খাদ্য ও মাল উৎপাদন হইত তাহা সরকারী সম্পত্তিতে পরিণত হয়। কোন মালিক তাহা হাতে রাখিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হয়। ক্ষেতে, খামারে ও কারখানায় উৎপন্ন মাল সরকার সকলকে বাঁটিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। এই সকল কারখানা হইতে যে মুনাফা হয় তাহা রাষ্ট্রের হাতে চলিয়া যায়। বেসরকারী বিদ্যালয় উঠাইয়া দেওয়া হয়। রাশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা পুরাপুরি সরকারের দায়িত্বে চালিত হইবার ব্যবস্থা হয়। রাশিয়ার শাসন-ব্যবস্থার জন্য কৃষক ও শ্রমিকের নির্বাচিত সোভিয়েত স্থাপিত হয়। এই সকল সোভিয়েত কর্তৃক নির্বাচিত জেলা সোভিয়েত এবং জেলা সোভিয়েতের দ্বারা নির্বাচিত নিখিল রাশিয়া সোভিয়েতকে দেশ শাসনের ক্ষমতা দেওয়া হয়। নিখিল রুশিয় সোভিয়েতের নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা প্রিসিডিয়াম গঠিত হয়। ইহাদের হাতেই শাসনভার থাকে। রাশিয়ার বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করা হয়। একমাত্র রুশ কমিউনিষ্ট পার্টি বৈধভাবে কাজ করিতে থাকে।

সাম্যবাদী সংস্কার

১. "He that will not work, neither shall he eat."

২. Langsham—World since 1914.

মার্কসবাদের লক্ষ্য হইল পৃথিবীর সকল শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি সাধন এবং ধনতন্ত্রী সমাজ ব্যবস্থার ধ্বংস। সুতরাং পশ্চিমী ধনতন্ত্রী দেশগুলি রাশিয়া হইতে তাহাদের দেশে সাম্যবাদী বিপ্লব ছড়াইবার সম্ভাবনায় আতঙ্কিত হয়। এজন্য ধনতন্ত্রী পশ্চিমী সরকারগুলি সাম্যবাদের পিতৃভূমি রুশ কমিউনিষ্ট সরকারকে ধ্বংস করিবার চক্রান্ত করে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জাপান, ইতালী প্রভৃতি দেশের সরকার, রাশিয়ার নবজাত বিপ্লবী সাম্যবাদী রাষ্ট্রকে ধ্বংস করিবার জন্য একযোগে সামরিক আক্রমণ চালায়। এই ধনতন্ত্রী শক্তিগুলি রাশিয়ার প্রতি-বিপ্লবী সেনাপতিগণ যথা কোলচাক, ডেনিকিন প্রভৃতিকে অস্ত্র সাহায্য দেয়। প্রতি-বিপ্লবী সেনাপতিগণ বিদেশী অস্ত্রের সাহায্যে সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ করে। ১৯১৯—২০ খ্রীঃ মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নকে প্রায় ১৭টি অঞ্চলে আক্রমণের মোকাবিলা করিতে হয়। লেনিন এই ঘোর বিপদে সাহস না হারাইয়া নব গঠিত রাষ্ট্রকে রক্ষার জন্য রুশ জনসাধারণকে আগাইয়া আসিতে বলেন। লেনিনের সহকারী ট্রটস্কি এই সময় তাঁহার অপূর্ব সংগঠন শক্তি দেখাইয়া বিপ্লবী শ্রমিক সেনা বা লাল ফৌজ (Red Army) গঠন করেন। তিনি ইহাদের নূতন রণকৌশলে পটু করেন। লাল ফৌজের সহায়তায় বৈদেশিক আক্রমণ ঠেকান সম্ভব হয়। এদিকে লেনিনের অপর সহকারী স্ট্যালিন চেকা (Cheka) নামে এক গুপ্ত পুলিশ সংস্থার সাহায্যে আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন করেন। চেকা অবশ্য খুবই নিষ্ঠুরতার সহিত "লাল সন্ত্রাস" (Red Terror) চালায়। ফলে রাষ্ট্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতক ও প্রতি-বিপ্লবীগণ ধ্বংস হইয়া যায়। বৈদেশিক শক্তিগুলিও কিছুদিন পরে রাশিয়া আক্রমণের বিফলতা উপলব্ধি করিয়া তাহাদের সেনাদল সরাইয়া নেয়। রাশিয়া এই সংকট হইতে রক্ষা পায়। পশ্চিমী শক্তিগুলির পারস্পরিক স্বার্থ বিরোধ এবং তাহাদের রণক্লান্ত সেনাদলের নূতন যুদ্ধে জড়াইয়া পড়িতে অনিচ্ছা, পশ্চিমী দেশের শ্রমিক শ্রেণীর রুশ সরকারের প্রতি সমর্থন এবং আক্রমণকারী দেশগুলির দীর্ঘ যুদ্ধ চালাইতে অনাগ্রহ বলশেভিক সরকারের আত্মরক্ষা সহজতম করে। তবে রাশিয়ার লাল ফৌজের অদম্য সাহস ও আত্মত্যাগ, রুশ জনসাধারণের স্বদেশপ্রেম এবং লেনিনের নেতৃত্ব আক্রমণকারীগণের মনোবল ভাঙিয়া দেয়।[১]

বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধ ও প্রতিবিপ্লব দমন

উগ্র সাম্যবাদ (Pure Communism) স্থাপনের ফলে রাশিয়ার ক্ষুদ্র কৃষক, ব্যবসায়ী শ্রেণীর মনে ঘোর অসন্তোষ দানা বাঁধে। রুশী কৃষকগণ রাষ্ট্রের নিকট তাহাদের উদ্বৃত্ত ফসল সরকারকে ছাড়িয়া দিতে আপত্তি জানায়। তাহারা বাড়তি জমি চাষ বন্ধ করিয়া দেয়। ফলে দেশে খাদ্যাভাব দেখা দেয়। এদিকে শ্রমিক সমিতি কল-কারখানা গুলি ঠিকমত চালাইতে না পারায় উৎপাদনের খরচ বাড়ে এবং জিনিষপত্রের দাম বাড়িয়া যায়। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীগণের কোন জীবিকা না থাকায় তাহারা হতাশ হইয়া পড়ে। রাশিয়ার রেল পরিবহণ ব্যবস্থাতেও ঘোর বিশৃংখলা দেখা দেয়। ইহার ফলে রাশিয়ায় এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হয়। পশ্চিমী দেশগুলি শত্রুতা করিয়া এই বিপদে রাশিয়াকে খাদ্য সাহায্য দিতে

উগ্র সাম্যবাদের প্রতিক্রিয়া

১. And Quiet Flows the Don—M. Solokov.

টাল বাহানা করিলে বহু লোক মারা পড়ে। রাশিয়ার এই দুর্দিনে একমাত্র আমেরিকা গম দিয়া রাশিয়াকে সাহায্য করে।

অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইয়া লেনিন ঘোষণা করেন যে "উগ্র সাম্যবাদ" বা "পুঁথিগত সাম্যবাদ" (Copy book Communism) বাস্তবে প্রয়োগ করা চলিবে না। বাস্তব অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইয়া মার্কসবাদ প্রয়োগ করিতে হইবে। এজন্য ১৯২১ খ্রীঃ দশম কমিউনিস্ট পার্টি কংগ্রেসে তিনি যে নূতন অর্থনীতি গ্রহণ করেন উহাকে "নব অর্থনৈতিক নীতি" (New Economic policy) বা সংক্ষেপে "নেপ" (NEP) বলা হয়। লেনিন বলেন যে পুঁথিগত সাম্যবাদ ছাড়িয়া রাশিয়ার পক্ষে যতটা দরকার ততখানি সাম্যবাদ গ্রহণ করা হইবে। নব অর্থনীতি অনুসারে ক্ষুদ্র চাষীকে জমির মালিকানা, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকে ব্যবসা করা ও জনসাধারণকে নির্দিষ্ট পরিমাণ ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাখার অধিকার দেওয়া হইবে। শিল্পগুলিকে নূতনভাবে ঢালিয়া সাজা হইবে। শ্রমিকগণকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক ও ছুটি দেওয়া হইবে। কৃষকগণকে খোলা বাজারে ফসল বিক্রয়ের অধিকার দেওয়া হইবে। মূল শিল্পগুলিকে যথা লোহা, ইস্পাত প্রভৃতিকে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে রাখা হইবে।

নব অর্থনৈতিক নীতি N. E. P.

লেনিন বিশ্ববিপ্লবের আদর্শকে কার্যকরী করার জন্য তৃতীয় আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী কংগ্রেসের (Third International) অধিবেশন ডাকেন। ইহাতে বিভিন্ন দেশে সাম্যবাদী বিপ্লবকে রূপায়িত করিবার জন্য প্রতিনিধিগণকে নির্দেশ দেওয়া হয়। এই উদ্দেশ্যে তৃতীয় ইণ্টারন্যাশনাল বা কমিণ্টার্ণ স্থাপিত হয়। রাশিয়া কমিণ্টার্ণের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হয়। লেনিনের বৈদেশিক মন্ত্রী জর্জ চিকেরিণের চেষ্টায় ইংলণ্ড ও ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলি সোভিয়েত রাশিয়াকে কুটনৈতিক স্বীকৃতি দেয়। আমেরিকা বহুদিন টালবাহানা করার পর রাশিয়াকে স্বীকৃতি দেয়। এইভাবে মহানায়ক লেনিন পৃথিবীর প্রথম সাম্যবাদী রাষ্ট্র স্থাপন করিয়া ইহাকে শক্তিশালী ও স্থায়ী করেন। ১৯২৪ খ্রীঃ ২১শে জানুয়ারী লেনিনের মৃত্যু হয়।

আন্তর্জাতিক সাম্যবাদের প্রস্তাব

লেনিনের আদর্শ ও কৃতিত্ব সম্পর্কে উপরে আলোচনা করা হইয়াছে। লেনিনের আসল নাম ছিল ভ্যাডিমির ইলিচ উলিয়ানভ। তিনি ১৮৭০ খ্রীঃ কাজান প্রদেশের একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কাজান ও সেণ্ট পিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন এবং আইন শাস্ত্রে উপাধি লাভ করেন। তিনি খুবই মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ছাত্র জীবনেই তিনি মার্কসবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং বিপ্লবী সমিতিতে যোগ দেন। ফলে তিনি জার সরকার দ্বারা সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হন। সাইবেরিয়া হইতে ফিরিয়া তিনি পুনরায় রাশিয়ায় সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার কাজ চালান। জার সরকারের চাপে তিনি স্বদেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। নির্বাসিত অবস্থায় তিনি সুইজারল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী ও ইংলণ্ডে বাস করেন।

লেনিনের প্রথম জীবন

লেনিন ১৯০৩ খ্রীঃ রাশিয়ার সোস্যাল ডেমোক্রেটিক দলের নেতৃত্ব লাভ করেন। লেনিন ঘোষণা করেন যে রাশিয়ার শ্রমিকগণকে লইয়া একটি রাজনৈতিক দল গড়া দরকার। তিনি আরও বলেন যে শ্রমিকগণের সক্রিয় সহযোগীতা লইয়া রাশিয়ায় সাম্যবাদী বিপ্লব করা সম্ভব হইবে। রাশিয়ায় শ্রমিকের স্বার্থে সরকার প্রতিষ্ঠার সংকল্প তিনি ঘোষণা করেন। সোস্যাল ডেমোক্র্যাট দলের সকলে লেনিনের মতবাদে বিশ্বাস করিত না। যাহারা লেনিনের মতবাদের বিরোধী ছিল তাহাদের নাম হয় মেনশেভিক (Menshevik)। মেনশেভিক কথার অর্থ হইল সংখ্যালঘু। লেনিনের অনুরাগীগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন বলিয়া তাঁহাদের বলশেভিক বলা হইত। লেনিন আরও বলেন যে মার্কসবাদ অনুযায়ী রাশিয়ায় জারতন্ত্রের পতনের পর বুর্জোয়াতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও তাহার পর সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার জন্য অপেক্ষার দরকার নাই। জারতন্ত্রের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এপ্রিল থিসিসে তিনি এই মত প্রকাশ করেন। লেনিনের কথাই শেষ পর্যন্ত সত্য প্রমাণিত হয়। তিনি কেরেনেস্কি সরকারের দুর্বল হস্ত হইতে শ্রমিকগণের সহায়তায় ক্ষমতা অধিকার করিয়া সাম্যবাদী রাষ্ট্র স্থাপন করেন। লেনিনের নেতৃত্বই এই শিশু রাষ্ট্রকে ঝড়-ঝাপ্টার হাত হইতে বাঁচাইয়া বৃক্ষে পরিণত করে। শেষ পর্যন্ত সোভিয়েত রাশিয়া পৃথিবীর একটি বৃহৎ শক্তিতে পরিণত হয়। পৃথিবীর নিপীড়িত খাটিয়া-খাওয়া মানুষের নিকট লেনিনের আদর্শ আদৃত হয়। রুশ দেশে লেনিনকে জাতির পিতার সম্মান দেওয়া হয়। মস্কোর সমাধি ক্ষেত্রে লেনিনের মৃতদেহ আজিও সসম্মানে রক্ষিত আছে।



লেনিন

বলশেভিক দল গঠন : বলশেভিক দলের আদর্শ ও কর্মপন্থা

ব্যক্তিগত জীবনে লেনিন ছিলেন দয়ালু, প্রাণবন্ত, সঙ্গীত রসিক। তিনি ছিলেন চিন্তাশীল লেখক এবং বহু পুস্তকের রচয়িতা। নিপীড়িত ও শোষিত জনসাধারণের জন্য তাঁহার অপরিসীম দরদ ছিল। যীশুখ্রীষ্ট যেমন মন্দির হইতে সুদখোর মহাজনগণকে বহিস্কার করেন, লেনিন সেইরূপ রাশিয়ার শোষক মালিকশ্রেণীকে সামাজিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করেন।[১]

ব্যক্তিগত গুণাবলী

যোসেফ স্ট্যালিন ও সোভিয়েত রাশিয়ার অগ্রগতি (Joseph Stalin and the march of Soviet Russia) : লেনিনের মৃত্যুর পর তাঁহার প্রধান সহকর্মী স্ট্যালিন ও ট্রটস্কির মতে আদর্শগত ও ব্যক্তিগত বিরোধ দেখা দেয়। স্ট্যালিন মনে করিতেন যে আপাততঃ রাশিয়ার কমিউনিষ্ট সরকারের বিশ্ববিপ্লবের কথা না ভাবিয়া আভ্যন্তরীন উন্নতির কাজ করা উচিত। তিনি যে মতবাদ প্রচার করেন ইহার নাম ছিল "একক

স্ট্যালিন ও ট্রটস্কির আদর্শগত বিভেদ

১. Remark of Luna Charsky.

রাষ্ট্রে সাম্যবাদ গঠন" (Communism in a single state)। রাশিয়ার সাম্যবাদী বিপ্লবকে যদি দৃঢ় ও স্থায়ী করা যায় তবে পরে ইহা বিশ্ব বিপ্লবের ভিত্তি হইতে পারিবে। অপর দিকে ট্রটস্কি, মার্কসীয় দর্শন অনুযায়ী বলেন যে বিশ্ব বিপ্লব সফল না হইলে কোন বিশেষ একটি দেশে সাম্যবাদ সফল হইবে না। পৃথিবীর অন্য ধনতন্ত্রী দেশগুলি এই সাম্যবাদী দেশটিকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবে। কারণ সাম্যবাদী ও ধনতন্ত্রী দেশের সম্পর্ক হইল সাপ ও বেজীর ন্যায়। সুতরাং ট্রটস্কি বলেন যে রাশিয়ার উচিত এখনই বিশ্ব সাম্যবাদী বিপ্লবের জন্য চেষ্টা করা। এছাড়া রুশ সরকারের নেতৃত্ব লইয়াও উভয় নেতার মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। রুশ কমিউনিষ্টগণের বৃহদংশ স্ট্যালিনের মত সমর্থন করিলে ট্রটস্কি ও তাঁহার অনুচারীগণ বহিস্কৃত হন। নির্বাসিত অবস্থায় আততায়ীর হস্তে (১৯৪০ খ্রীঃ) ট্রটস্কির রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হয়।



ট্রটস্কি

স্ট্যালিন ক্ষমতায় আসিয়া সোভিয়েত রাশিয়ার গঠনমূলক কাজে হাত দেন। তিনি ডিক্টেটর বা স্বৈর শাসকের ন্যায় কঠোর ও অনমনীয় মনোভাব লইয়া তাঁহার মৃত্যু কাল পর্যন্ত রাশিয়ার শাসন পরিচালনা করেন। প্রথমেই তিনি রাশিয়ার শিল্প প্রসারের জন্য ভারী শিল্প গড়ার কাজে হাত দেন। ইহার ফলে রাশিয়া পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পোন্নত দেশে পরিণত হয়। লোহা, ইস্পাত, তেল, কয়লা, যন্ত্রশিল্প সর্বক্ষেত্রেই স্ট্যালিন রাশিয়াকে স্বাবলম্বী করেন। বর্তমানকালে পৃথিবীর দুই শ্রেষ্ঠ শিল্পোন্নত দেশের মধ্যে অন্যতম হইল সোভিয়েত রাশিয়া। এজন্য স্ট্যালিনের দূরদৃষ্টি ও সংগঠন প্রশংসার যোগ্য।

শিল্প বিপ্লব

স্ট্যালিন রাশিয়ায় তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা চালু করেন। ১৯২৮ খ্রীঃ প্রথম, ১৯৩৩ খ্রীঃ দ্বিতীয় এবং ১৯৩৮ খ্রীঃ তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। রাশিয়ার যৌথ খামারের ভিত্তিতে (Collective Farming) বৈজ্ঞানিক প্রথায় সার ও ট্রাক্টরের সাহায্যে কৃষি ব্যবস্থাকে গঠন করা হয়। যৌথ খামার চালু করিবার জন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারী চাষীগণের জমিকে সমবায়ে আনিবার দরকার হয়। এবিষয়ে তিনি কুলাক বা জোতদার এবং ক্ষুদ্র চাষীগণের নিকট প্রবল বাধা পান। কিন্তু স্ট্যালিন কুলাক বা জোতদারদের বাধা দমন করেন। শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রয়োজনমুখী ও বাস্তবভিত্তিক করা হয়। বিজ্ঞান, কারিগরী বিদ্যাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। রুশ ভাষা ছাড়া ইংরাজী বা ফরাসী ভাষা শিক্ষা আবশ্যিক করা হয়। উৎপাদনকে যেমন রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত করা হয়, বণ্টনকেও

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

(লোকেটো) (নোট জমুনা সার্ভেন্টস ... অবসান নাম্বার
বিধিবদ্ধ নির্দেশ ...)

সেইরূপ নিয়ন্ত্রিত করা হয়। শাসন ব্যবস্থাকে দুর্নীতিমুক্ত ও কল্যাণ-মুখী করা হয়। স্ট্যালিনের নেতৃত্বে রাশিয়া এক মহা শক্তিধর রাষ্ট্রে পরিণত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঝড়-ঝাপ্টা কাটাইয়া রাশিয়া আজ বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে।



স্ট্যালিন

স্ট্যালিনের বৈদেশিক নীতি

স্ট্যালিন ১৯২৪—৩৩ খ্রীঃ পর্যন্ত বিভিন্ন দেশের সহিত নিরাপত্তা, অনাক্রমণ ও মিত্রতা চুক্তির স্বাক্ষর করেন। ১৯৩৩ খ্রীঃ জার্মানীতে নাৎসী সরকার গঠিত হয়। জার্মানীর নেতা হিটলারের কমিউনিষ্ট বিরোধিতা এবং রুশ বিরোধী নীতি লক্ষ্য করিয়া স্ট্যালিন শঙ্কিত হন। রাশিয়ার নিরাপত্তার জন্য তিনি পশ্চিমী শক্তির সহিত সহযোগিতা নীতি নেন। কিন্তু ইংলণ্ড প্রভৃতি পশ্চিমী দেশগুলি রাশিয়ার মিত্রতায় আগ্রহের অভাব দেখায়। তাহারা জার্মানীকে তোষণ করিয়া জার্মান সামরিক শক্তিকে রাশিয়ার দিকে চালিত করার চেষ্টা করে। ১৯৩৮ খ্রীঃ মিউনিখ চুক্তির দ্বারা জার্মানীকে চেকোস্লোভাকিয়া ও রুশ সীমান্তের দিকে ঠেলিয়া দেওয়া হয়। এই সংকটে আত্মরক্ষার জন্য স্ট্যালিন বাধ্য হইয়া নাৎসী জার্মানীর সহিত ১৯৩৯ খ্রীঃ অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদিত করেন। ফলে ১৯৩৯ খ্রীঃ জার্মানীর সহিত পশ্চিমী শক্তির বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইলে দুই বৎসর কাল রাশিয়া নিরপেক্ষ থাকে। এই সময়ে স্ট্যালিন তাঁহার রণ-প্রস্তুতি চালাইতে থাকেন। স্ট্যালিন জানিতেন যে শেষ পর্যন্ত জার্মানী সন্ধি ভাঙিয়া রাশিয়াকে আক্রমণ করিবে। এজন্য তিনি প্রস্তুতি চালান। ১৯৪১ খ্রীঃ জার্মানী রাশিয়া আক্রমণ করে। স্ট্যালিনের নেতৃত্বে লালফৌজ বহু আত্মত্যাগের দ্বারা জার্মান বাহিনীকে রাশিয়া হইতে বিতাড়িত করে। জার্মান বাহিনীর বিরুদ্ধে লাল ফৌজ মার্শাল জুকভের নেতৃত্বে স্ট্যালিনগ্রাদের ঐতিহাসিক লড়াইয়ে জয়লাভ করে। জার্মানীর সহিত যুদ্ধের সময় রাশিয়া পশ্চিমী দেশের সহিত মিত্রতাবদ্ধ হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পূর্ব ইওরোপে রাশিয়ার অপ্রতিহত প্রভাব গড়িয়া উঠে। রাশিয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধিতে পশ্চিমী শক্তিগুলি বিশেষতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঈর্ষাবোধ করে। ফলে মার্কিন দেশের সহিত রাশিয়ার ঠাণ্ডা লড়াই আরম্ভ হয়। ১৯৫৩ খ্রীঃ স্ট্যালিন দেহত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর রুশ নেতাগণ স্ট্যালিনীয় শৃংখলা ও কঠোরতা ত্যাগ করিয়া উদারনৈতিক শাসন এবং ব্যক্তি নেতৃত্ব ত্যাগ করিয়া যৌথ নেতৃত্ব গঠন করিয়াছেন।

বলশেভিক বিপ্লবের প্রভাব (Impact of the Russian Revolution): ফরাসী বিপ্লবের পর যেমন ইওরোপের সর্বত্র ইহার ভাবধারা ছড়াইয়া পড়ে, রুশ বিপ্লবের পর পৃথিবীর সকল দেশেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রুশ বিপ্লবের ভাবধারা অনুপ্রবেশ করিয়াছে। ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারা যেমন অভিজাততন্ত্রের উপর

আঘাত হানে, রুশ বিপ্লব সেইরূপ ধনতন্ত্র বা বুর্জোয়া শ্রেণীর ক্ষমতার উপর আঘাত হানিয়াছে। রুশ বিপ্লবের ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শ্রমিক, কৃষক ও ঔপনিবেশিক দেশগুলির নিপীড়িত জনগণের মনে মুক্তির যে আশাবাদ জাগে তাহা বিপ্লবের ৫০ বছর পরেও জাগ্রত আছে। রুশ নেতাগণ বিশ্ববিপ্লবের জন্য প্রত্যক্ষভাবে চেষ্টা না চালাইলেও যে সকল দেশে মুক্তির সংগ্রাম দেখা দেয় সেখানে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সাহায্য করিয়া থাকেন। সুতরাং তুরস্কের মুক্তি আন্দোলনে কামাল পাশাকে রুশ নেতাগণ সাহায্য করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আফ্রিকা ও এশিয়ার বহুদেশ—ভিয়েতনাম, বাংলাদেশ, আরব, কিউবা, এ্যাঙ্গোলা প্রভৃতির সাম্রাজ্যবাদ হইতে মুক্তিযুদ্ধে রাশিয়ার অবদান স্মরণীয়। মুক্তিপ্রাপ্ত দেশগুলির পুনর্গঠনে রুশ দেশ অনেক ক্ষেত্রে অকাতরে সাহায্য দিয়াছে। এইভাবে বিপ্লবী রুশ সরকার নিপীড়িত জাতিগুলিকে সাম্রাজ্যবাদের শোষণ হইতে মুক্ত হইবার জন্য প্রেরণা ও সাহায্য দেয়। কিউবা, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশে তাহারা সাম্যবাদী রাষ্ট্র স্থাপনে অকৃপণ সাহায্য দেয়। আজ পৃথিবীর বহু দেশে রাশিয়ার আদর্শ ও সহযোগিতায় সমাজবাদী রাষ্ট্র স্থাপিত হইয়াছে। পৃথিবীতে ধনতান্ত্রিক শোষণ হইতে মুক্ত করিবার জন্য রাশিয়ার প্রচেষ্টা ইতিহাসে স্বীকৃত হইয়াছে। স্বাধীন ভারতবর্ষও তাঁহার উন্নয়নের জন্য রাশিয়া হইতে বহু কারিগরী সাহায্য পাইয়াছে। ভারতের সেনাদলকে সর্বাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত করিবার জন্য রুশ পরামর্শ ও অস্ত্র সাহায্য স্মরণ করা যায়।

নিপীড়িত জাতির প্রতি সমর্থন

দ্বিতীয়তঃ, রাশিয়ার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আদর্শ বিভিন্ন দেশকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। ভারত, তুরস্ক, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশ রুশ আদর্শে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গঠন করিয়াছে।

পরিকল্পিত অর্থনীতি

তৃতীয়তঃ, রাশিয়ার সাম্যবাদী সংস্কারগুলি আজ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ বিভিন্নভাবে গ্রহণ করিতেছে। রাশিয়ায় উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা, কলকারখানা ও ক্ষেত খামারগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত হইবার ফলে সুপরিকল্পিত ভাবে ইহার পরিচালনা সম্ভব হয়। তাছাড়া কোন কলকারখানার মালিকের পক্ষে শোষণ করা সম্ভব হয় না। শ্রমিকেরা তাহাদের ন্যায্য মজুরী পাইয়া থাকে। রাশিয়ার আদর্শে ভারত প্রভৃতি অনেক দেশ মৌলিক শিল্পগুলি যথা লোহা, ইস্পাত, কয়লা প্রভৃতির রাষ্ট্রীয়করণ করিয়াছে। উন্নয়নশীল সকল দেশেই এখন রাশিয়ার আদর্শে মূল শিল্পগুলিকে রাষ্ট্রের হাতে আনার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। রাশিয়ার আদর্শে শ্রমিকের কল্যাণের নীতিও অনুসরণ করা হয়। এমন কি ধনতন্ত্রী সরকারগুলিও আজ শ্রমিক ও কৃষকের কল্যাণমূলক আইন রচনা করিয়া থাকে। রুশ বিপ্লবের ফলে দুনিয়ার শ্রমিক ও কৃষকের যে জাগরণ ঘটিয়াছে তাহা থামাইয়া রাখা সম্ভব নয় একথা অধিকাংশ রাষ্ট্র বুঝিয়াছে। এজন্য শ্রমিককে তাহার ন্যায্য প্রাপ্য দেওয়ার কথা সকলে উপলব্ধি করিয়াছে।

শ্রমিক ও মেহনতি মানুষের প্রতি দরদ

সর্বশেষে প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে ধনতন্ত্রবাদী পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির সহিত সাম্যবাদী রাশিয়ার যে পারস্পরিক সন্দেহ দেখা দিয়াছে তাহা আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে

প্রভাবিত করিয়াছে। ধনতন্ত্রী দেশগুলি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর রাশিয়ার বিরুদ্ধে জোট গঠনের চেষ্টা করে। কিন্তু রাশিয়া এই জোটের বিরুদ্ধে পাল্টা সাম্যবাদী জোট গঠন করিয়াছে। মোট কথা রুশ বিপ্লবের আদর্শ আজ বহু দেশ উপলব্ধি করিয়াছে। পূর্ব ইওরোপ, চীন, ভিয়েৎনাম প্রভৃতি দেশে সাম্যবাদী সরকার স্থাপিত হইয়াছে। ভারত প্রভৃতি দেশগুলি গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের আদর্শ গ্রহণ করিয়াছে। তাছাড়া সাম্রাজ্যবাদের হাত হইতে বিভিন্ন দেশের মুক্তি সংগ্রামে সোভিয়েত রাশিয়া অকুণ্ঠ সমর্থন করিয়া এশিয়া, আফ্রিকার বহুদেশে প্রশংসা পাইয়াছে।

আন্তর্জাতিক আবেদন

চতুর্দশ অধ্যায়

এক নায়কতন্ত্রের যুগ ঃ যৌথ নিরাপত্তার বিফলতা ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

(Dictatorship : Collapse of the collective Security : Outbreak of the Second World War)

19/8/85

ফ্রান্সের নিরাপত্তা ও লোকার্ণো চুক্তি (The Problem of French Security and the Locarno Treaty) ঃ প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানীর বিরুদ্ধে ফ্রান্স জয়লাভ করিলেও ফ্রান্সের নেতৃমণ্ডলী ভবিষ্যতে জার্মানী কর্তৃক ফ্রান্স আক্রমণের আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হইয়া পড়েন। অল্প সময়ের ব্যবধানে জার্মানী পর পর দুইবার ফ্রান্স আক্রমণ করিয়াছিল। সুতরাং জার্মানী পুনরায় ফ্রান্স আক্রমণ করিতে এই আশঙ্কা অমূলক ছিল না। প্রথম মহাযুদ্ধে পরাজিত হইলেও জার্মানীর লোকসংখ্যা, সম্পদ ও কারিগরী বিদ্যা অটুট ছিল। ফলে অচিরকালের মধ্যে জার্মানী পুনরায় বৃহৎ শক্তি হিসাবে দেখা দিবে এই সম্ভাবনা প্রায় সুনিশ্চিত ছিল। এই সম্ভাবনা দূর করিবার জন্য প্রথম মহাযুদ্ধের পর জার্মানীর উপর ভার্সাই সন্ধি চাপাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু ফ্রান্স ভার্সাই সন্ধি দ্বারা যথেষ্ট নিরাপদ বোধ করে নাই। যাহা হউক জার্মানীকে ঘায়েল করিবার জন্য ফ্রান্স ক্ষতিপূরণ সমস্যাকে ব্যবহার করে। ভার্সাই সন্ধি অনুসারে জার্মানীর ক্ষতিপূরণ দানে জার্মানী ব্যর্থ হইলে ফ্রান্স ১৯২২ খ্রীঃ জার্মানীর রুর জেলা শাস্তিমূলকভাবে অধিকার করে। ইহার ফলে ফরাসী-জার্মান সম্পর্কের যথেষ্ট অবনতি ঘটে। জার্মানীর প্রজাতন্ত্রী সরকার ফ্রান্সের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য সোভিয়েত রাশিয়ার সহিত ১৯২২ খ্রীঃ র‍্যাপালোর সন্ধি স্থাপন করেন। র‍্যাপালোর সন্ধিতে জার্মানী ও রাশিয়া মিত্রতাবদ্ধ হইলে ফ্রান্স আশঙ্কা বোধ করে। কারণ এই দুইটি দেশই ছিল ভার্সাই চুক্তি বিরোধী। ফ্রান্স আরও ভয় পায় যে রুশ সাম্যবাদ জার্মানীতে ঢুকিয়া

ফ্রান্সের নিরাপত্তার সমস্যা

পড়িবে। ফ্রান্স আত্মরক্ষার জন্য লীগকে জোরদার করার চেষ্টা করে। এজন্য জেনেভা প্রটোকোল রচনা করা হয়। কিন্তু জেনেভা প্রটোকোল লীগে গৃহীত না হইবার ফলে ফ্রান্সের নিরাপত্তার প্রশ্ন রহিয়া যায়। এমতাবস্থায় ফ্রান্স আত্মরক্ষার জন্য পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি দেশের সহিত জার্মানীর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা চুক্তি করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফরাসী সরকার বুঝিতে পারে যে জার্মানীর বিরুদ্ধে ফ্রান্সের নিরাপত্তার সমস্যা অমীমাংসিত রহিয়া গিয়াছে।

ব্রিয়াঁ ও ষ্ট্রাসম্যানের মতবাদ

ইতিমধ্যে ফ্রান্সে উগ্র জাতীয়তাবাদী পয়েনকারী মন্ত্রীসভার পতন ঘটে। ইহার ফলে উদারপন্থী ব্রিয়াঁ (Briand) ক্ষমতায় আসেন। ব্রিয়াঁ উপলব্ধি করেন যে জার্মানীর সহিত একটি সুনির্দিষ্ট বোঝাপড়া না করিতে পারিলে ফ্রান্সের নিরাপত্তা সমস্যার সমাধান হইবে না। অপরদিকে জার্মানীতে নূতন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে গুষ্টাভ ষ্ট্রাসম্যান (Stresemann) নিযুক্ত হন। ষ্ট্রাসম্যান ছিলেন অত্যন্ত বাস্তবতাবাদী, তীক্ষ্ণ বুদ্ধির মানুষ। তিনি যে নীতি গ্রহণ করেন তাহার নাম ছিল "পরিপূর্ণতা" নীতি (Policy of Fulfilment)। ষ্ট্রাসম্যান মনে করিতেন যে জার্মানীকে শক্তিশালী করিতে পারিলে তবে ভার্সাই সন্ধিকে পরিবর্তন করা যাইবে। ফ্রান্সের জার্মান আক্রমণ সম্পর্কে আশঙ্কা দূর হইলেই তবে জার্মানী আত্মগঠনের সুযোগ পাইবে বলিয়া তিনি মনে করেন।[১] এজন্য তিনি পশ্চিমী দেশ যথা ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সহিত মিত্রতা স্থাপনের চেষ্টা করেন। ষ্ট্রাসম্যান পশ্চিমী দেশগুলিকে বুঝাইবার চেষ্টা করেন যে জার্মানী শান্তিরক্ষায় আগ্রহী। তিনি ইহা বলেন যে ফ্রান্সের জার্মানীকে ভয় করিবার কোন দরকার নাই। জার্মানী ফ্রান্সকে আক্রমণ করিতে চাহে না।

লোকার্ণো কংগ্রেসের আহ্বান ও লোকার্ণোর ভাবধারা

উপরোক্ত নীতি অনুযায়ী ষ্ট্রাসম্যান ফ্রান্সের নিকট পারস্পরিক অনাক্রমণ চুক্তি স্থাপনের প্রস্তাব দেন। ফরাসী মন্ত্রী ব্রিয়াঁ একটি আন্তর্জাতিক বৈঠকের দ্বারা সেইরূপ চুক্তি স্বাক্ষর করার কথা বলেন। ব্রিয়াঁর প্রস্তাব অনুযায়ী ইংলণ্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, জার্মানী ও ইতালী এই সাতটি দেশের প্রতিনিধিগণ সুইজারল্যাণ্ডের লোকার্ণো (Locarno) শহরে ১৯২৫ খ্রীঃ সমবেত হন। এই সম্মেলনকে লোকার্ণো কংগ্রেস বলা হয়। লোকার্ণো কংগ্রেসে জার্মানীর প্রতি মিত্রজনোচিত মনোভাব প্রকাশ করা হয়। জার্মানীকে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের সমমর্যাদা দান করিলে, ভার্সাই সন্ধির পর যে তিক্ত আবহাওয়া দেখা দিয়াছিল তাহা দূর হয়। লোকার্ণোর ভাবধারা (Locarno spirit) ইওরোপে এক শান্তির আবহাওয়া আনে। ঐতিহাসিক ল্যাংসামের মতে লোকোর্ণো বৈঠকেই প্রকৃতপক্ষে প্রথম মহাযুদ্ধের বিরোধিতার অবসান ঘটে এবং প্রকৃত শান্তি স্থাপিত হয়।[২]

লোকার্ণো কংগ্রেসে নিম্নলিখিত সাতটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ঃ—যথা, (১) পারস্পরিক

---

১. A. J. P. Taylor—Origin of the Second World War.

২. "Locarno is the dividing line between years of war and years of peace."

গ্যারাণ্টি চুক্তি (General Treaty of Mutual Guarantee) (ক) জার্মানী, ফ্রান্স ও বেলজিয়াম এই তিনটি দেশ তাহাদের মধ্যে ভার্সাই সন্ধির নির্দিষ্ট সীমানা মানিয়া চলিতে স্বীকৃত হয়। (খ) রাইন নদের পূর্বতীরে ৫০ কিলোমিটার দূর দিয়া যে রেখা টানা হয় তাহার মধ্যে জার্মানী কোন সামরিক ব্যবস্থা না করিতে স্বীকৃত হয়। (গ) জার্মানী, ফ্রান্স ও বেলজিয়াম এই তিনটি শক্তি পরস্পরকে কোন ক্ষেত্রে আক্রমণ না করিতে অঙ্গীকার করে। (ঘ) ইংলণ্ড ও ইতালী এই চুক্তির গ্যারাণ্টর বা জামিনদার হিসাবে স্বাক্ষর দেয়। যদি কোন পক্ষ চুক্তিভঙ্গ করে তবে চুক্তিভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে তাহারা শাস্তিদানের দায়িত্ব নেয়।

লোকার্ণো চুক্তিসমূহ

(২) জার্মানী, ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের মধ্যে দুইটি বাধ্যতামূলক মীমাংসা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ইহার বলে এই তিন শক্তি তাহাদের ভবিষ্যৎ বিরোধগুলি বাধ্যতামূলকভাবে শান্তিপূর্ণ উপায়ে মিটাইয়া লইতে অঙ্গীকার করে। তবে অতীতের কোন বিষয়ের উপর যথা ভার্সাই সন্ধি প্রভৃতি বিষয় নিষ্পত্তিযোগ্য বিবেচিত হইবে না ইহাও বলা হয়।

(৩) জার্মানী, পোল্যান্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়ার মধ্যে দুইটি বাধ্যতামূলক মীমাংসা চুক্তি হয়। ইহার বলে এই তিন রাষ্ট্র তাহাদের সকল প্রকার বিরোধ বাধ্যতামূলকভাবে শান্তিপূর্ণ উপায়ে মিটাইয়া লইতে স্বীকৃতি দেয়।

(৪) ফ্রান্স, চেকোশ্লোভাকিয়া ও পোল্যাণ্ডের মধ্যে দুইটি পারস্পরিক আত্মরক্ষামূলক সন্ধি স্থাপিত হয়। ইহার বলে সকল প্রকার বিরোধ শান্তিপূর্ণ উপায়ে মিটাইয়া লইবার কথা বলা হয়।

(৫) এছাড়া লোকার্ণো সন্ধির স্বাক্ষরকারীগণ নিরস্ত্রীকরণের জন্য সুপারিশ করে। লোকার্ণো চুক্তি দ্বারা আপাততঃ ফ্রান্সের নিরাপত্তা সমস্যার সমাধান হয়। জার্মানী লীগ অফ নেশনসের সভ্য পদ পায়। কিন্তু লোকার্ণো চুক্তি প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়। জার্মানী ও ফ্রান্সের মনোমালিন্য সাময়িক ভাবে এই চুক্তির দ্বারা বন্ধ হইলেও পুনরায় লীগের সদস্য পদ লইয়া ফ্রান্স ও জার্মানীর মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। ফ্রান্স তাহার অস্ত্র হ্রাস না করায় জার্মানী অস্বস্তি বোধ করে। এছাড়া লোকার্ণো সন্ধি দ্বারা ফ্রাঙ্কো-জার্মান ও বেলগো-জার্মান সীমান্ত জার্মানীর দ্বারা স্বীকৃত হইলেও, জার্মানীর পূর্ব সীমান্তের সমস্যা অমীমাংসিত থাকে। লোকার্ণো সন্ধিতে জার্মানী পশ্চিমে ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের সহিত ভার্সাই সীমান্ত মানিয়া চলিতে প্রতিশ্রুতি দেয় ইহা সত্য। কিন্তু জার্মানী তাহার পূর্ব সীমান্তে পোল্যাণ্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়ার সহিত ভার্সাই সীমান্ত মানিয়া চলিতে প্রতিশ্রুতি দেয় নাই। ঐতিহাসিক এ. জে. পি. টেইলারের মতে ষ্ট্রাসম্যান কৌশলে পশ্চিম সীমান্ত স্বীকার করিয়া পূর্ব সীমান্তকে বিচারযোগ্য করিয়া তুলেন। তাছাড়া লোকার্ণো সন্ধিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্মতি না লইবার ফলে এই সন্ধির প্রতি রাশিয়ার সন্দেহের উদ্রেক হয়। ফলে রাশিয়া এই সন্ধির তীব্র সমালোচনা করে।

লোকার্ণো চুক্তির সমালোচনা

প্যারিসের যুদ্ধবিরতি চুক্তি, ১৯২৮ খ্রীঃ: কেলগ-ব্রিয়াঁ চুক্তি (Peace Pact of Paris): লোকার্ণোর সন্ধির দুর্বলতা অচিরে প্রকট

হইলে ফরাসী প্রধানমন্ত্রী ব্রিয়াঁ আমেরিকার বৈদেশিক মন্ত্রী ফ্রান্সিস কেলগকে একটি যুদ্ধ-বিরোধী চুক্তি গঠনের জন্য অনুরোধ জানান। ফলে ১৯২৮ খ্রীঃ কেলগ-ব্রিয়াঁ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পরে বিশ্বের প্রায় অর্ধশত রাষ্ট্র এই চুক্তিতে যোগ দিলে ইহার নাম হয় প্যারিসের যুদ্ধবিরতি চুক্তি (Peace Pact of Paris)।

প্যারিসের শান্তি চুক্তির শর্তাবলী

এই সন্ধির মুখবন্ধে শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধ নিষ্পত্তির আদর্শ ঘোষিত হয়। প্রথম ধারায় বলা হয় যে এই সন্ধি স্বাক্ষরকারী দেশগুলি যুদ্ধকে জাতীয় নীতি হিসাবে গ্রহণ করিবে না এবং আন্তর্জাতিক বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য বল প্রয়োগ হইতে বিরত থাকিবে। দ্বিতীয় ধারায়, স্বাক্ষরকারীগণ তাহাদের আন্তর্জাতিক বিরোধ ও সমস্যাগুলিকে শান্তিপূর্ণ পন্থায় মিটাইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়।

সমালোচনা

প্যারিসের যুদ্ধবিরতি চুক্তি দ্বারা আন্তর্জাতিক বিরোধ প্রশমনের জন্য যুদ্ধকে নিষিদ্ধ করা হইলেও আক্রমণ বা অঘোষিত যুদ্ধকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় নাই। ইহার ফলে আগ্রাসন বা অঘোষিত যুদ্ধকে বেআইনী করা সম্ভব হয় নাই। এছাড়া এই সন্ধির স্বাক্ষরকারীগণ আত্মরক্ষার জন্য আইনতঃ যুদ্ধ করিতে পারিত। তাহারা ইচ্ছা করিলে আক্রমণমূলক যুদ্ধকে আত্মরক্ষার যুদ্ধ বলিয়া চালাইয়া দিতে পারিত। ইহার ফলে প্যারিসের যুদ্ধ বিরতি চুক্তি বিফলতা দেখা দেয়। তাছাড়া এই যুদ্ধ বিরতি চুক্তি যদি কোন স্বাক্ষরকারী ভঙ্গ করিত তবে সেই চুক্তি ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থার নির্দেশ না থাকায় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যুদ্ধের সম্ভাবনা থাকিয়া যায়। ফ্রান্সের নিরাপত্তার প্রশ্নও অমীমাংসিত থাকে। তবুও একথা বলা যায় যে লীগ অফ নেশনস ও প্যারিসের যুদ্ধ বিরতি চুক্তি উভয় ব্যবস্থা অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য বিশ্বশান্তি রক্ষায় সক্ষম হয়।

নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা (Problem of Disarmament) : প্রথম মহা যুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংসলীলা চিন্তাশীল মানুষগণের মনে যুদ্ধের পরিণাম সম্পর্কে আশঙ্কা সৃষ্টি করে। সকলেই বুঝিতে পারে যে কোন দেশের হাতে অস্ত্র থাকিলে সেই দেশ শান্তির কথায় কান দিবে না। এজন্য নিরস্ত্রীকরণের দাবী উঠে। প্রেসিডেণ্ট উইলসন তাঁহার চৌদ্দ দফায়ও নিরস্ত্রীকরণের কথা বলেন। ভার্সাই সন্ধিতে মিত্রশক্তি সকল শক্তির নিরস্ত্রীকরণের কথা বলে। লীগের চুক্তিপত্রের ৮ম ধারায় লীগ পরিষদকে সকল দেশের অস্ত্র হ্রাসের জন্য ব্যবস্থা লইতে নির্দেশ দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানের সহিত নৌ প্রতিযোগিতা বন্ধের জন্য ১৯২১ খ্রীঃ ওয়াশিংটন বৈঠকে পঞ্চ শক্তি জাপান, ইংলণ্ড, মার্কিন দেশ, ইতালী ও ফ্রান্সের দ্বারা নৌশক্তি প্রশান্ত মহাসাগরে হ্রাস করা হয়।

লীগ চুক্তিপত্রে নিরস্ত্রীকরণের নির্দেশ

ইওরোপে অস্ত্র হ্রাস করিবার জন্য লীগ চুক্তিপত্রের অষ্টম ধারা অনুযায়ী লীগের একটি অস্থায়ী কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশন কয়েকটি প্রস্তাব দেয়। কিন্তু তাহা কার্যকরী হয় নাই। জার্মানী ১৯২৫ খ্রীঃ লীগের সভ্যপদ গ্রহণ করিলে নিরস্ত্রীকরণকে কার্যকরী করার জন্য জোর প্রচেষ্টা চলে।

অস্থায়ী মিশ্র কমিশন

নিরস্ত্রীকরণের খসড়া রচনার জন্য লীগ পরিষদ একটি প্রস্তুতি কমিটি নিয়োগ করে। এই কমিটিতে ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ ছাড়া জার্মানী ও সোভিয়েত রাশিয়া এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও যোগ দেয়। কিন্তু ইংলণ্ড ও ফ্রান্স এই কমিটির নিকট পরস্পর-বিরোধী প্রস্তাব দিলে কোন কার্যকরী সিদ্ধান্ত গ্রহণ কষ্টকর হইয়া উঠে।

ওয়াশিংটন ও লণ্ডন নৌ চুক্তি

ইতিমধ্যে লীগের বাহিরে বিভিন্ন রাষ্ট্র পরস্পর আলোচনার দ্বারা নিরস্ত্রীকরণের জন্য চেষ্টা চালায়। আটলাণ্টিক মহাসাগরে নৌ প্রতিযোগীতা হ্রাসের জন্য ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জেনেভা বৈঠকে (১৯২৭ খ্রীঃ) মিলিত হয়। কিন্তু এই বৈঠক বিফল হয়। ১৯৩০ খ্রীঃ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লণ্ডনে একটি নিরস্ত্রীকরণ বৈঠক আহবান করেন। ইহাতে ফ্রান্স তাহার ঔপনিবেশিক স্বার্থের দোহাই দিয়া নৌশক্তি হ্রাস করিতে অসম্মতি জানায়। এদিকে ইতালী ভূমধ্যসাগরে ফ্রান্সের সমান নৌশক্তি রাখিবার দাবী জানায়। শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন দেশ ওয়াশিংটন বৈঠকের হার অনুযায়ী ভূমধ্যসাগরে আরও পাঁচ বছরের জন্য নৌশক্তি হ্রাস করিতে রাজী হয়।

নিরস্ত্রীকরণ প্রস্তুতি সম্মেলন ১৯৩২ খ্রীঃ

লণ্ডন নৌ বৈঠকের আংশিক সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া লীগের নিরস্ত্রীকরণ কমিটি ১৯৩২ খ্রীঃ লীগের নেতৃত্বে বিশ্ব নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন আহবান করে। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল লীগের সকল সভ্য রাষ্ট্রের অস্ত্র হ্রাস করিয়া বিশ্ব-শান্তিকে দৃঢ় করা। এই সম্মেলনে মোট ৬১টি রাষ্ট্র যোগ দেয়। কিন্তু ইংলণ্ড ও ফ্রান্স এই সম্মেলনে মন্ত্রী পর্যায়ের কোন প্রতিনিধি না পাঠাইবার ফলে সম্মেলনের মর্যাদা অনেকাংশে কমিয়া যায়। যাহাই হউক বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্য ফ্রান্স, লীগ অফ নেশনসের অধীনে একটি আন্তর্জাতিক পুলিশ বাহিনী গঠনের প্রস্তাব দিয়া সকলকে চমকিত করে। ফ্রান্স আরও বলে যে বড় বড় শক্তিগুলি তাহাদের নৌবাহিনী, ভারী কামান, বোমারু বিমান লীগের হাতে ছাড়িয়া দিক। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে ফ্রান্স তাহার নিজ নিরাপত্তার প্রশ্ন তুলিয়া অস্ত্রহ্রাসের বিরোধিতা করে। ফ্রান্সের প্রস্তাবে ইংলণ্ড ও আমেরিকা আপত্তি জানায়। ইংলণ্ড প্রস্তাব দেয় যে কয়েকটি বিশেষ ধরনের অস্ত্র যথা—ভারী কামান, ট্যাংক, সাবমেরিন, বোমারু বিমান, বিষাক্ত গ্যাস প্রভৃতিকে হ্রাস করার জন্য চেষ্টা করা উচিত। কারণ এই অস্ত্রগুলি হইল আক্রমণাত্মক। ইংলণ্ডের প্রস্তাব অধিকাংশ সভ্য সমর্থন করিলে স্থল, জল ও বায়ু এই তিন ক্ষেত্রেই অস্ত্র হ্রাসের প্রস্তাব রচনার জন্য তিনটি কমিশন নিযুক্ত হয়। কিন্তু আলোচনার সময় কোন অস্ত্র আক্রমণাত্মক অথবা আত্মরক্ষামূলক ইহা লইয়া কমিশনের সভ্যগণের মধ্যে গভীর মতভেদ দেখা দেয়। জার্মানী দাবী করে যে ভার্সাই সন্ধি দ্বারা যে সকল অস্ত্র নিষিদ্ধ হইয়াছে সেইগুলিকে আপাততঃ সাধারণভাবে নিষিদ্ধ করা হউক। ফ্রান্স ইহাতে আপত্তি জানায়। কারণ ফ্রান্স উপলব্ধি করে যে জার্মানীর প্রস্তাব কার্যকরী হইলে ফ্রান্সকে জার্মানীর সমান ক্ষমতায় নামিয়া আসিতে হইবে। শেষ পর্যন্ত নিরস্ত্রীকরণ কমিশন প্রস্তাব নেয় যে (১) বোমারু বিমান, (২) ভারী কামান এবং ট্যাংক, (৩) রাসায়নিক যুদ্ধ বা বিষাক্ত গ্যাস প্রভৃতির ব্যবহার আইনতঃ নিষিদ্ধ করা দরকার। নিরস্ত্রীকরণ

সমিতির প্রস্তাব লীগের সাধারণ সভায় গ্রহণের জন্য পেশ করা হয়। কিন্তু লীগের ৪১টি সভ্য দেশ এই প্রস্তাবে সমর্থন দিলেও জার্মানী ইহাতে আপত্তি জানায়। জার্মানী দাবী জানায় যে ভার্সাই সন্ধি দ্বারা জার্মানীকে পুরাপুরি নিরস্ত্রীকৃত করা হইয়াছে। নিরস্ত্রীকরণ সমিতির প্রস্তাবে প্রতি রাষ্ট্রের হাতে একটি নিম্ন পরিমাণ অস্ত্র রাখিবার কথা বলা হইয়াছে। জার্মানীকেও ঐ পরিমাণ অস্ত্র রাখিবার অধিকার দিতে হইবে। যদি জার্মানীর দাবী গৃহীত হইত তবে জার্মানী ফ্রান্সের সমান অস্ত্র রাখিবার অধিকার পাইত। তাছাড়া জার্মানীর প্রস্তাব গৃহীত হইলে ভার্সাই সন্ধির অস্ত্র সম্পর্কীয় শর্ত ভাঙিয়া পড়িত। সুতরাং ফ্রান্স তাহার নিরাপত্তার জন্য নিরস্ত্রীকরণ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে। ইতিমধ্যে হিটলার জার্মানীর শাসনকর্তা হইলে ফ্রান্স তাহার নিরাপত্তার জন্য নিরস্ত্রীকরণে আগ্রহ দেখাইতে অরাজী হয়। জার্মানীর শাসক হিটলারও নিরস্ত্রীকরণ নীতির বিপক্ষে ছিলেন। অবশেষে জার্মানীকে ফ্রান্সের সহিত সমানহারে অস্ত্র না রাখিতে দেওয়ার অজুহাতে জার্মানী নিরস্ত্রীকরণ বৈঠক ও লীগের সভ্যপদ ত্যাগ করে। জার্মানীর পদত্যাগের ফলে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন অচল হইয়া যায়। ফ্রান্স অভিযোগ করে যে জার্মানী অস্ত্র সজ্জা আরম্ভ করিয়াছে। সুতরাং নিরস্ত্রীকরণের আলোচনা নিরর্থক। ইহার পর এই সম্মেলন ভাঙিয়া যায়।

লীগ অফ নেশনসের কার্যকলাপ (The work of the League of Nations): প্রথম মহাযুদ্ধের পর লীগ অফ নেশনস বা জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষা, শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক বিরোধের মিটমাট ও বিভিন্ন উদ্দেশ্য লইয়া স্থাপিত হয়। (বিশদ বিবরণ দ্বাদশ অধ্যায় পৃঃ ২১১ দেখ)। "১৯২৪—১৯৩০ খ্রীঃ পর্যন্ত লীগের সর্বোচ্চ ক্ষমতা ও মর্যাদার পরিচয় পাওয়া যায়।"[১] লীগ এই সময় আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষার কাজে প্রশংসনীয় কৃতিত্ব দেখায়।

১৯২৪ খ্রীঃ হইতে গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের মন্ত্রীগণ ব্যক্তিগতভাবে লীগের বৈঠকে যোগ দিলে লীগের মর্যাদা বাড়িয়া যায়। ১৯২৫ খ্রীঃ জার্মানী লীগের পরিষদের স্থায়ী সভ্য হিসাবে নির্বাচিত হইলে লীগের নিরপেক্ষ চরিত্র প্রকট হইয়া উঠে। কারণ এযাবৎ জার্মানী সভ্য না থাকায় লীগকে কেবলমাত্র বিজয়ী দেশের সভা বলা হইত। তুরস্ক ও ইরাকের মধ্যে মসুল প্রদেশ লইয়া সীমান্ত বিরোধ দেখা দিলে লীগের নির্দেশে ইহা আন্তর্জাতিক আদালতে বিচার করা হয় এবং আদালত লণ্ডন চুক্তির ভিত্তিতে এই স্থান ইরাকের প্রাপ্য বলিয়া ঘোষণা করিলে তুরস্ক তাহা মানিয়া নেয়। গ্রীস ও বুলগেরিয়ার সীমান্ত বিরোধ লইয়া গ্রীস, বুলগেরিয়াকে আক্রমণ করিলে লীগের নির্দেশে গ্রীস সৈন্যদল সরাইয়া নেয়। ভিল্না নামক স্থান লইয়া পোল্যাণ্ড ও লিথুয়ানিয়ার মধ্যে যুদ্ধাবস্থা দেখা দিলে লীগের মধ্যস্থতায় যুদ্ধাবস্থার অবসান হয়। কিন্তু এই সকল বিবাদ নিষ্পত্তির সময় লক্ষ্য করা যায় যে লীগ দুর্বল দেশকেই তাহার নির্দেশ মানিতে বাধ্য করে। অনেক ক্ষেত্রে লীগ

লীগের সাফল্যের যুগ

১. "The years 1924—1930 were the period of the League's greatest prestige and authority"—Carr.

পক্ষপাতহীনভাবে কাজ করিতে পারে নাই। ইতালী গ্রীসের কর্ফু দ্বীপ দখল করিলে লীগ পুরা পক্ষপাতহীনভাবে কাজ করিতে পারে নাই। লীগ প্রবল প্রতিপক্ষ ইতালীর পক্ষে রায় দেয়। সমানভাবে মেক্সিকো-নিকারগুয়া বিবাদে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ, ইঙ্গ-মিশরীয় বিবাদ এবং মিশরকে লীগের সভ্যপদ দানে ইংলন্ডের বাধা, চীনে ইওরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির বৈষম্যমূলক চুক্তির ব্যাপারে লীগ অফ নেশনস পক্ষপাতহীন ন্যায় বিচার করিতে ব্যর্থ হয়। বৃহৎ শক্তির উপর লীগের সিদ্ধান্ত চাপাইয়া দিতে লীগের কোন ক্ষমতা ছিল না।

১৯৩০ খ্রীঃ পর হইতে লীগের মর্যাদা ও কার্যকারিতা দ্রুত-হ্রাস পায়। লীগ চুক্তি-পত্রের ১০ম হইতে ১৬ ধারায় যুদ্ধ নিরোধ, আন্তর্জাতিক বিবাদের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা প্রভৃতির নির্দেশ থাকিলেও তাহা কার্যকরী করা কঠিন হইয়া পড়ে। জাপান ছিল লীগ অফ নেশনসের প্রতিষ্ঠাতা সভ্য। সুতরাং সকলেই আশা করে যে জাপান নিশ্চয়ই লীগের আদর্শ মানিয়া চলিবে। কিন্তু ১৯৩১ খ্রীঃ জাপান লীগের আদর্শ বিসর্জন দিয়া চীনের অন্তর্গত মাঞ্চুরিয়া প্রদেশ আক্রমণ করিলে লীগের মর্যাদা নষ্ট হয়। চীন লীগের নিকট প্রতিকার দাবী করিলেও লীগ জাপানকে নিরস্ত করিতে ব্যর্থ হয়। লীগ অফ নেশনস মাঞ্চুরিয়ার ঘটনার তদন্তের জন্য লিটন কমিশন নিয়োগ করে। লিটন রিপোর্টের ভিত্তিতে লীগ জাপানকে অপরাধী সাব্যস্ত করিলে, জাপান লীগের সদস্য পদ ত্যাগ করে। ইহার কিছু দিন পর লীগ অফ নেশনস (১৯৩২ খ্রীঃ) বিশ্ব নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন আহবান করে। কিন্তু জার্মানী লীগের সদস্য পদ ত্যাগ করিলে এই সম্মেলন বানচাল হইয়া যায়। জাপানের ন্যায় ইতালীও ছিল লীগের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। কিন্তু ১৯৩৫ খ্রীঃ ইতালী লীগের আদর্শ বিসর্জন দিয়া আবিসিনিয়া আক্রমণ করে। আবিসিনিয়া লীগের নিকট ন্যায় বিচার প্রার্থনা করে। লীগ প্রথম দিকে ইতালীকে মীমাংসায় রাজী করাইবার চেষ্টা করিয়া বিফল হয়। লীগ যখন ইতালীর সহিত মীমাংসার কথা চালাইতেছিল, তখন ইতালী লীগকে পুরাপুরি অগ্রাহ্য করিয়া আবিসিনিয়ায় তীব্র আক্রমণ আরম্ভ করে। ইহাতে লীগের সদস্যরা ক্ষুব্ধ হইয়া ইতালীকে আক্রমণকারী বলিয়া ঘোষণা করে। লীগের ১৬নং শর্ত অনুযায়ী ইতালীর বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ ঘোষণা করে। ইতালী ইহাতে বিচলিত না হইয়া লীগের সদস্য পদ ত্যাগ করে এবং লীগের শাস্তিকে উপেক্ষা করিয়া আবিসিনিয়া গ্রাস করে। আবিসিনিয়ার ঘটনার পর লীগের মর্যাদা দ্রুত হ্রাস পায়। নাৎসী জার্মানী লীগের আদর্শ অগ্রাহ্য করিয়া চেকোশ্লোভাকিয়া গ্রাস করে। ১৯৩৯ খ্রীঃ জার্মানী পোল্যান্ড আক্রমণ করিলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়। লীগ অবশ্য তখনও নামেমাত্র ছিল। ১৯৩৯ খ্রীঃ রাশিয়া, ফিনল্যাণ্ড আক্রমণ করিলে লীগ রাশিয়াকে সভ্য পদ হইতে বহিস্কার করে। ইহাই ছিল লীগের সর্বশেষ কাজ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ লীগের চূড়ান্ত বিফলতা প্রমাণ করে।

লীগের বিফলতা ; জাপান, ইতালী ও জার্মানীর লীগের আদর্শের প্রতি উপেক্ষা

লীগ অফ নেশনস বিশ্বশান্তি রক্ষায় বিফল হইলেও অন্যান্য ক্ষেত্রে কিছু কাজ করে। লীগ পরিষদ ম্যান্ডেট ও সংখ্যালঘু সমস্যা লইয়া নিয়মিত আলোচনা চালায় এবং

উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা বাড়াইবার জন্য লীগের দপ্তর বিশেষ সচেষ্ট হয়। লীগের তত্বাবধানে বিভিন্ন দেশকে উন্নয়নের জন্য ঋণ-দান করা হয়। ১৯২০ খ্রীঃ ব্রাসেলসে ও ১৯২৭ খ্রীঃ জেনেভায় আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্মেলন ডাকা হয়। লীগ ক্রীতদাস প্রথা বন্ধের জন্য কমিশন নিয়োগ করে। ভেজাল ও বিষাক্ত ঔষধ, নেশা, নারী বিক্রয়, শিশুগণকে কারখানায় খাটান, উদ্বাস্তু পুনর্বাসন প্রভৃতি বিষয়ে লীগ অফ নেশনস উল্লেখযোগ্য কাজ করে। লীগের তত্বাবধানে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ ও আন্তর্জাতিক বিচারালয়ও উল্লেখযোগ্য কাজ করে।

লীগের অন্যান্য কৃতিত্ব

লীগের পতনের কারণ (Causes of the failure of the League) ঃ লীগ অফ নেশনসের পতনের জন্য অনেকগুলি কারণ দায়ী ছিল। লীগের গঠনতন্ত্রের মধ্যে ইহার ধ্বংসের বীজ লুকান ছিল। ভার্সাই সন্ধির শর্ত হিসাবে লীগ চুক্তিপত্রকে স্থাপন করা অত্যন্ত ভুল কাজ ছিল। জার্মানী, রাশিয়া প্রভৃতি দেশগুলি ছিল ভার্সাই চুক্তি বিরোধী। ইহার ফলে তাহারা মনে করে যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ী দেশগুলির স্বার্থরক্ষার জন্যই লীগ গঠিত হইয়াছে। তাছাড়া জার্মানী ভার্সাই সন্ধি পরিবর্তনের জন্য আগ্রহী ছিল। যেহেতু লীগ ভার্সাই সন্ধিকে অপরিবর্তনীয় জ্ঞান করিত, সেহেতু জার্মানী লীগের বিরোধিতা করে। দ্বিতীয়তঃ, লীগ চুক্তিপত্রের ১০ – ১৬ ধারার দ্বারা আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার কথা বলা হয়। কিন্তু এই ধারাগুলির আইনগত দুর্বলতা অল্প দিনের মধ্যেই প্রকট হইয়া পড়ে। লীগের যাহারা সভ্য ছিল না তাহাদের উপর এই ধারা প্রয়োগে লীগের কোন এক্তিয়ার ছিল না। জার্মানী, ইতালী, জাপান ও মার্কিন দেশ লীগের সভ্য না থাকায় ইহারা লীগের এক্তিয়ারের বাহিরে চলিয়া যায়। ফলে লীগ দুর্বল হইয়া পড়ে। আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক বিরোধের নিষ্পত্তির জন্য লীগ পরিষদকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য কোন সিদ্ধান্তে আসিতে হইলে পরিষদের সকল সভ্যগণকে একমত হইতে হইবে এই ব্যবস্থা থাকায় সভ্যগণ একমত না হইলে লীগ পরিষদের পক্ষে কোন মীমাংসা করা সম্ভব হইত না। লীগ চুক্তিপত্রে যুদ্ধকে বেআইনী ঘোষণা করা হইলেও আগ্রাসন (Aggression) বা অঘোষিত যুদ্ধকে বেআইনী করা হয় নাই। ফলে কোন রাষ্ট্র অঘোষিত যুদ্ধ করিলে লীগের কিছু করিবার ছিল না। তৃতীয়তঃ, লীগ চুক্তিপত্রের ১৬নং ধারায় আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে বাধ্যতামূলক অর্থনৈতিক অবরোধের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু কেবলমাত্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দ্বারা আক্রমণকারীকে শায়েস্তা করা সম্ভব ছিল না। লীগের সামরিক ক্ষমতা না থাকায় আক্রমণকারীরা লীগকে উপেক্ষা করে। সুতরাং ১৯৩১ খ্রীঃ জাপান মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ এবং ১৯৩৫ খ্রীঃ ইতালী আবিসিনিয়া আক্রমণ করিলেও লীগ তাহাদের নিরস্ত করিতে ব্যর্থ হয়। চতুর্থতঃ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লীগের সভ্য না হইবার ফলে লীগের শক্তি ও মর্যাদা কমিয়া যায়। পঞ্চমতঃ, ইংলণ্ড ও ফ্রান্স লীগের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে যথোচিত মূল্য না দিয়া নিজ নিজ দেশের স্বার্থ সিদ্ধির চেষ্টা করে। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স ছিল লীগের প্রধান স্তম্ভ। ইহারা লীগের

লীগ অফ নেশনসের পতনের কারণ

আদর্শের প্রতি বিশ্বস্ত না থাকায় লীগ দুর্বল হইয়া পড়ে। লীগের আদর্শ অগ্রাহ্য করিয়া ইতালী আবিসিনিয়া আক্রমণ করিলে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ইতালীর সহিত নিজ নিজ মিত্রতা বজায় রাখার জন্য লীগকে ইতালীর সহিত মীমাংসায় আসার প্ররোচনা দেয়। এমন কি ইংলণ্ডের মন্ত্রী স্যার স্যামুয়েল হোর ও ফ্রান্সের মন্ত্রী পিয়ের লাভাল গোপনে আবিসিনিয়া ভাগ করিয়া ইতালীকে একাংশ দেওয়ার চেষ্টা করেন। ইংলণ্ড, ফ্রান্স লীগকে পুরাপুরি সাহায্য না করার ফলে লীগ ইতালীকে শাস্তি দিতে ব্যর্থ হয়। ষষ্ঠতঃ, লীগের সভ্য রাষ্ট্রগুলি লীগের আদর্শ অপেক্ষা নিজ দেশের স্বার্থকে বেশী মূল্য দেওয়ার ফলে লীগের ভাবধারা দুর্বল হইয়া পড়ে। ইতিমধ্যে নাৎসী জার্মানী, ফ্যাসিষ্ট ইতালী তীব্র আগ্রাসী নীতি অনুসরণ করিলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অনিবার্য হইয়া পড়ে। লীগ ক্ষমতা-হীন হইয়া অসহায় দর্শকের ভূমিকা নেয়। সর্বশেষে, আক্রমণকারীকে শায়েস্তা করিবার মত কোন ক্ষমতা লীগের ছিল না। লীগের কোন সামরিক শক্তি ছিল না। আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে সভ্যদেশ সামরিক শক্তি ব্যবহার করিতে লীগ বাধ্য করিতে পারিত না। ফলে লীগের দুর্বলতা প্রকট হইয়া পড়ে। তাছাড়া লীগের সভ্যরা পরস্পরের মধ্যে দলাদলি ও বিরোধে লিপ্ত হইলে লীগের আদর্শ ভাঙিয়া পড়ে।

ফ্যাসিষ্ট ইতালীর অভ্যুত্থান, ১৯২১-৩৯ খ্রীঃ (The Rise of Fascist Italy) ঃ প্রথম মহাযুদ্ধের আগে ইতালী ত্রিশক্তি চুক্তির সভ্য হইয়া জার্মানীর মিত্র রাষ্ট্রে পরিণত হয়। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইলে ইতালী পক্ষ পরিবর্তন করে। লণ্ডনের গোপন চুক্তির দ্বারা ইতালী মিত্রপক্ষ অর্থাৎ ইংলন্ড-ফ্রান্স-রাশিয়ার পক্ষে জার্মানীর বিরুদ্ধে যোগ দেয়। ইতালীর আশা ছিল যে জার্মানী যুদ্ধে পরাজিত হইলে জার্মানী উপনিবেশের একাংশ এবং ফ্রান্সের নিকট হইতে আফ্রিকার উপনিবেশের কিছু অংশ পাইবে। পূর্ব ইওরোপ বা বলকানেও ইতালী আধিপত্য পাইবে। এই কারণে ইতালীর প্রধানমন্ত্রী ভিক্টর অর্লাণ্ডো বিজয়ী শক্তি হিসাবে প্যারিসের শান্তি সম্মেলনে যোগ দিয়া যুগোশ্লাভিয়ার কিউম বন্দর এবং আলবানিয়া দাবী করেন। কিন্তু ফ্রান্সের বিরোধিতা ও উইলসনীয় আদর্শবাদের প্রভাবে ইতালীর দাবী নাকচ হইয়া গেলে অর্লাণ্ডো বিরক্ত হইয়া সম্মেলন পরিত্যাগ করেন। শান্তি বৈঠকে বিফলতার ফলে ইতালীর গণতান্ত্রিক সরকার ইতালীয় জনসাধারণের নিকট মর্যাদা হারাইয়া ফেলে। এদিকে ইতালীতে যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক সংকটের ফলে অর্থনৈতিক মন্দা, বেকার সমস্যা, খাদ্যাভাব ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। ইহার ফলে জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা বাড়ে। এই সুযোগে সমাজতান্ত্রিক দল (Socialists) সর্বত্র ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করে। শ্রমিকেরা কলকারখানা অধিকার করিয়া মালিক ও ম্যানেজারগণকে হঠাইয়া দেয়। সর্বত্র ব্যাপক ধর্মঘট ও অচলাবস্থা দেখা দেয়। কৃষকেরা জমিদারদের খেদাইয়া জমি দখল করে। তাহারা সরকারকে কর প্রদান বন্ধ করে। যুদ্ধ ফেরৎ সেনাদল ইচ্ছামত জমি দখল করে। ইতালীর গণতান্ত্রিক সরকার দেশে এই অরাজকতা দমনে কোন চেষ্টা না করিয়া বসিয়া বসিয়া দেখেন।

ফ্যাসিজমের উদ্ভবের কারণ

ইতালীর এই সংকট সময়ে বেনিটো মুসোলিনীর ফ্যাসিষ্ট দল সমাজতান্ত্রিক দলের

সহিত প্রকাশ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামিয়া পড়ে। ইতালীর পুঁজিপতি মধ্যবিত্ত, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্রগণ দেশের এই অরাজক অবস্থায় একটি শক্তিশালী সরকার গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। মুসোলিনী এই দাবী পূরণে আগাইয়া আসিলে এই শ্রেণীর লোকেরা তাঁহার দলভুক্ত হয়। মুসোলিনী তাঁহার অনুচরগণকে সামরিক কায়দায় গঠন করেন। "ক্যাষ্টর অয়েল, গদা ও বন্দুক" এই তিনটি অস্ত্রের সাহায্যে তাঁহার অনুচরবর্গ সমাজতান্ত্রিকগণের সহিত শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়। প্রয়োজন বোধে ফ্যাসিষ্টরা এই তিনটি জিনিষ প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে। ফ্যাসিষ্টগণের গুণ্ডামির ফলে অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি হতবুদ্ধি ও দুর্বল হইয়া পড়ে। মুসোলিনী তাঁহার দলের নাম দেন ফ্যাসিষ্ট। প্রাচীন রোমের কনসালগণের ক্ষমতার চিহ্ন হিসাবে (Fasces) ফ্যাসেস বা একটি প্রতীক ব্যবহার করা হইত। মুসোলিনী তাঁহার দলের নাম ইহা হইতে নেন। তিনি তাঁহার দলের কর্মীগণকে কালো রঙের পোষাক পরিতে নির্দেশ দেন। ইহারা বিশেষ ধরণের কুচ-কাওয়াজ ও শৃংখলা দ্বারা এক আধা সামরিক বাহিনীতে পরিণত হয়। ফ্যাসিষ্ট দলের সভ্য সংখ্যা দ্রুত বাড়ে। শেষ পর্যন্ত ১৯২১ খ্রীঃ ২৮শে অক্টোবর মুসোলিনী তাঁহার অসংখ্য দলীয় কর্মী লইয়া ইতালীর রাজধানী রোম অভিযান করেন। ইতালীর রাজা পরদিন তাঁহাকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করিয়া সরকার গঠনের দায়িত্ব দেন। এইভাবে মুসলিনী বল প্রয়োগের দ্বারা সরকার অধিকার করিয়া ফ্যাসিষ্ট নীতি অনুযায়ী শাসন ব্যবস্থা ও পররাষ্ট্র নীতি পরিচালনা করেন।

মুসোলিনী ও ফ্যাসিষ্ট সরকার গঠন, ১৯২১ খ্রীঃ

মুসোলিনী শাসন ক্ষমতা দখল করিয়া ইতালীতে ফ্যাসিজমকে প্রতিষ্ঠার কাজে হাত দেন। ফ্যাসিবাদের মূল কথা ছিল রাষ্ট্রকে সর্বাত্মক ক্ষমতার অধিকারী করা। ফ্যাসিবাদ অনুসারে ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের নিকট দায়ী করা হয়। গণতান্ত্রিক আদর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রকে ব্যক্তির সেবায় নিয়োগ করার নিয়ম রদ করা হয়। "বিশ্বাস, আনুগত্য ও সংগ্রাম" (Faith, obedience and struggle) এই তিনটি নীতিকে ফ্যাসিবাদীগণ গ্রহণ করে। ফ্যাসিবাদ ছিল উগ্রজাতীয়তায় বিশ্বাসী। মুসোলিনী বলেন যে, "জাতির স্বার্থের জন্য নীতিবোধ, রাষ্ট্র ও সকল কিছুকেই নিয়োজিত করিতে হইবে"। উপরোক্ত ভাবধারাগুলিকে রূপায়িত করিবার জন্য মুসোলিনী ইত্যলীতে "কর্পোরেট" রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। শ্রমিক, মালিকগণকে লইয়া ১২টি প্রতিনিধি সভা বা সিণ্ডিক (Syndic) এবং বুদ্ধিজীবিগণের একটি প্রতিনিধি সভা বা সিণ্ডিক এই মোট ১৩টি সিণ্ডিক গঠিত হয়। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা পূরণ করা হয়। সংবাদপত্রকে রাষ্ট্রের নির্দেশ অনুযায়ী সংবাদ প্রচার করিতে বলা হয়। শ্রমিকদের ধর্মঘট করা নিষিদ্ধ হয়। রাষ্ট্রে সকল ক্ষমতা মুসোলিনীর হাতেই কেন্দ্রীভূত হয়। মুসোলিনীর নাম হয় "ডুচে" (Duce)। কেন্দ্রীয় ফ্যাসিষ্ট দল মুসোলিনীকে শাসনকার্যে সহায়তা করে। পার্লামেণ্ট থাকিলেও তাহা মুসোলিনীর হাতের পুতুলে পরিণত হয়। বিরোধী দল ও সমালোচকগণকে নির্মমভাবে দমন করা হয়। এইভাবে মুসোলিনী তাঁহার একনায়কতন্ত্র বা ডিক্টেটরশিপ এবং সর্বাত্মকতন্ত্র বা টোটালিটারিয়ানবাদ (Totalitarianism)

ফ্যাসিষ্ট সংগঠন

স্থাপন করেন। তবে মুসোলিনী একনায়কতন্ত্র স্থাপন করিলেও শিল্প ও কৃষির উন্নতির দিকে বিশেষ নজর দেন। শ্রমিকদের কারখানায় কাজের সময় কমাইয়া তিনি শ্রমিকদের পূর্ণ উদ্যমে কাজ করিতে উৎসাহ দেন। কলকারখানাগুলিকে পর্যায়ক্রমে চালাইবার ব্যবস্থা করা হয়। অর্থাৎ কারখানার শ্রমিকেরা পালাক্রমে সারাদিন কাজ করে। কৃষির উন্নতির জন্য কৃষি ঋণদানের ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামীন ব্যাংক স্থাপন করিয়া কৃষির জন্য অর্থ বিনিয়োগ করা হয়। মুসোলিনী জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি বলেন যে "সংখ্যা না বাড়িলে গুণী বা যোগ্য লোকের অভাব দেখা দিবে।"[১] এজন্য তিনি অধিক সন্তানের জননীগণকে পুরস্কারদানের ব্যবস্থা করেন। মুসোলিনী ফৌজদারী আইনকে আরও কঠোর করেন। বিনা বিচারে গ্রেপ্তার চালু হয়। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষগণকে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা লইতে হয়। যুব সমাজকে বিভিন্ন সমিতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া তাহাদের শৃংখলাবদ্ধ করা হয়। শ্রমকে মর্যাদা দান করা হয়। প্রতি নাগরিককে রাষ্ট্রের জন্য কাজ করিতে আদেশ দেওয়া হয়। রাত্রিকালে অফিসে ও কারখানায় বাড়তি কাজ করার জন্য অতিরিক্ত মজুরী দেওয়ার আইন করা হয়। সংবিধান পরিবর্তন করিয়া ভোটাধিকার আইন পাল্টান হয়। ইতালীর স্থল সেনার সহিত নৌবাহিনী গঠনের দিকে নজর দেওয়া হয়। রাশিয়া প্রভৃতি দেশকে জাহাজ নির্মাণের বরাত দিলে এই দেশগুলি প্রচুর মুনাফা করে। মুসোলিনী বাণিজ্য ও শিল্পকে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণে আনিলেও এইগুলিকে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় আনেন নাই। ফলে কলকারখানা হইতে যে মুনাফা হইত তাহা মালিকদের হাতে যায়। শ্রমিকেরা শোষিত হইতে থাকে। মুসোলিনী মুখে রাষ্ট্রীয় অধিকারের কথা বলিলেও বাস্তবে ধনতন্ত্রী শিল্পপতিগণের স্বার্থে আঘাত দেন নাই। ব্যাংক ও কারখানা ব্যক্তিগত মালিকানায় থাকে।

ফ্যাসিস্ট ইতালীর উত্থান ইওরোপে গণতন্ত্রের পতনের সূচনা করে। ইতালীর নজিরে স্পেন, অষ্ট্রিয়া, রুমানিয়া, গ্রীস প্রভৃতি দেশে ফ্যাসিবাদী সরকার স্থাপিত হয়। জার্মানীর সহিত যোগ দিয়া ইতালী রুশ সাম্যবাদের বিরুদ্ধে কমিণ্টার্ণ বিরোধী চুক্তি করে। মোট কথা, ফ্যাসিস্ট শাসন ব্যবস্থায় জনসাধারণের ব্যক্তি স্বাধীনতা লোপ পায়। রাষ্ট্রের তথা ফ্যাসিস্ট দলের অধীন হইয়া তাহারা রাষ্ট্রের হুকুম অনুযায়ী চলিতে বাধ্য হয়। রাষ্ট্র বলিতে ফ্যাসিস্ট দল ও তাহার নেতা মুসোলিনীকেই বুঝাইত। তাঁহার ইচ্ছায় ছিল রাষ্ট্রের ইচ্ছা। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির স্বাধীনতা বিনষ্ট হয়। কৃষি, শিল্প, শিক্ষা জীবনের সকল ক্ষেত্রে ফ্যাসিস্ট সরকারের হস্তক্ষেপ হইতে থাকে। জনসাধারণের প্রকৃত ইচ্ছা-অনিচ্ছা চাপা পড়িয়া যায়। গণতান্ত্রিক আদর্শ দেশ হইতে লোপ পায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষদিকে এজন্য মুসোলিনীর বিরুদ্ধে বিরাট গণবিক্ষোভ দেখা দেয়। ইহাতে তিনি নিহত হন। ফ্যাসিস্ট সরকারের পতন ঘটে।

ইতালীর পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে মুসোলিনী উপনিবেশ বিস্তারের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে প্যারিসের শান্তি বৈঠকে ইতালীর প্রতি অবিচার করা হইয়াছে। যুদ্ধ ও বলপ্রয়োগ দ্বারা, ইতালী তাহার প্রাপ্য স্থান ও উপনিবেশ আদায় করিবে।

১. "Without quantity there cannot be any quality.

মুসোলিনী বলেন যে, "ফ্যাসীবাদের নীতি অনুযায়ী সাম্রাজ্য বিস্তার হইল একটি নৈতিক অধিকার। ইহা জীবনীশক্তির পরিচায়ক।"[১]

প্যারিসের শান্তি বৈঠকে ইতালীর প্রতি অবিচারের জন্য মুসোলিনী ফ্রান্সকে দায়ী করেন। ফ্রান্সের প্রভাবে উত্তর আফ্রিকার টিউনিস প্রভৃতি উপনিবেশের উপর ইতালীর দাবী শান্তি বৈঠকে নাকচ হইয়া যায়। তাছাড়া ইতালীর ফ্যাসিষ্ট সরকারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া ইতালীর বহু লোক দেশত্যাগ করিয়া ফ্রান্সে আশ্রয় নেয়। ফ্রান্সের আশ্রয়ে থাকিয়া ইহারা ফ্যাসিষ্ট সরকারের প্রতি শত্রুভাব দেখাইতে থাকে। ভূমধ্যসাগরে ফরাসী নৌ-বহরের আধিপত্য ইতালী কাম্য মনে করিত না। এজন্য মুসোলিনী নৌশক্তি বাড়াইবার চেষ্টা করেন। ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন ইতালীর স্যাভয় ও নিস ঊনবিংশ শতকে অধিকার করেন। এই দুইটি স্থান ইতালীকে ফিরাইয়া দিতে ফ্রান্স রাজী ছিল না। তাছাড়া ইতালীর বিরুদ্ধে ফ্রান্স যুগোশ্লাভিয়াকে সাহায্য করিত। এই সকল কারণে ইতালীর সহিত ফ্রান্সের ঘোর বিরোধ দেখা দেয়। মুসোলিনী ফ্রান্সের সহিত ইতালীর যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী মনে করিয়া নাৎসী-জার্মানীর সহিত অক্ষ চুক্তিতে যোগ দেন। ১৯৪১ খ্রীঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইতালী ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ইতালীয় সেনাদল আফ্রিকায় ফ্রান্সের উপনিবেশ দখলের চেষ্টা চালায়।

ইতালীর বৈদেশিক নীতির লক্ষ্য

ইতালী পূর্ব ইওরোপে প্রতিবেশী যুগোশ্লাভিয়ার কিছু অংশ গ্রাস করিবার জন্য নিরন্তর চেষ্টা চালায়। যুগোশ্লাভিয়ার দালমাশিয়া ও ফিউম বন্দর ছিল মুসোলিনীর দাবীর অন্তর্গত। নেটানোর সন্ধি, ১৯২৫ খ্রীঃ (Treaty of Nettuno) দ্বারা যুগোশ্লাভিয়া ইতালীর দাবী অনেকাংশে পূরণ করিতে বাধ্য হয়। ইতালী পূর্ব ইওরোপে ক্ষমতা বাড়াইবার জন্য অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী ও বুলগেরিয়া সরকারের সহিত মিত্রতা-বদ্ধ হয়।

আবিসিনিয়া আক্রমণ ও স্পেনের যুদ্ধ

ইতালীর সাম্রাজ্যবাদী ক্ষুধা ক্রমেই বাড়িতে থাকে। ১৯৩৫ খ্রীঃ ইতালী ইথিওপিয়া বা আবিসিনিয়া আক্রমণ করে। লীগের আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া আবিসিনিয়া আক্রমণ করায় ইতালীর উপর লীগ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে অর্থনৈতিক বয়কট চাপাইয়া দেয়। মুসোলিনী তাহাতে দৃকপাত না করিয়া আবিসিনিয়া অধিকার করেন। এই সংকট সময়ে নাৎসী-জার্মানী ইতালীর সহায়তা করে। ইহার পর মুসোলিনী স্পেনের গৃহযুদ্ধে জেনারেল ফ্রাঙ্কোকে সহায়তা করিয়া স্পেনে ফ্যাসীবাদী সরকার স্থাপনে সহায়তা করেন। মুসোলিনী আশা করেন যে স্পেনে মিত্র রাষ্ট্র স্থাপন করিয়া তিনি ফ্রান্সকে ঘিরিয়া ফেলিবেন।

অক্ষ চুক্তি

মুসোলিনী জার্মানীর নাৎসী শাসক হিটলারের সহিত মিত্রতা নীতি গ্রহণ করেন। হিটলার ইতালীকে নিজ পক্ষে আনিয়া ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ইওরোপে এক শক্তি জোট গঠনের চেষ্টায় ছিলেন। ইহার ফলে ইতালী, জার্মানী রোম-বার্লিন অক্ষ চুক্তি গঠন করে। পরে জাপান ইহাতে যোগ দেয়।

১. "Fascism regards empire......a moral one......a manifestation of vitality."

ফ্যাসী শক্তির উত্থানের ফলে ইওরোপে লীগের যৌথ নিরাপত্তার আদর্শ ভাঙিয়া পড়ে। ইতালী দ্বারা আবিসিনিয়া আক্রমণ ছিল ইহার প্রথম ধাপ। পরে স্পেনের গৃহযুদ্ধে ইতালীর হস্তক্ষেপ ইওরোপের শান্তিকে বিঘ্নিত করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একেবারে গোড়ার দিকে ইতালী নিরপেক্ষ থাকিলেও, ১৯৪১ খ্রীঃ ইতালী, অক্ষ শক্তির পক্ষ লইয়া যুদ্ধে যোগ দেয়। ইতালী আলবানিয়া ও গ্রীস আক্রমণ করে। আফ্রিকার ফরাসী উপনিবেশগুলিও ইতালীর দ্বারা অধিকৃত হয়। কিন্তু মিত্রপক্ষের সেনাদল পাল্টা আঘাত হানিলে ইতালীর শোচনীয় পরাজয় ঘটে। ইতালীয় সেনাপতি মার্শাল গ্রাৎসিয়ানী রণ-কৌশলে পরাস্ত হন। ইতালীকে সম্পূর্ণ পরাজয় হইতে রক্ষা করিতে বিখ্যাত জার্মান সেনাপতি রোমেল হিটলারের নির্দেশে দায়িত্ব নেন। ইহার পর ইতালীর ক্রমে পরাজয় ঘটে। শেষ পর্যন্ত মার্কিন সেনাদল ইতালী অধিকার করে। ফ্যাসিষ্ট সরকারের পতন ঘটে।

স্পেনের গৃহযুদ্ধ ও জেনারেল ফ্রাঙ্কোর উত্থান (The Spanish civil war and the rise of General Franco)ঃ ষোড়শ শতকের পর হইতে স্পেন ধীরে ধীরে তাহার পূর্ব গৌরব হারাইয়া একটি দরিদ্র দেশে পরিণত হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় স্পেনের কর্টেস বা পার্লামেণ্ট স্পেনকে নিরপেক্ষ শক্তি হিসাবে রাখিবার সিদ্ধান্ত নেয়। ইহার ফলে যুদ্ধমান বিভিন্ন শক্তিকে রসদ-পত্র বিক্রয় করিয়া প্রথম মহাযুদ্ধে স্পেন কিছুটা আর্থিক উন্নতি ঘটায়। ইতিমধ্যে স্পেনে বুরবোঁ রাজতন্ত্রের শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখা দেয়। স্পেনের উপনিবেশ মরক্কোয় বিদ্রোহ দমনে স্পেনের বুরবোঁ সরকার ব্যর্থ হইলে ইহার মর্যাদা নষ্ট হয়। ইহার ফলে রাজা নামেমাত্র থাকিলেও সকল সরকারী ক্ষমতা রিভেরা (Rivera) নামক এক ব্যক্তি গ্রহণ করেন। ১৯২৩ হইতে ১৯৩০ খ্রীঃ পর্যন্ত রিভেরা ডিক্টেটরের ন্যায় স্পেনকে শাসন করেন। তিনি শিল্প, কৃষি, শিক্ষার উন্নতির জন্য নানাবিধ আইন করেন। কিন্তু স্পেনে বামপন্থী ও দক্ষিণ পন্থীগণের বিরোধিতায় বিরক্ত হইয়া রিভেরা ১৯৩০ খ্রীঃ পদত্যাগ করেন। ইহার পর রাজা আলফান্সো নূতন মন্ত্রীসভা গঠন করিলেও স্পেনের বামপন্থী দল ও ছাত্রসমাজ প্রজাতন্ত্র স্থাপনের জন্য দাবী জানায় ও ব্যাপক ধর্মঘট চালায়। ইহার ফলে ১৯৩১ খ্রীঃ রাজতন্ত্রের পতন ঘটে ও স্পেনে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজা আলফান্সো দেশত্যাগ করেন। সিসেটো জামোরা স্পেনের প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেণ্ট ও ম্যানুয়েল আজানা প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন।

স্পেনের আভ্যন্তরীণ অবস্থা

স্পেনে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলেও দেশের অবস্থার বিশেষ উন্নতি ঘটে নাই। এই সময় স্পেনে প্রায় ২৫টি রাজনৈতিক দল ছিল। তাহাদের মধ্যে বামপন্থী কমিউনিষ্টগণ সমাজতান্ত্রিক সংস্কার, কৃষককে জমির অধিকার প্রভৃতি দানের জন্য দাবী জানাইলে, দক্ষিণপন্থী দলগুলি আশংকা বোধ করে। ইহার ফলে স্পেনে ঘন ঘন মন্ত্রীসভার পরিবর্তন ঘটিতে থাকে। শেষ পর্যন্ত স্পেনে বামপন্থীগণকে লইয়া (১৯৩৬ খ্রীঃ) গঠিত পপুলার ফ্রণ্ট দল পার্লামেণ্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। ম্যানুয়েল আজানার নেতৃত্বে পপুলার ফ্রণ্ট মন্ত্রীসভা গঠিত হয়।

পপুলার ফ্রণ্ট সরকার গঠন

ফ্রাঙ্কোর বিদ্রোহ

বামপন্থী পপুলার ফ্রণ্ট সরকার গঠিত হইলে স্পেনের দক্ষিণপন্থী লোকেরা চিন্তিত হইয়া পড়ে। স্পেনের সৈন্য বাহিনীর একাংশ ছিল দক্ষিণপন্থী মতবাদের অনুরাগী। ইহাদের নেতা ছিলেন জেনারেল ফ্রাঙ্কো। পর্তুগালের ডিক্টেটর সালাজার প্রতিবেশী স্পেনে বামপন্থী সরকারের প্রতিষ্ঠা ভাল চোখে দেখেন নাই। তিনি জেনারেল ফ্রাঙ্কোর পক্ষ সমর্থন করেন। ফলে জেনারেল ফ্রাঙ্কো পপুলার ফ্রণ্ট সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। স্পেনের সেনাবাহিনীর বহু সেনা তাঁহার পক্ষ গ্রহণ করে। ইহার ফলে বৈধ প্রজাতন্ত্রী সরকারের সহিত বিদ্রোহী ফ্রাঙ্কোর তুমুল গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয়।

মুসোলিনী ও হিটলারের স্পেনে হস্তক্ষেপ

এদিকে বিভিন্ন বৈদেশিক শক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্পেনের অন্তর্যুদ্ধে জড়াইয়া পড়িলে ইহা এক "ক্ষুদ্র বিশ্বযুদ্ধে" (Little World War) পরিণত হয়। ইতালীর ফ্যাসিষ্ট ডিক্টেটর মুসোলিনী মনে করিতেন যে স্পেনে ফ্রাঙ্কোর ডিক্টেটরশিপ প্রতিষ্ঠিত হইলে ইতালী, স্পেন ও পর্তুগাল মিলিয়া ফ্রান্সের বিরুদ্ধে একটি ফ্যাসিষ্ট জোট গড়া যাইবে। তাছাড়া ইতালী স্পেনের কয়লা, তেল, লোহা প্রভৃতি সম্পদ ব্যবহারের সুযোগ পাইবে। ইতালী ভূমধ্যসাগরে স্পেনের সহায়তায় ফ্রান্সের বিরুদ্ধে নৌ আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ পাইবে। এই সকল কথা ভাবিয়া মুসোলিনী সরাসরি ফ্রাঙ্কোর পক্ষ নেন। ইতালীর অস্ত্রশস্ত্র ফ্রাঙ্কোর হাতে পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়। জার্মানীর নাৎসী নেতা হিটলারও মনে করিতেন যে ফ্রাঙ্কোর জয়লাভের ফলে ইওরোপে ফ্যাসিষ্ট জোট দৃঢ় হইবে। তাছাড়া স্পেনের যুদ্ধে নবগঠিত জার্মান বিমান বহরকে কাজে লাগাইয়া ইহার কার্যকারিতা পরীক্ষায় হিটলার উৎসুক ছিলেন। এই কারণে ইতালী ও জার্মানী ফ্রাঙ্কোর সমর্থনে অস্ত্র ও সেনা পাঠায়। এদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রী পপুলার ফ্রণ্টের সমর্থনে সাহায্য দেয়। ফ্রান্সও প্রজাতন্ত্রী সরকারকে পরোক্ষ সমর্থন দেয়। কারণ সোভিয়েত সরকার মনে করিত যে পপুলার ফ্রণ্ট জয়লাভ করিলে সাম্যবাদ জয়যুক্ত হইবে। তাছাড়া ইহা ছিল বৈধ সরকার। ইহার ফলে বিভিন্ন শক্তি স্পেনের যুদ্ধে নানা প্রকারে জড়াইয়া পড়ে। ইওরোপীয় শক্তিগোষ্ঠী স্পেনের গৃহযুদ্ধকে উপলক্ষ করিয়া দুই পরস্পর বিরোধী শিবিরে বিভক্ত হইয়া যায়।[১]

নিরপেক্ষতা চুক্তি ও ইহার বিফলতা

ইংলণ্ড স্পেনের গৃহযুদ্ধে কিছুকাল নিরপেক্ষ থাকিবার পর আন্তর্জাতিক রেষারেষি প্রশমনের জন্য লণ্ডনে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন ডাকে। ইহাতে স্থির হয় যে বৈদেশিক শক্তিগুলি স্পেনের গৃহযুদ্ধে হস্তক্ষেপ না করিয়া নিরপেক্ষ থাকিবে এবং কোন পক্ষকে সাহায্য দিবে না। কিন্তু ইতালী ও জার্মানী মুখে ইহা স্বীকার করিলেও গোপনে ফ্রাঙ্কোকে সাহায্য দেয়। ইংলণ্ডের চেষ্টায় নিয়নের চুক্তিতে (Treaty of Nyon) নয়টি দেশ নিরপেক্ষ থাকিতে স্বীকৃতি দেয়। কিন্তু জার্মানী ও ইতালী এই চুক্তিতে স্বাক্ষর দিতে অস্বীকৃতি জানায়। নিয়নের চুক্তি স্বাক্ষরকারী দেশগুলি স্পেনের চতুর্দিকে নৌ-অবরোধ স্থাপন করিয়া

১. E. H. Carr—International Relations between Two World Wars.

বৈদেশিক হস্তক্ষেপ বন্ধ ও বিদেশী সেনা অপসারণের জন্য চাপ দেয়। এই অবরোধের আগেই জার্মানী ও ইতালীর সাহায্য ফ্রাঙ্কোর হাতে পৌঁছায়। কিন্তু প্রজাতন্ত্রী সরকারের জন্য সোভিয়েত সাহায্য দেরীতে আসায় তাহা অবরোধের দরুণ ঢুকিতে ব্যর্থ হয়। ইহাতে ফ্রাঙ্কোর খুব সুবিধা হয়। জেনারেল ফ্রাঙ্কো গৃহযুদ্ধে জয়লাভ করিয়া একটি ফ্যাসিবাদী সরকার গঠন করেন।

জার্মানীতে ভাইমার প্রজাতন্ত্রের উত্থান ও পতন (The Rise and fall of the Weimer Republic of Germany) ঃ প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ দিকে জার্মানীতে কাইজারের বিরুদ্ধে এক গণতান্ত্রিক বিদ্রোহের ফলে কাইজার সরকারের পতন ঘটে। ইহার ফলে জার্মানীতে এক প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়।

ভাইমার প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা

জার্মানীর পুরাতন রাজধানী বার্লিনের বদলে ভাইমার (Weimer) শহরে এই সরকারের রাজধানী স্থাপিত হয়। এইজন্য জার্মানীর এই প্রজাতন্ত্রকে ভাইমার প্রজাতন্ত্র বলা হয়। ভাইমার প্রজাতন্ত্রের সংবিধানে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার ও দুই কক্ষ-যুক্ত আইনসভার ব্যবস্থা থাকে। ফ্রেডারিক এবার্ট (Frederick Ebert) এই সরকারের প্রথম প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হন।

ভাইমার সরকার প্রতিষ্ঠিত হইলেও স্পার্টাসিষ্ট (Spartacist) নামে জার্মান কমিউনিষ্ট দল রোজা লাক্সেমবার্গ ও লাইবনিখ্‌টের নেতৃত্বে জার্মানীতে সাম্যবাদী সরকার স্থাপনের জন্য অন্তর্বিদ্রোহ সৃষ্টি করে। ১৯২০, ১৯২৩ খ্রীঃ পরপর দুইবার গুরুতর বিদ্রোহ দেখা দিলেও ভাইমার সরকার তাহা দমন করিতে সক্ষম হয়।

প্রজাতন্ত্রের দুর্বলতা

কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত ও হতাশাগ্রস্ত জার্মান জাতির মনে ভাইমার প্রজাতন্ত্র নূতন আশা ও আস্থা জাগাইতে বিফল হয়। জার্মানীর বুর্জোয়া শ্রেণী ভাইমার প্রজাতন্ত্রের দুর্বলতা লক্ষ্য করিয়া উগ্র জাতীয়তাবাদী নাৎসী দলের উপর অধিক আস্থা স্থাপন করে। বুর্জোয়া বা ধনীদের অর্থ সাহায্যে নাৎসী দল নিজস্ব জঙ্গী বাহিনী গঠন করে এবং ইহাদের সাহায্যে বিরোধীদের দমাইয়া ফেলে। মোট কথা নাৎসী দলের প্রতাপে ভাইমার প্রজাতন্ত্রের মর্যাদা নষ্ট হয়।

বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে ভাইমার সরকার এক জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়। প্রথমতঃ, মিত্রশক্তির চাপে বাধ্য হইয়া এই সরকার ভার্সাই সন্ধি স্বাক্ষর ও অনুমোদন করে। কিন্তু ইহার ফলে জার্মান জনসাধারণের নিকট প্রজাতন্ত্রের জনপ্রিয়তা বিনষ্ট হয়। ভার্সাই সন্ধি ছিল জার্মানীর পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। জনসাধারণ এজন্য ভাইমার সরকারকে দোষারোপ করে। দ্বিতীয়তঃ, ভার্সাই সন্ধিতে মিত্রশক্তির যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের জন্য ভাইমার প্রজাতন্ত্রকে এক বিরাট অঙ্কের মুদ্রা দিতে বলা হয়। ফ্রান্স ক্ষতিপূরণ আদায়ের ব্যাপারে প্রতিশোধাত্মক মনোভাব গ্রহণ করে। জার্মানী ক্ষতিপূরণের কিস্তি খেলাপ করিলে এই অজুহাতে ফ্রান্স রুর অঞ্চল অধিকার করে এবং রুর অঞ্চল হইতে জার্মানীতে মাল সরবরাহ বন্ধ করিয়া দেয়। ইহার ফলে জার্মানীর দুঃখ-দুর্দশার সীমা থাকে না। জার্মান প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট এবার্ট এজন্য রুষ্ট হইয়া রাশিয়ার সহিত র‍্যাপালোর সন্ধি স্থাপন করেন (পৃঃ ২৩১ দেখ)।

ইতিমধ্যে গুস্টাভ ষ্ট্রাসম্যান বৈদেশিক মন্ত্রী নিযুক্ত হন। ষ্ট্রাসম্যান ছিলেন এক দূরদর্শী, স্থিরমস্তিষ্ক, বাস্তববুদ্ধির লোক। তিনি বলেন যে জার্মানীর শক্তি বৃদ্ধি হইলে ভার্সাই চুক্তির দ্বারা জার্মানীর উপর যে বাধা নিষেধ দেওয়া হইয়াছে তাহা আপনিই ভাঙিয়া পড়িবে।[১] ষ্ট্রাসম্যান বিশ্বাস করিতেন যে পশ্চিমী শক্তির আস্থা পাইলেই জার্মানী ভার্সাই সন্ধি পরিবর্তনের সুযোগ পাইবে। এজন্য তিনি রাশিয়ামুখী নীতি ছাড়িয়া পশ্চিমী মুখী নীতি নেন।

ষ্ট্রাসম্যানের পরিপূর্ণতা নীতি

ষ্ট্রাসম্যান ক্ষতিপূরণ সমস্যা সমাধানের জন্য ১৯২৪ খ্রীঃ ডাওয়েজ পরিকল্পনা (Dawes Plan) গ্রহণ করেন। ইহার ফলে জার্মানী মার্কিন দেশ হইতে ঋণ পায় এবং ক্ষতিপূরণের টাকা দিতে সমর্থ হয়। রুর অঞ্চল হইতে ফরাসী সেনা অপসারিত হয়। ইহার পর ষ্ট্রাসম্যান ফ্রান্সের সহিত বিরোধ মিটাইবার জন্য ১৯২৫ খ্রীঃ লোকার্ণো চুক্তি স্বাক্ষর করেন (আগে পৃঃ ২৩১ দেখ)। লোকার্ণো চুক্তির ফলে ফরাসী-জার্মান সম্পর্ক স্বাভাবিক হয়। ক্ষতিপূরণ সমস্যার চূড়ান্ত সমাধানের জন্য এবং ক্ষতিপূরণের পরিমাণ হ্রাস করার জন্য ষ্ট্রাসম্যান মিত্রশক্তির নিকট আবেদন জানাইলে ইয়ং পরিকল্পনা (young Plan) দ্বারা ক্ষতিপূরণের মোট অর্থের $\frac{3}{4}$ অংশ কমাইয়া দেওয়া হয়। অবশিষ্ট টাকাকে দুই ভাগে ভাগ করিয়া একটি অংশ 'ভবিষ্যতে দেয়' বলিয়া গণ্য করা হয় এবং অপর অংশ 'অবশ্য দেয়' বলা হয়। জার্মানী মার্কিণ ঋণ গ্রহণ করিয়া ইহা পরিশোধ আরম্ভ করে। ইতিমধ্যে ১৯৩০ খ্রীঃ বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিলে (১৯২৯-৩০ খ্রীঃ) মার্কিন প্রেসিডেণ্ট হার্বার্ট হুভারের নির্দেশে ক্ষতিপূরণের অর্থ পরিশোধ আপাততঃ মুলতুবী রাখা হয়। এই সময়ে ষ্ট্রাসম্যানের মৃত্যু হয়। তাঁহার নীতির নাম ছিল পরিপূর্ণতা নীতি (Policy of Fulfilment)। ঐতিহাসিক এ. জে. পি. টেইলারের মতে ষ্ট্রাসম্যান ছিলেন বিসমার্কের ন্যায় ধুরন্ধর কুটনীতিজ্ঞ। তাঁহার মৃত্যুর ফলে জার্মান প্রজাতন্ত্রের বিরাট ক্ষতি হয়। কারণ তাঁহার নীতি চালাইবার মত লোক জার্মানীতে ছিল না।

ইতিমধ্যে জার্মানীতে নাৎসীদল হিটলারের নেতৃত্বে প্রবল হইয়া উঠে। ১৯৩২ খ্রীঃ নাৎসীদল আইন সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিলে, প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেনবুর্গ, নাৎসীনেতা এডলফ হিটলারকে চ্যান্সেলর বা প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। হিটলার পার্লামেণ্টকে নিজের হাতের পুতুলে পরিণত করিয়া একচ্ছত্র ক্ষমতা লাভ করেন। ১৯৩৪ খ্রীঃ হিণ্ডেনবুর্গের মৃত্যু হইলে হিটলার একাধারে প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা নেন। তাঁহার উপাধি হয় Feuhrer বা ফ্যুয়েরার। হিটলারের একনায়কতন্ত্র স্থাপিত হইলে ভাইমার প্রজাতন্ত্রের পতন ঘটে।

ভাইমার প্রজাতন্ত্রের পতন

জার্মানীতে নাৎসী বিপ্লব ও এডলফ হিটলারের উত্থান (The Nazi Revolution and the rise of Adolf Hitler): ইতিহাসে মাঝে মাঝে আকস্মিকভাবে এমন ব্যক্তির উদয় হয় যে তিনি সমকালীন

১. A. J. P. Taylor—Struuggle for Mastery of Europe.

যুগের উপর আপন ব্যক্তিত্বের স্থায়ী ছাপ রাখিয়া যান। ফলে তাঁহার প্রভাবেই সেই যুগ প্রভাবিত হয়। আমরা যে অর্থে মেটারনিকের বা নেপোলিয়নের যুগ বলি, সে অর্থে দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী যুগকে হিটলারের যুগ বলা হয়। ঐতিহাসিক উইলিয়াম শাইরারের মতে, "আলেকজাণ্ডার, সিজার ও নেপোলিয়নের মত এডলফ হিটলারকে সর্বশেষ দুঃসাহসী বিজেতা বলা যায় এবং হিটলারের তৃতীয় প্রজাতন্ত্রকে সর্বশেষ সাম্রাজ্য বলা যায়।"[১]

নাৎসী বিপ্লবের তাৎপর্য

হিটলারের জন্ম হয় ১৮৮৯ খ্রীঃ অষ্ট্রিয়া সীমান্তের একটি গ্রামে। তাঁহার পিতা ছিলেন অষ্ট্রিয়া সরকারের শুল্ক বিভাগের একজন কর্মচারী। এডলফ হিটলারের বাল্যকালে তাঁহার পিতা গত হন। তিনি লিনৎসের হাই স্কুলে বিদ্যা শিক্ষা করেন। ছাত্র হিসাবে তিনি মেধাবী ছিলেন না। তবে জার্মান ভাষায় তিনি বেশ পারদর্শিতা লাভ করেন। শিক্ষকগণের উপদেশের সহিত একমত না হইলে তিনি শিক্ষকদের মত অপেক্ষা নিজ ধারণাকেই ঠিক মনে করিতেন। হিটলার তাঁহার আত্মজীবনীতে তাঁহার ইতিহাসের শিক্ষক ডঃ লিওপোল্ড পোয়েটসের (Dr. Leopold Poetsch) বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। ইঁহার নিকট তিনি সর্বপ্রথম স্বদেশ প্রেমে দীক্ষা লাভ করেন। হিটলার ছাত্র জীবনে অংকন বিদ্যার অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন। লিনৎস হাইস্কুলে পড়ার পর তিনি ভিয়েনায় আসেন এবং ভিয়েনার আর্ট কলেজে ভর্তি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হন। ইতিমধ্যে তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়। হিটলার পৃথিবীতে একা, সহায় সম্বলহীন হইয়া পড়েন। তিনি এই সময় ছবি আঁকিয়া, রেষ্টুর্যাণ্ট পরিচারকের কাজ করিয়া জীবিকা অর্জন করেন। এই সঙ্গে ভিয়েনার সাধারণ পাঠাগারে তিনি নিয়মিত পড়াশুনা চালান। তিনি এই সময় প্যান জার্মান বা নিখিল জার্মানীর ঐক্য মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হন।

এডলফ হিটলারের প্রথম জীবন



হিটলার

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইলে হিটলার জার্মান সেনাদলে যোগ দেন এবং বীরত্বের জন্য "লোহার ক্রস" পুরস্কার পান। প্রথম মহাযুদ্ধের পর তিনি "জার্মান ওয়ার্কার্স পার্টির" সদস্য হন। পরে এই দলের নাম পরিবর্তন করিয়া "জাতীয় সমাজতন্ত্রী দল" বা "ন্যাশনাল সোস্যালিষ্ট পার্টি বা নাৎসী (Nazi) দল রাখা হয়। হিটলার ক্রমে এই দলের সর্বময় কর্তার পদ লাভ করেন।

নাৎসী দল প্রতিষ্ঠা

হিটলার নাৎসীদলের ২৫ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করিলে এই দল জনপ্রিয়তা লাভ করে। এই লক্ষ্যগুলির মধ্যে ছিল ঃ (১) সকল অঞ্চলের জার্মানগণকে লইয়া

১. "Adolf Hitler is probably the last of the great adventurers...conquerers in the tradition of Alexander, Caesar and Napoleon." W. Shirer.

ঐক্যবদ্ধ বৃহৎ জার্মানী গঠন ; (২) জার্মানী হইতে ইহুদি বিতাড়ন ; (৩) জার্মানীর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা ; (৪) শ্রমিকগণকে উপযুক্ত মজুরী দান ও কাজের সময় হ্রাস ; (৫) বেকার সমস্যার সমাধান প্রভৃতি। ২৫ দফার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল ভার্সাই সন্ধি নাকচ ও জার্মানীর লুপ্ত ক্ষমতার পুনরুজ্জীবন।

নাৎসী দলের ২৫ দফা কর্মসূচী

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজয় ও জার্মানী যখন হতাশার অন্ধকারে ডুবিতেছিল নাৎসী দলের ২৫ দফা ঘোষণা তখন জার্মান জাতির আত্মবিশ্বাস ফিরাইয়া দেয়। হিটলার তাঁহার উন্মাদনাময়ী বাগ্মীতার দ্বারা জার্মান যুব সমাজের শিরায় শিরায় উগ্র জাতীয়তাবাদের মদিরা বহাইয়া দেন। তিনি S. A. নামক ঝটিকা বাহিনী গঠন করিয়া নাৎসী দলের একটি জঙ্গী স্বেচ্ছাসেবক দল গড়িয়া তুলেন। ইহাতে যুবক, অবসরপ্রাপ্ত সৈন্য ও বেকারেরা যোগ দেয়। হিটলার ইহাদের বাদামী রংয়ের পোষাক ও স্বস্তিকা চিহ্নযুক্ত ব্যাজ দিয়া এক আধা সামরিক সংগঠনে পরিণত করেন। বলা বাহুল্য জার্মানীর বণিক শ্রেণী এজন্য তাঁহাকে গোপনে টাকা যোগায়। এই জঙ্গী বাহিনীর সাহায্যে হিটলার জার্মান কমিউনিষ্টগণের সভা-সমিতি বলপূর্বক ভাঙিয়া দেন। ফলে জার্মানীতে সাম্যবাদ বিস্তারের পথে নাৎসীদল প্রধান বাধা হইয়া দাঁড়ায়। তিনি সরকারী আইন অগ্রাহ্য করায় রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধে কারারুদ্ধ হন। কারাগারে তিনি যে আত্মজীবনী লেখেন তাহা একটি বহু পঠিত পুস্তক। ইহার নাম হইল Mein Kampf বা My Struggle বা আমার সংগ্রাম।

নাৎসী দলের ক্ষমতা বিস্তার

কারামুক্ত হইয়া হিটলার কিভাবে নাৎসীদলকে সংগঠিত করেন এবং ১৯৩২ খ্রীঃ প্রধান মন্ত্রী পদ লাভ করেন তাহা আগেই বলা হইয়াছে (২৪৬ পৃঃ দেখ)। প্রধানমন্ত্রীর পদে বসিয়া হিটলার পার্লামেণ্ট ভাঙিয়া দিয়া নূতন নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন। নির্বাচনের আগে ২৭শে ফেব্রুয়ারী রহস্যজনকভাবে জার্মান পার্লামেণ্ট ভবন অগ্নিদগ্ধ হয়। হিটলার এজন্য কমিউনিষ্ট পার্টি ও বিরোধীদলকে দায়ী করিয়া তাহাদের ব্যাপক গ্রেপ্তার করেন। এই গ্রেপ্তারের ফলে বিরোধী দলগুলি দুর্বল হইয়া পড়ে। ফলে নির্বাচনে নাৎসীদল বিনা বাধায় জয়লাভ করে। হিটলার তাঁহার বশংবদ পার্লামেণ্ট দ্বারা "ক্ষমতা প্রদানের আইন" (Enabling Act) নামে এক আইন পাশ করাইয়া নেন। ইহার বলে আইনসভা ছাড়া প্রধানমন্ত্রী চার বৎসরের জন্য নিজেই শাসন চালনা ও আইন রচনার অধিকার পান। এই আইনের বলে হিটলার জার্মানীর সর্বময় কর্তায় পরিণত হন। ১৯৩৪ খ্রীঃ ফিল্ড মার্শাল হিণ্ডেনবুর্গের মৃত্যু হইলে হিটলার একাধারে প্রেসিডেণ্ট ও প্রধানমন্ত্রী ও নাৎসীদলের সর্বময় কর্তা হন। তিনি ফুয়েরার (Fuehrer) নামে অভিহিত হন। এইভাবে জার্মানীতে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

নির্বাচনে জয়লাভ : হিটলারের প্রধান মন্ত্রীত্ব গ্রহণ

হিটলার জার্মানীতে নাৎসীবাদের আদর্শ অনুযায়ী অনেক প্রকার সংস্কার প্রবর্তন করেন। নাৎসীদল জার্মানীতে আমূল সংস্কার চালাইলে ইহাকে নাৎসী বিপ্লব বলা

জার্মানীর নাৎসীকরণ
নাৎসী সংস্কার

হয়। নাৎসীতন্ত্র অনুসারে হিটলার রাষ্ট্রকে সর্বাত্মক ক্ষমতার (Totalitarian) অধিকারী করেন। রাষ্ট্রের অধিনায়ক হিসাবে হিটলারই সর্বময় ক্ষমতার অধীশ্বর হন। তিনি কোন ধর্ম মানিতেন না। জার্মানীই ছিল তাঁহার ঈশ্বর। জার্মানীর অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের জন্য তিনি বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ডাঃ শাখ্‌টের (Dr. Schacht) পরামর্শ গ্রহণ করেন। জার্মানীকে স্বয়ং-সম্পূর্ণ রাষ্ট্রে (Auturchy) পরিণত করার জন্য উৎপাদন বাড়ান হয়। বড় বড় খামারগুলি না ভাঙিয়া তাহাতে বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ-আবাদ চালান হয়। ১৯৩৭ খ্রীঃ মধ্যে জার্মানীর প্রয়োজনীয় খাদ্যের ৮০ ভাগ জার্মানীতেই উৎপন্ন হয়। কলকারখানা সরকারী পরিচালকের পরামর্শ অনুযায়ী চালাইবার ব্যবস্থা করা হয়। কারখানাগুলিতে সিফ্‌ট বা পালা করিয়া কাজ করার ব্যবস্থা চালু করা হয়। ইহার ফলে বেশী লোক কাজ পায় ও উৎপাদন বাড়ে। শ্রমিকদের ধর্মঘট ও ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার হরণ করা হয়। শ্রমিকদের দাবী আদায়ের জন্য শ্রমিক সংঘ গঠন করা হয়। জার্মানীকে ১৩টি অঞ্চলে বিভক্ত করিয়া ১৩টি শ্রমিক সংঘ গঠন করা হয়। শ্রমিকদের সাপ্তাহিক কাজের সময় কমাইয়া দিয়া ঐ বাড়তি সময়ে নূতন শ্রমিক নিয়োগ করিয়া বেকারের চাকুরীর ব্যবস্থা করা হয়। এক বৎসরের মধ্যে ২০ লক্ষ বেকারের কর্মসংস্থান করা হয়। এছাড়া কলকারখানাগুলিতে পূর্ণ উৎপাদনের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। জার্মানীর রবার, পশম ও তেলের অভাব থাকায় বিকল্প রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদন করিয়া এই ঘাটতি মিটাইবার ব্যবস্থা করা হয়। দ্বিতীয়তঃ, জার্মানীর সমরযন্ত্রকে ঢালিয়া সাজাইবার ব্যবস্থা করা হয়। ভার্সাই সন্ধির পঞ্চম অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জার্মানীকে পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ করা হইয়াছিল। হিটলার কমিউনিষ্ট বিরোধী মনোভাব দেখাইলে পশ্চিমী শাসকগণ ইহার ফলে জার্মানীর প্রতি সহানুভূতি দেখান। এই সুযোগে হিটলার অস্ত্রসজ্জা আরম্ভ করেন। চিরাচরিত পুরাতন ধরনের যুদ্ধাস্ত্রের উপর আস্থা না রাখিয়া, যান্ত্রিক বাহিনী গঠনের দিকে জোর দেওয়া হয়। ইহার ফলে দূরপাল্লার কামান, বিমান, রণতরী, ট্যাংক ও মারণাস্ত্রের সমন্বয়ে জার্মান বাহিনী পৃথিবীর সকল শক্তিকে ছাড়াইয়া যায়। জার্মান জাতির সামরিক দক্ষতাকে কাজে লাগাইবার জন্য হিটলার বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা প্রবর্তন করেন। ট্যাংক, স্বয়ংক্রিয় রাইফেল, সাঁজোয়া গাড়ি, মোটর সাইকেল বাহিনী, ডুবোজাহাজ, বোমারু বিমান, আগুনে ও বিস্ফোরক বোমার সমন্বয়ে জার্মান বাহিনী পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা দুর্ধর্ষ শক্তিতে পরিণত হয়। জার্মান সেনাপতিমণ্ডলীকে হিটলার স্বয়ং পরিচালনা করেন। তৃতীয়তঃ, জার্মানীর সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও নাৎসী বিপ্লবের ভাবধারা ছড়াইয়া দেওয়া হয়। সাহিত্য, বিজ্ঞান, রেডিও, সংবাদপত্র সকল প্রকার সৃজনশীল মাধ্যমকে নাৎসী আদর্শ রূপায়ণে ব্যবহার করা হয়। হিটলারের প্রচার সচিব ও অন্তরঙ্গ বন্ধু দর্শনের অধ্যাপক ডাঃ গোয়েবলস এই বিষয়ে তাঁহার প্রতিভা দেখান। বিশ্ববিদ্যালয়, বিদ্যালয় সকল ক্ষেত্রেই নাৎসী আদর্শকে গ্রহণ করা হয়। গণতন্ত্রে বিশ্বাসী নাৎসীবাদ বিরোধী অধ্যাপক ও ছাত্রগণকে বহিস্কার করা হয়। ইতিহাসে জার্মান জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য জার্মানীর ইতিহাস নূতন করিয়া লেখা হয়। দর্শনকেও

নাৎসীবাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য ব্যবহার করা হয়। ইহুদিগণকে জার্মানী হইতে বিতাড়ন অথবা ধ্বংস করার জন্য ব্যাপক চেষ্টা চালান হয়। জার্মান জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য তাহাদের আর্য জাতির বংশধর বলিয়া প্রচার করা হয়। জার্মান জাতির আর্য রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষা করার জন্য তাহাদের জার্মানগণকেই বিবাহ করিতে বলা হয়। স্বস্তিকা চিহ্নকে জার্মান আর্য রক্তের প্রতীক বলিয়া গণ্য করা হয়। জার্মানীতে ব্যাপক ইহুদি নির্যাতন আরম্ভ হয়। বিশ্ববিখ্যাত ইহুদি বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক আলবার্ট আইনষ্টাইনও হিটলারী অত্যাচারের হাত হইতে রক্ষা পান নাই। তিনি শেষ পর্যন্ত আমেরিকায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। পৃথিবীর মধ্যে জার্মান জাতিই শ্রেষ্ঠ এবং জার্মান-গণের মধ্যে ফুয়েরার হইলেন শ্রেষ্ঠ মানব—বীরপূজার এই ধারণা জাতির মনে ছড়াইয়া দেওয়া হয়। মার্কসবাদ ও গণতন্ত্রকে কঠোর নিন্দা করা হয়। নাৎসী বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিকে ধ্বংস করা হয়। একমাত্র নাৎসী দলের একদলীয় শাসন কায়েম করা হয়। সর্বশেষে জার্মানীর বৈষয়িক উন্নতির জন্য ১৯৩৬ খ্রীঃ হইতে চতুর্বার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া কয়লা, লৌহ, ইস্পাত, ভারী শিল্প, রাসায়নিক দ্রব্য, কৃত্রিম রবার, তৈল, প্লাষ্টিক প্রভৃতি উৎপাদনের উপর জোর দেওয়া হয়। এইভাবে নাৎসী বিপ্লব সাধিত হয়।

নাৎসী জার্মানীর বৈদেশিক নীতিঃ আন্তর্জাতিক যৌথ-নিরাপত্তার ধ্বংস (Foreign Policy of Nazi Germany : The breakdown of collective security)ঃ নাৎসীবাদ জার্মানীর আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে যেমন বিপ্লব ঘটায়, বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রেও ইহা ভার্সাই সন্ধির দ্বারা গঠিত শক্তিসাম্যকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে। ভার্সাই সন্ধি দ্বারা জার্মানীকে দুর্বল করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা হয়। হিটলার তাহা ভাঙিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করেন। হিটলার কেবলমাত্র ভার্সাই সন্ধি ভাঙিয়া ফেলিয়া সন্তুষ্ট থাকিতেন কিনা তাহা সঠিক জানা যায় না। এ বিষয়ে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। উইনষ্টন চার্চিল, এল্যান বুলক প্রভৃতি ঐতিহাসিকের মতে হিটলার প্রথমে ইওরোপ জয় করিয়া তাহার পর উপনিবেশ দখল করিয়া জার্মানীর একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিতেন। মার্কসবাদী লেখক মেইস্কি প্রভৃতির মতে হিটলার সোভিয়েত রাশিয়াকে ধ্বংস করিয়া পূর্ব ইওরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকা অধিকারের বাসনা করিতেন। ঐতিহাসিক এ. জে. পি. টেইলার এই সকল মত অগ্রাহ্য করিয়াছেন। এই ঐতিহাসিক বলেন যে, হিটলার উপনিবেশ বা সাম্রাজ্য জয়ের ইচ্ছা পোষণ করিতেন কিনা তাহার কোন প্রমাণ দেখা যায় না। যদিও হিটলার আফ্রিকার যুদ্ধে জড়াইয়া পড়েন, তাহা ঘটনাচক্রের ফল বলা যায়। মিত্রশক্তি ইতালী আফ্রিকার যুদ্ধে পরাজয়ের সম্মুখীন হইলে হিটলারকে বাধ্য হইয়া আফ্রিকার যুদ্ধের দিকে নজর দিতে হয়। তবে তিনি আফ্রিকার যুদ্ধকে তাঁহার রণ পরিকল্পনায় কোন প্রাধান্য দেন নাই। অধ্যাপক টেইলারের মতে হিটলারের বৈদেশিক নীতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিলঃ—(১) ভার্সাই ও সেণ্ট জারমেইনের সন্ধিকে নস্যাৎ করা; (২) সমগ্র জার্মান জাতিকে জার্মান সাম্রাজ্য বা তৃতীয় রাইখের অন্তর্ভুক্ত করা; (৩) পূর্ব ইওরোপে

নাৎসী বৈদেশিক নীতির লক্ষ্য

জার্মানীর সাম্রাজ্যবাদী শাসন কায়েম করা। যাহা হউক হিটলারের বৈদেশিক নীতির দাপটে লীগ অফ নেশনসের প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ছারখার হইয়া যায় এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়। বৈদেশিক নীতি পরিচালনায় হিটলার অন্যায় পথ লইতে দ্বিধা করিতেন না। তিনি যে প্রতিশ্রুতি দিতেন তাহা ভাঙিতে মোটেই ইতস্ততঃ করিতেন না। তিনি যে সকল সন্ধি স্থাপন করেন তাহা তিনি নিজেই ছেঁড়া কাগজের ন্যায় দরকার হইলে নষ্ট করিয়া ফেলেন। আন্তর্জাতিক আইন ও ভ্রাতৃত্ববোধকে তিনি কোন মূল্য দেন নাই। মিথ্যা প্রচার ও আশ্বাসের দ্বারা তিনি শত্রুপক্ষকে ভুল পথে পরিচালিত করিতেন। কূটনীতির সাহায্যে শত্রু জোটকে বিভক্ত করিয়া তাহাদের একে একে আক্রমণ করা (one by one policy) ছিল তাঁহার বিশেষ কৌশল।[১]

হিটলার তাঁহার শাসন কালের গোড়ার দিকে (১৯৩৫ খ্রীঃ পর্যন্ত) বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে ভার্সাই সন্ধি বিরোধী কাজ করেন। প্রথমেই তিনি লীগের আহূত আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন হইতে (১৯৩৩ খ্রীঃ) জার্মান প্রতিনিধিকে ফিরাইয়া নেন। তিনি এই অজুহাত দেখান যে এই সম্মেলনে ফ্রান্সের সহিত জার্মানীর অস্ত্রের সমতার দাবী স্বীকার না করিয়া জার্মানীর উপর ঘোর অবিচার করা হইতেছে। হিটলারের এই কাজের ফলে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন ভাঙিয়া যায়। হিটলার বুঝিয়াছিলেন যে লীগের আদর্শ মানিয়া চলিলে জার্মানীকে ভার্সাই সন্ধি মানিয়া চলিতে হইবে। এজন্য হিটলারের নির্দেশে জার্মানী লীগের সদস্য পদ ত্যাগ করে। লীগের সদস্য পদ ত্যাগ করায় তাহার কাজের জন্য লীগের নিকট জবাবদিহির দায়িত্ব হইতে জার্মানী মুক্ত হয়। ইহার পর হিটলার পোল্যাণ্ডের সহিত দশ বছরের জন্য এক অনাক্রমণ চুক্তি (১৯৩৪ খ্রীঃ) সম্পাদন করেন। জার্মানী লীগ বর্জন করিবার ফলে জার্মানীর উদ্দেশ্য সম্পর্কে যে আশঙ্কার সৃষ্টি হয়, এই পোল্যান্ডের সহিত চুক্তির ধূম্রজাল দ্বারা হিটলার তাহা প্রশমিত করেন। তিনি ইহা প্রচার করেন যে ভার্সাই সন্ধির দ্বারা পোল্যাণ্ডের সহিত জার্মানীর সর্বাপেক্ষা জটিল সম্পর্ক দেখা দিয়াছে। কিন্তু জার্মানী পোল্যাণ্ডের সহিত এই বিরোধ যুদ্ধ দ্বারা মিটাইতে চাহে না। জার্মানী তাহার শান্তিপ্রিয়তার জন্যই পোল্যাণ্ডের সহিত অনাক্রমণ চুক্তি করিয়াছে। পোল-জার্মান চুক্তির দ্বারা হিটলার জার্মানীর বিরুদ্ধে সমালোচনা বন্ধ করেন। এদিকে জার্মানী হইতে আক্রমণের ভয় মুক্ত হইয়া পোল্যাণ্ড ফরাসী মিত্রতার প্রতি উদাসীন হইয়া পড়ে। লোকার্ণো চুক্তির দ্বারা জার্মানীর বিরুদ্ধে ফ্রান্স ও পোল্যাণ্ড মিত্রতাবদ্ধ হইয়াছিল। জার্মানীর সহিত পোল্যাণ্ডের অনাক্রমণ চুক্তির ফলে ইহা শিথিল হইয়া পড়ে। ইহার পর হিটলার অষ্ট্রিয়াকে জার্মানীর সহিত সংযুক্ত করিবার কাজে মন দেন। সেণ্ট জার্মেইন সন্ধি অনুযায়ী জার্মানী ও অষ্ট্রিয়াকে দুই পৃথক রাষ্ট্র হিসাবে রাখার ব্যবস্থা হয়। হিটলার দাবী করেন যে যেহেতু উভয় দেশে জার্মান জাতি বাস করে, উহাদের সংযুক্তি হওয়া দরকার। তাঁহার নির্দেশে অষ্ট্রিয়ায় নাৎসী দলের শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। জার্মান রাষ্ট্রদূত ইহাদের গোপনে সহায়তা করেন। অষ্ট্রিয়ার নাৎসীগণ ১৯৩৪

১৯৩৩-৩৫ খ্রীঃ পর্যন্ত বৈদেশিক নীতি

১. Allan Bullock—Hitler—A study in Tyrrany.

খ্রীঃ হঠাৎ অষ্ট্রিয়ার সরকারী দপ্তর আক্রমণ করিয়া প্রধানমন্ত্রী ডলফাসকে হত্যা করিয়া বেতার কেন্দ্র অধিকার করে। নাৎসীগণের উদ্দেশ্য ছিল অষ্ট্রিয়ার বৈধ সরকারের পতন ঘটাইয়া নাৎসী সরকার স্থাপন। কিন্তু অষ্ট্রিয়ার প্রেসিডেণ্ট মিকোলাস অনুগত সেনাদলের সাহায্যে এই বিদ্রোহ দমন করেন। ফ্রান্স, ইতালী, রাশিয়া প্রভৃতি দেশ অষ্ট্রিয়ায় জার্মান ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে জোর প্রতিবাদ জানাইলে হিটলার আপাততঃ অষ্ট্রিয়ার দিক হইতে নজর সরাইয়া নেন।

ঐতিহাসিক ই. এইচ. কারের মতে ১৯৩৫ খ্রীঃ হইতে হিটলার খোলাখুলিভাবে সন্ধি ভাঙিয়া আন্তর্জাতিক নিরাপত্তাকে ধ্বংস করার কাজে হাত দেন।[১] (১) ১৯৩৫ খ্রীঃ ভার্সাই সন্ধির ১৫ বৎসর পূর্ণ হইলে সার (Saar) অঞ্চলে গণভোট গৃহীত হয়। এই অঞ্চল জার্মানীর সহিত সংযুক্তির ইচ্ছা প্রকাশ করিলে নাৎসী সরকার অনাবশ্যক সামরিক মহড়া দেখাইয়া সার অঞ্চল অধিকার করেন। (২) ইহার পর হিটলার ঘোষণা করেন যে ভার্সাই সন্ধির পঞ্চম অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জার্মানীকে যে নিরস্ত্রীকরণ করা হয় তাহা নাকচ করা হইল। তিনি জার্মানীতে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার চলন এবং জার্মান বিমান বাহিনী সম্প্রসারণ আরম্ভ করেন। ভার্সাই সন্ধি ভাঙিয়া জার্মানী অস্ত্রসজ্জা আরম্ভ করায় ফ্রান্স আতঙ্কিত হইয়া পড়ে। জার্মানীর সন্ধি ভঙ্গের প্রতিবাদে লীগে ধীক্কার জানান হয়। ফ্রান্স আত্মরক্ষার জন্য রাশিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়ার সহিত পারস্পরিক আত্মরক্ষা চুক্তি সম্পাদন করে। (৩) জার্মানীর অস্ত্রসজ্জায় ফ্রান্স ও রাশিয়ার প্রতিবাদকে চূর্ণ করিবার জন্য হিটলার ইংলণ্ডকে দলে টানিবার চেষ্টা করেন। ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেইন মনে করিতেন যে জার্মানী শক্তিশালী হইলে ইওরোপে রুশ কমিউনিজমের প্রসার বন্ধ হইবে। এজন্য তিনি জার্মান তোষণ নীতি নেন। চেম্বারলেইন ১৯৩৫ খ্রীঃ ইঙ্গ-জার্মান নৌচুক্তি সম্পাদন করেন। ইহার বলে জার্মানীকে যুদ্ধ জাহাজ নির্মাণে ইংলণ্ড অনুমতি দেয়। ইঙ্গ-জার্মান নৌচুক্তি দ্বারা ইংলন্ড পরোক্ষভাবে জার্মানীকে অস্ত্রসজ্জায় উৎসাহ দেয়। ইহার পর জার্মানী দ্রুতবেগে তাহার অস্ত্রসজ্জা সম্পন্ন করে। ফলে ইওরোপের রাজনীতিতে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। (৪) অতঃপর হিটলার বলেন যে রাশিয়ার সহিত সামরিক চুক্তি সম্পাদন দ্বারা ফ্রান্স লোকার্ণো চুক্তির মূল নীতি ভাঙিয়াছে। সুতরাং জার্মানী লোকার্ণো চুক্তি মানিতে আর বাধ্য থাকিবে না। তিনি জার্মান সেনাদল পাঠাইয়া (১৯৩৬ খ্রীঃ) রাইনল্যাণ্ড অধিকার করেন এবং ভার্সাই সন্ধির রাইন অঞ্চলের অসামরিকীকরণ শর্ত ভাঙিয়া ফেলেন। (৫) ইতিমধ্যে ইতালী-আবিসিনিয়া যুদ্ধ উপলক্ষে লীগ ইতালীর বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ ঘোষণা করে। কিন্তু জার্মানী এই নির্দেশ না মানিয়া ইতালীকে অস্ত্র সাহায্য দেয়। ইহার ফলে ইতালীর সহিত জার্মানীর মিত্রতা স্থাপিত হয়। ইহাকে রোম-বার্লিন অক্ষচুক্তি বলা

জার্মানীর অস্ত্রসজ্জা ; রাইনল্যাণ্ড অধিকার ও অক্ষচুক্তি গঠন

---

১. "The...months which began in March, 1935, was marked by open violation, on a scale yet unknown in post-war history..." E. H. Carr—Internatfonal Relations between the Two World Wars.

হয়। এই অক্ষ চুক্তির দ্বারা জার্মানী ও ইতালী একটি ফ্যাসিষ্ট জোট গঠন করে। ক্রমে দূরপ্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ শক্তি জাপানও এই জোটের অন্তর্ভুক্ত হয়। হিটলার এই জোটের নাম "কমিউনিষ্ট-বিরোধী চুক্তি গোষ্ঠী" (Anti-Comintern Pact)। যাহাই হউক হিটলারী কূটনীতির ফলে আন্তর্জাতিক যৌথ নিরাপত্তা ভাঙিয়া বিশ্বের শক্তিগুলি ফ্যাসিষ্ট ও অফ্যাসিষ্ট জোটে গঠিত হয়।[১] একদিকে জার্মানী, ইতালী ও জাপান প্রভৃতি ফ্যাসিষ্ট শক্তি এবং অপরদিকে সোভিয়েত রাশিয়া ও ফ্রান্স প্রভৃতি গণতান্ত্রিক শক্তি। ইংলণ্ড তখনও দ্বিধাগ্রস্থ নীতি লইয়া চলে এবং জার্মান তোষণ চালায়।

১৯৩৮ খ্রীঃ হইতে হিটলার খোলাখুলিভাবে তাঁহার আক্রমণমুখী সাম্রাজ্যবাদী নীতিকে কার্যকরী করেন। (১) তিনি সেণ্ট জার্মেইন সন্ধি ভাঙিয়া অষ্ট্রিয়াকে জার্মানীর সহিত সংযুক্ত করিতে মনস্থ করেন। অষ্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী ডাঃ শুশনিগ্‌কে অষ্ট্রিয়ার নাৎসী দলের দ্বারা চাপ দিয়া পদত্যাগ করিতে বাধ্য করা হয়। নাৎসী নেতা শিয়েশ ইঙকার্টকে (Siyes Inquart) অষ্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়। নূতন প্রধান-মন্ত্রীর আহবানে জার্মান বাহিনী অষ্ট্রিয়ায় ঢুকিয়া রাজধানী ভিয়েনা দখল করে। পরে একটি সাজান গণভোট দ্বারা হিটলার অষ্ট্রিয়াকে জার্মানীর সহিত সংযুক্ত করেন। তিনি গর্বের সহিত বলেন যে, "প্রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী বিসমার্ক অষ্ট্রিয়াকে জার্মানী হইতে বহিস্কার করেন। অষ্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী হিটলার অষ্ট্রিয়াকে জার্মানীর সহিত যুক্ত করিলেন।" ইংলণ্ড এই আক্রমণের বিরুদ্ধে নীরব থাকে। ফলে ফ্রান্স এককভাবে কার্যকরী বাধা দিতে নিরস্ত থাকে। (২) অষ্ট্রিয়া অধিকারের পর হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়ার সুদেতেন জেলার জার্মান অধিবাসী-গণকে জার্মানীর সহিত সংযুক্ত করিবার সঙ্কল্প ঘোষণা করেন। হিটলার এই যুক্তি দেখান যে জাতীয়তাবাদী নীতি অনুযায়ী জার্মান অধ্যুষিত সুদেতেন জেলা জার্মানীরই প্রাপ্য। ভার্সাই সন্ধির দ্বারা অন্যায়ভাবে এই অঞ্চল চেকোশ্লোভাকিয়ার সহিত সংযুক্ত করা হয়। সুদেতেন জেলা উদ্ধারের জন্য তিনি চেকোশ্লোভাকিয়ার সহিত যুদ্ধ করিবার হুমকীও দেন। এদিকে ফ্রান্স ও রাশিয়া যৌথ চুক্তি অনুযায়ী চেকোশ্লোভাকিয়াকে জার্মানীর হাত হইতে রক্ষার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল। সুতরাং হিটলার চেকোশ্লো-ভাকিয়া আক্রমণ করিলে যুদ্ধ বাধিবার আশঙ্কা দেখা দেয়। কিন্তু ফরাসী প্রধানমন্ত্রী মসিঁয়ে দালাদিয়ের তাঁহার দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করিয়া দ্বিধাগ্রস্ত ভাব দেখান। ইহার ফলে রাশিয়াও চেকোশ্লোভাকিয়ার রক্ষার ব্যাপারে নিরুৎসাহ হইয়া পড়ে। ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেন জার্মান তোষণ নীতি অনুসারে সুদেতেন জেলা জার্মানীকে ছাড়িয়া দিয়া যুদ্ধ এড়াইবার নীতি গ্রহণ করেন। এজন্য তিনি ফ্রান্সের উপর চাপ দেন। শেষ পর্যন্ত ইংলণ্ডের প্রস্তাবে ফ্রান্সও সায় দেয়। ফলে মিউনিক বৈঠকে মিউনিক চুক্তির দ্বারা (১৯৩৮ খ্রীঃ) জার্মানীকে সুদেতেন জেলা ছাড়িয়া দিতে চেকোশ্লোভাকিয়াকে বাধ্য করা হয়। নাৎসী জার্মানীর নগ্ন আগ্রাসনের নিকট ইওরোপীয় শক্তিগুলি নীতি স্বীকার করে। হিটলার অবশ্য প্রতিশ্রুতি দেন যে "ইওরোপের নিকট

অষ্ট্রিয়া অধিকার ও মিউনিক চুক্তি

১. E. H. Carr.

তাঁহার আর কোন ভৌগোলিক দাবী নাই।"[১] কিন্তু কার্যক্ষেত্রে মিউনিক চুক্তির সূত্র ধরিয়া জার্মান সেনা চেকোশ্লোভাকিয়ার বৃহদংশ অধিকার করে এবং চেক রাষ্ট্রপতি এমিল হাশাকে (Hacha) ভয় দেখাইয়া চেক দেশটি হিটলার জার্মানীর কুক্ষিগত করেন।

জার্মানী কর্তৃক চেকোশ্লোভাকিয়া অধিকারের পর পশ্চিমী দেশগুলি জার্মান তোষণ নীতির ব্যর্থতা বুঝিতে পারে। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেইন ইহার পর জার্মান আগ্রাসন রুখিবার জন্য প্রস্তুত হন। ফ্রান্সও ইংলণ্ডের ন্যায় জার্মানীর আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সামরিক বাধাদানের জন্য দ্রুত প্রস্তুতি চালায়। ইতিমধ্যে হিটলার লিথুয়ানিয়ার মেমেল বন্দর অধিকার করেন এবং পোল্যাণ্ড আক্রমণের উদ্যোগ করেন। হিটলার বুঝিতে পারেন যে পোল্যাণ্ড আক্রমণ করিলে পশ্চিমী শক্তির সহিত জার্মানীর যুদ্ধ বাধিবে। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধ বাধিলে, সোভিয়েত রাশিয়া যদি জার্মানীর বিপক্ষে যোগ দেয়, তবে জার্মানী পূর্ব ও পশ্চিম উভয়দিকে আক্রান্ত হইবে। এই কারণে সোভিয়েত রাশিয়া যাহাতে পশ্চিমী শক্তির সহিত যোগ দিয়া তাঁহাকে আক্রমণ না করে সেজন্য তিনি রাশিয়াকে পশ্চিমী শক্তি হইতে বিচ্ছেদ করিবার চেষ্টা করেন। মিউনিক চুক্তির ফলে সোভিয়েত রাশিয়া ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মিত্রতা লাভে নিরাশ হইয়াছিল। রুশ নেতাদের ধারণা হয় যে পশ্চিমী দেশগুলি জার্মানীকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে লেলাইয়া দিতেছে। সুতরাং রাশিয়া আত্মরক্ষার জন্য জার্মানীর সহিত সন্ধি স্থাপনে ইচ্ছা প্রকাশ করে। ফলে ১৯৩৯ খ্রীঃ রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদিত হয়। জার্মানীর সহিত পশ্চিমী দেশের যুদ্ধে রাশিয়া নিরপেক্ষ থাকার প্রতিশ্রুতি দেয়। ইহার ফলে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সকে একক যুদ্ধের দায়িত্ব লইতে হয়। রুশ-জার্মান চুক্তি ছিল হিটলারের কুটনৈতিক সাফল্যের পরিচয়। আসলে হিটলার পশ্চিমী শক্তির সহিত যুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়াকে নিরপেক্ষ রাখেন। পরে তিনি সোভিয়েত রাশিয়াকে মিত্রহীন অবস্থায় আক্রমণ করেন। ইতিমধ্যে ১৯৩৯ খ্রীঃ ১লা সেপ্টেম্বর জার্মানী পোল্যাণ্ড আক্রমণ করে। ইহার প্রতিবাদে পশ্চিমী মিত্রশক্তি ৩রা সেপ্টেম্বর জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়।

রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি ও পোল্যাণ্ড আক্রমণ

ইঙ্গ-ফরাসী জার্মান তোষণ নীতি ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ভঙ্গঃ চেম্বারলেইন ও দালাদিয়েরের নীতি (The Anglo-French policy of German Appeasement and breakdown of collective Security : Policy of Chamberlaine and Daladier) : ১৯১৯ খ্রীঃ পর লীগের আমলে যে শান্তি ও যৌথ নিরাপত্তা ইওরোপে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা ধ্বংস করিবার জন্য জার্মানী ও অক্ষশক্তির যেমন দায়িত্ব ছিল, তেমনই ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি শক্তিও কম দায়ী ছিল না। যদি ইংলণ্ড ১৯১৯ খ্রীঃ পর জার্মানীর প্রতি তোষণ নীতি না গ্রহণ করিয়া জার্মানীর বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ

তোষণ নীতি

১. "Sudeten land is my last territorial demand on Europe." Hitler.

নীতি লইত এবং ইহার জন্য সোভিয়েত রাশিয়া ও ফ্রান্সকে সাহায্য দিত তবে অক্ষশক্তির আগ্রাসন সম্ভব হইত না।

জার্মানীকে তোষণ করার প্রধান পুরোহিত ছিলেন ইংলণ্ডের টোরী প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেইন। ইংলণ্ডের জার্মান তোষণ নীতির ব্যাখ্যা হিসাবে বলা হয় যে—(১) ইওরোপ তথা ইংলণ্ডে রুশ কমিউনিজমের প্রসারের ভয়ে ইংলণ্ডের ধনতন্ত্রী, রক্ষণশীল নেতাগণ অত্যন্ত ভীত ছিলেন। তাঁহারা মনে করিতেন যে জার্মানী দুর্বল হইয়া পড়িলে রুশী সাম্যবাদ জার্মানীর ভিতর দিয়া পশ্চিম ইওরোপে ঢুকিয়া পড়িবে। এজন্য জার্মানীকে শক্তিশালী করার কথা তাঁহারা ভাবেন। (২) চেম্বারলেইন নাৎসী জার্মানী ও কমিউনিষ্ট রাশিয়ার মধ্যে শক্তিসাম্য নীতি খাটাইয়া একটিকে অপরটির বিরুদ্ধে লেলাইয়া দেওয়ার আশা করিতেন। তাহার ধারণা ছিল যে ইহার ফলে উভয়েই অথবা যে কোন একটি ধ্বংস হইবে। ইংলণ্ডের দুইটি শত্রুর মধ্যে অন্ততঃ একটি বিনষ্ট হইবে। তাঁহার এই ভুল নীতির মাশুল অচিরেই বিশ্বকে দিতে হয়। চেম্বারলেইনের এই নীতির সুযোগে হিটলার ভার্সাই সন্ধির শর্তগুলি একের পর এক বিনা বাধায় ভাঙ্গিয়া ফেলেন। শেষ পর্যন্ত জার্মানী ইঙ্গ-ফরাসী মিত্রশক্তিকে আক্রমণ করে। (৩) ভার্সাই সন্ধি ও লীগ অফ নেশনসের বড় খুঁটি ছিল ইংলণ্ড ও ফ্রান্স। কিন্তু জার্মান নীতি লইয়া ১৯১৯ খ্রীঃ পর হইতে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে গুরুতর মতভেদ দেখা দেয়। ইহার সুযোগ লইয়া হিটলার ইংলণ্ডের সমর্থন লাভ করেন। তিনি ভার্সাই সন্ধি ভাঙিতে পরোক্ষভাবে ইংলণ্ডের অনুমোদন পান। ফ্রান্স প্রথম দিকে জার্মানীর বিরুদ্ধে লীগের মাধ্যমে ও কূটনীতির সাহায্যে বাধাদানের চেষ্টা করিয়া বিফল হয়। ফলে ফ্রান্স হতাশ হইয়া ইংলণ্ডের পন্থা ধরে। (৪) চেম্বারলেইনের ধারণা ছিল যে ভার্সাই সন্ধির দ্বারা জার্মানীর প্রতি যে অন্যায় করা হয় তাহার নিরসন হইলেই হিটলার শান্ত হইবেন। হিটলার ও তাঁহার মিত্র মুসোলিনীর সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী নীতি সম্পর্কে তাঁহার সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। চেম্বারলেইন কেবলমাত্র জার্মানীকে তোষণ করেন নাই। তিনি ইতালী ও জাপানকেও তোষণ করেন। রুশ কমিউনিজমের প্রতি অন্ধ ভীতির দ্বারা চালিত হইয়া তিনি বারংবার রুশ মিত্রতার সুযোগ নষ্ট করেন এবং অক্ষ শক্তিকে নির্লজ্জভাবে তোষণ করিয়া আন্তর্জাতিক আইন ও শান্তিকে জলাঞ্জলি দেন।

তোষণ নীতির কারণ

চেম্বারলেইন জার্মানীর ক্ষেত্রে নগ্নভাবে তোষণ নীতি গ্রহণ করেন। তবে তিনি উপযুক্ত অজুহাত দিয়া এই নীতিকে সমর্থন করিতে চেষ্টা করেন। তিনি তাঁহার মন্ত্রীসভা হইতে জার্মান বিরোধী এণ্টনী ইডেনকে সরাইয়া দেন। ১৯৩৮ খ্রীঃ আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট জার্মানীর আগ্রাসী নীতি লক্ষ্য করিয়া ইংলণ্ডকে প্রস্তাব দেন যে নিরপেক্ষ জাতির সম্মেলন ডাকিয়া আন্তর্জাতিক নীতি স্থির করিয়া জার্মানীকে তাহা মানিতে বাধ্য করা হউক এবং বিশ্বের কাঁচামাল ন্যায্যভাবে ভাগ করার ব্যবস্থা করা হউক। চেম্বারলেইন এই ঐতিহাসিক প্রস্তাবের প্রতি উপেক্ষা দেখান।[১]

জার্মান তোষণ

১. Gathering Storm—W. Churchill. P. 199.

(১) ১৯৩৫ খ্রীঃ চেম্বারলেইন ইঙ্গ-জার্মান নৌ চুক্তি দ্বারা জার্মানীর অস্ত্রসজ্জায় পরোক্ষ অনুমোদন দেন। তিনি "বাস্তবতা ও সুবিধাবাদের" (Expediency) দোহাই দিয়া ইহা সমর্থন করেন। (২) ১৯৩৬ খ্রীঃ জার্মানী লোকার্ণো চুক্তি ভাঙিয়া রাইন-ল্যাণ্ডে সৈন্য পাঠাইলে ফ্রান্স ইহার প্রতিবাদ করে। চেম্বারলেইন বলেন যে জার্মানী তাহার নিজ জনসাধারণের উপর "আত্মনিয়ন্ত্রণ" (self ditermination) স্থাপন করিতেছে। ইহাতে আপত্তির কারণ নাই। (৩) ১৯৩৮ খ্রীঃ জার্মানী অষ্ট্রিয়া অধিকার করিলে চেম্বারলেইন একই যুক্তি দেখান। (৪) ১৯৩৯ খ্রীঃ মিউনিক চুক্তির প্রাক্কালে তিনি বলেন যে সুদেতেন জেলা জার্মানীরই প্রাপ্য এবং ইহা ছাড়িয়া না দিলে চেকোশ্লোভাকিয়াকে রক্ষা করা যাইবে না। মিউনিক চুক্তির দ্বারা "শান্তি ও সম্মান" (peace and honour) রক্ষিত হইয়াছে। "ইহা স্থায়ী শান্তি আনিবে" (A peace of all time)। এইভাবে মিউনিক চুক্তি পর্যন্ত ইংলণ্ড একাদিক্রমে তোষণ নীতি চালাইয়া যায়। ঐতিহাসিক ল্যাংসাম এজন্য মিউনিক চুক্তিতে "তোষণ নীতির শ্রেষ্ঠ উদাহরণ" (Highest watermark of appeasement policy) বলিয়াছেন।

তোষণ নীতির বিফলতা

হিটলার মিউনিক চুক্তি ভাঙিবার পর চেম্বারলেইনের নীতির বদল হয়। তিনি নিজেই স্বীকার করেন যে, "হিটলার তাঁহার প্রতিজ্ঞা রক্ষার করেন নাই। আজ অত্যন্ত দুঃখের দিন এবং আমা অপেক্ষা কেহ বেশী দুঃখিত হইবে না"।[১] বলা বাহুল্য ইহার পর তিনি দৃঢ় নীতি গ্রহণ করেন। কিন্তু তখন বিশ্ব-যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যাওয়ায় আর নিবারণের কোন পথ ছিল না। ফরাসী প্রধানমন্ত্রী দালাদিয়েরও, চেম্বারলেইনের নীতি অন্ধভাবে অনুসরণ করেন।

জাপানী তোষণ

অক্ষশক্তির অন্যতম জাপানকেও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী তোষণ করেন। ১৯৩১ খ্রীঃ জাপান নগ্নভাবে মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করিলে লীগ অফ নেশনস ইংলণ্ডের প্রভাবে জাপানকে শাস্তি-দানে ব্যর্থ হয়। চেম্বারলেইন মনে করিতেন যে জাপান দুর্বল হইলে মাঙ্গোলিয়া ও চীনে রুশ প্রভাব বাড়িবে। রাশিয়াকে কোণ-ঠাসা করিবার জন্য তিনি জাপানী আক্রমণের দিকে চোখ বুজাইয়া রাখেন। মর্ণিংপোষ্ট, ডেইলীমেইল প্রভৃতি ইংলণ্ডের প্রধান সংবাদপত্রগুলি জাপানের আগ্রাসী নীতিকে সমর্থন করে। চেম্বারলেইনের ধারণা ছিল যে জাপান ইংলণ্ডের সাম্রাজ্যের ক্ষতি করিবে না। কিন্তু চেম্বারলেইনের এই ধারণা ছিল সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। জাপান, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ১৯৪১ খ্রীঃ ছারখার করিয়া দিলে চেম্বারলেইনের নীতির অসারতা প্রমাণিত হয়।

ইতালী তোষণ

ইতালী যাহাতে ন্যাৎসী জার্মানীর সহিত যোগ না দেয় এই আশায় চেম্বারলেইন ইতালীকে তোষণ করেন। ইতালী আন্তর্জাতিক আইন ও লীগের আদর্শ ভাঙিয়া ১৯৩৫ খ্রীঃ আবিসিনিয়া আক্রমণ করে। আবিসিনিয়ার একাংশ ছাড়িয়া দিয়া ইতালীকে শান্ত করার চেষ্টাও তিনি করেন। শেষ পর্যন্ত বিশ্ব জনমতের চাপে লীগ অফ নেশনস ইতালীর বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ ঘোষণা করিলেও ইংলণ্ড লীগের এই সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করার আগ্রহ দেখায় নাই।

১. "It is a sad day for us, none is sadder than me".

অনুরূপভাবে স্পেনের গৃহযুদ্ধের ক্ষেত্রেও ইংলণ্ড হস্তক্ষেপ না করার নাম করিয়া ফ্রাঙ্কোর জয়লাভে পরোক্ষ সহায়তা করে।

রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি ঃ হিটলার ও স্ট্যালিন (Russo-German Non Aggression Pact : Hitler and Stalin) ঃ মিউনিক চুক্তির পর (১৯৩৮ খ্রীঃ) ইওরোপের রাজনীতি দ্রুত পরিবর্তিত হইতে থাকে। মিউনিক চুক্তি পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন জার্মান আগ্রাসনের বিরুদ্ধে পশ্চিমী দেশের সহিত জোট বাঁধিবার চেষ্টা করে। কিন্তু রাশিয়ার এই মিত্রতা নীতিকে অগ্রাহ্য করিয়া ব্রিটিশ প্রধান-মন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেইন জার্মান তোষণ নীতি নেন। জার্মান আগ্রাসনের নিকট নতি স্বীকার করিয়া ইংলণ্ড ও ফ্রান্স মিউনিক চুক্তি সম্পাদন করায় সোভিয়েত নেতা স্ট্যালিনের মনে গভীর হতাশা সৃষ্টি হয়। স্ট্যালিন স্পষ্ট বুঝিতে পারেন যে পশ্চিমী শক্তি রাশিয়ার মিত্রতায় বিশ্বাসী নয়। তাহারা জার্মানীকে, সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে ব্যবহার করিতে চায়। এই পরিস্থিতিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন পশ্চিমী শক্তিগুলির মিত্রতা লাভের আশা ত্যাগ করিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে বাধ্য হয়।

সোভিয়েত পররাষ্ট্র নীতির পরিবর্তনের সূচনা রাশিয়ার বৈদেশিক মন্ত্রী বদলের দ্বারা সূচিত হয়। স্ট্যালিন পশ্চিমপন্থী মন্ত্রী লিট্‌ভিনভকে পদচ্যুত করিয়া পশ্চিম-বিরোধী মলোটোভকে মন্ত্রী পদে নিয়োগ করেন। এদিকে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স তাহাদের জার্মান শোষণ নীতির ব্যর্থতা বুঝিতে পারে। ইংলণ্ডের সতর্কবাণী অগ্রাহ্য করিয়া জার্মানী পোল্যাণ্ড আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি চালায়। এমতাবস্থায় জার্মানীর সহিত পশ্চিমী রাষ্ট্রের যুদ্ধ আসন্ন হইয়া পড়ে। এই সংকট সময়ে চেম্বারলেইন রুশ মৈত্রীর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। কারণ রাশিয়ার মিত্রতা পাইলে জার্মানীকে পূর্ব ও পশ্চিম দুই দিক দিয়া আক্রমণ করা সম্ভব হইত। রুশ মিত্রতা লাভের জন্য ব্রিটিশ সরকার মস্কোতে একটি প্রতিনিধিদল পাঠান। এদিকে কুটবুদ্ধি হিটলার দেখেন যে রাশিয়াকে পশ্চিমী জোট হইতে বিচ্ছিন্ন না করিলে জার্মানী দুই দিক হইতে আক্রান্ত হইবে। এজন্য তিনি রাশিয়ার সহিত অনাক্রমণ চুক্তির প্রস্তাব লইয়া বৈদেশিক মন্ত্রী রিবেনট্রপকে পাঠান।

ইংলণ্ডের রুশ মিত্রতা লাভের চেষ্টা

স্ট্যালিন ইংলণ্ডের জার্মান তোষণ নীতির বিশেষতঃ মিউনিক চুক্তির জন্য খুবই চটিয়াছিলেন। তিনি ইংলণ্ডের মিত্রতা প্রস্তাবের আন্তরিকতা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করিতেন। তাঁহার ধারণা ছিল যে "ইংলণ্ড বাদাম পোড়া খাইলেও আগুন হইতে বাদাম বাহির করিবার জন্য সোভিয়েত রাশিয়াকে ব্যবহার করিতে চায়।"[১] ইংলণ্ডের প্রতিনিধি দল মিত্রতা প্রস্তাব দিলে রুশ মন্ত্রী মলোটোভ ইংলণ্ডকে আগে কতকগুলি শর্ত পূরণ করিবার জন্য চাপ দেন। ইংলণ্ডের প্রতিনিধি দলে মন্ত্রী পর্যায়ের কেহ না থাকায় এই

রুশ নেতাগণের সন্দেহ; জার্মানীর সহিত অনাক্রমণ চুক্তি

---

১. "England wants Russia to pull the chestnut out of fire",

1795

প্রতিনিধি দলের পক্ষে মলোটোভের শর্ত পূরণের ক্ষমতাও ছিল না। সুতরাং মলোটোভের প্রস্তাবের উত্তরে তাহারা নিজ সরকারের মত জানিবার জন্য সময় চায়। ইহাতে ইংলণ্ডের আন্তরিকতা সম্পর্কে রুশ নেতাগণের মনে সন্দেহ হয়। তাঁহারা ব্রিটিশ প্রতিনিধি দলকে অগ্রাহ্য করিয়া জার্মানীর সহিত অনাক্রমণ চুক্তির আলোচনা চালান। শেষ পর্যন্ত নিম্নলিখিত শর্তে রুশ-জার্মান চুক্তি সন্ধি স্থাপিত হয়।

(১) জার্মানী ও সোভিয়েত রাশিয়া আপাততঃ দশ বৎসরের জন্য কেহ কাহাকেও আক্রমণ করিবে না। (২) কোন পক্ষকে তৃতীয় শক্তি আক্রমণ করিলে অপর পক্ষ নিরপেক্ষতা রক্ষা করিবে। (৩) কোন বিরোধী শক্তি জোট এই সন্ধির কোন একটি স্বাক্ষরকারীর বিরুদ্ধে গঠিত হইলে অপর স্বাক্ষরকারী সেই জোটে যোগ দিবে না।[১] (৪) একটি গোপন শর্ত দ্বারা জার্মানী ও রাশিয়ার মধ্যে পোল্যাণ্ড ভাগ করা হয়। (৫) গোপন শর্ত দ্বারা সমগ্র পূর্ব ইওরোপ জার্মানী ও রাশিয়ার মধ্যে বিভক্ত করা হয়।

রুশ-জার্মান চুক্তির সমালোচনা ও ফলাফল

রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি পশ্চিমী দেশগুলির কাছে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত ভয়ানক বিপদরূপে উপস্থিত হয়।[২] এই চুক্তির দ্বারা হিটলার, রাশিয়ার নিরপেক্ষতা লাভ করেন। আসন্ন যুদ্ধে তিনি রুশ আক্রমণের ভয় মুক্ত হইয়া জার্মান সেনাদলকে পুরাপুরি পশ্চিম রণাঙ্গনে নিয়োগের ব্যবস্থা করেন। ফলে জার্মানীর প্রবল চাপে যুদ্ধের প্রথম দিকে মিত্রশক্তির হার হয়। ইংলণ্ড মিউনিক চুক্তি দ্বারা যে ভুল করিয়াছিল রুশ-জার্মান চুক্তির দ্বারা তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। ইংরাজ লেখকগণ রুশ-জার্মান চুক্তিকে "রুশ বিশ্বাসঘাতকতা", "পৃষ্ঠদেশে ছুরিকাঘাত"[৩] করিলেও, যুক্তির বিচারে এই চুক্তি খুব অন্যায় ছিল না। পশ্চিমী দেশগুলির আন্তরিকতা সম্পর্কে রাশিয়ার ঘোর সন্দেহ ছিল। মিউনিক চুক্তির ফলে রাশিয়ার এই সন্দেহ দৃঢ় হয় যে ব্রিটেন জার্মানীকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ব্যবহারের চেষ্টা করিতেছে। সুতরাং জার্মানীর সহিত যুদ্ধের দায়িত্ব না লইয়া নিরপেক্ষ থাকা রাশিয়ার সমীচিন ছিল। দ্বিতীয়তঃ, যুদ্ধের গোড়ার দিকে নিরপেক্ষ থাকিয়া রাশিয়া ভবিষ্যত জার্মান আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য সামরিক প্রস্তুতির সুযোগ পায়। পোল্যাণ্ডের কিছু অংশ পাইয়া রাশিয়া তাহার আত্মরক্ষার বেষ্টনী মজবুত করে। জার্মানীর দিক হইতে এই চুক্তি ছিল খুবই সুবিধাজনক। এই চুক্তির ফলে রাশিয়া নিরপেক্ষ থাকে। ফলে যুদ্ধের গোড়ার দিকে দুইটি রণাঙ্গনে যুদ্ধের দায়িত্ব মুক্ত হইয়া জার্মানী প্রথমে পশ্চিমী ও পরে রাশিয়াকে আক্রমণ করার সুবিধা পায়।[৪] জার্মানী তাহার "একের পর এক নীতি" (one by one policy) খাটাইবার সুযোগ পায়। তবে রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি দ্বারা স্ট্যালিন অপেক্ষা হিটলারের কূটনীতির দক্ষতা বেশী দেখা যায়। কারণ স্ট্যালিন শেষ পর্যন্ত জার্মানীর দ্বারা আক্রান্ত হন।

১. Langsham—World since 1914. P. 755.

২. Ibid.

৩. 'Stab in the back."

৪. Langsham

স্ট্যালিন, হিটলারকে বিশ্বাস করিয়া ভুল করেন। তাছাড়া রাশিয়া আক্রান্ত হইলে পশ্চিমী দেশ রাশিয়ার সাহায্যে আগাইয়া আসে। যদি ১৯৩৯ খ্রীঃ রাশিয়ার সহিত পশ্চিমী দেশের মহা জোট (Grand Alliance) বাঁধা সম্ভব হইত তবে হয়ত বিশ্ব ইতিহাস অন্য খাতে বহিত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ (Origin of the Second World War) ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দুই দশকের মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়। এত কম সময়ের মধ্যে দুইটি বিশ্বযুদ্ধ ঘটা বিস্ময়কর সন্দেহ নাই। অনেকে মনে করেন যে ভার্সাই সন্ধির শর্তাবলীর ত্রুটির জন্যই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘটে। জার্মানী প্রথমাবধি ভার্সাই সন্ধির বিরুদ্ধে ঘোর প্রতিবাদ জানায়। ভার্সাই সন্ধির প্রতি জার্মানীর বিরোধিতা এই সন্ধির পতন ডাকিয়া আনে। ভার্সাই সন্ধিকে জার্মানীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে জার্মানীর উপর চাপাইয়া দেওয়া হয়। বিজয়ী শক্তিবর্গ ভুলিয়া যান যে, স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে বিজয়ী ও বিজিত উভয়ের স্বার্থ সমন্বয় করা দরকার। ভার্সাই সন্ধি ছিল জার্মান জাতির মতে "জবরদস্তি সন্ধি" (Dictated Peace)। ফলে জার্মানী এই সন্ধি পালনের জন্য নৈতিক দায়িত্ব অস্বীকার করে। ভার্সাই সন্ধির শর্তাবলী রচনার সময় মিত্রপক্ষ জার্মানীর ন্যায় বৃহৎ রাষ্ট্রকে বেলজিয়ামের ন্যায় ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের অপেক্ষা কম সেনাদল রাখিতে আদেশ দেন। জার্মানীকে নিরস্ত্রীকৃত করিলেও ইওরোপের অন্যান্য দেশকে নিরস্ত্রীকৃত করা হয় নাই। জার্মানীর উপনিবেশগুলি অধিগ্রহণ করা হইলেও অন্যান্য দেশের উপনিবেশে হস্তক্ষেপ করা হয় নাই। এই বৈষম্যমূলক নীতি জার্মান জাতির মনে গভীর অসন্তোষ সৃষ্টি করে। তাছাড়া ভার্সাই সন্ধি দ্বারা জার্মানীর উপর যে ক্ষতিপূরণের বোঝা চাপাইয়া দেওয়া হয় জার্মানী তাহাতে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। ক্ষতিপূরণ লইয়া জার্মানীর সহিত ফ্রান্সের বিরোধ বাধে। এইভাবে ভার্সাই সন্ধি আন্তর্জাতিক অশান্তি সৃষ্টি করে। নাৎসীদল ক্ষমতায় আসিয়া ভার্সাই সন্ধি ভঙ্গের কাজে হাত দেয়। এইভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পথ পরিষ্কার হয়।

ভার্সাই সন্ধির বিরুদ্ধে জার্মানীর অভিযোগ

ভার্সাই সন্ধি রচনার সময় জার্মান-পোল সীমান্ত ও জার্মান-চেক সীমান্তের ক্ষেত্রে অনাবশ্যক জটিলতা সৃষ্টি করা হয়। সন্ধি রচয়িতাগণ স্থানীয় সমস্যা সম্পর্কে তদন্ত কমিশনের রিপোর্টগুলি ভালভাবে না পড়িয়া সন্ধি রচনা করেন। ফলে সীমান্ত গঠনের ক্ষেত্রে বহু গোলযোগ দেখা দেয়। জার্মান অধ্যুষিত সুদেতেন জেলা যদি চেকোশ্লোভাকিয়ার ভিতর না ঢুকান হইত তবে হয়ত ভবিষ্যতে মিউনিক চুক্তি না হইতেও পারিত। সমানভাবে পূর্ব ও পশ্চিম প্রাশিয়ায় গণভোট গ্রহণ করিয়া জার্মান অধ্যুষিত পশ্চিম প্রাশিয়া ও পোজেন পোল্যান্ডকে ফিরাইয়া দিলে জার্মানীর সহিত পোল্যান্ডের বিরোধ দেখা দেয়।

সীমান্ত সমস্যা

ঐতিহাসিক ল্যাংসামের মতে "১৯১৯ খ্রীঃ শান্তি চুক্তির দ্বারা জার্মানীর প্রতিবেশী রাজ্যগুলিকে ক্ষুদ্র ও দুর্বল করিয়া গড়ার ফলে জার্মানীর পক্ষে সহজে চুক্তি ভাঙিয়া

প্রতিবেশী দেশকে গ্রাস করা সহজ হয়।"[১] ডেভিড টমসনও অনুরূপ মন্তব্য করিয়া বলিয়াছেন যে রাশিয়া, জার্মানী ও হ্যাপসবার্গ এই তিনটি সাম্রাজ্য ভাঙিয়া শান্তি চুক্তির দ্বারা কয়েকটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র গড়া হয়। এই রাষ্ট্রগুলির না ছিল প্রাকৃতিক সীমারেখা, না ছিল আত্মরক্ষার শক্তি। ফলে জার্মানী ও রাশিয়া উভয়ের পক্ষে এই দেশগুলিকে গ্রাস করা সহজ হয়। ভার্সাই সন্ধি দ্বারা অঙ্কিত ইওরোপের রাজনৈতিক মানচিত্র মোটেই পাকাপোক্ত ছিল না।

রাজনৈতিক মানচিত্রের দুর্বলতা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য নাৎসী জার্মানীর আগ্রাসী নীতিকে প্রধানতঃ দায়ী করা হয়। একথা সত্য যে হিটলার ভার্সাই সন্ধির দ্বারা জার্মানীর উপর অন্যায় ব্যবহারের অজুহাতে তাঁহার আগ্রাসী নীতি চালান। তিনি আন্তর্জাতিক ন্যায়-নীতি ও চুক্তিগুলিকে জলাঞ্জলি দিয়া নিজের দেওয়া প্রতিশ্রুতি নিজেই ভাঙিয়া আন্তর্জাতিক অরাজকতা সৃষ্টি করেন। ছলে বলে কৌশলে একের পর এক দেশ তিনি গ্রাস করেন। মিউনিক চুক্তি সম্পাদনের সময় তিনি বলেন যে তাঁহার আর কোন সীমান্ত সমস্যা নাই। ইওরোপের নিকট তাঁহার আর কোন ভৌগোলিক দাবী নাই। কিন্তু অচিরকালের মধ্যে তিনি পুনরায় আগ্রাসী নীতির অনুসরণ করেন। ইহার ফলে পশ্চিমী দেশগুলি শেষ পর্যন্ত বাধ্য হইয়া তাঁহাকে বাধা দিতে আগাইয়া আসে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য জার্মানীর দায়িত্ব

উইনষ্টন চার্চিল প্রভৃতি ঐতিহাসিকের মতে নাৎসী জার্মানীর আগ্রাসী নীতিই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য প্রধানতঃ দায়ী ছিল। হিটলার নিজ শক্তিমত্তায় মোহিত হইয়া জার্মানীকে ইওরোপ তথা বিশ্বের প্রধান ও একচ্ছত্র শক্তিতে পরিণত করার স্বপ্ন দেখেন। তিনি জানিতেন যে অস্ত্র প্রতিযোগিতায় জার্মানী ১৯৩৯ খ্রীঃ পশ্চিমী দেশ ও রাশিয়া অপেক্ষা অন্ততঃ পাঁচ বৎসর আগাইয়াছিল।[২] সুতরাং জার্মানীর দুর্বার সামরিক শক্তিকে প্রতিহত করা কাহারও সাধ্য ছিল না। তিনি ইওরোপে জার্মানীর সাম্রাজ্য স্থাপন করিবার পর ইওরোপের বাহিরে উপনিবেশ দখলের পরিকল্পনা করেন। অক্ষশক্তি গঠন করিয়া তিনি আফ্রিকায় ইতালীয় সাম্রাজ্যবাদ এবং এশিয়ায় জাপানী সাম্রাজ্যবাদ প্রসারের কাজে হাত মেলান। জার্মানী এইভাবে ইতালী ও জাপানের সাহায্যে ইঙ্গ-ফরাসী উপনিবেশ ধ্বংস করিয়া এবং ইওরোপের যুদ্ধে পশ্চিমী দেশগুলিকে পদানত করিয়া বিশ্বে শ্রেষ্ঠস্থান লাভের চেষ্টা করে। নাৎসী নেতা হিটলার ছিলেন অত্যন্ত উগ্র জাতীয়তাবাদী, গর্বিত, ক্রূর ও নিষ্ঠুর। মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধকে তিনি হেয়জ্ঞান করিতেন। জার্মানীর উপর তিনি যে নিষ্ঠুর ও একনায়কতন্ত্র স্থাপন করেন তাহা সারা পৃথিবীতে স্থাপন করিয়া তিনি বিশ্বকে শাসন করিবার স্বপ্ন দেখেন। জার্মান চিন্তাবিদ কার্ল হসোফারের (Karl Hausofar) "ভৌগোলিক রাজনীতির" (Geo-politics) ভুল ব্যাখ্যায় বিশ্বাস করিয়া

১. Langsham—World since 1914. P. 727.
২. Allan Bullock—Hitler—A study in Tyrrany.

তিনি জার্মান জাতির শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে বদ্ধমূল ধারণা করেন। মার্কসবাদী লেখকগণও হিটলারের আগ্রাসী নীতিকে যুদ্ধের জন্য দায়ী করেন।

একথা সত্য যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য নাৎসীবাদ ও নাৎসী নেতা এডলফ হিটলারের আগ্রাসী নীতি বিশেষ দায়ী ছিল। কিন্তু ইওরোপের অন্যান্য শক্তিগুলিও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য কম দায়ী ছিল না।

মিত্রশক্তির দায়িত্ব

ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের অদূরদর্শী নীতি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য দায়ী ছিল। যদি মিত্র-শক্তি জার্মানীর ভাইমার প্রজাতন্ত্রের উপর ভার্সাই সন্ধি স্থাপনে জবরদস্তি না করিত তবে ভাইমার প্রজাতন্ত্রের পতন না ঘটিতেও পারিত। ভাইমার প্রজাতন্ত্রকে ক্ষতিপূরণ দানে বাধ্য করিয়া মিত্রশক্তি ইহার আর্থিক ভিত্তি নষ্ট করিয়া দেয়। ভাইমার প্রজাতন্ত্রের পতনের ফলেই নাৎসী দল ক্ষমতায় আসে।[১]

ইঙ্গ-ফরাসী বিরোধের ফল

ইঙ্গ-ফরাসী শক্তিদ্বয় ছিল লীগ অফ নেশনসের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। তাহাদের ঐক্য ও সমর্থনের উপরেই ইওরোপের স্থিতাবস্থা নির্ভরশীল ছিল। যদি এই দুই শক্তি লীগকে জোরদার করিত তবে লীগ আগ্রাসী রাষ্ট্র-গুলিকে শাসন করিতে সক্ষম হইত। কিন্তু ১৯১৯ খ্রীঃ পর ইঙ্গ-ফরাসী শক্তির মতভেদ ও ভিন্নমুখী বৈদেশিক নীতি লীগ অফ নেশনসকে দুর্বল করিয়া দেয়। ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেইন জার্মানীর প্রতি তোষণ নীতির (Consession Policy) পক্ষপাতী ছিলেন। অপরদিকে ফ্রান্স ভার্সাই সন্ধিকে রক্ষা করিয়া নিজ নিরাপত্তা বাড়াইতে আগ্রহী ছিল। ইংলন্ড এই বিষয়ে ফ্রান্সের সহিত একমত না হইলে উভয় রাষ্ট্রের মতবিরোধ দেখা দেয়। ফ্রান্স চাহিত জার্মানীর নিরস্ত্রীকরণ। ১৯৩৫ খ্রীঃ এক চুক্তি দ্বারা ইংলণ্ড জার্মানীর আংশিক অস্ত্রসজ্জায় অনুমোদন দিলে ইঙ্গ-ফরাসী মতভেদ তীব্র হয়। জার্মানী ইঙ্গ-ফরাসী বিরোধের সুযোগ লইয়া আপন শক্তি বাড়াইতে থাকে।

ইংলণ্ডের তোষণ নীতি

ইংলণ্ডের জার্মান তোষণ নীতি বিশ্বযুদ্ধকে ত্বরান্বিত করে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেইন রুশ কমিউনিজমের ভয়ে নাৎসী জার্মানীকে তোষণ (Appeasement Policy) করেন। ফলে জার্মানীর অস্ত্রসজ্জা, লোকার্ণো চুক্তি ভঙ্গ, রাইনল্যান্ড অধিকার, অষ্ট্রিয়া অধিকার প্রভৃতি আগ্রাসী নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না করিয়া তিনি চোখ বুজাইয়া থাকেন। এমন কি মিউনিক চুক্তির সোনার থালায় তিনি চেকোশ্লাভাকিয়ার স্বাধীনতাকে হিটলারের নিকট ডালি দেন।[২] ইংলণ্ডের সহায়তা পাইয়া হিটলার একের পর এক রাজ্য গ্রাস করেন। তাঁহার ধারণা হয় যে ইংলণ্ড শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে সাহায্য দিবে। ইংলণ্ডের এই অদূরদর্শী নীতির ফলে ফ্রান্স বা রাশিয়ার পক্ষে জার্মানীকে সংযত করা সম্ভব হয় নাই।

---

১. Langsham—World since 1914.

২. Frederick Hartman—Relations of Nations.

হিটলারের ভয় ছিল যে যুদ্ধ বাধিলে তিনি পূর্বদিকে রাশিয়া ও পশ্চিম দিকে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের দ্বারা আক্রান্ত হইবেন। কিন্তু রুশ-জার্মানী চুক্তি দ্বারা রাশিয়া নিরপেক্ষ হইলে হিটলারের হাত শক্ত হয়। তিনি নির্ভয়ে পোল্যাণ্ড আক্রমণ ও ফ্রান্স-বেলজিয়াম আক্রমণ করিতে সক্ষম হন। যদি সোভিয়েত নেতাগণ নিরপেক্ষ না থাকিয়া জার্মানীর দ্বারা ফ্রান্স আক্রমণের সময় পশ্চিমী শক্তির পাশে দাঁড়াইতেন তবে জার্মানী বিপর্যস্ত হইয়া পড়িত।

ফ্যাসিষ্ট ইতালীর সাম্রাজ্যবাদ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য ফ্যাসিস্ট ইতালীরও দায়িত্ব ছিল। ইতালী ১৯৩৫ খ্রীঃ আবিসিনিয়া আক্রমণ করিয়া লীগ অফ নেশনসের পতনের সূচনা করে। ইতালী তাহার ঔপনিবেশিক স্বার্থ রক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক আইন জলাঞ্জলি দেয়। ইতালী নাৎসী জার্মানীর সহিত অক্ষ চুক্তি স্থাপন করিয়া ইওরোপে শক্তিসাম্য ভাঙিয়া দেয় এবং ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ঘোর শত্রুতা চালায়। ১৯৪০ খ্রীঃ ইতালী ফ্রান্সকে আক্রমণ করে।

আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষার জন্য লীগ অফ নেশনসের বিশেষ দায়িত্ব ছিল। কিন্তু লীগের প্রধান সভ্যগণের স্বার্থপরতা এবং লীগের আদর্শের প্রতি উদাসীনতা লীগ অফ নেশনসকে একটি বাকযুদ্ধের ক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছিল। জাপানের মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ, ইতালীর আবিসিনিয়া আক্রমণ লীগের মর্যাদা বিনষ্ট করে। ফলে হিটলার লীগের ভয় না করিয়া আক্রমণবাদী সম্প্রসারণের নীতি গ্রহণ করেন।

লীগের অকার্য-কারিতা

এছাড়া ধনতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি বিশ্বের বাজার ও উপনিবেশ একচেটিয়া দখলে রাখার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ে। জার্মানী যাহাতে ইংলণ্ডের ঔপনিবেশিক স্বার্থে আঘাত না করে এজন্য ইংলণ্ড যে কোন মূল্যে জার্মানীকে শান্ত রাখিবার চেষ্টা করে। কিন্তু ইংলণ্ডের সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাপান ও ইতালীর ক্ষোভ ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সুযোগে ইতালী আফ্রিকায় ইঙ্গ-ফরাসী সাম্রাজ্য আক্রমণ করে। জাপান এশিয়ায় মালয় ও ব্রহ্মে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আক্রমণ করে। এদিকে ইওরোপে জার্মানী পোল্যাণ্ড গ্রাস করিয়া ফ্রান্স ও বেলজিয়াম আক্রমণ করে। সাম্রাজবাদী স্বার্থ এই যুদ্ধকে ত্বরান্বিত করে।

ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ ছিল হিটলারের পোল্যাণ্ড আক্রমণ। ভার্সাই সন্ধি দ্বারা জার্মানী-পোল্যান্ডের মধ্যে অনেকগুলি ভৌগোলিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। হিটলার পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা রক্ষায় ইচ্ছুক ছিলেন না। সুতরাং তিনি ১৯৩৯ খ্রীঃ পোল্যাণ্ড আক্রমণ করার উদ্যোগ করেন। এদিকে পশ্চিমী শক্তিগোষ্ঠী পোল্যাণ্ডকে রক্ষার জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল। হিটলার পশ্চিমী শক্তির এই হুঁশিয়ারী অগ্রাহ্য করেন। ১৯৩৯ খ্রীঃ ১লা সেপ্টেম্বর জার্মান সেনা পোল্যান্ড আক্রমণ করিলে, ৩রা সেপ্টেম্বর ইংলণ্ড ও ফ্রান্স জার্মানীকে সন্ধিভঙ্গের জন্য দায়ী করিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করে। এইভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়।

পোল্যাণ্ড আক্রমণ

———

Model Questions (প্রশ্নাবলী)

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

১। টীকা লিখঃ প্যারিসের সন্ধি।

২। ১৭৬৩ খ্রীঃ অর্থাৎ প্যারিসের সন্ধির পর ইওরোপের রাজনৈতিক অবস্থার বর্ণনা দাও।

৩। সপ্তবর্ষের যুদ্ধের পর ইওরোপের রাজনৈতিক অবস্থার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

৪। ১৭৬৩ খ্রীঃ ঐতিহাসিক তাৎপর্য কি ?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১। এক কথায় উত্তর দাওঃ

(ক) পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে ইহা কে আবিষ্কার করেন ? (খ) মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কে আবিষ্কার করেন ? (গ) রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া কে আবিষ্কার করেন ? (ঘ) স্পিরিট অফ ল কাহার রচনা ? (ঙ) ভলতেয়ার কে ছিলেন ? (চ) সোসিয়েল কনট্রাক্ট কাহার রচনা ? (ছ) এ্যাডাম স্মিথের রচনার নাম কি ? (জ) গিবন কে ছিলেন ও তাঁহার বিখ্যাত রচনার নাম কি ?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাওঃ

(ক) অনুতাপময় রাজতন্ত্র কি ? (খ) ইওরোপের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানদীপ্ত শাসক কাহাকে বলা হয় ?

৩। জ্ঞানদীপ্তি বলিতে কি বুঝ ? ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে কি জান ? ইহার ফলাফল কি ?

৪। আলোকপ্রাপ্ত স্বৈরতন্ত্র কাহাকে বলে ? দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের জ্ঞানদীপ্ত সংস্কার সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৫। দ্বিতীয় যোসেফ ও দ্বিতীয় ক্যাথারিনের জ্ঞানদীপ্ত সংস্কার আলোচনা কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১। এক কথায় উত্তর দাওঃ

(ক) ফ্লায়িং শাটল বা 'উড়ন্ত মাকু' কে আবিষ্কার করেন ? (খ) স্পিনিং জেনির আবিষ্কর্তার নাম কি এবং কোন খ্রীঃ ইহা আবিষ্কৃত হয়। (গ) প্রথম বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের আবিষ্কর্তার নাম কি এবং কোন খ্রীঃ ইহা আবিষ্কৃত হয় ? (ঘ) সেফটি ল্যাম্প কে আবিষ্কার করেন ? (ঙ) প্রথম বাষ্পচালিত রেল ইঞ্জিনের নির্মাতা কে এবং কোন সালে ইহা আবিষ্কৃত হয় ?

২। অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দাওঃ

(ক) শিল্প-বিপ্লবের আগের উৎপাদন ব্যবস্থা কি ছিল ? (খ) বৃহৎ শিল্প ও কুটির শিল্পের তফাৎ কি ? (গ) বাষ্প ইঞ্জিন আবিষ্কারের প্রতিক্রিয়া কি ? (ঘ) রেল ইঞ্জিন আবিষ্কারের ফল কি ? (ঙ) লাডাইট দাঙ্গা কাহাকে বলে এবং ইহা কেন হয় ? (চ)

শিল্প-বিপ্লবের ফলে কুটির শিল্প ও গ্রাম-জীবনের কিরূপ অবস্থা হয় ? (ছ) শিল্প-বিপ্লবের ফলে শ্রমিকের কি অবস্থা হয় ? (জ) পুঁজিবাদ কিভাবে শিল্প বিপ্লবে বাড়ে ? (ক) চার্টিস্ট আন্দোলন কেন হয় ? (ঞ) সমাজতন্ত্র কি ?

৩। শিল্প-বিপ্লব কাহাকে বলে ? সমসাময়িক সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার উপর ইহার প্রতিক্রিয়া আলোচনা কর।

৪। শিল্প-বিপ্লবের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর। ইংলণ্ডের প্রথম শিল্প বিপ্লব আরম্ভ হইবার কারণ কি ?

৫। মানব সভ্যতার উপর শিল্প-বিপ্লবের প্রতিক্রিয়ার বিবরণ দাও।

৬। শিল্প-বিপ্লবের গোড়ার দিকে শ্রমিকের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন কিরূপ ছিল ?

তৃতীয় অধ্যায়

১। এক কথায় উত্তর দাও ঃ

(ক) জেমস ওটিস কে ছিলেন ? তাঁহার বিখ্যাত মন্তব্য কি ? (খ) তিন পেনী কর কোন মন্ত্রীসভা ধার্য করেন ? (গ) বোষ্টন চা পার্টি কোন খ্রীঃ হয় ? (ঘ) আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র কোন খ্রীঃ এবং কোথায় ঘোষিত হয় ? (ঙ) কে আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র রচনা করেন ? (চ) টম পেইনের বিখ্যাত রচনাটির নাম কি ? (ছ) জর্জ ওয়াশিংটন কে ছিলেন ? (জ) বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন কে ছিলেন ?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ

(ক) মার্কাণ্টাইল মতবাদ কি ? (খ) নেভিগেশন আইন কি ? (গ) ষ্ট্যাম্প আইন কি ? (ঘ) বোষ্টন চা পার্টি কি ? (ঙ) ফিলাডেলফিয়া কংগ্রেস কি ? (চ) আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের মর্ম কি ?

৩। আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল সম্বন্ধে কি জান ?

৪। ইংলণ্ড ও তাহার উত্তর আমেরিকার উপনিবেশগুলির মধ্যে যুদ্ধের কারণ কি ? (1978)

৫। আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধে ঔপনিবেশিকগণের সাফল্যের কারণ সম্বন্ধে কি জান ? (1979)

৬। আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

চতুর্থ অধ্যায়
প্রথম পরিচ্ছেদ

১। এক কথায় উত্তর দাও ঃ

(ক) "রাজাই হইলেন রাষ্ট্র" ইহা কে বলেন ? (খ) "আমার মৃত্যুর পর মহাপ্রলয় হইবে" ইহা কাহার উক্তি ? (গ) ফ্রান্সের কোন রাজবংশীয় কোন রাজা গিলোটিনে প্রাণ দেন ? (ঘ) টুর্গো কে ছিলেন ? (ঙ) লেটারস ডি কেশেট কাহাকে বলে ? (চ) 'স্পিরিট অফ ল' কাহার রচনা ? (ছ) সোসিয়েল কণ্ট্রাক্ট কাহার রচনা ? (জ) ডি এলেম-

বার্ট কে ছিলেন ? (ঝ) ফ্রান্সে জাতীয় সভা কবে আহূত হয় ? (ঞ) টেনিস কোর্টের
শপথনামা কবে নেওয়া হয় ? (ট) বাস্তিল দুর্গের কবে পতন হয় ? (ঠ) "ব্যক্তি ও
নাগরিকের অধিকারপত্র" কবে ঘোষিত হয় ? (ড) "ধর্মযাজকগণের সংবিধান" কবে পাকা
হয় ? (ঢ) ফ্রান্সে প্রথম বিপ্লবী সংবিধান কবে পাশ হয় ? (ণ) জিরণ্ডিষ্ট কাহাকে
বলে ? (ত) ফ্রান্সে প্রথম প্রজাতন্ত্র কবে ঘোষিত হয় ? (থ) ব্রান্সউইক ম্যানিফেস্টো কে
ও কবে ঘোষিত হয় ? (দ) ষোড়শ লুইয়ের কবে প্রাণদণ্ড হয় ? (ধ) গিলোটিন কি
এবং কে আবিষ্কার করেন ? (ন) ভ্রাতৃত্বের ঘোষণা কি ? (প) জননিরাপত্তা সমিতি
কি ? (ফ) ডাণ্টন কে ছিলেন ? (ব) ক্যাম্পোফার্মিওর সন্ধি কবে স্বাক্ষরিত হয় ?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ

(ক) টুর্গোর সংস্কার কি ছিল ? (খ) অভিজাতগণের বিশেষ অধিকার বলিতে কি
বুঝায় ? (গ) ফ্রান্সে মধ্যবিত্ত শ্রেণী কেন অসন্তুষ্ট ছিল ? (ঘ) ফরাসী বিপ্লবের
সামাজিক কারণ কি ? (ঙ) রুশো ও মন্তেস্কুর মতবাদ কি ? (চ) ফ্রান্সেই কেন বিপ্লব
হয় ? (ছ) মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিদ্রোহ কিভাবে ঘটে ? (জ) টেনিস কোর্টের শপথনামার
বর্ণনা দাও। (ঝ) ব্যক্তি ও নাগরিকের অধিকারগুলি কি ? (ঞ) জিরণ্ডিষ্ট দলের কার্য-
কলাপ কি ছিল ? (ট) সন্ত্রাসের রাজত্ব বলিতে কি বুঝায় ? (ঠ) সন্ত্রাসের রাজত্ব
কিভাবে গঠিত হয় ? (ড) জ্যাকোবিন দলের সংস্কারগুলি কি ছিল ? (ঢ) ডাইরেক্টরীর
আভ্যন্তরীন নীতি কি ছিল ? (ণ) রোবসপিয়েরের কৃতিত্ব আলোচনা কর।

৩। ফরাসী দার্শনিকগণের মতবাদ আলোচনা কর এবং ফরাসী বিপ্লবের পশ্চাতে তাহাদের প্রভাব উল্লেখ কর।

অথবা, ফরাসী বিপ্লবের পশ্চাতে দার্শনিকগণের প্রভাব কি ছিল ?

৪। ফরাসী বিপ্লবের কারণগুলি বর্ণনা কর। (1978)

অথবা, ১৭৮৯ খ্রীঃ ফ্রান্সে বিপ্লব ঘটিল কেন তাহা ব্যাখ্যা কর।

৫। সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যগুলি ১৭৮৯ খ্রীঃ ফরাসী বিপ্লবের জন্য কতখানি দায়ী ছিল ?

৬। ফরাসী বিপ্লবের অর্থনৈতিক কারণগুলি কি ছিল ?

৭। ফরাসী বিপ্লব রাজনৈতিক অথবা সামাজিক কারণে ঘটে তাহা ব্যাখ্যা কর। ফ্রান্সেই কেন বিপ্লব হয় ?

৮। ফরাসী বিপ্লবের জন্য পঞ্চদশ ও ষোড়শ লুই দায়ী ছিলেন কিনা আলোচনা কর।

৯। ১৭৮৯—১৭৯৫ খ্রীঃ পর্যন্ত ফরাসী বিপ্লবের অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

১০। ন্যাশন্যাল কনভেনশনের শাসনকালের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর। (1979)

১১। জাতীয় পরিষদের কার্যাবলী বর্ণনা কর।

১২। সন্ত্রাসের রাজত্ব ও উহার গুরুত্ব আলোচনা কর।

অথবা, সন্ত্রাসের রাজত্ব কেন দরকার হয় ? ইহার পক্ষে ও বিপক্ষে সমালোচনা কর।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১। এক কথায় উত্তর দাও ঃ

(ক) নেপোলিয়নের জন্ম কোন খ্রীঃ এবং কোন দেশে হয় ? (খ) ক্যাম্পোফর্মিওর সন্ধি কাহাদের মধ্যে হয় ? (গ) কোন খ্রীঃ কনসুলেট স্থাপিত হয় অথবা ডাইরেক্টরীর পতন ঘটে ? (ঘ) প্রথম কনসাল কে ছিলেন ? (ঙ) কোন খ্রীঃ নেপোলিয়ন সম্রাট পদ লাভ করেন ? (চ) কোড নেপোলিয়ন কি এবং কাহার দ্বারা গঠিত হয় ? (ছ) ব্যাঙ্ক অফ ফ্রান্স কে স্থাপন করেন ? (জ) কনকর্ডাট কে প্রচলন করেন এবং কোন খ্রীঃ ? (ঝ) কোন খ্রীঃ কে 'নেপোলিয়নের যুগ' বলা হয় ? (ঞ) এ্যামিয়েন্সের সন্ধি কবে ও কাহাদের মধ্যে স্থাপিত হয় ? (ট) তৃতীয় শক্তিজোট কাহাদের মধ্যে গঠিত হয় এবং কাহার বিরুদ্ধে ? (ঠ) ট্রাফালগারের যুদ্ধ কোথায় ঘটে এবং ইহা কি ধরণের যুদ্ধ ছিল এবং ইহাতে ইংরাজ সেনাপতি কে ছিলেন ? (ড) জেনার যুদ্ধে কে পরাজিত হয় ? (ঢ) টিলসিটের সন্ধি কবে এবং কাহাদের মধ্যে স্থাপিত হয় ? (ণ) মহাদেশীয় প্রথা কে চালু করেন ? (ত) স্পেনের যুদ্ধে ইংরাজ সেনাপতি কে ছিলেন ? (থ) বোরোডিনের যুদ্ধ কোথায় ঘটে ? (দ) লাইপজিগের যুদ্ধ কবে এবং কোথায় অনুষ্ঠিত হয় ? (ধ) ওয়াটারলুর যুদ্ধ কবে এবং কোথায় ঘটে এবং ইহাতে কে পরাস্ত হন ? (ন) "স্পেনের ক্ষত আমাকে ধ্বংস করে" ইহা কাহার উক্তি ? (প) বার্লিন ডিক্রী কোন খ্রীঃ আরম্ভ হয় ?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ

(ক) কনসুলেটের গঠন ও উহার বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর। (খ) নেপোলিয়নকে বিপ্লবের ধ্বংসকারী কেন বলা হয় ব্যাখ্যা কর। (গ) নেপোলিয়নের শাসন সংস্কারে সাম্যনীতি কিভাবে প্রযুক্ত হয় দেখাও। (ঘ) নেপোলিয়নের রাজ্য জয়ের উদ্দেশ্য কি ছিল ? (ঙ) মহাদেশীয় প্রথা কি এবং কিভাবে প্রযুক্ত হয় ? (চ) মহাদেশীয় প্রথার ফলে ইংলণ্ড কি পাল্টা ব্যবস্থা নেয় ? (ছ) স্পেনের যুদ্ধের ফলাফল কি ছিল ? (জ) নেপোলিয়নের মস্কো অভিযানের ফলাফল কি ছিল ? (ঝ) নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যের কি দুর্বলতা ছিল ? (ঞ) জার্মানী ও ইতালীকে নেপোলিয়ন কিভাবে পুনর্গঠন করেন। (ট) নেপোলিয়নের সহিত রাশিয়ার কেন বিবাদ বাধে এবং তাহার কি ফল হয় ? (ঠ) স্পেনের যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল কি ? (ড) নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যের কি দুর্বলতা ছিল ?

৩। শাসক ও বিজেতা হিসাবে নেপোলিয়নের কৃতিত্ব আলোচনা কর।

৪। নেপোলিয়নের সহিত যুদ্ধে ইংলণ্ডের ভূমিকা বর্ণনা কর। (1979)

৫। সংস্কারক হিসাবে প্রথম নেপোলিয়নের কার্যাবলী বর্ণনা কর।

অথবা, সংস্কারকরূপে নেপোলিয়নের ভূমিকা কি ছিল ?

৬। নেপোলিয়নকে "বিপ্লবের সন্তান" বা "বিপ্লবের উত্তরাধিকারী" বলা যায় কিনা আলোচনা কর।

৭। প্রথম কনসাল হিসাবে নেপোলিয়ন কিভাবে বিপ্লবের আদর্শ রূপায়িত করেন ?

৮। নেপোলিয়ন বোনাপার্টের পতনের কারণসমূহ বর্ণনা কর।

অথবা, নেপোলিয়নের পতনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৯। নেপোলিয়ন কিভাবে সম্রাট হইয়াছিলেন ? তাঁহার সংস্কারগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। (1978)

১০। ফরাসী বিপ্লবের সুদূরপ্রসারী ও ঐতিহাসিক ফল কি ছিল ? (1979)

অথবা, স্বাধীনতা ও সাম্যের প্রতি নেপোলিয়নের প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা কর।

১১। ফরাসী বিপ্লবের কারণ কি ? ফরাসী অভিজাত অথবা ফরাসী মধ্যবিত্ত কোন শ্রেণী বিপ্লবের পথ রচনা করে। যুক্তিসহ আলোচনা কর।

পঞ্চম অধ্যায়

১। এক কথায় উত্তর দাও ঃ

(ক) কোন খ্রীঃ ভিয়েনা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ? (খ) 'নেপোলিয়ন বিজেতা' কাহাকে বলা হইত ? (গ) ন্যায্য অধিকার নীতি কোন সম্মেলনে গৃহীত হয় ? (ঘ) প্যারিসের দ্বিতীয় চুক্তির ফলে ফ্রান্সের সিংহাসনে কোন রাজবংশের কে বসেন ? (ঙ) ভিয়েনা চুক্তিতে জার্মানীকে কয় ভাগ করা হয় ? (চ) ভিয়েনা চুক্তিতে পোল্যাণ্ডকে কি ভাবে ভাগ করা হয় ? (ছ) ইওরোপের ইতিহাসের কোন সময়কে "মেটারনিকের যুগ" বলা হয় ? (জ) "রাজত্ব করুন, পরিবর্তন স্বীকার করিবেন না" একথা কে বলেন ? (ঝ) কার্লসবাড ডিক্রী কি ? (ঞ) প্রটোকোল অফ ট্রপো কাহার রচনা ? (ট) পবিত্র চুক্তি কে রচনা করেন এবং কোন খ্রীঃ ইহা ঘোষিত হয় ? (ঠ) চতুঃশক্তি সন্ধি কে রচনা করেন, কাহারা ইহাতে অংশ নেয় ? (ড) মনরো নীতি কোন খ্রীঃ কাহার দ্বারা ঘোষিত হয় ?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ

(ক) ভিয়েনা সম্মেলনে ন্যায্য অধিকার নীতি কিভাবে প্রযুক্ত হয় ? (খ) শক্তিসাম্য নীতি ফ্রান্সের বিরুদ্ধে কিভাবে প্রযুক্ত হয় তাহা দেখাও। (গ) ইওরোপের ইতিহাসে মেটারনিকের ভূমিকা কি ছিল ? (ঘ) মেটারনিকতন্ত্র বলিতে কি বুঝায় ? (ঙ) মেটারনিকের পতনের কারণ কি ? (চ) পবিত্র চুক্তি কি ছিল ? (ছ) ট্রপোর বৈঠকে কি করা হয় ? (জ) মনরো নীতি কাহাকে বলে ?

৩। ভিয়েনা বন্দোবস্ত সম্পর্কে কি জান ? ভিয়েনা বন্দোবস্তের প্রতিনিধিবর্গ কি নীতির দ্বারা এই বন্দোবস্ত করেন ?

অথবা, ভিয়েনা কংগ্রেসে ইওরোপের যে পুনর্গঠন হয় তাহার বিবরণ দাও। ভিয়েনা সম্মেলনে কি কি নীতি অনুসরণ করা হয় ?

৪। ১৮১৫ খ্রীঃ ভিয়েনা বন্দোবস্তের প্রধান শর্তগুলি কি কি ছিল ? এই বন্দোবস্তের কি কি ত্রুটি ছিল ?

৫। ভিয়েনা বন্দোবস্তের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর। ইহা কেন ব্যর্থ হয় ?

৬। মেটারনিকতন্ত্র কি ? উহা ইওরোপে কিভাবে কার্যকরী হয় তাহা আলোচনা কর।

৭। মেটারনিকের যুগ বলিতে কি বুঝায় ? মেটারনিকের মতবাদের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি দেখাও।

৮। ইওরোপীয় শক্তি সমবায়ের কার্যকারিতা কি ছিল ?

৯। ইওরোপীয় শক্তি সমবায় কেন বিফল হয় ?

ষষ্ঠ অধ্যায়

১। এক কথায় উত্তর দাও ঃ

(ক) নেপোলিয়নের পতনের পর ফ্রান্সের সিংহাসনে কোন রাজবংশ বসে ? (খ) অষ্টাদশ লুইয়ের পর কে কোন খ্রীঃ ফরাসী সিংহাসনে বসেন ? (গ) শ্বেত সন্ত্রাস কবে এবং কোথায় হয় ? (ঘ) উগ্র রাজপন্থী দলে ফ্রান্সের কোন শ্রেণী ছিল ? (ঙ) জুলাই অর্ডিন্যান্স কে জারী করেন ? (চ) জুলাই রাজতন্ত্র কোন রাজবংশের শাসনকে বলা হয় ? (ছ) লুই ফিলিপ কোন বিপ্লবে সিংহাসন পান এবং কোন বিপ্লবে সিংহাসন হারান ? (জ) "ফ্রান্স ক্লান্ত ও বিরক্ত" ইহা কাহার উক্তি এবং কাহার সম্পর্কে এই উক্তি করা হয় ? (ঝ) লুই ফিলিপের প্রিয় মন্ত্রীর নাম কি ছিল ? (ঞ) ফিলকে হেটাইরিয়া কি ? (ট) ন্যাভারিনোর যুদ্ধ কোন খ্রীঃ হয় ? (ঠ) এ্যাড্রিয়ানোপলের সন্ধি কোন খ্রীঃ হয় ?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ

(ক) অষ্টাদশ লুই ও দশম চার্লসের নীতির কি পার্থক্য ছিল ? (খ) ফ্রান্সে জুলাই বিপ্লবের ফল কি ছিল ? (গ) জুলাই রাজতন্ত্রের আভ্যন্তরীন নীতি কি ছিল ? (ঘ) গ্রীক জাতীয়তাবাদের কেন উদ্ভব হয় ?

৩। ১৮৩০ খ্রীঃ জুলাই বিপ্লবের কারণ নির্ণয় কর। (1978)

৪। ফ্রান্সে ১৮৪৮ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের কারণ ও ফলাফল কি ছিল ?

৫। গ্রীসের স্বাধীনতা যুদ্ধের কারণ ও গুরুত্ব বিচার কর।

সপ্তম অধ্যায়

১। এক কথায় উত্তর দাও ঃ

(ক) ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেণ্ট কবে, কোথায় এবং কেন আহূত হয় ? (খ) "বিপ্লবী জাতীয়তাবাদের প্রস্ফুটিত কুসুম" কাহাকে বলা হয় ? (গ) লুই কসাথ কোন দেশের নেতা ছিলেন ? (ঘ) স্ট্যাটুটো সংবিধান কে এবং কবে চালু করেন ? (ঙ) ১৮৪৮ খ্রীঃ বিপ্লবে কোন শ্রেণী প্রাধান্য পায় ? (চ) শহুরে বিপ্লব কাহাকে বলে ?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ

(ক) ফেব্রুয়ারী বিপ্লবে শিল্প-বিপ্লবের কি প্রভাব ছিল ? (খ) জার্মানীতে ফেব্রুয়ারী বিপ্লব কিভাবে কার্যকরী হয় ? (গ) ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেণ্ট সম্পর্কে যাহা জান লিখ। (ঘ) অষ্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যে ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের কি প্রভাব দেখা যায় ? (ঙ) ফেব্রুয়ারী বিপ্লবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভূমিকা আলোচনা কর। (চ) ফেব্রুয়ারী বিপ্লবে কি আদর্শবাদ প্রাধান্য পায় তাহা আলোচনা কর। (ছ) ফ্রান্সে ও ইওরোপে ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের কি ফল দেখা যায় ?

৩। ১৮৪৮ খ্রীঃ "বিপ্লবের বৎসর" বলা হয় কেন ?

৪। ১৮৪৮-৫০ খ্রীঃ ইওরোপের জ্যাতীয়তাবাদী বিপ্লবের পরিচয় দাও।

৫। ১৮৪৮-৫০ খ্রীঃ বিপ্লবের প্রকৃতি ও ফলাফল আলোচনা কর।

৬। ১৮৪৮ খ্রীঃ বিপ্লবের কারণ ও ইহার ব্যর্থতা ব্যাখ্যা কর।

অষ্টম অধ্যায়

১। এক কথায় উত্তর দাও ঃ

(ক) "ইওরোপের রুগ্ন মানুষ" কাহাকে বলা হয় ? (খ) ব্যালাক্লাভার যুদ্ধ কোথায় হয় ? (গ) প্যারিসের সন্ধি (১৮৫৬ খ্রীঃ) কোন যুদ্ধের পর হয় ? (ঘ) নেপোলিয়নের ভাবধারা (Ideas of Napoleon) গ্রন্থ কে লেখেন ? (ঙ) 'অশ্বারোহী সেণ্ট সাইমন' কাহাকে বলা হয় ? (চ) 'ক্ষুদ্র নেপোলিয়ন' কাহার নাম ? (ছ) কবডেন চুক্তি কে সম্পাদন করেন ? (জ) কার্বোনারী দল কোথায় গড়িয়া উঠে ? (ঝ) ইয়ং ইতালী দল কে গড়েন ? (ঞ) প্লমবিয়ারের গোপন চুক্তি কাহারা সম্পাদন করে ? (ট) লাল কোর্তা বাহিনী কে গড়েন ? (ঠ) জোলভেরাইন কোন খ্রীঃ কোথায় স্থাপিত হয় ? (ড) জোলভেরাইন কি এবং ইহার উদ্ভাবন কর্তা কে ? (ঢ) "রক্ত ও লৌহ নীতির" প্রবক্তা কে ? (ণ) অষ্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধ বা স্যাডোয়ার যুদ্ধ কোন খ্রীঃ ঘটে ? (ত) সেডানের যুদ্ধ কোন খ্রীঃ হয় ? (থ) মেইনজ প্রস্তাব কে করেন ? (দ) এমস টেলিগ্রাম কে করেন ?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ

(ক) পূর্বাঞ্চল সমস্যা কি ? (খ) গ্রোটোর চাবির সমস্যা কি ? (গ) তৃতীয় নেপোলিয়ন কেন ক্রিমিয়ার যুদ্ধে যোগ দেন ? (ঘ) প্যারিসের সন্ধির শর্তগুলি কি ? (ঙ) ইওরোপে জাতীয়তাবাদী বিপ্লবের সাফল্যের যুগ বলিতে কি বুঝায় ? (চ) তৃতীয় নেপোলিয়নের শাসন নীতি কি ছিল ? (ছ) তৃতীয় নেপোলিয়নের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারগুলি আলোচনা কর। (জ) তৃতীয় নেপোলিয়নের বৈদেশিক নীতির লক্ষ্য কি ছিল ? (ঝ) ইয়ং ইতালী দলের আদর্শ ও সংগঠন ব্যাখ্যা কর। (ঞ) কাভুরের কর্মপন্থা ও আদর্শ ব্যাখ্যা কর। (ট) জার্মান জাতীয়তাবাদের উদ্ভবে বুদ্ধিজীবিগণের কি অবদান ছিল ? (ঠ) জোলভেরাইন ও ফ্রাংকফুর্ট পার্লামেণ্টের অবদান আলোচনা কর। (ড) অষ্ট্রো-প্রাশিয় যুদ্ধ (১৮৬৬ খ্রীঃ) সম্পর্কে যাহা জান লিখ। (ঢ) ফ্রাঙ্কো-প্রশিয় যুদ্ধের কারণ লিখ। (ণ) ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয় যুদ্ধের ফল কি ছিল ? (ত) ১৮৭১ খ্রীঃ ইওরোপে কি প্রকার রাজনৈতিক অবস্থা হয় ?

৩। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল আলোচনা কর। ক্রিমিয়ার যুদ্ধ কি অনিবার্য ছিল ?

৪। প্যারিসের সন্ধির দ্বারা পূর্বাঞ্চল সমস্যার কিভাবে সমাধান হয়।

৫। তৃতীয় নেপোলিয়নের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতির বিবরণ দাও।

৬। তৃতীয় নেপোলিয়নের চরিত্র ও কৃতিত্ব ব্যাখ্যা কর।

৭। ইতালীর ঐক্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৮। ম্যাৎসিনী, গ্যারিবল্ডী ও কাভুর কিভাবে ইতালীর ঐক্যের জন্য কাজ করেন তাহা আলোচনা কর।

৯। ইতালীর ঐক্যের পরিপন্থী কারণসমূহ কি ছিল ? ১৮৫৯-১৮৭০ খ্রীঃ ইতালীর ঐক্যের বিভিন্ন পর্যায়গুলি আলোচনা কর।

১০। ইতালীর ঐক্যের জন্য কাভ্যুরের অবদান উল্লেখ কর।
১১। জার্মানীর ঐক্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
১২। বিসমার্ক কিভাবে জার্মানীর ঐক্য সমাধা করেন ? (1979)
অথবা, বিসমার্কের নেতৃত্বে জার্মানীর ঐক্য আলোচনা কর।
অথবা, বিসমার্কের রক্ত ও লৌহ নীতির আলোচনা কর।
১৩। ১৮৭১ খ্রীঃ ইওরোপের যে রাজনৈতিক গঠন হয় তাহা আলোচনা কর।
১৪। ম্যাৎসিনী ও কাভ্যুরের তুলনামূলক আলোচনা কর।
১৫। ইতালীর ঐক্য ও জার্মানীর ঐক্যের তুলনা কর।

নবম অধ্যায়

১। এক কথায় উত্তর দাও ঃ

(ক) জার্মান সাম্রাজ্য বলিতে কি বুঝায় ? (খ) রাইখ ব্যাংক কোন খ্রীঃ কে স্থাপন করেন ? (গ) কুলটুর ক্যাম্প বলিতে কি বুঝায় ? (ঘ) মে আইন কে প্রচলন করেন ? (ঙ) স্টেট সোস্যালিজম বা রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র কে প্রচলন করেন ? (চ) "জার্মানী পরিতৃপ্ত দেশ" ইহা কাহার উক্তি ? (ছ) বিসমার্ক কোন খ্রীঃ পদচ্যুত হন ? (জ) তিন কাইজারের সঙ্ঘ অথবা ড্রে-কাইজার বুন্ড কে স্থাপন করেন ? (ঝ) দ্বিশক্তি মিত্রতা (Dual Alliance) কোন খ্রীঃ, কাহাদের মধ্যে, কে গঠন করেন ? (ঞ) ত্রিশক্তি চুক্তি (Triple Alliance) কাহাদের মধ্যে কে গঠন করেন ? (ট) কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম কোন খ্রীঃ সিংহাসনে বসেন ? (ঠ) ক্রুগার টেলিগ্রাম কে পাঠান ? (ড) বার্লিন-বাগদাদ রেলপথের কে পরিকল্পনা করেন ? (ঢ) প্যান্থার জাহাজ কে কবে কোথায় পাঠান ? (ণ) 'বিসমার্কের যুগ' কোন খ্রীঃ বলা হয় ?

২। এক কথায় উত্তর দাও ঃ

(ক) "মুক্তিদাতা জার" কাহাকে বলা হয় ? (খ) কোন জার ভূমিদাস উচ্ছেদ আইন কোন খ্রীঃ পাশ করেন ? (গ) 'মীর' কাহাকে বলে ? (ঘ) নিহিলিষ্ট বিদ্রোহ কোন জারের আমলে ঘটে ? (ঙ) পোল বিদ্রোহ কোন জারের আমলে ঘটে ? (চ) 'এক জার, এক গীর্জা, এক রাশিয়া' কাহার নীতি ছিল ? (ছ) 'কৃত্রিম সামন্ততন্ত্র' (Bastard feudalism) কে চালু করেন ? (জ) রাসপুটিন কে ছিলেন ? (ঝ) রুশ-জাপান যুদ্ধ কবে হয় এবং ইহাতে কে পরাস্ত হয় ? (ঞ) 'পেট্রোগ্রাড ধর্মঘট' কবে হয় ? (ট) রোমানভ বংশের কবে পতন ঘটে ? (ঠ) শেষ রোমানভ রাজার নাম কি ? (ড) ত্রিশক্তি আতাঁত কাহাদের মধ্যে হয় ? (ঢ) ইঙ্গ-রুশ চুক্তি কবে হয় ? (ণ) 'সশস্ত্র শান্তির যুগ' কোন খ্রীষ্টাব্দকে বুঝায় ?

৩। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ

(ক) ১৮৭১ খ্রীঃ জার্মান শাসনতন্ত্রের বিবরণ দাও। (খ) কুলটুর ক্যাম্প বলিতে কি বুঝায় ? (গ) বিসমার্ক ও সমাজতন্ত্রবাদ সম্পর্কে কি জান লিখ। (ঘ) তিন সম্রাটের চুক্তি কিভাবে গঠিত হয় ? (ঙ) বিসমার্ক কিভাবে রাশিয়াকে নিরপেক্ষ রাখেন ?

(চ) কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের রুশ নীতি কি ছিল ? (ছ) কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের সহিত ইংলণ্ডের সম্পর্ক আলোচনা কর। (জ) জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের ভূমিদাস উচ্ছেদ আইন আলোচনা কর। (ঝ) ১৯০৫ খ্রীঃ রুশ বিপ্লব সম্পর্কে কি জান লিখ। (ঞ) ইংলণ্ড কিভাবে তাহার মিত্রহীনতার অবসান ঘটায় ? (ট) ইওরোপে 'সশস্ত্র শান্তির যুগ' বলিতে কি বুঝায় ?

৪। বিসমার্কের পররাষ্ট্রনীতি আলোচনা কর।

৫। ত্রিশক্তি মিত্রতা চুক্তি কিভাবে গঠিত হয়।

৬। বিসমার্ক কিভাবে জার্মানীকে সংগঠিত করেন ?

৭। বিসমার্কের কৃতিত্ব বিচার কর।

৮। কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের রাজত্বকাল বর্ণনা কর।

৯। জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারকে কেন 'মুক্তিদাতা জার' বলা হয় ? (1979)
অথবা, জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের রাজত্বকাল বর্ণনা কর। তিনি কেন বিফল হন ?

১০। জার দ্বিতীয় নিকোলাসের রাজত্বকাল বর্ণনা কর।

১১। ত্রিশক্তি আতাঁতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও ইহার ফলাফল আলোচনা কর।

১২। ইওরোপে দুই পরস্পর বিরোধী শক্তি জোট কিভাবে গড়িয়া উঠে তাহা দেখাও। ইহাকে "সশস্ত্র শান্তির যুগ" কেন বলা হয় ?

১৩। কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের পররাষ্ট্র নীতি আলোচনা কর। তিনি কিভাবে প্রথম মহাযুদ্ধের জন্য দায়ী ছিলেন তাহা দেখাও।

দশম অধ্যায়

১। এক কথায় উত্তর দাও ঃ

(ক) কার্ল মার্কসের কোন খ্রীঃ কোথায় জন্ম হয় ? (খ) কমিউনিষ্ট ম্যানিফেষ্টো কাহার রচনা ? (গ) মার্কসের লিখিত দুইটি প্রধান গ্রন্থের নাম কর। (ঘ) কোন খ্রীঃ মার্কসের মৃত্যু হয় ? (ঙ) ইতিহাসের বস্তুবাদী ও দ্বন্দ্বমূলক ব্যাখ্যা কে করেন ? (চ) শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার আদর্শ কে প্রচার করেন ? (ছ) প্রথম চীন-জাপান যুদ্ধ কবে ঘটে এবং কি সন্ধি দ্বারা ইহার অবসান হয় ? (জ) তাইপিং বিপ্লব কোথায় ও কবে ঘটে ? (ঝ) তাইপিং বিপ্লবের নেতার নাম কি ? (ঞ) কোন ইংরাজ সেনাপতি তাই পিং বিদ্রোহ দমন করেন ? (ট) লি-হাং-চাং কোন দেশের কোন সময়ে নেতা ছিলেন ? (ঠ) কাং-ইউ-ওয়ে কে ছিলেন ও তাঁহার সংস্কারের নাম কি। (ড) 'একশ দিবসের সংস্কার' কে চালু করেন ? (ঢ) বক্সার বিদ্রোহ কোন খ্রীঃ হয় ? (ণ) "প্রাচীন বুদ্ধ" কাহাকে বলা হয় ? (ত) ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেনের কোন খ্রীঃ জন্ম হয় এবং কোথায় ? (থ) ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেনের মতবাদের নাম কি ? (দ) চীনে প্রজাতন্ত্রী বিপ্লব কোন সালে ঘটে ? (ধ) ১৯১১ খ্রীঃ বিপ্লবের নেতা কে ছিলেন ? (ন) কুয়ো-মিন-তাং এর নেতার নাম কি ? (প) চীনে কমিউনিষ্ট দল কোন খ্রীঃ গঠিত হয় ? (ফ) কোন

খ্রীঃ চীনে কমিউনিষ্ট বিপ্লব জয়যুক্ত হয় ? (ব) চীনের তিনজন আদি কমিউনিষ্ট নেতার নাম কর। (ভ) ফর্মোসা বা তাই-ওয়ান সরকার কাহাকে বলে ? (ম) ফ্রেডারিক এংগেল কে ছিলেন ?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ

(ক) মার্কসের মতে ইতিহাসের ব্যাখ্যা কি ? (খ) আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদের স্রষ্টা হিসাবে কাহাকে গণ্য করা হয় ? (গ) সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের পার্থক্য কি ? (ঘ) মার্কসের মতে সমাজে শোষণ বন্ধ করিতে হইলে কি করা উচিত ? (ঙ) তাই-পিং বিপ্লবের আদর্শ কি ছিল ? (চ) চীনে আধুনিকীকরণের জন্য সর্বপ্রথম কে সংস্কার করেন ? (ছ) কাং-ইউ-ওয়ের ভাবধারা কি ছিল ? (জ) বক্সার বিদ্রোহের কারণ কি ? (ঝ) সান-ইয়াৎ-সেনের আদর্শ সম্পর্কে কি জান লিখ। (ঞ) চীনে কুয়োমিন তাং ও কমিউনিষ্ট গৃহযুদ্ধ সম্পর্কে যাহা জান লিখ। (ট) মাও-সে-তুং কি পদ্ধতিতে গৃহযুদ্ধে জয়লাভ করেন তাহা ব্যাখ্যা কর। (ঠ) কুয়োমিন তাং রাষ্ট্রের কেন পতন ঘটে ? (ড) জাপানের সহিত যুদ্ধে চিয়াং ও মাও কি পৃথক নীতি নেন ? (ঢ) লং মার্চ কাহাকে বলে ?

৩। সমাজতন্ত্রবাদ কি ? সমাজতন্ত্রবাদের জনক কাহাকে বলা হয় ? ইওরোপে সমাজতন্ত্রবাদের উদ্ভবের ইতিহাস পর্যালোচনা কর।

৪। কার্ল মার্কসের মতবাদ আলোচনা কর।

৫। মার্কস কিভাবে শোষণহীন সমাজ স্থাপিত হইবে বলিয়াছেন তাহা ব্যাখ্যা কর।

৬। বক্সার বিদ্রোহের বিবরণ দাও।

৭। বক্সার বিদ্রোহ সম্বন্ধে কি জান ?

৮। চীনে প্রজাতান্ত্রিক বিপ্লব কেন হয় ? ইহার নায়ক কে ছিলেন ?

৯। সান-ইয়াৎ-সেনের জীবনী ও কার্যকলাপ আলোচনা কর।

১০। ১৯৪৯ খ্রীঃ কমিউনিষ্ট বিপ্লব পর্যন্ত চীনের ইতিহাস বর্ণনা কর।

১১। চীনে কুয়োমিন তাং-এর পতন ও কমিউনিষ্টগণের জয়লাভের কারণ বর্ণনা কর।

১২। কমিউনিষ্ট বিপ্লব চীনে কেন সফল হয় ?

একাদশ অধ্যায়

১। এক কথায় উত্তর দাও ঃ

(ক) নিখিল স্লাভ (Pan Slav) আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষক কোন দেশ ছিল ? (খ) বুলগেরিয়ার অত্যাচার কে করেন ? (গ) সানস্টিফেনোর সন্ধি কোন খ্রীঃ হয় ? (ঘ) বার্লিনের সন্ধি কোন খ্রীঃ হয় ? (ঙ) বার্লিনের বৈঠকে 'নিরপেক্ষ দালাল' কে ছিলেন ? (চ) 'তরুণ তুর্কী' কাহাদের বলা হয় ? (ছ) বলকান লীগ কোন খ্রীঃ গঠিত হয় ? (জ) বলকান যুদ্ধ দুইটি কোন কোন খ্রীঃ ঘটে ?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ

(ক) সর্ব স্লাভ বা নিখিল স্লাভ আন্দোলন সম্পর্কে লিখ। (খ) বুলগেরিয়ার বিদ্রোহ সম্পর্কে কি জান ? (গ) সানস্টিফেনোর সন্ধি সম্পর্কে কি জান লিখ।

(ঘ) বার্লিন চুক্তির মতগুলি কি ছিল ? (ঙ) তরুণ তুর্কী আন্দোলনের বিবরণ দাও। (চ) বলকান লীগের দ্বারা তুরস্কের কিভাবে ব্যবচ্ছেদ হয় ?

৩। বলকান জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও বলকান যুদ্ধের বিবরণ দাও।

৪। বার্লিনের সন্ধির পটভূমিকা আলোচনা কর। এই সন্ধির দ্বারা বলকানে প্রকৃত শান্তি স্থাপিত হয় কিনা দেখাও।

৫। বার্লিনের সন্ধির শর্তগুলি আলোচনা কর। এই সন্ধি কিভাবে প্রথম মহাযুদ্ধের বীজ বপন করে তাহা দেখাও। (1979)

৬। পূর্বাঞ্চল সমস্যা বলিতে কি বুঝ ? বার্লিনের সন্ধির দ্বারা তাহার কিরূপ সমাধান হয় ?

৭। বার্লিন সন্ধির পশ্চাতে ইঙ্গ-রুশ কূটনীতি কিভাবে কাজ করে ?

দ্বাদশ অধ্যায়

১। এক কথায় উত্তর দাও ঃ

(ক) সেরাজেভোর হত্যাকাণ্ড কোন খ্রীঃ হয় ? (খ) ব্রেস্ট লিটভস্কের সন্ধি কোন খ্রীঃ কাহাদের মধ্যে হয় ? (গ) প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিখ্যাত জার্মান সেনাপতির নাম কি ছিল ? (ঘ) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বৎসর কি ? (ঙ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোন খ্রীঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগ দেয় ? (চ) সাবমেরিন দ্বারা শত্রু জাহাজ ডুবাইবার নীতি কোন দেশ নেয় ? (ছ) নেতিবাচক যুদ্ধ কোন দেশ করে ? (জ) লুসিটানিয়া ঘটনা কি এবং ইহার গুরুত্ব কি ? (ঝ) চৌদ্দ দফা দাবির রচয়িতা কে এবং কবে ইহা ঘোষিত হয় ? (ঞ) 'এক জাতি এক রাষ্ট্র' নীতির উদ্ভাবক কে ? (ট) ভার্সাই সন্ধি কোন খ্রীঃ কাহার বিরুদ্ধে করা হয় ? (ঠ) "জবরদস্তি সন্ধি" (Dictated Peace) কাহাকে বলা হয় ? (ড) বলকানাইজেশন কাহাকে বলে ? (ঢ) "এই যুদ্ধই মানবজাতির শেষ যুদ্ধ" ইহা কাহার উক্তি ? (ণ) লীগের সংবিধানের নাম কি ? (ত) P. C. I. J. বলিতে কি বুঝায় ? (থ) 'ইওরোপের রুগ্ন মানুষ' কাহাকে বলা হইত ? (দ) নবীন তুরস্কের সংগঠক কে ? (ধ) কামাল পাশার কবে মৃত্যু হয় ? (ন) প্রথম মহাযুদ্ধের পর তুরস্কের উপর কি কি সন্ধি চাপান হয় ?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ

(ক) সেরাজেভো হত্যাকাণ্ডের গুরুত্ব কি ? (খ) ব্রেস্ট লিটভস্কের সন্ধির তারিখ ও গুরুত্ব আলোচনা কর। (গ) অষ্ট্রো-সার্বিয় বিরোধ কিভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করে তাহা ব্যাখ্যা কর। (ঘ) প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ঘটিবার জন্য উগ্র ও অপরিতৃপ্ত জাতীয়তাবাদ কিরূপ দায়ী ছিল ? (ঙ) কি কি আন্তর্জাতিক ঘটনা প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে ত্বরান্বিত করে ? (চ) ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য কিরূপ দায়ী ছিল তাহা ব্যাখ্যা কর। (ছ) কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের বিশ্ব রাজনীতি বিশ্বযুদ্ধকে কিরূপে ত্বরান্বিত করে ? (জ) প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ্য কি ছিল ? (ঝ) চতুর্দশ দফা কি ছিল ? (ঞ) ভার্সাই সন্ধির ভৌগোলিক

শর্ত কি ছিল? (ট) লীগের আদর্শ কি ছিল? (ঠ) লীগের সাধারণ সভা ও পরিষদের গঠন ও কাজ কি ছিল? (ড) তরুণ তুর্কী আন্দোলন সম্পর্কে যাহা জান লিখ। (ঢ) কামাল পাশার আধুনিক সংস্কারগুলি কি ছিল?

৩। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ আলোচনা কর।

৪। উগ্র জাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ প্রথম মহাযুদ্ধের জন্য কিরূপ দায়ী ছিল?

৫। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য জার্মানীর দায়িত্ব আলোচনা কর।

৬। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেন যোগ দেয় এবং কি ভূমিকা নেয় তাহা আলোচনা কর।

৭। কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম কেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগ দেন? তাহার পরাজয়ের কারণ বর্ণনা কর।

৮। ভার্সাই সন্ধির শর্তাবলী আলোচনা কর। এই সন্ধির বিপক্ষে কি বলা যায়? (1979)

৯। লীগের আদর্শ কি ছিল? লীগের গঠন আলোচনা কর।

১০। কামাল পাশার নেতৃত্বে তুরস্কের প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও নবীন তুরস্কের গঠন আলোচনা কর।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

১। এক কথায় উত্তর দাও ঃ

(ক) কোন বিদ্রোহকে ১৯১৭ খ্রীঃ মহড়া বলা হয়? (খ) 'ভূমি ও স্বাধীনতা' বিপ্লব কোন খ্রীঃ হয়? (গ) নারোদনিক বলিতে কি বুঝায়? (ঘ) ১৯১৭ মার্চ বিপ্লবে কোন শ্রেণী রাশিয়ায় ক্ষমতা পায়? (ঙ) ১৯১৭ খ্রীঃ বিপ্লবে কোন দল ক্ষমতা পায়? (চ) কোল খোজ বা যৌথ খামার কাহাকে বলে? (ছ) লাল ফৌজ (Red Army) কে গঠন করেন? (জ) চেকা কাহাকে বলে? (ঝ) N. E. P. কে প্রবর্তন করেন কোন খ্রীঃ? (ঞ) এপ্রিল থিসিস কে প্রচার করেন?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ

(ক) ১৯১৭ খ্রীঃ বিপ্লবের জন্য রাশিয়ার জারতন্ত্রের দায়িত্ব আলোচনা কর। (খ) ১৯১৭ খ্রীঃ বিপ্লবের প্রাক্কালে রুশ কৃষক ও শ্রমিকের কি অবস্থা ছিল তাহার বিবরণ দাও। (গ) রুশ বিপ্লবে লেনিনের ভূমিকা কি ছিল? (ঘ) ১৯১৭ খ্রীঃ রাশিয়ায় কয়টি বিপ্লব ঘটে এবং কেন ঘটে? (ঙ) বলশেভিক বিপ্লবের পর কিভাবে সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা করা হয়? (চ) N. E. P. ব্যাখ্যা কর।

৩। রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লবের সাফল্যের পশ্চাতে লেনিনের কৃতিত্ব কি ছিল তাহা আলোচনা কর। এই বিপ্লবের ফলাফল কি? (1978)

৪। ১৯১৭ খ্রীঃ বলশেভিক বিপ্লবের কারণগুলির বিস্তারিত আলোচনা কর। এই বিপ্লবের জন্য পূর্ব প্রস্তুতি কি ছিল?

৫। লেনিন কিভাবে রাশিয়ায় সাম্যবাদী বিপ্লব সফল করেন এবং ইহা সংগঠিত করেন তাহা আলোচনা কর।

৬। সাম্যবাদী সংস্কার ও N. E. P. বিস্তারিত বর্ণনা দাও।

৭। লেনিনোত্তর রাশিয়ার অগ্রগতির বিবরণ দাও।

চতুর্দশ অধ্যায়

১। এক কথায় উত্তর দাও ঃ

(ক) র‍্যাপালোর সন্ধি কোন খ্রীঃ স্বাক্ষরিত হয়? (খ) ষ্ট্রাসম্যান কে ছিলেন? (গ) ভাইমার প্রজাতন্ত্র কোন খ্রীঃ স্থাপিত হয়? (ঘ) লোকার্ণো চুক্তি কোন খ্রীঃ স্বাক্ষরিত হয়? (ঙ) পরিপূর্ণতা নীতির উদ্ভাবক কে? (চ) প্যারিসের যুদ্ধ বর্জন চুক্তি কোন খ্রীঃ স্বাক্ষরিত হয়? (ছ) ওয়াশিংটন চুক্তি কোন খ্রীঃ হয়? (জ) লীগ কোন খ্রীঃ বিশ্ব নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন ডাকে? (ঝ) কোন খ্রীষ্টাব্দকে লীগের সর্বোচ্চ মর্যাদার যুগ বলা হয়? (ঞ) জাপান কোন খ্রীঃ মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করে? (ট) ইতালী কোন খ্রীঃ আবিসিনিয়া আক্রমণ করে? (ঠ) জার্মানী কোন খ্রীঃ পোল্যাণ্ড আক্রমণ করে? (ড) I. L. O. কি? (ঢ) ফ্যাসিষ্ট কথাটি কি হইতে উদ্ভুত? (ণ) কোন খ্রীঃ ইতালীতে ফ্যাসিষ্ট শাসন স্থাপিত হয়? (ত) মুসোলিনী কে ছিলেন? (থ) কপোরেট রাষ্ট্রের আদর্শ কে গ্রহণ করে? (দ) ক্ষুদ্র বিশ্বযুদ্ধ বলিতে কোন যুদ্ধ বুঝায়? (ধ) স্পেনের গৃহযুদ্ধে সরকারের বিরুদ্ধে কে যুদ্ধ করেন? (ন) ডাওয়েজ পরিকল্পনা কোন খ্রীঃ হয়? (প) হিটলারের জন্ম কোন খ্রীঃ হয়? (ফ) কোন খ্রীঃ নাৎসীদল জার্মানীতে ক্ষমতা পায়? (ব) ফুয়েরার বলিতে কাহাকে বুঝায়? (ভ) স্বস্তিকা চিহ্ন ও বাদামী রংয়ের পোষাক কোন দল প্রতীক হিসাবে নেয়?

২। এক কথায় উত্তর দাও ঃ

(ক) ইঙ্গ-জার্মান নৌ চুক্তি কোন খ্রীঃ সম্পাদিত হয়? (খ) রোম-বার্লিন অক্ষ চুক্তি কাহাদের মধ্যে হয়? অথবা (গ) অক্ষ শক্তি কাহাদের বলা হয়? (ঘ) হিটলার কোন খ্রীঃ অষ্ট্রিয়া অধিকার করেন? (ঙ) মিউনিখ চুক্তি কোন খ্রীঃ হয়? (চ) রুশ জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি কোন খ্রীঃ স্বাক্ষরিত হয়? (ছ) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধিবার সময় ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন? (জ) তোষণ নীতির প্রবক্তা হিসাবে কাহাকে গন্য করা হয়? (ঝ) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রাশিয়ার শাসকের নাম কি ছিল?

৩। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ

(ক) ফ্রান্স ১৯১৯ খ্রীঃ পর কেন নিরাপত্তার অভাব বোধ করে? (খ) লোকার্ণোর ভাবধারা কি? (গ) লোকার্ণো চুক্তি বলিতে কি বুঝায়? (ঘ) প্যারিসের যুদ্ধ বর্জন চুক্তি কি? (ঙ) লীগের নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণ কমিশনের বিবরণ দাও। (চ) লীগের সাফল্যের যুগ বলিতে কি বুঝায় ইহা ব্যাখ্যা কর। (ছ) লীগের পতনের কারণ কি? (জ) ফ্যাসিষ্ট সংগঠন ইতালীতে কিভাবে করা হয়? (ঝ) স্পেনের

গৃহযুদ্ধের গুরুত্ব কি ? (ঞ) ভাইমার প্রজাতন্ত্রের কেন পতন ঘটে ? (ট) জার্মানীর নাৎসীকরণ কিভাবে করা হয় ? (ঠ) নাৎসী বৈদেশিক নীতির লক্ষ্য কি ছিল ? (ড) মিউনিখ্ চুক্তি কিভাবে হয় ? (ঢ) ইংলণ্ড কেন তোষন নীতি নেয় ? (ণ) রুশ নেতাগণ ১৯৩৯ খ্রীঃ কেন জার্মানীর সহিত অনাক্রমণ চুক্তি করেন তাহা ব্যাখ্যা কর। (ত) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য জার্মানীর দায়িত্ব কি ছিল ?

৪। ফ্রান্সের নিরাপত্তার সমস্যা কি ? লোকার্ণো চুক্তির দ্বারা ইহার কিরূপ সমাধান হয় ?

৫। লোকার্ণো ও প্যারিসের যুদ্ধ বর্জন চুক্তি দুইটির শর্ত ও কার্যকারিতা আলোচনা কর।

৬। আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা কর।

৭। লীগ অফ নেশনশের কৃতিত্ব আলোচনা কর। ইহার কেন পতন ঘটে ? (1979)

৮। লীগ অফ নেশনসের আদর্শ কি ছিল ? ইহা কতদূর সফল হয় তাহা দেখাও।

৯। ইতালীর ফ্যাসিষ্ট শাসন কিভাবে সংগঠিত হয় ?

১০। মুসোলিনীর বৈদেশিক নীতি আলোচনা কর।

১১। স্পেনের গৃহযুদ্ধের বিবরণ দাও। ইহার কি গুরুত্ব ছিল ?

১২। ভাইমার প্রজাতন্ত্রের শাসন সম্পর্কে কি জান লিখ। ইহার কেন পতন ঘটে ?

১৩। জার্মানীতে হিটলার কিরূপে ক্ষমতায় আসীন হন তাহা ব্যাখ্যা কর।

১৪। নাৎসী বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে কি জান লিখ। ইহা কেন প্রথম দিকে সফল হয় ?

১৫। মিউনিক চুক্তি ও রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

১৬। চেম্বারলেইন, হিটলার, মুসোলিনী কিভাবে ১৯১৮ খ্রীঃ ইওরোপের সমস্যার মোকাবিলা করেন ?

১৭। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ আলোচনা কর। এজন্য নাৎসী জার্মানী কিরূপ দায়ী ছিল ?

১৮। চেম্বারলেইন ও দালাদিয়েরের বৈদেশিক নীতি আলোচনা কর।

———

H. S. Questions—1978

HISTORY

(Second Paper)

'ক' বিভাগ

(যে কোনো **চারটি** প্রশ্নের উত্তর লেখ) $4 \times 14 = 56$

১। 'জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী' কাহাদের বলা হয় ? জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি কি ছিল ? $6+8$

২। শিল্প-বিপ্লবের মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা কর। ইহার ফলাফল কি হইয়াছিল ? $7+7$

অথবা

সম্রাট প্রথম আলেকজাণ্ডার এবং প্রথম নিকোলাসের আমলে রুশ দেশের অবস্থার বিবরণ লেখ। $7+7$

৩। ইংলণ্ড ও তাহার উত্তর আমেরিকায় উপনিবেশগুলির মধ্যে কি কি কারণে যুদ্ধ বাধে ? 14

অথবা

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দকে 'বিপ্লবের বৎসর' বলা হয় কেন ? 14

৪। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে বিপ্লব ঘটিল কেন তাহা ব্যাখ্যা কর। 14

৫। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট কি ভাবে ফ্রান্সের সম্রাট হইয়াছিলেন ? তাঁহার সংস্কারগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। $7+7$

৬। ইটালির ঐক্যসাধনের বিভিন্ন পর্যায়গুলি আলোচনা কর। 14

৭। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণগুলি পর্যালোচনা কর। 14

৮। ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবে লেনিনের ভূমিকা কি ছিল ? এই বিপ্লবের ফলাফল কি ? $8+6$

'খ' বিভাগ

(যে কোনো **তিনটি** প্রশ্নের উত্তর লেখ) $3 \times 8 = 24$

৯। ইতিহাসে ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের গুরুত্ব আলোচনা কর। 8

১০। 'কনসার্ট অব্ ইওরোপ' (ইউরোপের ঐক্য) কি কি কারণে ব্যর্থ হয় তাহা বিশ্লেষণ কর। 8

১১। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে 'জুলাই বিপ্লবের' কারণগুলি নির্ণয় কর। 8

১২। মার্কস-প্রবর্তিত সমাজতন্ত্রবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে বুঝাইয়া দাও। 8

১৩। ১৮৭৮ সালে বার্লিন সেটেলমেণ্টের (বার্লিন নিষ্পত্তির) কি কৃতিত্ব ? 8

১৪। রুশ-জাপান যুদ্ধের (১৯০৪—১৯০৫) ঐতিহাসিক তাৎপর্য কি ? 8
১৫। ট্রিপ্‌ল আঁতাত (ত্রিশক্তি-মৈত্রী) কি ভাবে গঠিত হইয়াছিল ? 8
১৬। জার্মানীতে হিটলার কি রূপে ক্ষমতায় আসীন হইলেন, দেখাও। 8

'গ' বিভাগ

(যে কোন **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর লেখ) $5 \times 2 = 10$

১৭। বাস্তিলের পতনের তারিখ কি ? 2
১৮। আমেরিকার গৃহযুদ্ধে কোন কোন দল লিপ্ত ছিল ? 2
১৯। কোন সালে বিসমার্ক ক্ষমতাচ্যুত হন ? 2
২০। ১৯১১ সালে চীন বিপ্লবের নেতা কে ছিলেন ? 2
২১। 'চৌদ্দ দফা দাবি'র রচয়িতা কে ? 2
২২। কামাল আতাতুর্ক কেন বিখ্যাত ? 2
২৩। 'লীগ অব নেশনস'-এর (জাতি-সংঘের) মূল উদ্দেশ্য কি ছিল ? 2
২৪। মুসোলিনি কে ছিলেন ? 2
২৫। যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধে, তখন ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী কে ছিলেন ? 2
২৬। 'মিউনিখ চুক্তিটি' কি ? 2

1979

(Second Paper)

ক—বিভাগ

(যে কোন **তিনটি** প্রশ্নের উত্তর লেখ) $3 \times 16 = 48$

১। প্রাশিয়ার রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডরিককে মহান্‌ বলা হয় কেন ? 16
২। 'ন্যাশনাল কনভেনশন'-এর কার্যাবলী আলোচনা কর। 16
৩। 'কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেম' বলিতে কি বোঝায় ? ইহা কিরূপে নেপোলিয়নের পতন ঘটায় ? $6+10$
৪। বিসমার্ক কি ভাবে জার্মানিকে ঐক্যবদ্ধ করেন ? 16
৫। দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারকে "মুক্তিদাতা জার" বলা হয় কেন ? তাঁহার সংস্কারগুলির ফল কি হইয়াছিল ? $12+4$
৬। বার্লিনের সন্ধির সর্তাবলী সংক্ষেপে বর্ণনা কর। বার্লিনের চুক্তি কি বলকান সমস্যার সমাধান করিতে পারিয়াছিল ? $12+4$
৭। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আধুনিক শক্তি হিসাবে জাপানের অগ্রগতির বিবরণ লেখ। 16
৮। 'লীগ অব নেশনস'-এর ব্যর্থতার কারণগুলি নির্ণয় কর। 16

খ—বিভাগ

(যে কোন তিনটি প্রশ্নের উত্তর লেখ) $3 \times 10 = 30$

৯। ব্রিটেনের বিরুদ্ধে উত্তর আমেরিকার বিদ্রোহী উপনিবেশগুলি কি কি কারণে সফল হইয়াছিল ? 10

১০। ইউরোপের উপর ফরাসী বিপ্লবের (১৭৮৯) প্রভাব সংক্ষেপে আলোচনা কর। 10

১১। ম্যাৎসিনি কে ? তিনি ইতিহাসে কেন বিখ্যাত ? 10

১২। প্রিন্স মেটারনিক-এর উদ্দেশ্য ও কার্যকলাপ কিরূপ ছিল ? 10

১৩। ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা কর। 10

১৪। সান ইয়াত সেনকে আধুনিক চীনের জনক বলা হয় কেন ? 10

১৫। ভার্সাই-এর সন্ধি (১৯১৯) জার্মানির প্রতি কি অবিচার করিয়াছিল ? 10

১৬। 'ফ্যাসিবাদ' বলিতে কি বোঝায় ? মুসোলিনি কি ভাবে ইটালিতে ক্ষমতা দখল করিলেন ? 4+6

গ—বিভাগ

(যে কোন ছয়টি প্রশ্নের উত্তর লেখ) $6 \times 2 = 12$

১৭। কখন কোন সন্ধি দ্বারা সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের অবসান হয় ? 2

১৮। ইউরোপের দুইজন 'জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী'র নাম কর। 2

১৯। কোথায় ও কাহার দ্বারা নেপোলিয়ন চূড়ান্তভাবে পরাজিত হন ? 2

২০। বকসার বিপ্লব কখন ও কোথায় সংঘটিত হয় ? 2

২১। ফ্রান্সে তৃতীয় রিপাবলিক কখন প্রতিষ্ঠিত হয় ? ইহার প্রথম রাষ্ট্রপতি কে ছিলেন ? 2

২২। ইউরোপের ইতিহাসে কোন সময়কাল 'সশস্ত্র শান্তির যুগ' বলিয়া অভিহিত ? 2

২৩। 'ট্রিপ্‌ল অ্যালায়েন্স'-এর স্বাক্ষরকারী ছিলেন কাহারা ? 2

২৪। নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন কোথায় বসিয়াছিল ? ইহার সভাপতি কে ছিলেন ? 2

২৫। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির মিত্রপক্ষ কাহারা ছিল ? 2

২৬। হিরোশিমায় ও নাগাসাকিতে কি হইয়াছিল ? 2

———